তলস্তয় গল্পসমগ্র

[প্রথম খণ্ড]

লেভ্ নিকোলায়েভিচ্ তলস্তয়

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত

ভূমিকা

ডক্টর বিষ্ণু বসু

পরিবেশক

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা—৭০০০০৯

সূচীপত্র

॥ ভাষান্তরিক-এর কথা ॥

লেভ্ তলস্তয়-এর গল্প-উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বাংলা-ভাষান্তর আমার অনেক দিনের স্বপ্ন। মনে পড়ে, পঞ্চাশের দশকে একবার এই দুঃসাহসিক মহৎ কর্মে ব্রতী হয়েও অনিবার্য কারণে ভাষান্তর-প্রচেষ্টা বন্ধ করতে বাধ্য হই। সত্তরের দশকে এই প্রচেষ্টা নতুন করে শুরু করি এবং একটি নির্বাচিত ছোট গল্প সংকলন ও "বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস" সিরিজে Ressurection-এর বাংলা ভাষান্তর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে প্রচুর জন-সমাদর লাভ করে। দুটি খণ্ডে সমাপ্য "তলস্তয় গল্পসমগ্র"-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। তলস্তয়-সাহিত্যের ভাষান্তরের ক্ষেত্রে এটি আমার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। রসিক পাঠকের সহানুভূতি ও সহযোগিতার আশ্বাস পেলে "তলস্তয় উপন্যাস সমগ্র" প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় তলস্তয়-সাহিত্যের ত্রিপাদ-ভূমি পরিক্রমা সম্পূর্ণ করবার বাসনা রইল। জানি না, সে দুঃসাহসিক স্বপ্ন সফল হবে কি না; শুধু জানি, স্বপ্ন মৃত্যুহীন।

খ্যাতিমান অধ্যাপক ডক্টর বিষ্ণু বসু স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। নানাবিধ সহায়তার জন্য শ্রীমান পল্লব রায়কে ধন্যবাদ জানাই।

—শ্রীম

তলস্তয় সম্পর্কে দু-চার কথা

১. সুধিজনেরা বলেন, গত পাঁচশো বছরে পৃথিবীতে এমন চারজন সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের সঙ্গে অন্য কারুর তুলনা চলে না। তাঁরা দেশকালাতীত। সর্বযুগের মানুষের আশা-আকাঙ্খা সাফল্য নৈরাশ্য অসাধারণ ভাষায় তাঁরা প্রকাশ করেছেন। স্ব স্ব দেশকালের গভীরে প্রবেশ করে জগৎ ও জীবনের এক সর্বকালীন সুমহান তাৎপর্য তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। তাই তাঁরা শুধু আপন দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক নন, তাঁরা বিশ্ব শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, এ চারজন হলেন—ইংল্যাণ্ডের শেকস্‌পীয়র, জর্মনীর গ্যেটে, রাশিয়ার তলস্তয় এবং ভারতের রবীন্দ্রনাথ। শেকস্‌পীয়র ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়াযুগের ঐশ্বর্যকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, গ্যেটে বিপুল জনজাগরণের অন্যতম ভাষ্যকার এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতের ক্রান্তিকালীন গভীর উপলব্ধির মহৎ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। এ কারণেই, আচার্য সুনীতিকুমার পুনঃ পুনঃ এঁদের রচনাপাঠ সংস্কৃতিমনস্ক পাঠকের পক্ষে আবশ্যিক মনে করেছিলেন।

ঊনিশ শতকের রাশিয়া মহা ভাগ্যবান। একের পর এক দিকপাল সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাশিয়াকে এক শতকের মধ্যেই দীপ্যমান করে তুলেছিলেন। সাহিত্যের সকল শাখায় সাফল্য দেখা দিলেও উপন্যাসে ও ছোট গল্পে যে অভূতপূর্ব সমারোহ দেখা গিয়েছিল তার নজির পৃথিবীর খুব কম দেশেই পাওয়া যাবে। পুশ্‌কিন, গোগোল, তুর্গেনেভ, দস্তয়ভস্কি, চেকভ, গোর্কি এবং কম বেশি শক্তিসম্পন্ন আরও বহু কথা-সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং এঁদের সকলের শীর্ষে তলস্তয়। তিনি সর্বোত্তম। রুশ সাহিত্যের 'গ্র্যাণ্ড মাস্টার।'

২. কাউণ্ট লেও নিকোলায়েভিচ্‌ তলস্তয় ১৮২৮ সালে ২৮শে অগস্ট ইয়াসিয়ানা পলিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি রাশিয়ার অভিজাতশ্রেণীর অন্যতম একজন ছিলেন। তখনকার রাশিয়া বর্তমানের মতো শিল্পসমৃদ্ধ ছিল না। অভিজাতদের ঐশ্বর্যের জোগান দিত জমি থেকে আয়। কিন্তু তলস্তয় জমিদার হয়েও নিজের শ্রেণী থেকে নিজেকে মুক্ত করার সংগ্রামে আজীবন কাটিয়ে গেছেন। নিজের শ্রেণীকে পরিত্যাগ করা কখনো সহজ হয় না। তলস্তয়ের পক্ষেও বিষয়টি সহজ হয় নি। ফলে সারা জীবন স্বতোবিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। বহু লোকের বাধা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি, জীবনের একটি পর্বে স্ত্রীর বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের অন্বেষা থেকে কখনো বিরত হন নি।

রাশিয়ার কৃষক শ্রেণী তখন জেগে উঠছে। বহু শতাব্দীব্যাপী ভূমি-

দাস প্রথার বিলোপ হলো ১৮৬১ সালে। তলস্তয়ের তখন পূর্ণ যৌবনকাল। তিনি দেখেছেন, আইনত ভূমিদাসপ্রথা লুপ্ত হলেও কৃষকদের দাসত্ব ও দুর্দশা বিন্দুমাত্র কমে যায় নি। তিনি সমাজের এ পুঞ্জীভূত অন্যায় ও বেদনাকে দূর করবার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ চেষ্টা শুধুমাত্র তাঁর লেখনীকে আশ্রয় করে পরিস্ফুট হয় নি। তাঁর জীবনচর্যাও এ মহৎ প্রচেষ্টাকে ব্যক্ত করেছে। নিজের জমিদারী ত্যাগের বাসনা এ জীবনচর্যারই একটি দিক। বিলাসবহুল অভিজাতসুলভ জীবনযাত্রাকে তাই অস্বীকার করে তিনি দরিদ্র 'মুঝিক' (রাশিয়ার চাষী) হতে চেয়েছিলেন। 'আমার জীবনই আমার বাণী'—এ মহৎ বাক্য এ যুগে তাই তলস্তয়ের জীবনেই সর্বাধিক সার্থক হতে পেরেছিল।

৩. লেও তলস্তয় শৈশবেই তাঁর মা-বাবাকে হারান। তাঁর দু-বছর বয়সে মায়ের এবং ন-বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হয়। এক নিকট আত্মীয়ের কাছে তিনি লালিত হন। সে-কালীন রাশিয়ার অভিজাতদের উপযুক্ত শিক্ষা তাঁকে দেওয়া হয়। অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে ফরাসী ও জর্মন ভাষাও শিক্ষা করেন। ষোল বছর বয়সে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা-দান পদ্ধতি তাঁকে খুসি করতে পারে নি। ফলে স্নাতক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে কলেজ ছাড়েন। তারপর থেকে জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এমন কি সেণ্ট পিটার্সবার্গ শহরে জুয়ার আড্ডাতেও তাঁকে দেখা যেতে থাকে। অবশেষে তখনকার রুশ-প্রথা অনুযায়ী সেনা-বাহিনীতে তিনি যোগ দেন। প্রথমে তিনি ককেশাসে প্রেরিত হন। অতঃপর জুনিয়র অফিসার হিসেবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ-ফরাসী-তুর্কীর মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এ সময়কার অভিজ্ঞতা থেকেই রচিত হয় 'সেবাস্তপোলের গল্পসমূহ।' বিভিন্ন প্রণয় ব্যাপারেও তিনি কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার ক্লিয়ার প্লেন্ডর্স্ অঞ্চলে চাষী ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য স্কুলও খুলেছিলেন। এখানেই তিনি তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। একসঙ্গে বহুমুখী কার্যধারা ও তাদের পরস্পরবিরোধী চরিত্র তলস্তয়ের মনে এক জটিল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করেছিল। সারা জীবন তিনি এ দ্বন্দ্ব দিয়ে তাড়িত হয়েছিলেন।

৪. সাহিত্য রচনায় সাফল্য তাঁর প্রথম জীবনেই ঘটেছিল। সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণেও সক্ষম হয়েছিলেন যৌবনকালেই। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবনের যথার্থ সূত্রপাত ঘটে ১৮৬২ সাল থেকে। এ বছরেই তিনি সোফিয়া বেহ্‌রুস নামের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। বয়সে সোফিয়া তাঁর প্রায় অর্ধেক ছিলেন। তখন থেকে তিনি ইয়াসিয়ানা পলিয়ানায় বসবাস করতে থাকেন। এর পর থেকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো প্রকাশিত হতে থাকে।

'দ্য কসাকস্' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে। এ বছরেই শুরু করেন তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ওয়র অ্যান্ড পীস্।' ১৮৭৩ সালে 'আনা কারেনিনা' লেখা শুরু হয়। এ উপন্যাসটি শেষ হবার আগেই তিনি গভীর আত্মিক সংকটে আক্রান্ত হন। এ সংকটের চেহারা কিছুটা ব্যক্ত হয়েছে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত 'কন্‌ফেশন্‌স্' নামের বইতে।

তলস্তয় তাঁর অতীতকে অস্বীকার করলেন। অভিজাত জীবনযাত্রা, তাঁর সম্পত্তি, এমন কি তাঁর এ যাবৎকালের সমগ্র সাহিত্যকীর্তিকেও তিনি অস্বীকার করতে চাইলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল আত্মিক উত্তরণ ও মানবতার সেবা। পরবর্তীকালে যে সকল লেখা লিখলেন, তাঁর মূল কথা হলো তাঁর একান্ত নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি এবং যুক্তিতর্কের অতীত এক পরম বোধের প্রকাশ।

তলস্তয়ের মনের এ পরিবর্তনটি এসেছিল এক প্রবহমান নিরন্তর সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসেবে। একদিকে ফরাসী চিন্তাবিদ রুশোর প্রভাব, অপর দিকে রুশ কৃষকদের সরল জীবনযাত্রার প্রতি গভীর আগ্রহ তলস্তয়কে এ উপলব্ধির সমীপে পৌঁছে দিয়েছিল। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার যে ব্যাপক যন্ত্রমনস্কতা দেখা দিয়েছিল তলস্তয়ের সজাগ মন তার খবর রাখত। তাঁর বিশেষ ধরনের মানসিক গড়ন এ যান্ত্রিকতাকে বরদাস্ত করবার অনুকূলে ছিল না। এ যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতার উপর খড়্গহস্ত তিনি, এমন কি, এ-বোধের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিলেন—সভ্যতা মানেই দাসত্বের শৃঙ্খল। সমাজ নিজের প্রয়োজনে এসব শৃঙ্খল সৃষ্টি করে নিয়েছে। কাজেই সভ্য সমাজ থেকেই যাবতীয় গরল উত্থিত হয়ে মনুষ্যত্বকে গ্রাস করছে। এ সমাজ বেশ কিছু মিথ্যা মূল্যবোধ দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা পড়ে আছে। তার ফলে মানুষের ভেতরকার খাঁটি ভালো গুণগুলো স্ফুরিত হতে পারছে না। তলস্তয় মনে প্রাণে চাইলেন এই সব প্রাথমিক ভালোর কাছে গভীরভাবে ফিরে যেতে। তাঁর পীড়িত বিবেক বার বার সরল সত্যকে অবলম্বন করতে চাইল। তাঁর সামাজিক মর্যাদা আর ঐশ্বর্য তাঁকে নিরন্তর যন্ত্রণাদগ্ধ করতে লাগল। তিনি মনে করলেন, গ্রামের গরীব চাষীদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়ে তাদেরই মধ্যে অভিমানবিহীনভাবে বসবাস করতে পারলে জীবন যথার্থ সার্থক হয়ে উঠতে পারে। সরল গরীব চাষীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে নিহিত রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা।

৫. এ বোধে উপনীত হবার পর স্বভাবতই তলস্তয় তাকে কাজে পরিণত করতে চাইলেন। অবশ্য প্রথমটায় কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে প্রতিষ্ঠিত সংসারের কাঠামোটাকে ভাঙতে চান নি তিনি। পারিবারিক জীবনের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে তিনি একজন ভদ্র কৃষক হতে চাইলেন।

এ সাধনা নেহাৎ সহজ ছিল না। পরিজন, বিশেষ করে স্ত্রী, এমন জীবন-যাত্রা পদ্ধতিকে সহজে মেনে নিতে পারলেন না। পারা সম্ভবও ছিল না। এর ফলে তাঁর মনে যে নিদারুণ মানসিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল, তার পরিচয় সমকালীন সাহিত্যকীর্তিতে উজ্জ্বলভাবে ধরা আছে।

মনের এ পর্যায় নিয়ে তলস্তয়ের প্রায় পনেরো বছর কেটেছিল। বলা যায়, ১৮৮০ সালের পর থেকেই এ পর্যায়ের শুরু। এ সময়ে এক অসহ্য অপরাধবোধ তাঁকে অবিরত পীড়ণ করত। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে চাইতেন এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে সন্তসুলভ ধৈর্যে এক গভীর উপলব্ধির জগতে পৌঁছে যেতে। নিজেকে উত্তীর্ণ হবার মহৎ সাধনায় নিজেকে তিনি তখন নিযুক্ত রেখেছিলেন।

কিন্তু এ দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলা তাঁর পক্ষে অসহ্য হলো। তিনি বুঝলেন, এভাবে সমন্বয় করে সত্যকে পাওয়া সহজ নয়। তাই এবার, জীবনের শেষ পর্বে, চাইলেন সংসার সমাজ পরিজন সম্পদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মুক্ত সরল জীবনে আশ্রয় নিতে। তখন কিন্তু তাঁর পুত্রকন্যার সংখ্যা তেরো এবং অনেকেই তাদের মধ্যে সাবালক। এমন কি নিজস্ব সম্পত্তি সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হতে চাইলেন তিনি। এই নিয়ে পরিবারের সকলের সংগে, বিশেষ করে, স্ত্রীর সঙ্গে বাধল তাঁর প্রচণ্ড বিরোধ। যে স্ত্রী যৌবনকালে স্বামীর লেখা বৃহত্তম উপন্যাস 'সংগ্রাম ও শান্তি'-র পাণ্ডুলিপি অসংখ্যবার অনুলিপি করে দিয়েছিলেন, তিনিই স্বামীর যাবতীয় ধ্যানধারণা ও সাহিত্যকীর্তির বিরোধী হয়ে উঠলেন। মনান্তর এমন পর্যায়ে পৌঁছোল যাতে সোফিয়া কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করলেন। নিজের সুকঠিন মানসিক সংকট এবং স্ত্রীর সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্ব বিরাশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ তলস্তয়কে বাধ্য করল ইয়াসিয়ানা ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমাতে। কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও ট্রেনে শুরু হল তাঁর দীর্ঘ পথযাত্রা। অবশেষে অস্তাপোভো স্টেশনে এসে আর চলতে পারলেন না। নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ইয়াসিয়ানায় খবর পৌঁছোল। কাউণ্টেস সোফিয়া পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে অখ্যাত স্টেশনে এসে পৌঁছোলেন। কিন্তু তলস্তয় আর বেশীদিন পৃথিবীতে রইলেন না। কাউণ্টেস ও তাঁর পরিজনেরা এসে পৌঁছোবার তিনদিন পর ভোরে ৬·০৫ মিনিটে মৃত্যু হল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক লিও তলস্তয়ের। সেদিন নভেম্বরের ২৩ তারিখ, ১৯১০ সাল। যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হলো ইয়াসিয়ানায়। কোনো রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই তাঁকে সমাহিত করা হলো। ইয়াসিয়ানায় তলস্তয় স্মৃতি ভবন গড়ে উঠল। ইয়াসিয়ানা পলিয়ানা আজ সোভিয়েত রাশিয়া তথা পৃথিবীর অন্যতম তীর্থস্থান।

৬. তলস্তয়ের সমগ্র কথাসাহিত্যকে প্রবণতা অনুযায়ী মোট দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে অভিজাত শ্রেণীর সমারোহপূর্ণ জীবন-যাত্রার অন্তরালে তীব্র বাসনা ও নৈতিক সংকট, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সহজ সরল দৈনন্দিন জীবনে পরম উপলব্ধির বিকাশ। একদিকে 'আনা কারেনিনা' বা 'রেজারেক্সন' জাতীয় উপন্যাস এবং 'আফটার দ্য বল' বা 'ক্রুয়েৎসার সোনাটা' জাতীয় গল্প, অন্যদিকে 'ইয়ার্ডস্টিক' বা 'হোয়র লাভ ইজ' শ্রেণীর রচনা। এবং সর্বোপরি রয়েছে তাঁর মহত্তম কীর্তি 'সংগ্রাম ও শান্তি'—যাকে কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আঁটানো যায় না।

'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের শুরুর বাক্যটি স্মরণ করা যাক। 'সুখের সাধারণ চেহারা সবখানে এক, দুঃখের অভিব্যক্তি প্রতি পরিবারে পৃথক।' এই সামান্য সূত্রের বৃহৎ ভাষ্য রচনা করেছে গোটা উপন্যাসটি। বিবাহ, প্রেম, পরিবার প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠান সমাজের তথাকথিত কাঠামোটাকে ধরে রাখে তা যে কত অন্তঃসারশূন্য 'আনা কারেনিনা' সেকথা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একদিকে আনা কারেনিনার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রবল অভীপ্সা অবৈধ প্রণয়ের মধ্যে আত্মহননের বীজ বুনে চলে, অন্যদিকে লেভিন-এর ক্রমাগত অন্বেষা ও হতাশা শেষ পর্যন্ত মুক্তির আলো দেখতে পায় বুড়ো চাষীদের সহৃদয় সান্নিধ্যে। এই দ্বিধাহীন পক্ষপাত লেখক হিসাবে তলস্তয়কে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয় যা একান্তই তলস্তয়ী-বিশ্ব বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। 'রেজারেক্সন' উপন্যাসেও লক্ষ্য করি, অপরাধ ও অনুতাপের টানাপোড়েনে ব্যক্তিহৃদয় কেমন বিদীর্ণ হতে পারে! নায়ক নেখলিউদফ্ আত্ম শোধনের পন্থা বেছে নিতে যে দুরূহ কষ্ট ও শাস্তি বরণ করেছে তা একান্তভাবে তলস্তয়ের সমকালীন মানসিক প্রবণতার পরিচয় দেয়। তাছাড়া, এ উপন্যাসে রুশ সরকারী মহলের অবক্ষয়ের চিত্র, উচ্চ পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতি এবং চার্চের অন্যায়ের প্রতি সুগভীর ঘৃণা এ উপন্যাসটিকে বিশ্বসাহিত্যে স্মরণীয় করে রেখেছে। অভিজাতমহলের অন্তঃ-সারশূন্যতা, অন্যান্য উপন্যাসের মতো, এখানেও বিশ্বাসযোগ্য চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। এই চেহারার ভিতর দিয়েই তলস্তয়ের মানসিক প্রবণতা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

অভিজাত মহলের এ চেহারার বিপরীতে তিনি স্থাপন করেছেন সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখদুঃখ মাখানো তরঙ্গিত জীবন। 'ক্রুয়েৎসার সোনাটা' থেকে 'হোয়র লাভ ইজ'-য়ের জগৎ একেবারেই আলাদা। মন্ত্রের মতো উচ্চারণে তলস্তয় এখানে জীবনসত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। তলস্তয় 'কনফেশনস' নামের আত্মকাহিনীতে ব্যক্ত করেছেন 'আনা কারেনিনা' লেখার পর তাঁর মনে এক দুরূহ দুঃখ ও হতাশা চেপে বসেছিল এবং তা থেকে উদ্ধার পাবার

জন্য প্রায়শই তিনি আত্মহননের চিন্তা করতেন। এমন কি, দুর্বল মুহূর্তে পাছে গলায় দড়ি দিয়ে বসেন অথবা নিজের শরীরে গুলি বিঁধিয়ে দেন সেজন্য গৃহস্থালীর কোন দড়ির সংস্পর্শে তিনি আসতেন না এবং শিকারে যাওয়াও একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মনের এ অবস্থায় তিনি আশ্রয় নিলেন এমন সব গল্প রচনায় যেগুলো নম্র বেদনায় মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে। এসব গল্পের কয়েকটি হয়তো তাঁর মৌলিক উদ্ভাবন নয়। বেশ কিছু আছে বিদেশী গল্পের স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন অনুবাদ, (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'হোয়র লাভ ইজ'-য়ের উৎস একটি ফরাসী গল্প। এ কারণে, এ সব গল্প প্রকাশিত হবার পর একটি রুশ পত্রিকার সমালোচনায় তলস্তয়ের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল), ভাষান্তরেও তাদের মৌল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চাপা পড়ে থাকে নি। তলস্তয় বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষের আড়ম্বরহীন জীবনে এমন ধর্মের মোড়কে মোড়া চিরন্তন সত্য সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া, কিছু তুর্কী যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গেও তাঁর এ বিষয়ে কিছু কথা হয়েছিল। এসব যুদ্ধ বন্দীদের তুলা ও ইয়াসিয়ানা পলিয়ানার অন্তর্বর্তী অঞ্চলের এক পরিত্যক্ত চিনিকলে রাখা হয়েছিল। তলস্তয় বিস্মিত হয়ে দেখেছিলেন, প্রত্যেকটি বন্দীর কাছে একটি করে কোরাণ রয়েছে। তাই বলে তিনি কিন্তু প্রচলিত ধর্ম ও তার অবক্ষয়ী আচার সমূহকে কখনো বড় করে দেখান নি। বরং তাদের দুরন্ত ব্যঙ্গে বিধ্বস্ত করেছেন। প্রসঙ্গত থ্রি লিট্‌ল্ হার্মিট'-য়ের কথা বলা যায়। ধর্ম প্রচারকের অহং তিনটি তথাকথিত 'অ-ধার্মিক' মানুষের অলৌকিক সরলতার কাছে কতটা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

এমন দুটি বিপ্রতীপ বিশ্ব পাশাপাশি রেখে তলস্তয় পাঠককে আহ্বান করেন সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছোতে। এ উভয় কোটির বাইরে রয়েছে তলস্তয়ের মহত্তম রচনা 'সংগ্রাম ও শান্তি।' ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সঞ্চরমান মানুষের সুখদুঃখের আলেখ্য এ উপন্যাসটি। এখানেও তলস্তয় দেখিয়েছেন নেপোলিয়ানের মত দুর্ধর্ষ ব্যক্তিও ইতিহাসের নিয়ামক নন। ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে চলে পিয়ের, আন্দ্রেই, নাতাশা এবং আরও অসংখ্য সাধারণ মানুষ। তাদের আশা আকাঙ্খা ভালোবাসাগুলোই চিরকাল বেঁচে থাকে।

৭. তলস্তয়ের মধ্যে এক প্রচণ্ড স্ব-বিরোধিতার সন্ধান পেয়েছিলেন লেনিন। তলস্তয়ের দর্শনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য কম নেই। কিন্তু এটাই তো স্বাভাবিক। যে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করে এসেছেন, দেশের মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে আদ্যন্ত সুগভীরভাবে জড়িয়ে আছে, তার যাবতীয় উত্থান পতনের মধ্যে নিজের মতো করে নিজেকে নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন, তার মধ্যে কিছু স্ব-বিরোধিতা আসা স্বাভাবিক। ঊনিশ শতকে রাশিয়ার সমাজ ও রাজ-

নৈতিক জীবন যথার্থই বজ্রগর্ভ ছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রস্তুতি হিসেবে পুরো বিগত শতকটি অস্থির থাকতে বাধ্য হয়েছিল। তাই যুযুধান শক্তিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিন্যাস ঘটছিল। তলস্তয়ের নিপুণ পর্যবেক্ষণ এসব বিন্যাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে তৎপর ছিল। এ প্রসঙ্গে লেনিনের সিদ্ধান্ত স্মরণীয়: একজন মহান শিল্পী তাঁর রচনাবলীতে 'বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর অন্তত কয়েকটি দিককেও প্রতিফলিত করবেন।' তলস্তয় অবশ্যই প্রতিফলিত করেছেন এবং তা করেছেন সুগভীর প্রত্যয় ও ক্ষমতার সঙ্গে। বিপ্লব সরল পথে আসে না। বহু বিষয়ের জটিল টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হলো বিপ্লব। যথার্থ মহৎ শিল্পী না হলে তার সমগ্র আলো আঁধারি উপযুক্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। অভ্রান্ত ক্রান্তদর্শী মনীষীর মতো তলস্তয় বুঝেছিলেন কালের গতি কোন্ দিকে ঘুরছে, রথের রশি কাদের হাতে। তাই তিনি নিজের জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে বার বার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন কোন্ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া উচিত। এই ঔচিত্য কোন উপদেশের আকারে আসে নি। জীবনের আশ্চর্য প্রতিফলন পাঠককে এ বিষয়ে আপনিই সচেতন করে তুলেছে। ১৮৮৬ সালেই তিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন: 'হোয়াট মাস্ট বি ডান, দেন?'—'তাহলে কি করতে হবে?' সারাদিন একজন মানুষকে কেমন করে কাটাতে হবে, তার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। প্রাতরাশের আগেকার কাজগুলো হবে এমন যাতে মাথার ঘাম পায়ে পড়ে এবং তা আক্ষরিক অর্থে। এ পর্যায়ের কাজ হলো লাঙল চালানো, রাখালি, কুয়ো-খোড়া, বাড়ী তৈরি প্রভৃতি। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে করতে হবে আঙুল ও কব্জির জোর বাড়ানোর কাজ অর্থাৎ জামাজুতো সেলাই করা, বাসন তৈরি এবং অনুরূপ অন্য কিছু হাতের কাজ। মধ্যাহ্ন থেকে সন্ধ্যার মধ্যে করা উচিত বুদ্ধিবৃত্তির চাষ, কল্পনার যাতে বিকাশ ঘটতে পারে এমন শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন। সন্ধ্যাটি উৎসর্গিত হবে সামাজিক মেলামেশার জন্য।

শুধুমাত্র উপদেশ বা অনুশাসনের মধ্যে তলস্তয় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। নিজের জীবনে আচরণে তাকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন তিনি। প্রাত্যহিক কায়িক শ্রমের সাহায্যে তিনি প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ ও মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমকালীন ঔপন্যাসিক দাদিলিয়েভ্স্কিকে তলস্তয় বলেছিলেন, 'ঋতু অনুযায়ী প্রতিদিন আমি হয় নিজের হাতে চাষ করি ও বীজ বুনি অথবা করাত দিয়ে কাঠ চিরি বা কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটি। কখনো কাস্তে বা নিড়ানির কাজ, আবার কখনো

বাসন তৈরির কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। তুমি ভাবতে পারবে না কী আনন্দ পাওয়া যায় নিজের হাতে চাষ করলে…কি করে যে ঘণ্টাগুলো কাজের ভেতর দিয়ে কেটে যায় তা টেরই পাওয়া যায় না। ফলে, প্রতিটি শিরায় রক্ত চলাচলের মধ্যে খুসীর স্রোত অনুভব করা যায়। মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে আসে। নিজেকে হাল্কা মনে হয়। খিদেও পায় প্রচুর। ঘুমটি হয় জব্বর।'

তলস্তয়ের এ নির্দেশ সকলের পক্ষে মেনে চলা অবশ্যই সহজ নয়। তলস্তয় কিন্তু যথার্থই বিশ্বাস করতেন এ পথেই মানুষের সামাজিক ও আত্মিক মুক্তি ঘটবে। তাছাড়া, তিনি আরও বিশ্বাস করতেন উপনিষদের সেই মহৎ বাণী—(অবশ্য উপনিষদ তিনি পড়েছিলেন কি না জানি না) 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা'—'ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর।' ত্যাগের অভীপ্সা তাঁকে এমন তাড়া করে ফিরেছিল যে এক সময় তিনি ভেবেছিলেন তাঁর গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব তিনি বিলিয়ে দেবেন। এ নিয়েও তাঁর পরিবারে কম অশান্তি ছিল না। লিখে রোজগার করাকেও তিনি আর পছন্দ করতেন না। এমন কি, 'রেজারেকসন'-য়ের মতো মহৎ উপন্যাসটিকেও তিনি প্রকাশ করতে চান নি। দুখোরবদের সাহায্য করবার জন্য শেষ পর্যন্ত বইটি ছাপাতে রাজী হয়েছিলেন বাইশ হাজার রুবলের বিনিময়ে। পুরো টাকাই তিনি দান করে দিয়েছিলেন।

এই হলেন তলস্তয়। এ যুগের মহত্তম লেখকদের একজন। ত্যাগ ও শ্রমের গুণগানে তিনি অহরহ সোচ্চার। রাশিয়ার পরিবর্তনে এ দুটি গুণের প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশি।

এবং বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তনের জন্যও বটে।

বিষ্ণু বসু

দুই হুজার*

Two Hussars

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, যখন কোন রেলপথ বা রাজপথ ছিল না, গ্যাস বা অনুরূপ কোন আলো ছিল না, স্প্রিংয়ের গদি-আঁটা সোফা বা বার্নিশবিহীন আসবাবপত্র ছিল না, যখন চোখে এক চশমা-পরা মোহমুক্ত যুবকের দল ছিল না, আজকের মত দলে দলে 'নিপুণিকা চতুরিকার দল' গজিয়ে ওঠে নি—সেই নির্দোষ যুগে যখন মস্কো থেকে সেণ্ট পিতার্সবার্গ যেতে হলে গরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়িতে এক গাদা রান্না-করা খাবার বোঝাই করে ভাজা কাটলেট, গরম 'বুবুলিকি' আর ভালদাই গাড়ির ঘণ্টার উপর ভরসা করে আট দিন আট রাত ধুলো-ওড়া বা কাদা-মাখা রাস্তায় গাড়ি চালাতে হত—যখন হেমন্তের দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলোতে মোমবাতির ধোঁয়াটে আলো একটা পরিবারের সমবেত বিশ বা ত্রিশজন সদস্যের উপর ছড়িয়ে পড়ত, যখন বল-রুমের সুদৃশ্য দীপাধারগুলো মোম ও চর্বির বাতিতে পূর্ণ থাকত এবং আসবাবপত্র থাকত সুসমঞ্জসভাবে সাজানো, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের যৌবনের পরিচয় বহন করত তাঁদের মুখে বলিরেখা ও মাথায় পাকা চুলের অভাব তো বটেই, আর সেই সঙ্গে মহিলাদের কেন্দ্র করে তাদের দ্বৈত-যুদ্ধ এবং আকস্মিকভাবে বা অন্য কারণে পড়ে-যাওয়া রুমাল কুড়িয়ে দেবার জন্য ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে তাঁদের লম্ফঝম্পের তৎপরতা; যখন আমাদের মায়েরা মস্ত বড় আস্তিনওয়ালা উঁচু-কোমর গাউন পরত আর ভাগ্যের দোহাই দিয়েই সব পারিবারিক সমস্যার সমাধান করত; যখন মনোহারিণী চতুরিকা'রা দিনের আলো থেকে দূরে সরে থাকত—ইটের তৈরি বাড়িঘর, মার্টিনিস্ট, এবং তুগেনবুন্দদের সেই নির্দোষ যুগে, মিলোরাদোভিচ, দেভিদভ ও পুস্কিনদের সেই কালে সরকারী কর্ম-কেন্দ্র কে-শহরে ধনী ভূস্বামীদের এক জমায়েত হয়েছে, এবং অভিজাতদের চূড়ান্ত প্রতিনিধি-নির্বাচন সবে সমাপ্ত হয়েছে।

---

* অশ্বারোহী সৈনিক

॥ ১ ॥

"ঠিক আছে, দরকার হলে আমি সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটাতেই থাকব," যুবক অফিসারটি কথাগুলি বলল। তার পরনে লম্বা কোট, মাথায় সৈনিকের টুপি। এইমাত্র স্লেজ-গাড়ি থেকে নেমে কে-শহরের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সুন্দর সরাইখানায় সে ঢুকেছে।

"মহামান্য প্রভু, বড় বেশী লোক জমায়েত হয়েছে, ব্যাপারটা একটু অসাধারণ," ছোকরা চাকরটা কথাগুলি বলল। অফিসারের চাকরের কাছ থেকে সে ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছে যে এই লোকটিই কাউণ্ট তুরবিন, আর সেই জন্যই তাকে "মহামান্য প্রভু" বলে সম্বোধন করেছে। "আফ্রেমোভ্‌স্কায়া-জমিদারীর কর্ত্রীঠাকরুণ আজ সন্ধ্যায়ই মেয়েদের নিয়ে চলে যাবেন বলে কথা দিয়েছেন, কাজেই আপনি যদি চান তো আপনাকে এগারো নম্বর ঘরে তুলতে পারি," কাউণ্টের আগে আগে দালানের সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে নামতে সারাক্ষণ তাঁর দিকে চোখ রেখে সে বলল।

সর্বসাধারণের ঘরটায় জার আলেকজান্দারের একখানি কাল-জীর্ণ পূর্ণাবয়ব ছবির নীচেকার ছোট টেবিলটায় বসে জনাকয় লোক শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছিল। দেখলেই বোঝা যায় তারা স্থানীয় ভদ্রসমাজের লোক; আর তাদের কাছেই ছিল গাঢ় নীল আলখাল্লা পরা একদল ভ্রাম্যমান বণিক।

মস্ত বড় ধূসর রঙের কুকুর ব্লুইশারকে ডেকে নিয়ে কাউণ্ট ঘরের মধ্যে ঢুকে কোটের কলারে জমাট হিম-কণা গলবার আগেই সেটাকে ছুঁড়ে দিল। তারপর ভদ্‌কার অর্ডার দিয়ে নীল সাটিনের জামা পরেই টেবিলে বসে ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টের সুঠাম দেহ ও খোলা মুখ দেখে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে এক গ্লাস শ্যাম্পেন খাবার প্রস্তাব করল। কাউণ্ট ভদ্‌কার গ্লাসটা সরিয়ে রেখে নতুন পরিচিত জনদের আপ্যায়নের জন্য আর একটা বোতলের অর্ডার দিল। ঠিক সেই সময় একপাত্র পানীয়ের জন্য টাকা চাইতে স্লেজ-চালকটি এসে হাজির হল।

কাউণ্ট চেঁচিয়ে বলল, "সাশ্‌কা! এটা ওকে দিয়ে দে!"

চালকটি সাশ্‌কার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই তার খোলা মুঠোয় মুদ্রাটা নিয়ে ফিরে এল।

"দেখুন মহামান্য প্রভু, আপনার জন্য আমি এত খাটলাম, আপনিও আধ রুবল দেবেন কথা দিয়েছিলেন, আর ও এখন দিচ্ছে মাত্র সিকি রুবল!"

"সাশ্‌কা, ওকে এক রুবল দিয়ে দে!"

সাশ্‌কা বেজার মুখে চালকের বুটজোড়ার দিকে তাকাল।

খাদে গলা নামিয়ে সে বলল, "ওর পক্ষে এই যথেষ্ট। তাছাড়া, আমার কাছে আর টাকা নেই।"

কাউণ্ট থলি থেকে দুখানা পাঁচ রুবলের নোট (থলির শেষ সম্বল) বের করে একখানা স্লেজ-চালককে দিল। সেও তার হাত চুম্বন করে চলে গেল।

"আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি!" কাউণ্ট বলল। "আমার শেষ পাঁচটি রুবল।"

"আপনি একজন সত্যিকারের 'হুজার'।" ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন সহাস্যে বলে উঠল। তার গোঁফ, তার কণ্ঠস্বর, তার দুই পায়ের একটা বিশেষ চলার ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায় সে একজন অবসরপ্রাপ্ত অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার। "আপনি কি এখানে অনেক দিন থাকবেন কাউণ্ট?"

"কিছু টাকার দরকার না হলে মোটেই থাকতাম না। এই বাজে সরাইখানাটায় আবার একটা ঘরও নেই। উচ্ছন্নে যাক!"

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বলল, "ইচ্ছা করলে আপনি আমার সঙ্গে আমার ঘরে থাকতে পারেন কাউণ্ট। আমি সাত নম্বরে আছি। আমার সঙ্গে থাকতে কোন আপত্তি না হলে এখানে তিন দিন থাকতে পারেন। আজ রাতে সমাবেশ-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা মার্শাল একটি বল-নাচের আয়োজন করেছেন। আপনি তাতে যোগ দিলে তিনি খুশি হবেন।"

দলের অপর একটি সুন্দর যুবক বলে উঠল, "সত্যি কাউণ্ট, থেকে যান। আপনার আর তাড়া কিসের? তাছাড়া, এই সব নির্বাচন তো প্রতি তিন বছরে মাত্র একবারই হয়ে থাকে। অন্তত আমাদের যুবতী মহিলাদের তো একবার চোখের দেখাও দেখতে পাবেন কাউণ্ট।"

কাউণ্ট উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সাশা, আমার জামা-কাপড় বের করে দে। আমি স্নানের ঘরে চললাম। তারপর দেখা যাক—হয় তো মার্শালের আসরে একবার ঢু মারব।"

একটি পরিচারককে ডেকে কি যেন বলতেই মুখ টিপে হেসে সে জবাব দিল, "সব কিছুই সম্ভব মহামান্য প্রভু।" তারপর সে বেরিয়ে গেল।

বাইরের দালান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাউণ্ট বলল, "তাহলে আমার পোর্ট-ম্যাণ্টোটা আপনার ঘরেই রাখতে বলছি।"

দরজার কাছে ছুটে গিয়ে অফিসারটি বলল, "এটাকে আমি পরম অনুগ্রহ বলেই মনে করব। সাত নম্বর ঘর, ভুলে যাবেন না।"

কাউণ্টের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই অফিসারটি টেবিলে ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারটিকে কেরাণীর আরও কাছে টেনে নিয়ে সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল:

"ঠিক সেই লোক।"

"বলেন কি!"

"আমি বলছি, ঠিক সে—দ্বৈত-যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত সেই হুজার।...

তুরবিন, সকলেই তাকে চেনে। বাজি ধরে বলছি সে আমাকে চিনতে পেরেছে—নির্ঘাৎ চিনেছে। লেবেদিয়ানে তিন সপ্তাহব্যাপী যে মদ্যপানোৎসব হয়েছিল তাতে সে আর আমি গিয়েছিলাম। নতুন ঘোড়া সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল—তার জন্য দায়ী ছিলাম সে আর আমি, সেই জন্যই সে আমাকে না চিনবার ভাণ করেছে। ভারি ভাল লোক, না?"

সুদর্শন যুবকটি বলল, "সত্যি ভাল লোক। আর কী চমৎকার আদব-কায়দা! উনি যে ও রকমটা ছিলেন তা কেউ ভাবতেই পারবে না! আর কত তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাকে তো পঁচিশের বেশী বলে মনে হয় না, তাই নয় কি?"

"দেখে মনে হয় না, কিন্তু আসলে বেশী। কিন্তু তার সমঝদার হতে হলে তাকে ঠিক ঠিক জানা দরকার। মাদাম মিগুনোভাকে নিয়ে কে হাওয়া হয়েছিল? সে। আর সাবলিনকে কে খুন করেছিল? আর মাৎনেভকে দুই পা ধরে জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিল কে? ডিউক নেস্তেরভের কাছ থেকে তিন শ' হাজার কে জিতে নিয়েছিল? লোকটা যে কত বড় উড়নচণ্ডী তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একটা জুয়াড়ি, দ্বন্দ্ব-বিশারদ, নারীহরণকারী। কিন্তু মনে-প্রাণে সে একজন 'হুজার', সাচ্চা 'হুজার'। লোকে আমাদের নিন্দা করতেই ভালবাসে, কিন্তু একজন সাচ্চা হুজার যে কী তা বোঝে না! আহা, কী দিনই ছিল!"

তারপর অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি লেবেদিয়ানে কাউণ্টের সঙ্গে তার দুষ্কর্মের এমন এক ফিরিস্তি দিতে লাগল যা কখনও ঘটে নি এবং কোন দিন ঘটতেও পারে না। ঘটতে পারে না তার প্রথম কারণ, এর আগে সে কখনও কাউণ্টকে চোখেই দেখে নি; কাউণ্ট সেনাবাহিনীতে ঢুকবার দু বছর আগেই সে অবসর নিয়েছিল; আর দ্বিতীয় কারণ, অফিসারটি কোন কালে অশ্বারোহী বাহিনীতেই ছিল না; চার বছর সে ছিল বেলেভ্স্কি রেজিমেণ্টের একজন নীচের দিকের শিক্ষানবীশ এবং ধ্বজাধারী সৈনিক হিসাবে কমিশন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পদত্যাগ করেছিল। তবে দশ বছর আগে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের পর সে সত্যি সত্যি লেবেদিয়ানে গিয়েছিল এবং সেখানে কয়েকজন অশ্বারোহণ-শিক্ষক অফিসারের দলে ভিড়ে সাত শ' রুবল ফুঁকে দিয়েছিল, আর বর্শাধারী বাহিনীতে যোগ দেবার বাসনায় কমলা রঙের আস্তিনওয়ালা একটা 'উহ্লান' (অশ্বারোহী বাহিনীর বর্শাধারী সৈনিক) ইউনিফর্মের অর্ডার পর্যন্ত দিয়েছিল। অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দেবার বাসনা তার মনে এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে লেবেদিয়ানে যে তিন সপ্তাহ সময় সে অশ্বারোহণ-শিক্ষক অফিসারদের সঙ্গে কাটিয়েছিল সেটাই তার সারা জীবনের

সব চাইতে সুখের দিন হয়ে রয়েছে, এবং মনে মনে সেই বাসনাটাকেই প্রথমে বাস্তবে ও তারপর স্মৃতিতে রূপান্তরিত করেছে ; ফলে সে নিজেই একান্তভাবে বিশ্বাস করে বসেছে যে সে অশ্বারোহী বাহিনীর একজন অফিসার ; অবশ্য তার জন্য সততা ও সহৃদয়তার বিচারে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক হওয়ায় তার কোন বাধা হয় নি।

"আহা, সত্যি, অশ্বারোহী-বাহিনীতে যারা কাজ করে নি তারা আমাদের ঠিকমত বুঝতেই পারে না।" চেয়ারটাকে ঠেলে দিয়ে নীচের চোয়ালটাকে বের করে সে গম্ভীর গলায় বলতে লাগল : "এমন দিন ছিল যখন সৈন্যদলের প্রধান হিসাবে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি, আর আমার সে ঘোড়া তো ঘোড়া নয় যেন শয়তান ; আমিও তেমনি শয়তান, সেই ঘোড়াতেই সওয়ার হয়েছি, আর ওদিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন স্কোয়াড্রন-কম্যান্ডার আমাদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতে। তিনি বললেন, 'ধ্বজাধারী, তোমাকে ছাড়া কিছুই চলে না। দয়া করে কুচকাওয়াজ শুরু করে দাও।' 'ঠিক আছে স্যার', আমি বললাম, আর কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে আমার গোঁফধারী সাহসী সৈন্যদের নির্দেশ দিলাম, আর শুরু হল যাত্রা। আহা, সে যে কী দিনই ছিল।"

কাউণ্ট মুখ লাল করে চুল ভিজিয়ে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সাত নম্বর ঘরে চলে গেল। অফিসারটি ড্রেসিং-গাউন পরে দাঁতের ফাঁকে পাইপটা চেপে ধরে ভয়মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে তার সৌভাগ্যের কথাই ভাবছিল—অর্থাৎ বিখ্যাত তুরবিনের সঙ্গে এক ঘরে থাকবার সৌভাগ্য। "কিন্তু," তার চিন্তা হল, "তার মাথায় যদি হঠাৎ খেয়াল চাপে যে আমাকে উলঙ্গ করে শহরের বাইরে নিয়ে বরফের মধ্যে কবর দিয়ে দেবে, অথবা আমার সারা গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে দেবে, অথবা শুধু......কিন্তু না, একজন সহকর্মীর সঙ্গে সে ও রকম ব্যবহার করবে না," এই ভেবে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল।

"সাশা! ব্লুইশারকে খাইয়ে দে!" কাউণ্ট চেঁচিয়ে বলল।

এক গ্লাস ভদকা গিলে সাশার পা টলতে শুরু করেছে। সেই ভাবেই সে হাজির হল।

"তোর আর তর সয় নি! এর মধ্যেই মদ গিলেছিস বদমাস! ব্লুইশারকে খাইয়ে দে!"

"না খেলে ওটা মরবে না ; দেখুন [illegible] কেমন চিকন-চাকনটি হয়েছে," কুকুরটার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে সাশা বলল।

"দয়া করে বাজে কথা রাখো। ওকে খাইয়ে দাও।"

"আপনার যত মাথা ব্যথা কুকুরটার জন্য ; [illegible] খেলেই খেঁকিয়ে ওঠেন।"

"এই, মারব কিন্তু!" কাউণ্ট এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল যে জানালার কাঁচ ঝনঝনিয়ে উঠল, আর অফিসারটিও ভয় পেয়ে গেল।

সাশা বলল, "আপনার সাশা আজ কিছু খেয়েছে কিনা তাও তো জিজ্ঞেস করতে পারতেন। মানুষ অপেক্ষা কুকুরের জন্যই যদি আপনার বেশী ভাবনা হয়ে থাকে, তাহলে আসুন, আমাকে মারুন।" ঠিক তখনই সাশার নাকের উপর এমন একটা আঘাত এসে পড়ল যে মাটিতে পড়ে গিয়ে তার মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গেল; পরক্ষণেই হাত দিয়ে নাকটা চেপে ধরে সে উঠে দাঁড়াল; ছুটে দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে সে দালানে রাখা একটা ট্রাংকের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

কুকুরটা তখন নিজের গা চাটছিল। এক হাতে সেটার পিঠ আঁচড়াতে আঁচড়াতে আর অন্য হাতে রক্তাক্ত নাকটা মুছতে মুছতে সে বলতে লাগল, "উনি আমার দাঁত উপড়ে ফেলেছেন; জানিস ব্লুইশার, উনি আমার দাঁত উপড়ে ফেলেছেন; তবু তিনি যে কাউণ্ট সেই কাউণ্ট, আর তার জন্য আমাকে আগুনে পুড়তে হবে, জলে ভিজতে হবে; এটাই বিধান, কারণ, জানিস তো ব্লুইশার, তিনি আমার কাউণ্ট। তোর কি ক্ষিধে পেয়েছে ব্লুইশার?"

কয়েক মিনিট সেখানে পড়ে থাকবার পর সে উঠে দাঁড়াল, কুকুরটাকে খাওয়াল, এবং তারপর প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় কাউণ্টের সেবা করতে, তাকে চা দিতে চলে গেল।

কাউণ্ট তখন খাটের রানার উপর পা তুলে দিয়ে অফিসারের বিছানায় শুয়ে ছিল, আর অফিসারটি বিনীতভাবে তাকে বলছিল, "আমি এটাকে অপমানকর বলে মনে করব। বলতে গেলে আমিও একজন প্রাক্তন সৈনিক ও সহকর্মী। অন্য কারও কাছ থেকে আপনাকে টাকা নিতে দেবার আগে আমি নিজেই আপনাকে দু'শ রুবল আনন্দের সঙ্গে দেব। এখনই অতটা আমার কাছে নেই—শুধু এক শ' আছে—কিন্তু আজকের দিনের মধ্যেই বাকিটা যোগাড় করব। নইলে আমি কিন্তু এটাকে অপমানজনক বলে মনে করব কাউণ্ট।"

তাদের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে যাচ্ছে সেটা অনুধাবন করে অফিসারের পিঠ চাপড়ে কাউণ্ট বলল, "ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। আচ্ছা, তাই যদি হয় তাহলে তো বল-নাচে যেতেই হবে। কিন্তু আপাতত কি করা যায়? এ শহরের হাল-চাল একটু বলুন তো: এখানে সুন্দরী মেয়ে আছে তো? অথবা লম্পট? বা তাসারু?'

অফিসারটি জানাল, বলের আসরে এক দঙ্গল সুন্দরী হাজির হবে, শহরের সব চাইতে বড় লম্পট হচ্ছে নব-নির্বাচিত পুলিশ-ক্যাপ্টেন কল্কভ, তবে সে অশ্বারোহী সৈনিকদের মত উচ্ছৃংখল নয়, লোকটা ভাল; তাছাড়া নির্বাচন শুরু হবার সময় থেকেই ইলিউস্কার বেদের দল এখানে গানের আসর বসিয়েছে,

স্টিয়েশাও বাজাচ্ছে ; এবং প্রত্যেকেই স্থির করেছে যে বল-নাচের পরে বেদেদের আসরে গিয়ে গান শুনবে।

সে আরও বলল, "তাস-খেলাও এখানে জোর তালেই চলে। ধনী আগন্তুক লুখনভ তো সারাক্ষণই খেলেন, আর-আট নম্বর ঘরের উহ্‌লান রেজিমেণ্টের পতাকাবাহী ইল্‌য়িন তো মোটা রকম হেরেছেন। এর মধ্যেই তারা খেলা শুরু করে দিয়েছেন। প্রতি সন্ধ্যায়ই তারা খেলেন। জানেন কাউণ্ট, আপনি বিশ্বাস করবেন না এই ইল্‌য়িন কত ভাল ছেলে ; নীচতার কোন বালাই নেই,—এমন কি গা থেকে খুলে শার্টটা পর্যন্ত আপনাকে দিয়ে দিতে পারে।"

কাউণ্ট বলল, "তাহলে চলুন, তাকে দেখেই আসি। এখানকার সকলের সঙ্গেই পরিচয় হওয়া দরকার।"

"চলুন, চলুন। আপনাকে দেখলে তারা খুবই খুশি হবে।"

॥ ২ ॥

উহ্‌লানের পতাকাবাহী ইল্‌য়িনের এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে। গত রাতে সে তাসের টেবিলে বসেছিল আটটায় এবং সকাল এগারোটা পর্যন্ত একটানা পনেরো ঘণ্টা খেলেছে। অনেক টাকা সে হেরেছে, কিন্তু ঠিক কত টাকা তা সে নিজেও বলতে পারবে না, কারণ তার সঙ্গে নিজস্ব টাকা ছিল তিন হাজার আর সেনা-বাহিনীর দরুন ছিল পনেরো হাজার। দুটো টাকা সে অনেক আগেই একত্র মিশিয়ে ফেলেছিল, কাজেই ইতিমধ্যেই সে যে সরকারী টাকাও ভেঙে বসেছে এই আশংকা পাছে প্রমাণ হয়ে পড়ে তাই টাকা-কড়ি গুণতেও ভয় পাচ্ছে। দুপুর হতে না হতেই সে গভীর স্বপ্নহীন ঘুমে ঢলে পড়েছে, যে ঘুম আসে একমাত্র যুবকদের চোখে আর তাও তাসের বাজিতে অনেক টাকা হারবার পরে। সন্ধ্যা ছ'টায়—ঠিক যে সময়ে কাউণ্ট তুরবিন সরাইখানায় হাজির হয়েছে—ঘুম ভাঙতেই তার চোখে পড়ল মেঝেয় ছড়িয়ে রয়েছে তাস আর চক, ঘরের মাঝখানে রয়েছে বিবর্ণ টেবিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল রাতের খেলার বিভীষিকা, বিশেষ করে তার শেষ তাসটা—একটা গোলাম—যার ফলে সে হেরেছিল পাঁচশ' রুবল ; কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেবার অনিচ্ছায় সে বালিশের তলা থেকে সব টাকা বের করে গুণতে বসল। যে সব ব্যাংক-নোট হাতে হাতে ঘুরেছে সেগুলিকে চিনতেই খেলার সম্পূর্ণ ছবিটা তার মনে পড়ে গেল। তার নিজের তিন হাজার তো গেছেই, সরকারী টাকারও আড়াই হাজার উধাও।

পর পর চার রাত সে খেলেছে।

সে আসছে মস্কো থেকে। সেখানেই রেজিমেণ্টের টাকাটা তাকে দেওয়া হয়েছিল। পোস্টিং-স্টেশনের ওভারসিয়ার তাকে এই ছুতো ধরে কে-শহরে আটকে দিয়েছিল যে বদলি ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আসলে সরাইওয়ালার সঙ্গে একটা গোপন চুক্তিই হয়েছিল যে সব যাত্রীকেই একটা রাত এখানে আটকে রাখতে হবে। হাসিখুশি উহ্‌লান যুবকটিকে তার বাবা-মা মস্কোতে তিন হাজার রুবল উপহার দিয়েছিল পোষাক-পরিচ্ছদ বানাবার জন্য। আর সেও নির্বাচন-উৎসব উপলক্ষে এখানে প্রচুর আমোদ-আহ্লাদ পাবার আশায় কে-শহরে কয়েক দিন কাটাতে পারায় খুবই খুশি হয়েছিল। তার পরিচিত একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক এই অঞ্চলেই সপরিবারে বাস করত। তার সঙ্গে ও তার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি সেখানে হাজির হয়ে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিল। আর সেদিন সন্ধ্যায়ই বসবার ঘরে সে তার বন্ধু লুখনভ ও অপর কয়েকজন তাসারুর সঙ্গে অফিসারটির পরিচয় করিয়ে দিল। অবশ্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য তার ছিল না। তখন থেকেই উহ্‌লান তাসের টেবিলে বসতে শুরু করল। গ্রাম্য ভদ্রলোকের কথা সে বেমালুম ভুলে গেল; এমন কি ঘোড়ার জন্য তাগাদা দিতেও ভুলে গেল; আসলে পর পর চারদিন সে ঘর থেকে বেরলই না।

সাজগোজ করে প্রাতরাশ সেরে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভাবল, একটু বেড়াতে গেলে হয় তো তাসের দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর হয়ে যাবে। তাই সে বড় কোটটা চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। লাল ছাদওয়ালা সাদা বাড়িগুলোর পিছনে সূর্য অস্ত গেছে, গোধূলি নেমে এসেছে। বাতাসে গরম ভাব। ময়লা রাস্তার উপরে ভেজা বরফ ধীরে ধীরে জমছে। সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে—এই চিন্তা তার মনটাকে গভীর বিষাদে ভরে দিল।

সে ভাবতে লাগল, "এই হারানো দিনটি আর কোন দিন ফিরে আসবে না। আমার যৌবনকে আমি উড়িয়ে দিয়েছি।" নিজেকেই সে কথাগুলি বলল। সে যে সত্যি ভাবল যে তার যৌবনকে উড়িয়ে দিয়েছে তা কিন্তু নয়, আসলে এ রকম কোন চিন্তাই তার মনে আসে নি,—শুধু কথাগুলো হঠাৎ তার মনে এল বলেই যেন বলে ফেলল।

সে আবার ভাবতে লাগল, "এখন আমি কি করি? কারও কাছ থেকে টাকাটা ধার করে চলে যাব?" একটি যুবতী তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। অকারণেই তার মনে হল, "কেমন বোকা-বোকা দেখতে মহিলাটি।...টাকা ধার করতে পারি এ রকম কেউ তো নেই। আমার যৌবনকে উড়িয়ে দিয়েছি।" এক সারি দোকানের দিকে সে এগিয়ে গেল। শেয়ালের চামড়ার লাইনিং-দেওয়া কোট গায়ে একজন দোকানী একটি দরজায় দাঁড়িয়ে খদ্দেরদের ডাকাডাকি

করছিল। "ওই আর্ট-ফোটার হাত থেকে যদি রেহাই না পেতাম তাহলে হয় তো হারটা পুষিয়ে নিতে পারতাম।" তার পিছন পিছন আসতে আসতে একটা বুড়ি ভিখারিণী ঘ্যান-ঘ্যান করতে লাগল। "ধার করতে পারি এমন তো কেউ নেই।" ভাল্লুকের চামড়ার কোট-পরা একটা লোক গাড়ি চালিয়ে চলে গেল; একটি পাহারাওলা কর্তব্যরত। "হৈ-চৈ পড়ে যায় এমন কী আমি করতে পারি? লোকগুলোকে গুলি করব? বড়ই একঘেয়ে ব্যাপার। আমার যৌবনকে উড়িয়ে দিয়েছি। কী সুন্দর পোষাক ঝুলিয়ে রেখেছে! আঃ; তিন-কুকুরের স্লেজ-গাড়িতে ছুটে যেতে কী মজা। সরাইখানায় ফিরে যাব। লুখনভ এখনই আসবে আর আমরা খেলা শুরু করে দেব।"

ফিরে গিয়ে সে আবার টাকা-পয়সা গুণল। না, প্রথম বারে তার কোন ভুল হয় নি; রেজিমেণ্টের টাকার দু' হাজার পাঁচশ' রুবলের হদিশ মিলছে না। "প্রথম তাসেই পঁচিশ বাজি ধরব, তারপর দ্বিতীয় তাসে এক 'কর্ণার', তারপর বাজির সাতগুণ, তারপর পনেরো, ত্রিশ, ষাট গুণ, তিন হাজার রুবল পর্যন্ত। তার পর ঐ পোষাকগুলো কিনে চলে যাব। কিন্তু ঐ বদমাসটা তো আমাকে জিততে দেবে না। আমার যৌবনকে উড়িয়ে দিয়েছি।"

উহ্‌লানের মনের মধ্যে এই সব ভাবনা চলা-ফেরা করছিল এমন সময় লুখনভ ঘরে ঢুকল।

শক্ত নাকের উপর থেকে সোনার চশমা জোড়া খুলে ইচ্ছা করে একটা লাল সিল্কের রুমাল দিয়ে সেটাকে পালিশ করতে করতে লুখনভ জিজ্ঞাসা করল, "মিথাইলো ভাসিলিচ, আপনি কি অনেকক্ষণ উঠেছেন?"

"না, এইমাত্র উঠলাম। সুন্দর ঘুমিয়েছি।"

"একজন অশ্বারোহী সৈনিক এইমাত্র এসেছেন। তিনি জাভালশেভ্‌স্কির সঙ্গে আছেন। শুনেছেন কি?"

"না, আমি শুনি নি। আর সকলে কোথায়?"

"তারা প্রিয়াখিনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। এখনই এসে পড়বে।"

সত্যি সত্যি, একটু পরেই সকলে হাজির হল; লুখনভের সর্বক্ষণের সঙ্গী স্থানীয় সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসার; মস্ত বড় বাঁকানো নাক, তামাটে চওড়া আর দৃঢ়বন্ধ কালো চোখওয়ালা এক গ্রীক বণিক; মোটাসোটা একজন ভূস্বামী যে দিনের বেলায় একটা ভাটিখানা চালায় আর রাতের বেলায় আধ-রুবলের বাজি ধরে জুয়া খেলে।

সকলেই খেলা শুরু করতে ব্যগ্র, কিন্তু প্রধান খেলুড়েরা, বিশেষ করে লুখনভ, সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্যই করল না; লুখনভ তো শান্তভাবে মস্কোর আইন-শৃংখলাহীনতার কথাই বলতে লাগল।

সে বলল, "ভেবে দেখুন! মস্কো আমাদের সব চাইতে বড় শহর, আমাদের

রাজধানী, অথচ রাতের বেলায় দুর্বৃত্তরা ভূতের মত সাজগোজ করে হুক হাতে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, বোকা-সোকা ছোটলোকদের সন্ত্রস্ত করে তোলে, পথচারীদের সর্বস্ব লুঠ করে, অথচ তার কোনই প্রতিকার হয় না। পুলিশ কি ভেবেছে ?—সেটাই আমি জানতে চাই।"

উহ্লান মনোযোগসহকারে আইনহীনতার বিবরণ শুনছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উঠে দাঁড়াল এবং শান্তভাবে তাস নিয়ে আসতে বলল। মোটা ভূস্বামীটিই তাদের মনের কথা প্রথম প্রকাশ করল :

"আচ্ছা ভদ্রমহোদয়গণ, এই সুবর্ণ সময় আমরা নষ্ট করব কেন ? আসুন, কাজ শুরু করা যাক !"

গ্রীক ভদ্রলোক বলল, "কাল রাতে যে টাকা আপনি বাড়ি নিয়ে গেছেন, তারপর আপনার এ ইচ্ছার অর্থ ভালই বুঝতে পারছি।

স্থানীয় বাহিনীর অফিসারটি বলল, "কিন্তু সময় তো সত্যি হয়েছে।"

ইল্য়িন লুখনভের দিকে তাকাল। লুখনভও সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে লম্বা নখরওয়ালা ভূতের মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের কথাই বলতে লাগল।

উহ্লান জিজ্ঞাসা করল, "তাস বেটে দেব কি ?"

"খুবই আগে হয়ে যাচ্ছে নাকি ?"

কোন কারণে মুখ লাল করে উহ্লান ডাকল, "বেলভ! আমাকে কিছু খেতে দাও। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার এখনও খাওয়া হয় নি। শ্যাম্পেন নিয়ে এস; আর তাসগুলো দাও।"

ঠিক সেই সময় কাউন্ট ও জাভাল্‌শেভ্‌স্কি ঘরে ঢুকল। ক্রমে জানা গেল তুরবিন ও ইল্য়িন এক বাহিনীতেই ছিল। খুব তাড়াতাড়ি তারা বন্ধু হয়ে উঠল, শ্যাম্পেন দিয়ে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত কথা বলতে লাগল। ইল্য়িনকে দেখে কাউন্টের খুব ভাল লাগল। তার দিকে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল এবং সে বয়সে এত ছোট বলে তাকে ঠাট্টা করতে লাগল।

সে বলল, "তুমি যেন একটি উহ্লান! ইয়া গোঁফ! ইয়া ভয়ংকর গোঁফ!"

ইল্য়িনের উপরের ঠোঁটের লোমগুলো ছিল একেবারে সাদা।

কাউন্ট বলল, "আপনারা কি তাস খেলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ? ইল্য়িন, আশা করছি তুমি জিতবে। তুমি তো একজন প্রথম সারির খেলুড়ে, নয় কি ?" কাউন্ট হেসে বলল।

এক জোড়া তাস খুলতে খুলতে লুখনভ জবাব দিল, "সত্যি আমরা তৈরি হচ্ছি। আপনি কি আমাদের দলে যোগ দেবেন না কাউন্ট ?"

"না, আজ নয়। আমি খেললে আপনাদের ন্যাংটো করে ছাড়ব। যখনই আমি খেলি, যে কোন ব্যাংক ফেটে হাঁ হয়ে যায়। কিন্তু আমার সঙ্গে খেলবার মত রেস্ত নেই। ভলোচোকের নিকটবর্তী পোস্টিং-স্টেশনে আমি সব কিছু হারিয়েছি। হাতে আংটি-পরা এক শয়তান পদাতিক আমাকে পথে বসিয়েছে। লোকটা নিশ্চয় তাসের ভেল্কি জানে।"

ইলুয়িন জিজ্ঞাসা করল, "সে কি? সেখানে কি আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল?"

"বাইশ ঘণ্টা। সেই অভিশপ্ত স্টেশনটার কথা আমি কোন দিন ভুলব না। আবার পোস্টমাস্টারও কোন দিন আমাকে ভুলবে না।"

"সে আবার কি?"

"আমি গাড়ি চালিয়ে যেতেই পোস্টমাস্টার তার ধূর্ত কদাকার ছোট মুখ নিয়ে এক লাফে বাইরে এল। বলল, ঘোড়া নেই। আগেই তোমাকে বলে রাখছি, নিজের জন্য আমি নিম্নবর্ণিত নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছি: যখনই আমাকে বলা হয় যে ঘোড়া নেই, তৎক্ষণাৎ আমি কোট না খুলেই সোজা চলে যাই ওভারসিয়ারের চেম্বারে—মনে রাখবে বাইরের ঘরে নয়, একেবারে প্রাইভেট চেম্বারে এবং গিয়েই সব দরজা ও জানালা খুলে দেবার হুকুম দেই, যাতে মনে হতে পারে যে জায়গাটা কয়লার ধোঁয়ায় একেবারে আচ্ছন্ন। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করলাম। সে কী ঠাণ্ডা! গত মাসে কী রকম বরফ পড়েছিল মনে পড়ে? চার ডিগ্রি নীচে। পোস্টমাস্টারটা তর্ক শুরু করতেই দিলাম তার নাকে এক ঘা বসিয়ে। একটি বৃদ্ধ মহিলা, কয়েকটি ছোট মেয়ে ও অন্য স্ত্রীলোকরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল ও ঘটি-বাটি নিয়ে গ্রামে চলে যেতে উদ্যত হল। তাদের পথ আটকে দিয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম, "আমাকে কয়েকটা ঘোড়া দাও, তাহলেই আমি চলে যাব; যদি না দাও, তোমরা ঠাণ্ডায় জমে মরবে, কাউকে বাইরে যেতে দেব না!"

ভুঁড়িওলা ভূস্বামীটি হো-হো করে হেসে বলল, "এই ওদের উচিত শিক্ষা! ঠিক যেন গুবরে পোকাকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে মারা।"

"কিন্তু তাদের উপর আমি ঠিকমত নজর রাখতে পারি নি—কেমন করে যেন সব ফসকে চলে গেল—পোস্টমাস্টার আর মহিলারাও সরে পড়ল। যে বৃদ্ধা মহিলাটি স্টোভ-বাংকের উপর শুয়ে ছিল সেই শুধু বাড়িতে রয়ে গেল। সে অনবরত হাঁচতে লাগল আর প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর কথাবার্তা শুরু হল: পোস্টমাস্টার ফিরে এসে দূর থেকে বৃদ্ধাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানাল, আর আমি করলাম কি, ব্লুইশারকে লেলিয়ে দিলাম,—আর ব্লুইশারও পোস্টমাস্টারদের ভালই চেনে। কিন্তু তবু পরদিন সকালের আগে সে আমাকে ঘোড়া দিল না, শালা বদমাস! এই ভাবেই সেই শয়তান পদাতিক-

অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হল। পাশের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে খেলতে শুরু করলাম। আরে, রুইশারকে দেখেছেন? রুইশার! এখানে আয়।"

রুইশার এল। জুয়াড়িরা তার প্রতি সদয় ব্যবহার করলেও বোঝা গেল যে অন্য রকম করতেই তারা ইচ্ছুক।

তুরবিন বলল, "কিন্তু মশাইরা খেলছেন না কেন? আমার জন্য আপনারা খেলা বন্ধ করবেন না। আমি জানি, আমি একটি বাচাল। তবে আপনাদের ভাল লাগুক আর না লাগুক, কথা আমি ভালই বলতে পারি।"

॥ ৩ ॥

দুটো মোমবাতির আলোয় উঠে গিয়ে লুখনভ টাকায় ভর্তি একটা মস্তবড় ধূসর রঙের থলি বের করে একটা রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠানের ভংগীতে ধীরে ধীরে তার মুখটা খুলল, দু'শ রুবলের নোট বের করল এবং সেগুলোকে তাসের নীচে রেখে দিল।

চশমাটা সোজা করে নাকে লাগিয়ে এক জোড়া নতুন তাসের প্যাক খুলে সে বলল, "দু'শ' রুবলের একটি ব্যাংক, ঠিক কালকের মত।"

তার দিকে না তাকিয়ে তুরবিনের সঙ্গে কথা চালাতে চালাতেই ইলিয়িন বলল, "ঠিক আছে।"

খেলা শুরু হল। যন্ত্রের মত নির্ভুলভাবে লুখনভ তাস বেটে দিল; মাঝে মাঝে ধীর স্থিরভাবে একটা পয়েণ্ট দেখতে থামল, অথবা চশমার উপর দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল, "আপনার খেলা।" ভুঁড়িওলা ভূস্বামীটি সরবে নিজের তাসের হিসাব করতে করতে এবং বেঁটে মোটা আঙুল দিয়ে তাসের কোণাগুলো দুমড়ে দিয়ে তাসগুলোকে নোংরা করে অন্য সকলের চাইতে বেশী গোলমাল করতে লাগল। স্থানীয় অফিসারটি সুন্দর হস্তাক্ষরে তার পয়েণ্টগুলো লিখতে লাগল এবং টেবিলের নীচে তার তাসের কোণাগুলি সামান্য বেঁকিয়ে দিতে লাগল। গ্রীক ভদ্রলোক বসেছে লুখনভের কাছে। ব্যাংকটা রয়েছে লুখনভের হেপাজতে। দৃঢ়বদ্ধ কালো চোখ দিয়ে এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে খেলাটি দেখছে যেন কোন ঘটনার জন্যই সে অপেক্ষা করে আছে। জাভালশেভস্কি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে সচল হয়ে উঠল: পকেট থেকে একটা লাল বা নীল ব্যাংক নোট বের করে তার উপর একখানা তাস চাপা দিল, আর তার উপর হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলল, "চলে আসুন; সাত," গোঁফে কামড় দিল, এক পা থেকে আরেক পায়ে দাঁড়াল, সমস্ত শরীরটা মোচড়াতে লাগল, এবং যতক্ষণ না একখানা তাস পেল ততক্ষণই

মোচড়াতে লাগল। ইল্‌য়িন তার পাশে ঘোড়ার লোমের সোফার উপর রাখা প্লেট থেকে গো-মাংস ও শসা খেল, তাড়াতাড়িতে জ্যাকেটেই আঙুল মুছল এবং একটার পর একটা তাস ফেলতে লাগল। তুরবিন প্রথম থেকে সোফার উপর বসেছিল, কাজেই সব কিছুই সে ঠিকঠিক দেখতে পাচ্ছিল। লুখনভ উহ্‌লানের দিকে ফিরেও তাকায় নি বা তাকে একটা কথাও বলে নি; শুধু মাঝে মাঝে চশমার ভিতর দিয়ে তার হাতটা দেখছিল। উহ্‌লানের প্রায় সব তাসই হারের তাস।

ভুঁড়িওলা ভূস্বামীটি আধ-রুবলের বাজিতে খেলছিল। তার একটা তাস দেখিয়ে লুখনভ বলল, "ওই তাসটা আমি ধরতে চাই।"

ভূস্বামী বলল, "আপনি ইল্‌য়িনের তাস নিন—আমারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

সত্যি সত্যি ইল্‌য়িনের মত দুর্ভাগা তাস আর কারও ছিল না। যত বার হারছে ততবার সে কাঁপা হাতে দুর্ভাগা তাসটাকে টেবিলের তলায় নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে আর একটা তাস বেছে নিচ্ছিল। তুরবিন সোফা থেকে উঠে গ্রীক ভদ্রলোককে অনুরোধ করল, যে খেলুড়ের কাছে ব্যাংক রয়েছে তার পাশে যাতে সে বসতে পারে। গ্রীক ভদ্রলোক স্থান পরিবর্তন করল এবং তুরবিন তার চেয়ারে বসে লুখনভের হাতের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখল।

"ইল্‌য়িন!"। হঠাৎ সে এমন গলায় ডাকল যেটা তার স্বাভাবিক গলা হলেও অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে গেল। "ঐ তাসটা পয়মন্ত এ কথা ভাবছ কেন? তুমি খেলতেই জান না।"

"আমি যে ভাবেই খেলি, ফলাফল সেই একই হচ্ছে।"

"ও ভাবে চিন্তা করলে তুমি নির্ঘাৎ হারবে। তোমার হাতটা আমাকে দাও।"

"না, ধন্যবাদ: আমি কাউকে আমার হয়ে খেলতে দেই না। ইচ্ছা হলে আপনি নিজে খেলুন।"

"তোমাকে তো বলেছি, আমি খেলতে চাই না: শুধু তোমার জন্যই খেলতে চাইছি। তোমাকে এ ভাবে হারতে দেখে আমি দুঃখ পাচ্ছি।"

"মনে হয় এই আমার ভাগ্য।"

কাউণ্ট আর কিছুই বলল না; শুধু টেবিলের উপর কনুইটা রেখে লুখনভের হাতের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ সে লম্বা টানা সুরে জোর গলায় বলে উঠল, "খুব খারাপ।"

লুখনভ তার দিকে তাকাল।

লুখনভের চোখের দিকে সোজা চোখ রেখে সে আরও জোর গলায় আবার বলল, "খুব, খুব খারাপ।"

সকলেই খেলতে লাগল।

লুখনভ ইল্যিয়িনের আরও একখানা তাস নিতেই তুরবিন বলল, "জঘন্য কাজ-কারবার।"

বিনীত ঔদাসিন্যে লুখনভ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি জন্য অসন্তুষ্ট হচ্ছেন কাউণ্ট?"

"আপনি যে ভাবে ইল্যিয়িনের তাস নিচ্ছেন সেই জন্য। সেটাই খুব খারাপ।"

লুখনভ তার কাঁধ ও ভুরু সামান্য একটু কাত করল; যেন সে বলতে চাইল, যার যার ভাগ্য তো মানতেই হবে। তারপর যথাপূর্ব খেলতে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে কাউণ্ট চীৎকার করে ডাকল, "ব্লুইশার! এখানে আয়! সঙ্গে সঙ্গে আবার বলল, "ওকে ধর তো ব্লুইশার!"

সোফার নীচ থেকে এক লাফে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ব্লুইশার স্থানীয় অফিসারটিকে এক ধাক্কায় প্রায় ফেলে দিয়েছিল আর কি। প্রভুর কাছে ছুটে গিয়ে গড়র্-গড়র্ করতে করতে লেজ নাড়তে লাগল, আর এমন ভাবে সকলের দিকে তাকাতে লাগল যেন বলতে চাইছে, "কোন্‌টি অপরাধী হে?"

হাতের তাস নামিয়ে রেখে লুখনভ চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিল।

বলল, "এ অবস্থায় খেলা অসম্ভব। আমি কুকুর সইতে পারি না। ঘর-ভর্তি কুকুর নিয়ে কি খেলা হয়?"

স্থানীয় অফিসার ফোড়ন কাটল, "বিশেষ করে এ রকম কুকুর নিয়ে—যাকে বলে একেবারে বিচ্ছু।"

লুখনভ ঘরের মালিককে বলল, "দেখুন মিখাইলো ভাসিলিচ, আমরা কি খেলা চালিয়ে যাব, না না?"

ইল্যিয়িন তুরবিনকে বলল, "দয়া করে খেলায় বিঘ্ন ঘটাবেন না কাউণ্ট।"

ইল্যিয়িনের হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে যেতে তুরবিন বলল, "কিছুক্ষণের জন্য এস তো।"

কাউণ্ট যা কিছু বলল স্পষ্টই শোনা গেল, কারণ গলা না নামিয়েই সে কথাগুলো বলল। আর এমনি তার গলার জোর যে তিনটে ঘর দূরে থেকেও সব শোনা যায়।

"তুমি কি একেবারেই পাগল হয়েছ? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ঐ চশমা-পরা ভদ্রলোক একটি পাকা ভেল্কিবাজ……

"আঃ, আস্তে। আপনি কি বলছেন?"

"বলছি, খেলা বন্ধ কর। আমার আর কি? অন্য সময় হলে আমি

নিজেও তোমার সব টাকা মনের সাধে মেরে দিতাম ; কিন্তু যে জন্যই হোক আজ রাতে তোমাকে এভাবে ঠকতে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। যে টাকা নিয়ে খেলছ তার সবটাই কি তোমার নিজের ?"

"হ্যাঁ।...মানে......কেন ? আপনি কি ভাবছেন ?"

"দেখ বন্ধু, এ পথে আমি নিজেও অনেক হেঁটেছি, তাই এই সব ভেল্কিবাজদের সব কলা-কৌশলই আমি জানি : আমি বলছি ঐ চশমাধারী লোকটি একজন ভেল্কিবাজ। খেলা বন্ধ কর—বন্ধ কর ; বন্ধু হিসাবে তোমাকে এ পরামর্শ দিচ্ছি।"

"আর এক দান মাত্র খেলব।"

"আর এক দানের অর্থ আমি জানি। বেশ, দেখা যাক।"

তারা ফিরে এল। এক দানেই ইল্যুয়িন এত বেশী তাস ফেলল এবং তার মধ্যে এত বেশী তাসে তার হার হল যে তার প্রচুর লোকসান হল।

তুরবিন দুই হাতে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিল।

চেঁচিয়ে বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। চলে এস!"

তুরবিনের দিকে না তাকিয়ে বাঁকানো তাসগুলো ভাজতে ভাজতে ইল্যুয়িন বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি এখন যেতে পারি না ; দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন।"

"শয়তান তোমাকে ভর করুক! হারতে যখন তোমার এত মজা তখন হারতে থাক। কিন্তু আমি চললাম। জাভাল্শেভ্স্কি। আমার সঙ্গে মার্শালের কাছে চলুন!"

তারা চলে গেল। কেউ একটা কথাও বলল না। তাদের পায়ের শব্দ এবং বুইশারের নখের আঁচড়ের শব্দ দালানের ওপাশে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত লুখনভ তাস বাটল না।

ভূস্বামী হেসে বলল, "কী লোকরে বাবা!"

দ্রুত অথচ নীচু গলায় স্থানীয় অফিসারটি বলল, "যাক, আর সে নাক গলাবে না।"

সকলে খেলতে শুরু করল।

॥ ৪ ॥

উৎসব-উপলক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান মার্শালের গৃহ-ভৃত্য, বাজনাদারেরা ইতিমধ্যেই কোটের আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছিল ; এবার সংকেত পাওয়া মাত্রই পুরনো কালের পোলিশ "আলেক-

জাণ্ডার-এলিজাবেথ" নাচের সুর বাজাতে শুরু করে দিল, এবং মোমবাতির নরম উজ্জ্বল আলোয় জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষরা প্রকাণ্ড হলের কাঠের মেঝেতে তালে তালে পা ফেলতে আরম্ভ করল (প্রথমে ক্যাথারিনের দরবারের সেনাপতি লাটসাহেব বুকের উপর একটা তারকা লাগিয়ে মার্শালের শীর্ণা স্ত্রীর হাত ধরে; তারপরে লাট-পত্নীর হাত ধরে মার্শাল, তারপরে ভিন্ন ভিন্ন দলে ও জোটে শাসক পরিবারসমূহের অন্য সকলে); এমন সময় কাঁধের উপর ফেলানো মস্ত-বড় কলার-ওয়ালা নীল ফ্রক-কোট গায়ে, লম্বা মোজা ও নাচের জুতো পায়ে, গোঁফে, কোটের বুকে ও রুমালে যথেচ্ছভাবে ছিটানো জুঁই ফুলের আতরের গন্ধ ছড়িয়ে সে ঘরে প্রবেশ করল জাভালশেভ্স্কি; তার সঙ্গে একজন সুদর্শন অশ্বারোহী সৈনিক—পরনে নীল রঙের আঁটোশাঁটো রাইডিং-ব্রীচেস আর ভ্লাদিমির ক্রশ ও ১৮১২-র মেডেলশোভিত সোনার কাজ-করা লাল জোব্বা। কাউণ্টের উচ্চতা সাধারণের চাইতে বেশী না হলেও তার দেহ খুবই সুগঠিত। তার ঝকঝকে নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ ও ঘন বাদামী চুলের দীর্ঘ গুচ্ছ তার সৌন্দর্যে এনেছে একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি। নাচের ঘরে তার আগমন অপ্রত্যাশিত ছিল না; যে সুদর্শন যুবকটি তাকে হোটেলে দেখেছিল সেই মার্শালকে জানিয়েছে যে এখানে আসবার অভিপ্রায় তার আছে। এ সংবাদের নানা রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে; তবে মোটামুটি খুব একটা উৎসাহের সঞ্চার করে নি। পুরুষরা এবং বয়স্ক মহিলারা বলেছে, "সে আমাদের নিয়ে কৌতুক করতে পারে।" বালিকা এবং তরুণীদের মনে হয়েছে, "সে যদি আমাকে নিয়ে পালিয়েই যায় তাতেই বা কি?"

বাজনা থামল। নাচের জুটিরা পরস্পরকে অভিবাদন জানিয়ে জোড় ভাঙল, নারীরা নারীদের দলে আর পুরুষরা পুরুষদের দলে মিশে গেল। তখন গর্বিত ও আনন্দিত জাভালশেভ্স্কি কাউণ্টকে গৃহকর্ত্রীর সামনে হাজির করল। মার্শাল-পত্নীর মনে ভয় ছিল পাছে সকলের সামনে কাউণ্ট তাকে বেকায়দায় ফেলে, তাই মুখ ফিরিয়ে গর্বিত সদয় ভঙ্গীতে বলল, "চমৎকার। আশা করি আপনি নাচবেন।" কথার শেষে এমন একটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে সে তাকাল যাতে মনে হল সে যেন বলছে, "এর পরেও যদি একটি মহিলাকে অসম্মান কর তাহলে বুঝব তুমি একটি বদমাস!" কিন্তু ভদ্রতা, মনোযোগ, জাঁকজমক ও সুদর্শন চেহারা দিয়ে কাউণ্ট অবিলম্বেই মহিলার মন থেকে সে ভয় দূর করে দিল, ফলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার মুখের ভঙ্গী যেন সকলকে বলতে লাগল, "এ ধরনের ভদ্রলোকদের কি ভাবে বশে আনতে হয় তা আমি জানি; মুহূর্তের মধ্যেই লোকটি বুঝতে পেরেছে সে কার সঙ্গে কথা বলছে। দেখ না, সারা সন্ধ্যা সে আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।" কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কাউণ্টের পিতার

পূর্ব-পরিচিত লাটসাহেব এগিয়ে এসে কথাবার্তা বলার জন্য তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেল। ফলে স্থানীয় ভদ্রজনের মনে যেটুকু আশংকা ছিল তাও দূর হওয়ায় কাউণ্ট সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও ভাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে জাভালশেভ্স্কি তার বোনের সঙ্গে কাউণ্টের পরিচয় করিয়ে দিল। এই মোটাসোটা তরুণী বিধবাটি কাউণ্ট ঘরে ঢোকার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তার বড় বড় কালো চোখ দুটিকে কাউণ্টের উপর থেকে সরায় নি। অর্কেস্ট্রায় তখন ওয়াল্‌জ্‌ বাজছিল। কাউণ্ট সেই সুরের তালে মহিলাকে তার সঙ্গে নাচের আমন্ত্রণ জানাল, আর তার নাচের দক্ষতা তার বিরুদ্ধে যেটুকু বিরূপতা অবশিষ্ট ছিল শেষ পর্যন্ত তাও দূর করে দিল। তার নীল রাইডিং-ব্রীচেস পরা পা দুটি যখন সারা ঘরময় ঘুরতে লাগল, তখন নিজের মনেই "এক, দুই, তিন : এক, দুই, তিন—চমৎকার!" বলে তাল দিতে দিতে এক স্থানীয় ভদ্রলোকের স্থূলাঙ্গী স্ত্রী বলল, "সত্যি, লোকটি অপূর্ব নাচে।"

শহরে আগন্তুক আর একটি নারী যাকে স্থানীয় সমাজ উঁচু শ্রেণীর নয় বলে ধরে নিয়েছিল সে বলল, "কী পায়ের কাজ! কী পায়ের কাজ! নাচের সময় যে কারও শরীরে তার পায়ের আঘাত লাগে না সেটা কি করে হয়! অপূর্ব! পা ফেলবার কী লঘু ভঙ্গিমা!"

নাচ দেখিয়ে কাউণ্ট সরকারী মহলের তিনজন শ্রেষ্ঠ নাচিয়েকে ম্লান করে দিল : একজন হল লম্বা, মাথা-মোটা লাট সাহেবের সহকারী যে নাচের ক্ষিপ্রগতি ও নাচের সঙ্গিনীকে বুকের খুব কাছে টেনে নেবার দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিল; আর একজন হল অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার যে ওয়াল্‌জ্‌ নাচের সময় সঙ্গিনীকে অতি সুকৌশলে দুলিয়ে দিতে পারত এবং গোড়ালিকে খুব লঘু অথচ দ্রুততালে ফেলতে পারত; আর তৃতীয় ভদ্রলোক একজন অসামরিক অফিসার—সকলেই বলে তার মনটা বড় না হলেও সে অপূর্ব নাচিয়ে এবং যে কোন বল-নাচের প্রাণস্বরূপ। সত্যি সত্যি ভদ্রলোকটি বল-নাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও থামে নি, মহিলারা পর পর যে ভাবে বসেছিল সেই ভাবেই প্রত্যেককে নাচের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, শুধু একখানি ভেজা রুমাল দিয়ে শ্রান্ত অথচ ঝকঝকে মুখখানি মুছবার জন্য কদাচিৎ দু'একবার নাচ বন্ধ রেখেছে। কিন্তু কাউণ্ট তাদের সকলকে পাল্লা দিয়ে নাচের আসরের তিনটি জাঁদরেল মহিলার সঙ্গেই নাচল : একজন লম্বা—ধনী ও সুন্দরী, কিন্তু বোকা-বোকা; একজন মাঝারি গড়নের—সুন্দরীও নয়, কিন্তু সুসজ্জিতা; আর একজন ছোটখাট—খুব সাদাসিদে, কিন্তু খুব চালাক-চতুর। সে অন্যদের সঙ্গেও নাচল; বস্তুত সব সুন্দরীদের সঙ্গেই নাচল, আর নাচের আসরে সুন্দরীদের সংখ্যা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু যার সঙ্গে নেচে সে সব চাইতে বেশী খুশি হল সে জাভালশেভ্স্কির বিধবা বোন। তার সঙ্গে সে নাচল

"কোয়াড্রিল", "একোশাস" ও "মাজুরকা।" "কোয়াড্রিল" নাচের সময় সে নানাভাবে তার গুণগান করল, তাকে ভেনাস, ডায়ানা, গোলাপ ও অন্য ফুলের সঙ্গে তুলনা করল। এই সব ভদ্রতাসূচক কথাবার্তার উত্তরে ছোট বিধবাটি শুধু তার সুন্দর সাদা গ্রীবাটি বাঁকাল এবং নিজের সাদা মসলিন-ফ্রকের দিকে চোখ রেখে ও পাখাটাকে এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে চোখ দুটি নামিয়ে নিল। সে যখন ' প্রিন্স কাউণ্ট, আপনি তামাসা করছেন" বা ঐ ধরনের কথা বলল তখন তার ফ্যাসিফেঁসে গলায় এমন নির্দোষ অকপটতা ও হাস্যকর সরলতা ফুটে উঠল যে কাউণ্ট তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালেই সে ভাবল যে সত্যি সত্যি সে একটি ফুল, স্ত্রীলোকমাত্র নয় ; তাও গোলাপ ফুল নয়, এমন একটি প্রস্ফুটিত গোলাপি-সাদায় মেশানো গন্ধবিহীন বুনো ফুল যা বহুদূর দেশের এক আদিম বরফের বুকে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে।

তার আচরণের সরলতা ও ভনিতার অভাব তার নবীন সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে কাউণ্টের মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটে বসল যে আলাপচারির ফাঁকে ফাঁকে কাউণ্ট যখনই নীরবে তার চোখের দিকে অথবা তার বাহু ও গলার রমণীয় রেখার দিকে তাকিয়েছে, তখনই তাকে বাহুপাশে জড়িয়ে চুম্বন করবার বাসনা এতই তীব্র হয়ে উঠেছে যে অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করেছে। ছোট্ট বিধবাটি নিজের এই কৃতিত্বে খুশি হলেও কাউণ্টের আচরণে এমন কিছু ছিল যা তাকে বিব্রত করেছে, শংকিত করেছে ; অবশ্য আচরণের প্রচলিত মান দিয়ে বিচার করলে কেবলমাত্র চাটুকারসুলভ মনোযোগ দেওয়া ছাড়া কাউণ্ট ছিল বেশী রকমেরই সম্ভ্রমশীল। সে ছুটে গিয়ে তার জন্য খাবার এনে দিল, রুমালটা তুলে দিল, গলগণ্ড রোগীর মত দেখতে এক যুবক প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে তার চেয়ারটা জোর করে ছিনিয়ে এনে দিল এবং এই ধরনের অসংখ্য ছোটখাট কাজ করে দিল।

কিন্তু কাউণ্ট যখন দেখল এই সব কাজ-কর্মে মহিলাটির উপর কোন প্রভাব পড়ল না, তখন নানান হাসির গল্প বলে এবং তার কথায় সে যে মাথার উপরে দাঁড়াতে পারে, কাকের মত কা-কা শব্দ করতে পারে, নিজেকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে বা নদীর বরফের একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে—এমনি সব আশ্বাস দিয়ে নিজেকে রসাল করে তুলতে চেষ্টা করল। এবার কিন্তু সে পুরোপুরি সফল হল। ছোট্ট বিধবাটি খুব খুশি হয়ে এমন ভাবে হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল যে তার সুন্দর সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। রসিক পুরুষটির প্রতি সে খুবই সদয় হয়ে উঠল। আর কাউণ্টও প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হতে লাগল এবং তার ফলে "কোয়াড্রিল" নাচের শেষে সে সত্যি মহিলাটির প্রেমে পড়ে গেল।

সে অঞ্চলের সব চাইতে ধনী ভূস্বামীর যে আঠারো বছরের অকর্মণ্য

ছেলেটি অনেক দিন ধরেই বিধবাটিকে ভজনা করে আসছিল (এই সেই গলগণ্ড রোগীর মত দেখতে যুবক যার হাত থেকে তুরবিন জোর করে চেয়ারটা ছিনিয়ে নিয়েছিল) সে যখন কোয়াড্রিল নাচের শেষে হাজির হল তখন বিধবাটি অনাসক্ত-ভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাল এবং কাউণ্ট তার মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তার দশ ভাগের এক ভাগও প্রকাশ করল না।

তুরবিনের পিঠের উপর চোখ রেখে এবং তার কোটটা তৈরি করতে কত গজ সোনালী জরি লেগেছে মনে মনে তার হিসাব করতে করতে বিধবাটি বলে উঠল, "তুমি বেশ লোক তো! আচ্ছা লোক! আসবে বলে কথা দিয়েছিলে, বলেছিলে স্লেজ-গাড়িতে চড়াবে, চকোলেট দেবে।"

"কিন্তু আমি তো এসেছিলাম আন্না ফিয়োদরভ্না। তুমিই বাড়ি ছিলে না, তাই এক বাক্স খুব ভাল চকোলেট তোমার জন্য রেখে এসেছি," যুবকটি বলল; তার চেহারাটা ঢ্যাঙা হলেও নীচু কর্কশ গলায় সে কথা বলে।

"তুমি তো সব সময়ই ছুঁতো খুঁজে বেড়াও। চাই না তোমার চকোলেট। দয়া করে মনে করো না—"

"বুঝতে পারছি আন্না ফিয়োদরভ্না, তুমি খুব বদলে গেছ। তার কারণও আমি জানি। এটা তোমার খুব অন্যায়," সে আরও বলল। হয়তো সে আরও কিছু বলত, কিন্তু রাগে তার ঠোঁট দুটো এমন তীব্রভাবে কাঁপতে লাগল যে সে আর কথাই বলতে পারল না।

আন্না ফিয়োদরভ্না তার কথায় কান না দিয়ে তুরবিনের খোঁজে চলে গেল।

সে সন্ধ্যার আমন্ত্রণ-কর্তা মার্শাল একজন শক্তপোক্ত, দন্তহীন, বৃদ্ধ, মহাশয় ব্যক্তি। কাউণ্টের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে সে তাকে তার স্টাডিতে গিয়ে ধূমপান করতে এবং ইচ্ছা হলে সুরা পান করতে আমন্ত্রণ জানাল। তুরবিন চলে যেতেই নাচের ঘরটা আন্না ফিয়োদরভ্নার কাছে প্রায় ফাঁকা বলে মনে হতে লাগল। সেও তার জনৈকা অবিবাহিতা সখীর হাত ধরে তাকে ড্রেসিং রুমে টেনে নিয়ে গেল।

সখী শুধাল, "কি লা? পছন্দ হয়?"

আয়নার কাছে গিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্না বলল, "কিন্তু তার রকম-সকম দেখে ভয় লাগে যে!"

তখন তার মুখখানি চক চক করছে, চোখ দুটো হাসছে, একটু লজ্জা-লজ্জাও করছে। হঠাৎ নির্বাচনের সময় যে ব্যালে-নাচ হয়েছিল তার নকল করে সে একটা আঙুলের উপর ঘুরতে লাগল, এবং তারপরে মনোরম ভঙ্গীতে গলা ছেড়ে হেসে উঠে গোড়ালির ধাক্কায় শূন্যে লাফিয়ে উঠল।

সখীকে বলল, "তোমার কি মনে হয়?—সে তো একটা স্মৃতি-চিহ্ন পর্যন্ত চেয়েছে। কিন্তু সে এ-ক-টি-ও-পা-বে-না!" চামড়ার দস্তানায় ঢাকা

একটি আঙুল তুলে গানের সুরে সে শেষের কথাগুলি বলল।

মার্শাল তুরবিনকে নিয়ে স্টাডিতে ঢুকল। সেখানে নানা রকমের ভদ্কা, লিকার ও শ্যাম্পেন সাজানো ছিল, আর ছিল প্লেটে-প্লেটে সুস্বাদু খাবার। স্থানীয় ভদ্রলোকরা তামাকের ধোঁয়াসার মধ্যে বসে বা হাঁটতে হাঁটতে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছিল।

নব-নির্বাচিত পুলিশ ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যেই টলতে শুরু করেছে। সেই কথা বলছিল, "আমাদের জেলার ভদ্রজনরা যখন তাকে নির্বাচিত করে সম্মান দেখিয়েছে তখন কর্তব্যকে এড়িয়ে যাবার কোন অধিকার তার নেই, কোন অধিকার নেই—"

কাউণ্টের আগমনে আলোচনা বাধা পেল। সকলকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পরে পুলিশ ক্যাপ্টেন বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে তার করমর্দণ করে বার বার তাকে অনুরোধ জানাল, নতুন হোটেলে সে একটি নৈশ-ভোজের আয়োজন করেছে; কাউণ্ট যেন নাচের পরে তাতে যোগদান করে; সেখানে জিপসিদের সমবেত সংগীতও শোনানো হবে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কাউণ্ট তার সঙ্গে কয়েক গ্লাস শ্যাম্পেন পান করল।

স্টাডি থেকে চলে যাবার সময় সে প্রশ্ন করল, "মশাইরা, আপনারা নাচছেন না কেন?"

পুলিশ ক্যাপ্টেন হেসে বলল, "নাচের ব্যাপারে আমরা তেমন পোক্ত নই কাউণ্ট, আমরা বরং বোতলের খেলই ভাল দেখাতে পারি। কি জানেন কাউণ্ট, এই সব তরুণীরা তো আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে উঠেছে। তবে হ্যাঁ, "একোশাস"-এ কখনও-সখনও পা ফেলে থাকি কাউণ্ট—ওটা এখনও চালাতে পারি।"

তুরবিন বলল, "তাহলে আসুন, পা ফেলি। জিপসিদের গান শুনতে যাবার আগে এখানেই একটু আনন্দ করা যাক।"

যে তিনজন লাল-মুখো সম্ভ্রান্ত লোক বল-নাচের একেবারে শুরু থেকেই স্টাডিতে বসে মদ খাচ্ছিল তারা এবার দস্তানা পরে নিল, একজন পরল কিড-চামড়ার কালো দস্তানা, অপর দুজন রেশমে-বোনা। তারা নাচের ঘরে যাবার উদ্যোগ করতেই গলগণ্ড রোগীর মত দেখতে সাদা-ঠোঁট যুবকটি তাদের থামিয়ে দিল। তার চোখের জল বাধা মানছিল না। তুরবিনের কাছে গিয়ে কষ্ট করে শ্বাস টানতে টানতে বলল, "আপনি কাউণ্ট বলেই ভেবেছেন বাজারের ভিতর দিয়ে চলবার সময় যাকে-তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এটা খুব খারাপ এবং......এবং......" আবারও ঠোঁট দুটো কাঁপতে কাঁপতে তার কথার স্রোতকে বন্ধ করে দিল।

"কী!" হঠাৎ চোখ রাঙিয়ে তুরবিন চীৎকার করে বলল। তারপর

যুবকটির হাত চেপে ধরে এমনভাবে মুচড়ে দিল যে অপমানের চাইতে ভয়েই তার মুখে রক্ত উঠে এল। কাউণ্ট চীৎকার করে বলল, "কী বললি? কুকুরের বাচ্চা! তুই কি আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাস? তাই যদি হয় তো চলে আয়।"

তুরবিন তার হাত ছেড়ে দিতেই দুজন ভদ্রলোক হাত ধরে যুবকটিকে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল।

"তুমি কি পাগল হয়েছ? নিশ্চয় এক বাঁড়ি মদ গিলেছ? তোমার বাবাকে বলে দেব। কি হয়েছে তোমার?" তারা জিজ্ঞাসা করল।

প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করে যুবকটি আর্তনাদ করে উঠল, "আমি মাতাল নই, কিন্তু উনি সবাইকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছেন, অথচ ক্ষমাটি পর্যন্ত চাইছেন না। উনি একটা শুয়োর, ঠিক তাই।"

কিন্তু তার অভিযোগে কান না দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল।

তুরবিনকে শান্ত করবার জন্য পুলিশ ক্যাপ্টেন ও জাভালশেভ্স্কি বলল, "ওর কথায় কান দেবেন না কাউণ্ট, ও তো ছেলেমানুষ; আরে, এখনও তো ওকে চড়-চাপড়ই মারা হয়। মোটে তো ষোল বছর বয়স। না জানি কি ওর মাথায় ঢুকেছে। নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। অথচ ওর বাবা একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক—আমাদের প্রার্থী।"

"ঠিক আছে, এতেও শায়েস্তা না হলে ওকে শয়তানে পাক।"

বলেই কাউণ্ট নাচের ঘরে চলে গেল; সুন্দরী ছোট্ট বিধবাটির সঙ্গে মনের সুখে এক চক্কর "একোশাস" নাচল; যে দুটি ভদ্রলোক স্টাডি থেকে তার সঙ্গে এসেছিল তাদের নাচের বহর দেখে প্রাণ খুলে হাসল; এবং এমন সোরগোল তুলল যে সারা নাচের ঘর গম-গম করে উঠল, আর পুলিশ ক্যাপ্টেন পা পিছলে নাচের জুটিদের মাঝখানে সপাটে মাটিতে পড়ে গেল।

॥ ৫ ॥

কাউণ্ট স্টাডিতে বসে ছিল। ঘরে ঢুকল আন্না ফিয়োদরভ্না। যেন কিছুই হয়নি এ রকম একটা ভাব ভাইকে দেখাতে হবে ভেবে নিয়ে সে শান্তভাবে প্রশ্ন করল, "বল তো ভাই, আমার সঙ্গে যে অশ্বারোহী সৈনিক নাচল তিনি কে?" তুরবিন যে একজন জাঁদরেল "হুজার" যথাসাধ্য সে কথাটা বুঝিয়ে বলে অফিসার আরও জানাল যে, পথে তার টাকা-পয়সা চুরি গেছে বলেই সে শহরে থেকে গেছে এবং বল-নাচে এসেছে; তাছাড়া সে নিজে তাকে একশ' রুবল ধার দিয়েছে, কিন্তু সেটা তো খুবই সামান্য; কাজেই

বোনটি কি তাকে আরও দু'শ' রুবল ধার দিতে পারে না? সঙ্গে সঙ্গে সে বোনকে আরও বলে দিল, সে যেন একথা কাউকে, বিশেষ করে সেই কাউন্টকে না বলে। আন্না ফিয়োদরভ্না কথা দিল, সেদিন সন্ধ্যায়ই ভাইকে টাকাটা পাঠিয়ে দেবে এবং ব্যাপারটা গোপন রাখবে। কিন্তু "একোশাস"-নাচবার সময় তার ভীষণ ইচ্ছা হল, কাউণ্টের যত টাকা দরকার হবে সবটাই দেবার প্রস্তাবটা তার কাছে তোলে। কিন্তু সে প্রস্তাব করবার মত সাহস মনে আনতে তার বেশ কিছু সময় লাগল; সে লজ্জায় লাল হল, ইতস্তত করল, তারপর অনেক চেষ্টা করে কথাটা পাড়ল।

"দেখুন কাউণ্ট, আমার ভাই বলছিল যে পথের মধ্যে আপনার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এবং এখন আপনার কাছে টাকা-কড়ি কিছু নেই। টাকার দরকার হলে সেটা আপনি আমার কাছ থেকে নেবেন কি? নিলে আমি খুবই খুশি হব।"

কথাগুলো মুখ থেকে বের হওয়া মাত্রই আন্না ফিয়োদরভ্না ভীষণ ভয় পেল, তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। কাউণ্টের মুখের উপর থেকে সব আলো নিভে গেছে।

সে সোজা বলল, "আপনার ভাই একটি মুখ্খু। আপনি তো জানেন, একজন পুরুষ যখন অপর একজন পুরুষকে অপমান করে, তখন তাকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করা হয়। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে অপমান করলে কি হয় জানেন কি?"

বেচারি আন্না ফিয়োদরভ্নার ঘাড় ও কান লজ্জায় জ্বালা করে উঠল। সে চোখ নামিয়ে নিল; একটা কথাও বলল না।

তার কানের কাছে মুখ এনে কাউণ্ট চুপি চুপি বলল, "সকলের সামনে স্ত্রীলোকটিকে চুম্বন করা হয়।" মহিলাটির বিহ্বল অবস্থা দেখে তার করুণা হল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় আবার বলল, "আপনার হাতখানি চুম্বন করবার অনুমতি আমাকে দিন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আন্না ফিয়োদরভ্না বলল, "ওঃ, কিন্তু এখন নয়।"

"কখন? কাল সকালেই আমি চলে যাব। আর ওটা আমার প্রাপ্য।"

আন্না ফিয়োদরভ্না হেসে বলল, "কিন্তু এ অবস্থায় আপনার প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারছি না।"

"আজ রাতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ আমাকে দিন, তাহলেই আপনার হাতখানি চুম্বন করতে পারব। কিন্তু সে সুযোগ আমি নিজেই করে নেব।"

"কেমন করে করবেন?"

"সেটা আমার ব্যাপার। আপনার দেখা পাবার জন্য আমি সব কিছু

করতে পারি। আপনার আপত্তি নেই তো?"

"না।"

'একোশাস' শেষ হয়ে গেল। তারা আর একটা 'মাজুরকা' নাচল। সেই নাচের সময় কাউণ্ট অবাক কাণ্ড করতে লাগল; রুমাল চেপে ধরে, একটা হাঁটুর উপর ভর রেখে, বিচিত্র ওয়ালস-পদ্ধতিতে একই সঙ্গে দুটো গোড়ালিতে খট্-খট্ শব্দ তুলে এমন কাণ্ডকারখানা করল যে সে নাচ দেখতে বুড়োরা তাসের টেবিল ছেড়ে উঠে এল, আর যে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে বলে খ্যাতি ছিল সেও পরাজয় মেনে নিল। খাবার পরিবেশন করা হল। শেষ পর্বে একটা "ঠাকুর্দা" নাচ হল, তারপর অতিথিরা একে একে বিদায় নিতে লাগল। সারাক্ষণ কাউণ্ট এক দৃষ্টিতে ছোট্ট বিধবাটিকে দেখতে লাগল। সে যখন বলছিল যে তার জন্য বরফের ভিতরকার গর্তের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করতেও সে প্রস্তুত, তখন সে মোটেই বাড়িয়ে বলে নি। কি ভালবাসা, কি খেয়াল, কি নেহাৎই একগুয়েমি, যে কারণেই হোক সেই সন্ধ্যায় তার সব শক্তি একটিমাত্র বাসনায় কেন্দ্রিভূত হয়েছিল—তার সঙ্গে দেখা করা, আর তাকে ভালবাসা জানানো। সে যখন দেখল, আন্না ফিয়োদরভ্না গৃহস্বামিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন সে দৌড়ে সহিসের ঘরে গেল এবং কোট না পরেই সেখান থেকে রাস্তায় নেমে গেল। সবগুলো গাড়ি সেখানে অপেক্ষা করছিল।

সে হেঁকে বলল, "আন্না ফিয়োদরভ্না জাইৎসভার গাড়ি!" লণ্ঠন-লাগানো চার-আসনের একটা উঁচু গাড়ি বাড়িতে ঢোকবার মুখে এগিয়ে এল।

এক-হাঁটু বরফের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে সে কোচয়ানকে বলল, "থামো"।

কোচয়ান উত্তরে বলল, "আপনি কি চান?"

গাড়িতে চাপবার জন্য গাড়ির পাশে ছুটতে ছুটতে দরজাটা খুলে সে বলল, "আমি গাড়িতে ঢুকতে চাই। থামা, হারামজাদা! ব্যাটা মুখ্খু কোথাকার!"

কোচয়ান অপর চালককে বলল, "ভাসকা! গাড়ি থামাও।" সে নিজেও ঘোড়ার রাশ টানল। "আপনি কেন অন্যের গাড়িতে চড়তে চাইছেন? মাননীয় মহাশয়, এ গাড়িটা আন্না ফিয়োদরভ্নার; আপনার নয়।"

কাউণ্ট বলে উঠল, "চুপ কর্, বুদ্ধু কোথাকার! নে, এই এক রুবল নিয়ে নীচে নেমে দরজাটা বন্ধ করে দে।" কোচয়ান নড়ল না। তখন কাউণ্ট নিজেই পাদানিতে উঠে জানালাটা খুলল এবং কোন রকমে দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। সব পুরনো গাড়ি, বিশেষ করে জরির কাজ-করা গদীওলা পুরনো গাড়ির মত এ গাড়িটার ভিতরেও কেমন একটা ছাতা-পরা, পোড়া কুচির

গন্ধ। কাউন্টের পা দুটো শুধুমাত্র পাতলা বুট ও রাইডিং-ব্রীচেসে ঢাকা ছিল ; তার উপর এতক্ষণ হাঁটু পর্যন্ত বরফে ঢাকা থাকায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। কোচয়ান তার বক্সে বসেই গজ-গজ করছিল, এবার সে নামবার উপক্রম করল। কিন্তু কাউন্ট কিছুই জানলও না, বুঝলও না। তখন তার চোখ-মুখ জ্বালা করছে, বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে। কাঁপা আঙুলে চামড়ার হলদে পোর্টটা চেপে ধরে পাশের জানালা দিয়ে মুখটা বের করল ; তার সমস্ত সত্তা তখন একটি মুহূর্তের প্রত্যাশায় কেন্দ্রীভূত। সে অবস্থা বেশীক্ষণ রইল না। বাড়ির প্রবেশ-পথে কে যেন হেঁকে উঠল, "মাদাম জাইৎসভার গাড়ি!" কোচয়ানের হাতের চাবুক হিস-হিস করে উঠল, উঁচু স্প্রিং-এর উপর গাড়িটা দুলে উঠল, আর বাড়ির অলোকিত জানালাগুলি একের পর এক গাড়ির জানালার পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল।

সামনের জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে কাউন্ট কোচয়ানকে বলল, "খবরদার, আমি যে এখানে আছি সে কথা সহিসকে বলবি না, বুঝলি বদমাস। যদি বলিস, চাবুকে লাল করে দেব ; আর যদি না বলিস—দশ রুবল।"

সশব্দে জানালাটা বন্ধ করার সংগে সংগেই গাড়িটা একটু কাত হয়ে থেমে গেল। কুঁচকে এক কোণে সরে গিয়ে কাউন্ট নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল ; এমন কি চোখও বন্ধ করল ; তার তীব্র আশা পাছে ব্যর্থ হয়ে যায় এই তার ভয়। দরজা খুলে গেল, একে একে সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে এল, স্ত্রীলোকের গাউনের খস্‌-খস্‌ আওয়াজ উঠল, ছাতা-পড়া গাড়ির মধ্যে ভেসে এল জুঁইফুলের গন্ধ, পাদানিতে ছোট দুখানি পায়ের হাল্কা শব্দ হল, আর আন্না ফিয়োদরভ্না তার পোষাকের আঁচলটা কাউন্টের পায়ের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে নীরবে রুদ্ধশ্বাসে তার পাশেই বসে পড়ল।

আন্না কাউন্টকে দেখল কি দেখল না তা কেউ বলতে পারে না, এমন কি সে নিজেও না। কিন্তু কাউন্ট যখন তার হাতখানি ধরে গুঞ্জন করে উঠল, "এবার আমি তোমার হাতখানি চুম্বন করব," তখন সে কিছুমাত্র ভয় পেল না বা কোন কথা বলল না। সংগে সংগে হাতখানা বাড়িয়ে দিতেই কাউন্ট দস্তানার অনেকটা উপর পর্যন্ত চুমোয় চুমোয় ভরে দিল। গাড়ি চলতে লাগল।

কাউন্ট তাকে বলল, "কিছু বল। তুমি রাগ করো নি তো ?"

সে আরও কোণের দিকে সরে গেল। তারপরই সহসা একেবারেই অকারণে তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল, আর মাথাটা আপনা থেকেই কাউন্টের বুকের উপর এলিয়ে পড়ল।

॥ ৬ ॥

নব-নির্বাচিত পুলিশ ক্যাপ্টেন ও তার দলবল, অশ্বারোহী-বাহিনীর অফিসার ও অন্যান্য ভদ্রজনরা বেশ কিছুক্ষণ হল নতুন সরাইখানায় বসে মদে চুমুক দিতে দিতে জিপসিদের গান শুনছিল, এমন সময় আন্না ফিয়োদরভ্নার স্বর্গত স্বামীর ভালুক-চামড়ার লাইনিং দেওয়া মোটা কাপড়ের নীল জোব্বাটা গায়ে চাপিয়ে কাউণ্ট এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

একটি কালো-চুল জোড়া-ভুরু জিপসি ঢুকবার পথের মুখ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে কোটটা খুলতে তাকে সাহায্য করতে করতে সাদা দাঁতের পাটি বের করে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে উঠল, "ওঃ, মাননীয় প্রভু, আপনার আসার আশা তো আমরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। লেবেদিয়ানের পরে আর আপনার সঙ্গে দেখাই হয় নি। স্তাইয়োশ্কা তো আপনার জন্য শুকিয়ে মরছে।"

তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য স্তাইয়োশ্কাও ছুটে এল। সুন্দরী যুবতী জিপসি; ফোলা ফোলা গালে উষ্ণ লাল আভা, দুটি গভীর কালো চোখের উজ্জ্বলতা দীর্ঘ পল্লবের ছায়ায় ঈষৎ ম্রিয়মান।

সানন্দে হেসে উঠে সে গুঞ্জনের সুরে বলল, "আঃ, আমার ছোট্ট কাউণ্ট! আমার ছোট্ট প্রিয়! কী আনন্দ!"

এমন কি ইলিউশ্কাও খুশি হবার ভাণ করে তার দিকে ছুটে গেল। বৃদ্ধা, মধ্যবয়সিনী, কুমারী মেয়ে—সকলেই লাফিয়ে উঠে তাকে ঘিরে ধরল। অনেকেই তার সঙ্গে আত্মীয়তার দাবী জানাল,—কেউ বলল কাউণ্ট তার ছেলেমেয়েদের ধর্মপিতা হয়েছিল, আবার কেউ বলল সে তাদের সঙ্গে ক্রুশ-বিনিময় করেছিল।

তুরবিন সব তরুণী জিপসিদের ঠোঁটে চুম্বন করল; জিপসি বৃদ্ধা ও পুরুষেরা তার ঘাড়ে ও হাতে চুম্বন করল। সম্ভ্রান্ত জনরাও তাকে দেখে খুশি হল, বিশেষ করে উৎসবের জৌলুষ চরমে উঠে এখন পড়তি অবস্থায় বলে যেন তারা আরও খুশি হল। প্রত্যেকেরই তখন অরুচি ধরে গেছে। মদে আর স্নায়ুতে উত্তেজনার স্রোত বইছে না, শুধু পাকস্থলীর বোঝাই বাড়াচ্ছে। যত রকমে হৈ-হুল্লোড় করা যায় সব শেষ করে অতিথিরা তখন বসে বসে পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছে। সব গান গাওয়া হয়ে গেছে, সেগুলো তাদের মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে, শুধু জেগে আছে গণ্ডগোল ও অপচয়ের একটা অস্পষ্ট ধারণা। যত মৌলিক ও দুঃসাহসিক খেলাই দেখানো হোক না কেন, কেউ আর তাতে মজা পাচ্ছে না। পুলিশ অফিসারটি

জনৈকা বৃদ্ধার পায়ের কাছে একটা কদর্য ভঙ্গীতে মেঝেয় পড়ে ছিল।

পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "শ্যাম্পেন! কাউণ্ট এসেছেন! শ্যাম্পেন! তিনি এসেছেন। শ্যাম্পেন নিয়ে এস! স্নানের টবটাকে শ্যাম্পেনে ভর্তি করে আমি তাতে স্নান করব! ভদ্রমহোদয়গণ! এ ধরনের বিশিষ্ট সমাজে মিশতে আমি যে কত ভালবাসি! স্তাইয়োশকা! আবার 'খোলা পথ'টা গাও!"

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটিও তার মতই মাতাল হয়ে পড়েছে। তবে তার প্রকাশটা আলাদা। একটি লম্বা সুন্দরী জিপসি মেয়ের একেবারে কাছ ঘেঁষে একটা সোফার এক কোণে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে পড়ে আছে। মেয়েটার নাম লাইউবাশা; অফিসার বার বার চোখ পিট পিট করে আর মাথা নেড়ে মদের আচ্ছন্নতা কাটাতে চেষ্টা করছে, আর বার বার একই ভাষায় মেয়েটাকে তার সংগে পালিয়ে যেতে বলছে। লাইউবাশা হেসে তার কথা শোনার ভাণ করছে; তার বেশ মজাও লাগছে, আবার দুঃখও হচ্ছে। বার বারই সে তার বিপরীত দিকের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে-থাকা তার জোড়া-ভুরুওয়ালা স্বামী সাশ্কার দিকে তাকাচ্ছে। অফিসারের প্রেম নিবেদনের জবাবে সে মাথা নীচু করে তার কানে কানে বলছে, কিছু ফিতে আর গন্ধ তেল সে কিনে দিক, কিন্তু খবরদার, কেউ যেন জানতে না পারে।

কাউণ্ট আসতেই অফিসার চেঁচিয়ে উঠল, "হুর্রা।"

সুন্দর যুবকটি চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে অস্বাভাবিক দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে-পিছিয়ে "সেরাগলিওতে বিদ্রোহ" থেকে একটা সুর গুন-গুন করে গাইছিল।

অভিজাত ভদ্রজনের একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে একজন প্রবীণ পরিবার-প্রধান জিপসিদের মজলিসে যোগ দিয়েছে। সকলেই তাকে বুঝিয়েছিল যে তিনি যোগদান না করলে তাদের মজাই নষ্ট হয়ে যাবে এবং কারও ভাল লাগবে না। ভদ্রলোক সেখানে হাজির হয়েই একটা সোফায় সটান শুয়ে পড়েছে। তার দিকে কারও এতটুকু নজর নেই। জনৈক সরকারী কর্মচারী গায়ের ফ্রক-কোটটা খুলে টেবিলের উপরে পা তুলে সে যে কত বড় লম্পট সেটা বোঝাবার জন্য চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে বসে আছে। কাউণ্ট সেখানে ঢুকতেই সে শার্টের কলারটা খুলে টেবিলের উপরে আরও খানিকটা পিছনে সরে গেল। মোটের উপর, কাউণ্টের আগমনে জমায়েতটা আরও জমাট বেঁধে উঠল। জিপসিরা ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল, এবার তারাও গোল হয়ে বসল। একক গায়িকা স্তাইয়োশ্কাকে হাঁটুর উপর বসিয়ে কাউণ্ট আরও শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল।

ইলিউশ্কা তাদের ঠিক সামনে বসেছিল গীটার হাতে নিয়ে। এবার সে

"যখনই আমি পথে চলি", "এই, তোমরা অশ্বারোহী সৈনিকরা!" এবং "শোন আর বোঝ" প্রভৃতি জিপসি গান পর পর গেয়ে যাবার নির্দেশ হিসাবে "প্লায়াস্‌কা" শুরু করবার ইঙ্গিত করল। স্তাইয়োশ্‌কা চমৎকার গাইল। একেবারে বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে-আসা তার মিষ্টি, নমনীয় মেয়েলি স্বর, তার মুখের বিজয়িনীর হাসি, হাস্যমুখর উচ্ছ্বসিত চাউনি, গানের তালে তালে ছোট পায়ের স্বতস্ফূর্ত তাল ঠোকা, প্রতিটি সমবেত কণ্ঠের শুরুতে তার অনুচ্চ বন্য চীৎকার—সব কিছু মিলে গীটারের তারকে স্পর্শ না করেও যেন তাতে কাঁপন জাগিয়ে তুলল। গানের মধ্যে সে যেন তার সমস্ত আত্মাকে ডুবিয়ে দিল। গীটারে তার সঙ্গে সহযোগিতা করল ইলিউশ্‌কা। পিঠ ও পায়ের ছোট ছোট তালে, তার হাসিতে, তার সমগ্র সত্তা দিয়ে সে ঐ গানের সঙ্গে তার একাত্মতা প্রকাশ করতে লাগল। গানের তালে তালে মাথা নাড়তে নাড়তে তার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে এমন আগ্রহ ও মনযোগের সঙ্গে সে গান শুনতে লাগল যেন ও গান আগে সে কখনও শোনে নি। গানের শেষ সুরটি মিলিয়ে যেতেই সহসা সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবং যেন নিজেকে পৃথিবীর সকলের সেরা মানুষ ভেবে নিয়ে সগর্বে ও স্বেচ্ছায় হাঁটু দিয়ে গীটারটাকে এমনভাবে ঠুকে দিল যে সেটা বাতাসে ঘুরপাক খেতে লাগল আর সেই সঙ্গে সে মেঝেতে পা ঠুকতে শুরু করে দিল, চুলগুলোকে পিছনে সরিয়ে দিল, আর ভ্রূকুটি-কুটীল দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিপসিদের সমবেত সঙ্গীতকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর শুরু হল তার নাচ—দেহের প্রতিটি তন্ত্রী দিয়ে সে নাচতে লাগল। আর কুড়িটি জোরালো বলিষ্ঠ কণ্ঠ একযোগে বাজতে লাগল; প্রত্যেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল সব চাইতে নতুন ও মৌলিক এক সুরসৃষ্টি করতে। বৃদ্ধ মহিলারা আসন না ছেড়েই ছোট ছোট লাফ দিতে লাগল, রুমাল ওড়াতে লাগল, আর মুখ বিকৃত করে গানের তালে তালে এমনভাবে চীৎকার করতে লাগল যেন প্রত্যেকেই চাইছে অপরের কণ্ঠকে ডুবিয়ে দিতে। আর পুরুষরা চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের গভীর মোটা গলা ছেড়ে দিল, মাথা নাড়তে লাগল, তাদের কণ্ঠনলী ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

স্তাইয়োশ্‌কা যখনই চড়া পর্দায় যায় তখনই যেন তাকে সাহায্য করবার জন্য ইলিউশকা গীটারটাকে আরও কাছে নিয়ে যায়, আর সুন্দর যুবকটিও সোল্লাসে চীৎকার করে ওঠে।

একটা নাচের গান যখন চলছিল তখন দানিয়াশা এগিয়ে গেল। তার কাঁধ ও বুক কাঁপছে। প্রথমে সে কাউণ্টের সামনে ঘুরপাক খেল, তারপর মেঝের মাঝখানে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠল তুরবিন, জ্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, এবং দুই পায়ের কারিকুরিতে এমন সব কাণ্ড দেখাতে লাগল যাতে জিপসিরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সমর্থনের হাসি

হাসতে লাগল।

পুলিশ ক্যাপ্টেন তুর্কীদের মত জোড়াসন হয়ে বসেছিল। হাতের মুঠি দিয়ে বুক চাপড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "সাবাশ!" তারপর কাউণ্টের পা চেপে ধরে বলল যে দু' হাজার রুবল নিয়ে সে এসেছিল, তার মধ্যে মাত্র পাঁচ শ' অবশিষ্ট আছে, এখন কাউণ্ট মঞ্জুর করলেই সেটা দিয়ে সে যা খুশি তা করতে পারে। প্রবীণ পরিবার-প্রধানটি ঘুম থেকে উঠে বাড়ি যেতে চাইল, কিন্তু তাকে যেতে দেওয়া হল না। সুদর্শন যুবকটি জনৈকা জিপসি মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচতে শুরু করল। কাউণ্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রকাশের ব্যগ্রতায় অফিসারটি এক কোণ থেকে এগিয়ে এসে দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

বলল, "ওগো প্রিয়, আমাদের ফেলে আপনি কোথায় ছিলেন?" কাউণ্ট জবাব দিল না, তখন তার মন রয়েছে অন্য কোথাও। "কোথায় ছিলেন আপনি? আপনি বড় চালাক লোক কাউণ্ট, আমি জানি কোথায় গিয়ে-ছিলেন!"

যে কারণেই হোক, এই গায়ে-পড়া ভাব দেখে তুরবিন বিরক্ত হল। সে না হেসে অফিসারের মুখের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল মাত্র, কোন কথাই বলল না। তারপর হঠাৎ সে এমন হুল-ফোটানো কথার ফুলঝুড়ি ছোটাতে শুরু করল যে অফিসার হতভম্ব হয়ে গেল এবং এটা সত্যি রাগ না ঠাট্টা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সে একটুখানি হেসে জিপসি মেয়েটার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বোঝাতে লাগল যে ঈস্টারের পরেই সে তাকে বিয়ে করবে।

সকলে মিলে আর একটা গান করল, আরও একটা, আরও নাচল, পরস্পরের প্রতি সম্মানে গান করল এবং ভাবল, কী মজায়ই না সময়টা কাটল। শ্যাম্পেনের স্রোতেরও বিরাম নেই। কাউণ্ট প্রচুর মদ খেল। তার চোখ আবছা হয়ে এল, কিন্তু পা টলল না। সে খুব ভাল নাচল, অকম্পিত গলায় কথা বলল, জিপসিদের সমবেত সংগীতে গলা মেলাল, এবং স্তাইয়োশকো যখন গাইল "ভালবাসার পাখায় লাগে মধুর কাঁপন" তখন সেও তার সঙ্গে সুর মেলাল।

একটা গানের মাঝখানে সরাইখানার মালিক এসে সবাইকে চলে যেতে বলল, কারণ তখন প্রায় তিনটে বাজে। কাউণ্ট তার গর্দান চেপে ধরে তাকে একটা স্কোয়াট নাচতে হুকুম করল। সে অস্বীকার করল। কাউণ্ট একটা শ্যাম্পেনের বোতল হাতে নিয়ে মালিককে মেঝেতে উল্টে ফেলল, তার কথা মত সকলে তাকে চেপে ধরল, আর সকলের হৈ-হল্লার মধ্যে সে সমস্ত বোতলটাই তার গায়ে ঢেলে দিল।

তখন দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। একমাত্র কাউণ্ট ছাড়া আর সকলেই বিবর্ণ ও পরিশ্রান্ত।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "আমাকে এখনই মস্কো রওনা হতে হবে। মশাইরা, আমাকে বিদায় জানাতে আমার সঙ্গে হোটেলে ফিরে চলুন। একটু চা খাওয়া যাবে।"

একমাত্র ঘুমন্ত পরিবার-প্রধান ছাড়া আর সকলেই সম্মতি দিল এবং তাকে সেখানে রেখেই সকলে চলে গেল। দরজায় দাঁড়ানো তিনটি স্লেজে সকলে গাদাগাদি হয়ে বসে হোটেলে রওনা হল।

॥ ৭ ॥

অতিথিবর্গ ও জিপসিদের সঙ্গে নিয়ে হোটেলের বাইরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই কাউণ্ট চেঁচিয়ে বলল, "ঘোড়াগুলোকে সাজ পরা! সাশ্কা!—না, না, জিপসিদের সাশ্কা নয়, আমার সাশ্কা—পোস্টমাস্টারকে বলে দে, আমাকে খারাপ ঘোড়া দিলে আমি তার চামড়া ধোলাই করে দেব। আর আমাদের জন্য চা নিয়ে আয়! জাভাল্শেভ্স্কি, তুমি চায়ের ব্যবস্থাটা দেখ, আমি ততক্ষণ ইল্যিনের ঘরে গিয়ে দেখে আসি সে কেমন আছে।" কথা শেষ করে সে দালান পেরিয়ে উহ্লানের ঘরের দিকে গেল।

ইল্যিন সবে খেলা শেষ করেছে। শেষ কোপেক পর্যন্ত হেরে গিয়ে সে ঘোড়ার লোমের ছেঁড়া সোফায় শুয়ে একটা একটা করে লোম টেনে তুলে মুখে দিচ্ছে, আর দাঁতে কামড়ে থু-থু করে ফেলে দিচ্ছে। দুটো মোমবাতি টেবিলে জ্বলছে। একটা একেবারে তলাকার কাগজ পর্যন্ত পুড়ে গেছে। তাসগুলো টেবিলের উপর ইতস্ততঃ ছড়ানো। জানালা দিয়ে ভোরের যে আলো এসে পড়েছে, মোমবাতির ম্লান আলো যেন বৃথাই তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। উহ্লানের মনে চিন্তার লেশমাত্র নেই; জুয়ার নেশার গাঢ় কুয়াসায় তার মনের সব ক্ষমতা চাপা পড়ে গেছে; দুঃখবোধ পর্যন্ত চলে গেছে। একথা ঠিক যে এক সময়ে সে ভাবতে চেষ্টা করছিল এর পর কি করবে, কোপেকহীন অবস্থায় এখান থেকে যাবে কেমন করে, রেজিমেণ্টের পনেরো হাজারই বা ফেরৎ দেবে কেমন করে, রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারই বা কি বলবে, তার মা কি বলবে, সহকর্মীরা কি বলবে—এত কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে এতখানি ভয় ও বিরক্তি তাকে চেপে ধরল যে সব কিছু ভুলে যাবার জন্য

সে লাফ দিয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল, বিশেষ করে মেঝেতে পাতা বোর্ডের ফাঁটা জায়গাগুলোতেই পা ফেলে হাঁটতে লাগল। আবার নতুন করে যতগুলো খেলা সে খেলেছে তার বিস্তারিত বিবরণ মনে করতে লাগল। মনে পড়ল, সে প্রায় জিতে যাচ্ছিল—সে তুলেছিল স্পেডের নহলা আর সাহেব, আর তার উপর বাজি ধরেছিল দু হাজার রুবল: ডাইনে—বিবি; বাঁয়ে—টেক্কা; ডাইনে—ডায়মণ্ডের গোলাম, আর—সে সবটা হেরে গেল। ছক্কাটা যদি থাকত ডাইনে আর ডায়মণ্ডের সাহেবটা বাঁয়ে, তাহলেই সে সবটা জিতে নিত এবং আবার সবটা বাজি ধরে আরও পরিষ্কার পনেরো হাজার জিততে পারত। আঃ, তাহলেই সে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের একটা জিনশুদ্ধ ঘোড়া কিনে ফেলত, আর তাছাড়া আরও একজোড়া ঘোড়া ও একখানি ফিটন! আর কি? কেন…কেন…আঃ, কী আশ্চর্য ব্যাপারই না হত, আশ্চর্য!

পুনরায় সোফায় শুয়ে পড়ে সে লোম চিবুতে লাগল।

মনে মনে ভাবল, "ওরা সাত নম্বর ঘরে গান গাইছে কেন? নিশ্চয় তুরবিন সবাইকে আপ্যায়ন করছে। হয় তো আমারও সেখানে যাওয়া উচিত, পেটে মদ পড়লেই হয় তো ভাল হয়ে যাব।"

ঠিক সেই সময় কাউণ্ট ঘরে ঢুকল।

জিজ্ঞাসা করল, "কি হে, একেবারে ছিবড়ে করে দিয়েছে তো?"

ইল্যিন ভাবল, "ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকি, নইলে কথা বলতে হবে, কিন্তু আমি ভীষণ ক্লান্ত।"

কিন্তু তুরবিন কাছে গিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"কি হে ভাল মানুষ, ছিবড়ে করে দিয়েছে তো? সব হেরে গেছ? কথা বল।"

ইল্যিন জবাব দিল না।

কাউণ্ট তার আস্তিন ধরে টানল।

"হ্যাঁ, হেরেছি। তাতে আপনার কি?" ঘুম-ঘুম গলায় এমনভাবে ইল্যিন কথাগুলো বলল যাতে তার বিরক্তি ও উদাসীনতাই প্রকাশ পেল; সে পাশ ফিরল না পর্যন্ত।

"সব?"

"হ্যাঁ। তাতে কি? সব। তাতে আপনার কি?"

কাউণ্ট বলল, "শোন। একজন কমরেড হিসাবে আমাকে সত্য কথা বল।" সুরার প্রভাবে তার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জেগে উঠছে; সে আস্তে আস্তে যুবকটির মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগল। "সত্যি, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। ঠিক করে বল তো, যদি সত্যি তুমি রেজিমেণ্টের টাকা হেরে থাক,

আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব; এখনই আমাকে বল, এটা কি রেজিমেণ্টের টাকা? এর পরে হয় তো অনেক দেরী হয়ে যাবে।

ইল্যুয়িন সোফা থেকে লাফ দিয়ে নামল।

"আপনি যদি সত্যি জানতে চান, তাহলে এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না যেন......যেন......দয়া করে আমাকে কিছু বলবেন না। আমার মাথার ভিতর দিয়ে একটা বুলেট চালিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।" দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে গভীর নৈরাশ্যে সে কথা বলতে লাগল, অথচ মাত্র মুহূর্তেক আগে সে একটা জিন-আঁটা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখছিল।

"এই দেখ, তুমি যে মেয়েলি কাণ্ড শুরু করে দিলে। বিপদ সকলের জীবনেই আসে। বিশেষ ক্ষতি তো কিছু হয় নি; মনে হচ্ছে যেটুকু হয়েছে তা শুধরে নেওয়া যাবে। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর।"

কাউণ্ট বেরিয়ে গেল।

ছোকরা চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করল, "জমিদার লুখনভ কোন্ ঘরে থাকেন?"

ছোকরা দেখিয়ে দিল।

খানসামা বাধা দিয়ে জানাল যে তার প্রভু এইমাত্র ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছাড়ছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও কাউণ্ট ভিতরে ঢুকে গেল। টেবিলের সামনে বসে ড্রেসিং-গাউন পরিহিত লুখনভ সামনে রাখা একগাদা ব্যাংক-নোট গুণছিল। টেবিলের উপর তার একান্ত প্রিয় রাইন-মদও এক বোতল ছিল। খেলায় জিতেছে বলেই এই দামী মদের ব্যবস্থা সে করেছে। লুখনভ চশমার ভিতর দিয়ে এমন কঠিন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে কাউণ্টের দিকে তাকাল, যেন তাকে সে চেনেই না

সদর্পে পা ফেলে টেবিলের কাছে গিয়ে কাউণ্ট বলল, "মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চেনেনই না।"

কাউণ্টকে চিনতে পেরে লুখনভ বলল, "আপনার জন্য কি করতে পারি?"

সোফায় বসে তুরবিন বলল, "আপনার সঙ্গে আমি তাস খেলতে চাই।"

"এখন?"

"হ্যাঁ।"

"দেখুন কাউণ্ট, অন্য কোন সময় আমি আনন্দের সঙ্গেই খেলব, কিন্তু এখন আমি শ্রান্ত, শুতে যাব।"

"আমি এখনই খেলতে চাই।"

"আজ রাতে আর খেলবার ইচ্ছা আমার নেই। হয় তো আর কোন ভদ্র-

লোক খেলতে পারেন, কিন্তু আমি পারব না কাউণ্ট। আশা করি, ক্ষমা করবেন।"

"তাহলে আপনি খেলবেন না?"

লুখনভ দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়েই যেন বুঝিয়ে দিল যে, কাউণ্টের মনোবাসনা পূর্ণ করতে না পারায় সে দুঃখিত।"

"কোন কিছুর জন্যই নয়?"

আবার ছোট একটু ঝাঁকুনি।

"খুব আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসা করছি: খেলবেন কি না?"

নীরবতা!

"আপনি কি খেলবেন?" কাউণ্ট আবার বলল। "মনে রাখবেন, এখনই!"

লুখনভ তথাপি নিরুত্তর। চশমার উপর দিয়ে সে দ্রুত একবার কাউণ্টের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করল—সেখানে দ্রুত মেঘ জমছে।

"আপনি খেলবেন কি না," চীৎকার করে কথাগুলি বলেই কাউণ্ট এমন জোরে টেবিলের উপর আঘাত করল যে রাইন-মদের বোতলটা পড়ে গিয়ে সব মদ গড়িয়ে পড়ল। "আপনি জানেন যে আপনি ফাঁকিবাজি করে জিতেছেন। আপনি খেলবেন কি না? এই তৃতীয় বার আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

চোখ না তুলেই লুখনভ মন্তব্য করল, "আমি তো বলে দিয়েছি, খেলব না। কিন্তু আপনার আচরণ তো অদ্ভুত কাউণ্ট। সম্ভ্রান্ত মানুষ কখনও এ ভাবে হামলা করে লোকের গলার উপর ছুরি তুলে ধরে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কাউণ্টের মুখ ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে লুখনভ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। টাকাগুলোকে হাত দিয়ে চেপে ধরে সে সোফার উপর লুটিয়ে পড়ল; তার মুখ দিয়ে এমন একটা উদ্ভ্রান্ত তীক্ষ্ম চীৎকার বেরিয়ে এল যা তার মত একজন ধীর স্থির সম্ভ্রান্ত লোকের কাছ থেকে কেউই আশা করতে পারে না। তুরবিন তাড়াতাড়ি টাকাগুলো হাতিয়ে নিল। প্রভুর আর্তনাদ শুনে খানসামা ছুটে এসেছিল। তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

দরজার কাছে পৌঁছে কাউণ্ট বলল, "যদি বোঝাপড়া করতে চান, আমি তৈরি আছি। আরও আধঘণ্টা আমি আমার ঘরে থাকব।"

ঘরের ভিতর থেকে চীৎকার ভেসে এল, "চোর! বদমাস! আমি তোমাকে আদালতে নিয়ে তবে ছাড়ব!"

সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে বলে কাউণ্ট যে কথা দিয়েছিল ইলুয়িন তাতে মোটেও বিশ্বাস করে নি। নিরাশার কান্নায় তার গলা আটকে আসছিল।

সে তখনও সোফায়ই শুয়ে ছিল। কাউণ্টের সহানুভূতি তার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সে এখন সচেতন হয়েছে। সে বুঝতে পারছে, তার আশাময় যৌবন, তার সম্মান, সহকর্মীদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের স্বপ্ন,—সব চিরতরে মুছে গেছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, একটা শান্ত নৈরাশ্য ক্রমেই তার মনের উপর চেপে বসছে, আর আত্মহত্যার চিন্তা মনের মধ্যে ভয় ও বিতৃষ্ণা না জাগিয়ে বরং ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। ঠিক সেই সময় কাউণ্টের দৃঢ় পদশব্দ তার কানে এল।

তুরবিনের মুখে তখনও ক্রোধের আভাষ, হাত দুটি সামান্য কাঁপছে, কিন্তু দুটি চোখ আনন্দে ও তৃপ্তিতে জ্বলজ্বল করছে।

একগাদা নোট টেবিলের উপর রেখে বলল, "দেখ, সব আমি জিতে নিয়েছি। গুণে দেখ সব ঠিক আছে কি না। তারপর জল্দি বসবার ঘরে চলে এস। আমি চলে যাচ্ছি।" উহ্লানের মুখে যে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল তা যেন সে দেখেও দেখল না। একটা জিপসি গানের সুরে শিস্ দিতে দিতে ঘর থেকে চলে গেল।

॥ ৮ ॥

চাপরাশটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে সাশ্কা জানিয়ে দিল যে ঘোড়া তৈরি। সে আরও দাবী জানাল, তাদের উচিত এখনই গিয়ে কাউণ্টের পুরো তিনশ' রুবল দামের ফারের কলার লাগানো গ্রেটকোটটা উদ্ধার করা, আর যে জোচ্চোররা মার্শালের গ্রেটকোটটা হাতিয়ে নিয়েছে ঐ বাজে নীল আলখাল্লাটা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু তুরবিন বলল; গ্রেটকোটটা ফিরে পাবার কোন দরকার নেই। তারপরই সে পোষাক বদলাবার জন্য তার ঘরে চলে গেল।

অফিসারটি তার মনের মত জিপসি মেয়েটার পাশে চুপচাপ বসে অনবরত হিক্কা তুলছে। পুলিশ ক্যাপ্টেন ভদকার অর্ডার দিয়ে সমবেত ভদ্রজনকে তার বাড়িতে প্রাতরাশের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের কথা দিল যে তার স্ত্রীও নীচে নেমে জিপসিদের সঙ্গে নাচবে। সুদর্শন যুবকটি ইল্যুশ্কাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে গীটার অপেক্ষা পিয়ানোফোর্ট অনেক বেশী প্রাণময় বাজনা। সরকারী কর্মচারীটি এক কোণে বসে চা খাচ্ছিল; এখন দিনের আলো ফুটতে দেখে নিজের লাম্পট্যের জন্যই লজ্জা বোধ করতে লাগল। জিপসিরা নিজেদের ভাষায় তর্কাতর্কি করছিল; তারা বলছিল যে ভদ্রলোকদের সম্মানে আর একটা গান হোক, কিন্তু স্তাইয়োশ্কা এই বলে আপত্তি করছিল যে তাতে

'ব্যারোরে'ই (কাউণ্ট, প্রিন্স বা সম্ভ্রান্ত লোক) রাগ করবে। এক কথায় বলা যায়, সেখানে জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গটাও যেন নিভু নিভু হয়ে এসেছে।

ভ্রমণের উপযোগী পোষাক পরে ঘরে ঢুকল কাউণ্ট। তাকে আরও ঝরঝরে, আরও সুন্দর, আরও উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। সে বলল, 'বিদায় বেলায় একটা শেষ গান হোক, তারপরই যে যার বাড়ি।"

জিপসিরা গোল হয়ে বসে শেষ গানের জন্য তৈরি হয়েছে, এমন সময় এক বাণ্ডিল নোট হাতে নিয়ে ইলুয়িন ঘরে ঢুকে কাউণ্টকে এক পাশে ডাকল।

বলল, "আমার কাছে শুধু রেজিমেণ্টের পনেরো হাজার রুবল ছিল, আর আপনি আমাকে দিয়েছেন ষোল হাজার তিন শ'। বাকিটা তো আপনার প্রাপ্য।"

"চমৎকার! সেগুলো আমাকে দিয়ে দাও!"

টাকাটা দেবার সময় ইলুয়িন সলজ্জভাবে কাউণ্টের দিকে তাকাল, কিছু বলবার জন্য মুখও খুলল, কিন্তু পারল না ; লজ্জায় লাল হয়ে তার চোখ জলে ভরে এল ; কাউণ্টের হাতটা সে সজোরে চেপে ধরল।

"এখন চলে যাও! ইলয়ুশকো! শোন—এই নাও কিছু টাকা ; শহরের গেট পর্যন্ত গানে গানে আমাকে বিদায় জানাও।" ইলুয়িনের দেওয়া এক হাজার তিন শ' রুবল সে জিপসিদের গীটারের উপর ছড়িয়ে দিল। কিন্তু আগের রাতে অফিসারটির কাছ থেকে যে একশ' রুবল ধার করেছিল সেটা শোধ করতে ভুলে গেল।

সকাল দশটা বাজে। সূর্য বাড়ির ছাদের উপর উঠে এসেছে, পথঘাট লোকজনে পূর্ণ, দোকানীরা অনেক আগেই দরজা খুলেছে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও সরকারী কর্মচারীরা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, মহিলারা বাজারের এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ঘোরাফেরা করছে, এমন সময় জিপসিদের দল, পুলিশ ক্যাপ্টেন, অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, সুদর্শন যুবক, ইলুয়িন, এবং ভালুকের চামড়ার পাড়-বসানো নীল আলখাল্লা পরিহিত কাউণ্ট হোটেলের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। দিনটি রৌদ্রোজ্জ্বল। বরফ গলতে শুরু করছে। উঁচু করে লেজ-বাঁধা তিন-ঘোড়ায় টানা তিনটে স্লেজ হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল, আর সমস্ত আনন্দমুখর দলটা তাতে চেপে বসল। কাউণ্ট, ইলুয়িন স্তাইয়োশকো, ইলয়ুশকা আর কাউণ্টের চাকর সাশকো উঠল প্রথম স্লেজটায়। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বুইশার লেজ নাড়তে নাড়তে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। বাকি তিনজন ও জিপসিরা উঠল অন্য স্লেজে। হোটেলটা পার হবার পরেই তিনটে স্লেজ পাশাপাশি চলতে লাগল, আর জিপসিরা সমবেত কণ্ঠে গান শুরু করে দিল।

এইভাবে গাইতে গাইতে আর ছোট ছোট ঘণ্টার ঠুন ঠুন শব্দ করতে

করতে তারা সারা শহর পার হয়ে গেট পর্যন্ত এগিয়ে চলল। পথে যত গাড়ি পড়ল সেগুলোকে ঠেলে দিল ফুট-পাথের উপর। এই সব শ্রদ্ধার্হ ভদ্রজনরা প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের রাজপথে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে জিপসি মেয়েরা আর মাতাল জিপসি পুরুষরা, এ দৃশ্য দেখে দোকানী ও পদযাত্রী, বিশেষ করে যারা তাদের চিনত তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

শহরের গেট পেরিয়ে স্লেজগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। সকলেই কাউণ্টের কাছ থেকে বিদায় নিল।

যাত্রার আগে ইলায়িন অনেকটা মদ খেয়েছিল। এতক্ষণ সে নিজেই ঘোড়াগুলোকে চালাচ্ছিল। হঠাৎ তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল; কাউণ্টকে আরও একটা দিন থেকে যেতে বলল। কিন্তু যখন বুঝল যে সেটা সম্ভব নয় তখন খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে সে সজল চোখে নতুন বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে জানাল যে, রেজিমেণ্টে ফিরে গিয়েই যে অশ্বারোহী রেজিমেণ্টে তুরবিন যেখানে কাজ করে সেখানে বদলি হবার জন্য সে একখানা আবেদন-পত্র পেশ করে দেবে। কাউণ্ট তখন খুশিতে মশগুল। সারা সকালটা অফিসারের সঙ্গে কাটানোর ফলে তার সঙ্গে কাউণ্টের বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কাউণ্ট তাকে ধাক্কা মেরে বরফের ভিতর ফেলে দিল। বুইশারকে লেলিয়ে দিল পুলিশ ক্যাপ্টেনের দিকে। দুই হাতে স্তাইয়োশকাকে তুলে ধরে তাকে মস্কো নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখাল। সব শেষে এক লাফে স্লেজে চেপে বুইশারকে নিজের পাশে বসিয়ে দিল, যদিও কুকুরটা চাইছিল মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। কাউণ্টের গ্রেটকোটটা খুঁজে-পেতে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য অফিসারকে আর একবার অনুরোধ জানিয়ে সাশকাও লাফিয়ে চালকের আসনে উঠে বসল। কাউণ্ট চেঁচিয়ে বলল, "চললাম!" টুপিটা খুলে মাথার উপর নাড়তে লাগল, স্লেজ-চালকের মত করে ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে শিস দিতে লাগল, আর তিনখানা স্লেজ তিন দিকে এগিয়ে চলল।

সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত একঘেয়ে বরফ-ঢাকা প্রান্তর, আর তার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে ময়লা হলুদ ফিতের মত রাস্তাটা। গলে-পড়া বরফের চুড়োয় নৃত্যপর ঝকঝকে উজ্জ্বল সূর্যটা মুখে ও পিঠে একটা আরামদায়ক উষ্ণতার ছোঁয়া লাগিয়ে দিচ্ছে। ঘোড়াগুলোর ঘর্মাক্ত দেহ থেকে বাষ্প উঠছে। স্লেজের ঘণ্টাগুলো ঠুনঠুন্ করে বাজছে। একটি চাষী তার বেশী বোঝাই-করা স্লেজের পাশে পাশে দৌড়ে যাচ্ছিল; কাউণ্টকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য তাড়াতাড়িতে ঘোড়ার দড়িতে টান দিতে গিয়ে পথের পাশের কাদায় তার বাকলের জুতো ডুবে গেল। একটি মোটামত লাল-মুখো

চাষী মেয়ে ভেড়ার চামড়ার কোটের ভিতরে বুকের কাছে একটা বাচ্চাকে নিয়ে আর একটা স্লেজে বসে লাগামের গোড়া দিয়ে সাদা টাট্টুঘোড়াটার পিঠে আস্তে আস্তে টোকা মারছিল। সহসা কাউণ্টের মনে পড়ল আন্না ফিয়োদরভ্নার কথা।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মুখ ঘোরাও।"

চালক ঠিক বুঝতে পারল না।

"গাড়ি ঘোরাও! শহরে ফিরে চল! জলদি!"

আবার গেট পেরিয়ে স্লেজটা দ্রুত ছুটতে ছুটতে মাদাম জাইৎসভার বাড়ির কাঠের দরজার সামনে হাজির হল। কাউণ্ট সিঁড়ি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশ-পথের হল ও বসবার ঘর পার হয়ে গেল। ছোট্ট বিধবাটি তখনও বিছানায়ই ছিল। দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তুলে নিয়ে তার ঘুম-ঘুম দুটি চোখ চুম্বনে ভরে দিয়ে কাউণ্ট দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আধো-ঘুম অবস্থায় আন্না ফিয়োদরভ্না শুধু তার ঠোঁট দুটি চাটতে চাটতে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, "হল কি?"

লাফ দিয়ে স্লেজে উঠে কাউণ্ট চালককে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল, এবং তারপর আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে, লুখনভ, বা ছোট্ট বিধবাটি, বা স্তাইয়োশ্কার কথা একটি বারের জন্যও মনে না এনে শুধু মস্কোর কথা ভাবতে ভাবতেই চিরদিনের মত কে-শহর ছেড়ে চলে গেল।

॥ ৯ ॥

কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে। সেতুর নীচ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, অনেকের মৃত্যু হয়েছে, অনেক মানুষ জন্মেছে, আবার অনেকে এতদিনে বড় হয়েছে বা বার্ধক্যে পেঁচেছে; এমন কি মানুষের তুলনায় অনেক বেশী নতুন ভাবাদর্শের জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যু ঘটেছে। পুরনো দিনের অনেক কিছু ভাল এবং অনেক কিছু মন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; অনেক নতুন ভাল জিনিসের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, এমন কি অনেক নতুন খারাপ জিনিসও দেখা দিয়েছে।

অনেক বছর পার হয়ে গেল। কাউণ্ট ফিয়োদর তুরবিন মারা গেছে; পথের মাঝখানে জনৈক বিদেশীকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছিল বলে সেই বিদেশীর সঙ্গে তার যে দ্বৈত-যুদ্ধ হয় তাতেই সে মারা যায়। তার ছেলে যেন হুবহু বাবার প্রতিমূর্তি। সে এখন তেইশ বছরের মনোহরণ যুবক, 'ক্যাভেলিয়ার গার্ডস'-এ অফিসার। কিন্তু প্রকৃতিতে তরুণ কাউণ্ট তুরবিনের সঙ্গে তার

বাবার একদম মিল নেই। বিগত যুগের উচ্ছৃংখল, আবেগময়, এবং খোলাখুলি বললে, অসংযত চরিত্রহীনতার ছায়ামাত্র তার মধ্যে নেই। বুদ্ধিমত্তা, সুশিক্ষা ও স্বভাবগত প্রতিভা সে তো উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছে; সেগুলি ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর মধ্যে মর্যাদা ও আরামের প্রতি আকর্ষণ, মানুষ ও ঘটনাকে বিচার করবার বাস্তবানুগ পদ্ধতি এবং জীবনের প্রতি সতর্ক ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী অন্যতম। এই তরুণ কাউন্টটি চাকরির ক্ষেত্রেও বেশ এগিয়ে গেছে; তেইশ বছর বয়সেই সে লেফ্‌টেন্যান্ট পদে উন্নীত হয়েছে।

যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন সে বুঝতে পারল যে যুদ্ধে যোগ দিলে পদোন্নতির সম্ভাবনা অনেক বেশী, তাই সে একটি অশ্বারোহী রেজিমেন্টে নিজের বদলির ব্যবস্থা করে ক্যাপ্টেন হয়ে যোগদান করল এবং শীঘ্রই একটি স্কোয়াড্রনের ভারপ্রাপ্ত হল।

১৮৪৮-এর মে মাসে অশ্বারোহী বাহিনীর এস. রেজিমেন্ট "কে" গুবার্নিয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং তরুণ কাউন্ট তুরবিনের অধীনস্থ স্কোয়াড্রনটিকে একটা রাত কাটাতে হল আন্না ফিয়োদরভ্‌নাদের গ্রাম মরজভ্‌কাতে। আন্না ফিয়োদরভ্‌না তখনও বেঁচে আছে, কিন্তু তার বয়স এখন এতই বেশী যে নিজেকেও সে আর তরুণী বলে ভাবে না, আর মেয়েদের দিক থেকে এটা খুবই বাড়াবাড়ি ব্যাপার। সে খুবই বড়সড় হয়ে উঠেছে, কোন নারী নিজেকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাবার জন্য এই কথাই বলে থাকে। তার নরম সাদা দেহ জুড়ে বলিরেখার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সে এখন আর গাড়ি চেপে শহরে যায় না, আসলে সে আর গাড়িতে চড়তেই পারে না। কিন্তু তার স্বভাব আগের মতই হাসিখুশি, আর বোকা-বোকাই আছে; কথাটা বলতে পারছি এই জন্য যে তার মধ্যে আর এমন কোন সৌন্দর্য অবশিষ্ট নেই যা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে। মেয়ে লিজা তার কাছেই থাকে। তার বয়স তেইশ বছর, দেখতে সুন্দরী। আর তার দাদা আমাদের পরিচিত সেই অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারও তার আয়েসী স্বভাবের জন্য বিষয়-সম্পত্তি সব উড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে এখন বোনের কাছেই থাকে। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে; উপরের ঠোঁটটা বেঁকে গেছে, কিন্তু ঠোঁটের উপরকার গোঁফ জোড়াটি সযত্ন কলপের ফলে বেশ কালোই আছে। বলি-রেখা শুধু তার গাল আর কপালকেই ছেয়ে ফেলে নি, তার নাক ও গলাকেও ছেয়েছে; পিঠ বেঁকে গেছে, কিন্তু দুর্বল দুটি বাঁকা ঠ্যাঙে এখনও যেন পুরনো দিনের অফিসারের কিছুটা অবশিষ্ট আছে।

ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা পরিবারের ও গৃহস্থালির সকলকে নিয়ে সে পুরনো বাড়িটার ছোট বসবার ঘরে বসে ছিল। ঘরের বারান্দার দরজা ও জানালাগুলো

লেবুগাছের ছায়ায় ঘেরা পুরনো আমলের তারকাকৃতি একটি বাগানের দিকে খোলে। মাথা-ভর্তি পাকা চুল আন্না ফিয়োদরভ্‌না একটা সুগন্ধি আবরণে ঢাকা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে গোল মেহগেনি টেবিলটার পিছনে একটা সোফায় বসে 'সলিতেয়ার' (এক রকম একক খেলা) খেলছিল। তার বৃদ্ধ দাদা পরিষ্কার সাদা পাৎলুন ও নীল কোট পরে জানালার পাশে বসে সাদা সুতো দিয়ে কি যেন বুনছিল। যেহেতু সে আর এখন কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে না এবং চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত কমে যাওয়ায় তার একান্ত প্রিয় কাজ খবরের কাগজও আর পড়তে পারে না, সেই জন্য বোন-ঝিটি তাকে এই বোনাটা শিখিয়ে দিয়েছে, আর কাজটা তারও খুব ভাল লেগে গেছে। আন্না ফিয়োদরভ্‌নার পালিত কন্যা ছোট্ট পিমচ্‌কা তার পাশে বসে লেখাপড়া করছিল। লিজা তার লেখাপড়ার তদারক করছিল আর মামার জন্য ছাগলের লোমের এক জোড়া মোজা বুনছিল। দিনের এই সময়টা যেমন হয়ে থাকে, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিগুলো লেবুগাছের ফাঁক দিয়ে তির্যকভাবে পড়ে সর্বশেষ জানালাটাকে আলোকিত করে তুলেছে। ঘরের ভিতরটা এবং বাগানটা এতই শান্ত, স্তব্ধ যে জানালার বাইরে চাতক পাখির পাখার ঝাপটানি, ঘরের মধ্যে আন্না ফিয়োদরভ্‌নার শান্ত দীর্ঘশ্বাস আর পা দুটো ভাঙবার সময় বৃদ্ধ লোকটির কাতরোক্তি—সব তারা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।

খেলা থামিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্‌না বলল, "এই তাসটা যে কোথায় গেল লিজা, খুঁজে দে তো ; আমি সব ভুলে যাই।"

বোনা না থামিয়েই লিজা মায়ের কাছে উঠে গিয়ে তাসগুলি দেখতে লাগল।

তাসগুলো ঠিকমত গুছিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি যে সব গুলিয়ে ফেলেছ মাগো। ঠিক এই ভাবে সাজাতে হবে। তবে এই ভাবেই হবে—তুমি ঠিক ধরেছ।" মায়ের চোখ অন্য দিকে থাকায় সেই ফাঁকে সে একখানা তাস সরিয়ে দিল।

"তুই তো সব সময়ই আমাকে বোকা বানাস, বলিস ঠিক হয়ে যাবে।"

"সত্যি যাবে। দেখছ ? হয়ে গেল।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছেরে ঝগড়াটি। আরে, চা খাবার সময় কি হয় নি ?"

"সামোভারটা গরম করতে বলেছি। যাই, দেখে আসি। চা কি এখানেই আনতে বলব ? পিমচ্‌কা, তাড়াতাড়ি পড়া শেষ কর, আমরা যে বেড়াতে যাব।"

লিজা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোনার উপর চোখ রেখেই মামা ডেকে বলল, "লিজা ! লিজচ্‌কা ! আবার একটা ঘর বাদ পড়ে গেছে। সেটা তুলে দে, লক্ষ্মী মেয়ে।"

"এক মিনিট, এক মিনিট ! এই চিনির ডেলাটা দিয়েই আসব।"

ঠিক তাই, তিন মিনিটের মধ্যেই সে দৌড়ে ঢুকে মামার কাছে গিয়ে তার কান পাকড়ে ধরল।

হেসে বলল, "ঘর ফেলে দেবার এই শাস্তি। আজকের জন্য তোমাকে যতটুকু কাজ দেওয়া হয়েছিল তাও তুমি কর নি।"

"আয়, আয় ; ঠিক করে দে—মনে হচ্ছে কোথাও একটা গিঁট পড়েছে।"

লিজা ক্রুচেটের কাঁটাটা হাতে নিয়ে মাথার রুমাল থেকে পিনটা খুলে নিল। ফলে জানালা দিয়ে আসা বাতাসে রুমালটা অল্প অল্প উড়তে লাগল। তারপর পিন দিয়ে ঘরটাকে ধরে দু' তিনটি গিঁট দিয়ে বোনাটা মামাকে ফিরিয়ে দিল।

পিনটাকে রুমালে যথাস্থানে লাগাতে লাগাতে নিজের গোলাপী গালটা এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "মজুরি হিসাবে একটা চুমু দাও। আজ তুমি চায়ের সঙ্গে মদ পাবে। তুমি তো জান আজ শুক্রবার।"

আবার সে চায়ের ঘরে চলে গেল।

"মামা ! শিগগির এস, দেখে যাও, 'হুজার'-রা আসছে !" স্পষ্ট জোরালো গলায় সে চীৎকার করে ডাকতে লাগল।

আন্না ফিয়োদরভ্না ও তার দাদা 'হুজার'দের দেখতে চায়ের ঘরে গেল। ঘরের জানালাগুলো গ্রামের দিকে খোলা। জানালা দিয়ে খুব সামান্যই দেখা গেল ; শুধু বোঝা গেল ধুলোর মেঘের ভিতর দিয়ে একদল লোক ছুটে যাচ্ছে।

লিজার মামা আন্না ফিয়োদরভ্নাকে বলল, "বড়ই দুঃখের কথা বোন, আমাদের বাড়িটা এত ছোট, আর নতুন অংশটাও এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। নইলে কয়েকজন অফিসারকে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতে পারতাম। অশ্বারোহী বাহিনীর যুবক অফিসাররা এত আমুদে যে তাদের দেখতে আমার খুব ইচ্ছা করে।"

"তাদের কাছে পেলে আমিও আনন্দে আটখানা হতাম ; কিন্তু তুমি তো জান দাদা, তাদের রাখবার মত জায়গা আমাদের নেই। আছে শুধু আমার শোবার ঘর, লিজার ছোট ঘর, বসবার ঘর, আর তোমার ঘর। তাদের এনে রাখব কোথায় ? তুমি নিজেই ভেবে দেখ। মিখাইলো মাৎভেয়েভ প্রবীণদের বাড়িটা তাদের জন্য ঠিক করেছে। সে বলেছে, বাড়িটা যথাযোগ্যভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।"

মামা বলল, "লিজচ্কা, ওদের ভিতর থেকে একটি সাহসী অশ্বারোহীকে বেছে তোর বর করে দেব।"

"আমি 'হুজার' চাই না, আমি চাই 'উহ্লান'। আচ্ছা মামা, তুমি

তো বর্শাধারী বাহিনীতে ছিলে ? এই সব অশ্বারোহীদের আমার পছন্দ নয়, শুনেছি তারা খুব উচ্ছৃংখল হয়ে থাকে।"

লিজার গাল দুটিতে ঈষৎ রঙের ছোপ লাগল। আবার সে খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "ঐ যে উস্তয়ুশকা দৌড়ে আসছে ; ও কি দেখে এল শুনতে হবে।"

আন্না ফিয়োদরভ্না উস্তয়ুশকাকে ডেকে আনল ; বলল, "তোমার বুঝি হাতে কোন কাজ নেই ! তাই সৈন্যদের দেখতে ছুটেছ ! আচ্ছা, অফিসারদের কোথায় থাকতে দেওয়া হবে ?"

"এরেম্‌কিনের বাড়িতে মাদাম। অফিসার দুজন, আর কী সুন্দর ! সকলে বলছে, একজন নাকি কাউণ্ট।"

"তার নাম কি ?"

"কাজারভ, কি তুরবিন, কি ঐ রকম একটা কিছু—আমার ঠিক মনে পড়ছে না, সেজন্য ক্ষমা চাইছি।"

"তুমি একটা বোকার ডিম—কিচ্ছু বলতে পার না। অন্তত তার নামটা তো জেনে আসবে।"

"বলেন তো দৌড়ে গিয়ে জেনে আসি।"

"ও ঃ, সে কাজে তুমি খুব পটু, তা কি আর জানি না ! না, বরং দানিলো যাক। দাদা, তাকে যেতে বল ; জেনে আসুক, অফিসারদের কিছু লাগবে কিনা ; তাদের সংগে সব রকম ভদ্রতা করতে হবে ; হ্যাঁ, সে যেন বলে যে তার কর্ত্রী তাকে পাঠিয়েছেন।"

বুড়ো-বুড়ি দুজনে চায়ের ঘরেই বসে রইল। চিনিটা দেবার জন্য লিজা দাসীদের ঘরে গেল। গিয়ে দেখে, উস্তয়ুশকা অশ্বারোহীদের কথা বলছে।

সে বলছে, "কাউণ্টটি যে কী সুন্দর যদি দেখতেন ! ঠিক যেন দেবদূত : কালো ভুরু, কালো চুল ! ও রকম একজন স্বামী যদি আপনার হয়, তাহলে একেবারে রাজ-যোটক হবে !"

অন্য চাকর-বাকররাও হেসে সম্মতি জানাল। বুড়ি নার্সটি জানালায় বসে একটা মোজা রিপু করছিল ; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে কি যেন প্রার্থনা জানাল।

লিজা বলল, "তাহলে অশ্বারোহীদের দেখে এই তোমার মনে হয়েছে ! এই সব কপচানো ছাড়া তোমার বুঝি আর কোন কাজ নেই ! উস্তয়ুশকা, কিছুটা ফলের রস এনে দাও—একটু যেন টক্‌টক্ হয়, অশ্বারোহীদের দিতে হবে।"

হাসতে হাসতে লিজা চিনির পাত্র নিয়ে চলে গেল।

মনে মনে ভাবল, "অশ্বারোহীটিকে একবার দেখতে হচ্ছে। সে কি ফর্সা না কালো? আমাদের সঙ্গে পরিচয় হলে সে যে খুশিই হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হয় তো সে এখান দিয়েই চলে যাবে, অথচ কোন দিন জানতেও পারবে না আমি এখানে বসে তার কথা ভেবেছি। তার মত কত জনই তো চলে গেল। মামা আর উস্তয়ুশকা ছাড়া আর কেউ কোন দিন আমাকে দেখল না। কেমন করে আমি চুল বাঁধলাম, বা কি রকমের জামা পড়লাম, তাতে কি এসে গেল? আমাকে প্রশংসা করবার তো কেউ নেই।" গোলগাল সাদা দুখানি হাতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবতে লাগল, "হয় তো সে বেশ লম্বা, বড় বড় চোখ, হয় তো ছোট কালো গোঁফ আছে। ভাবুন তো, তেইশ বছর বয়স হয়ে গেল, অথচ একমাত্র মুখভর্তি বসন্তের দাগ আইভান ইপাতিচ ছাড়া আর কেউ আজ পর্যন্ত আমার প্রেমে পড়ল না। আর চার বছর আগে তো আমি এখনকার চাইতেও সুন্দরী ছিলাম। আমার বালিকা-বয়স তো প্রায় শেষ হতে চলল, কিন্তু কেউ তো তা ভোগ করল না। হায়, আমি কী হতভাগিনী? একটা বেচারি গাঁয়ের মেয়ে!"

চা ঢালতে মা ডাকল। সেই ডাক শুনে গাঁয়ের মেয়েটির স্মৃতি-রোমন্থনে ছেদ পড়ল। একটুখানি মাথা ঝাঁকিয়ে সে চায়ের ঘরে গেল।

হঠাৎ যা ঘটে যায় তাই ভাল; চেষ্টা করে যা করা হয় সেটা প্রায়ই খারাপই হয়। গ্রামাঞ্চলে শিশুদের শিক্ষার প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় না, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের শিক্ষাটা ভালই হয়ে থাকে। লিজার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আন্না ফিয়োদরভ্‌না্র মনও যেমন সীমিত, তার স্বভাবও তেমনি আলস্য-প্রিয়; কাজেই সে লিজাকে লেখাপড়া কিছুই শেখায় নি: গান-বাজনা শেখায় নি, অপরিহার্য ফরাসীভাষাটুকুও নয়; কিন্তু নেহাৎই ঘটনাচক্রে সে তার স্বর্গত স্বামীকে একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশু উপহার দিয়েছিল—একটি মেয়ে। দাই ও নার্সের কাছেই সে মানুষ হয়েছে। সে তাকে খাইয়েছে, সুতির ফ্রক আর ছাগলের চামড়ার জুতো পরিয়েছে, জাম আর ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে পাঠিয়েছে, একটি তরুণ ছাত্রকে দিয়ে তাকে পড়তে, লিখতে ও অংক কষতে শিখিয়েছে, আর ষোল বছর পরে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে যে লিজা একটি ভাল বন্ধু আর আমুদে, দয়ালু ও পরিশ্রমী গৃহকর্ত্রী হয়ে উঠেছে। আন্না ফিয়োদরভ্‌না নিজে এতই দয়ালু-চিত্ত যে সে মাঝে মাঝেই কোন ভূমিদাসের সন্তান বা বেওয়ারিশ শিশুকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছে। দশ বছর বয়স থেকেই লিজা তার মায়ের এই সব পোষ্যদের ভার নিয়েছে: সে তাদের প্রাথমিক লেখাপড়া শিখিয়েছে, পোষাক পরিয়েছে, গীর্জায় নিয়ে গেছে, আর দুষ্টুমি করলে বকুনিও দিয়েছে। তারপর এল তার দুর্বল, ভাল মানুষ বুড়ো

মামাটি ; ছোট শিশুর মতই তারও দেখাশুনা করতে হত। তার উপরে আছে বাড়ির দাসদাসী ও গ্রামের ভূমিদাসরা : সব জ্বালা-যন্ত্রণার জন্যই তারা এই ছোট্ট কর্ত্রীটির কাছেই ছুটে আসে ; আর সেও এল্ডার-ফুলের রস, পিপারমেণ্ট ও কর্পূরের নির্যাস দিয়ে তাদের চিকিৎসা করে। আর আছে গোটা বাড়িটার ঝক্কি-ঝামেলা, ঘটনা-চক্রে সে সবই তার ঘাড়েই এসে চেপেছে। তার উপর আছে ভালবাসার তৃষ্ণা,—প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ও ধর্মের প্রতি আকর্ষণের ভিতর দিয়েই যার প্রকাশ। কাজেই ঘটনা-চক্রেই লিজা হয়ে উঠেছে একটি সদাব্যস্ত, হাসিখুসি, প্রীতিপূর্ণ, স্বাধীন, পবিত্র ও গভীরভাবে ধর্মভীরু নারী। একথা ঠিক যে, গীর্জায় গিয়ে যখন দেখে যে তার প্রতিবেশিনীরা কে-শহর থেকে আনা আধুনিক সব টুপি পরেছে তখন তার মনে ঈর্ষার জ্বালা ধরে ; তার খুঁতখুঁতে বুড়ি মায়ের খামখেয়ালের জন্য তার চোখ জলে ভরে আসে ; তার ভালবাসার স্বপ্ন বাঁকা-চোরা, এমন কি স্থূল রূপ নিয়ে থাকে—কিন্তু যে অনিবার্য দরকারী কাজ তার উপর চেপেছে তাতেই সে সব কিছু তার মন থেকে দূরে চলে গেছে ; আর বাড়ন্ত মেয়েটির দৈহিক ও নৈতিক সৌন্দর্য এতই বেশী যে তেইশ বছর বয়সেও কোন দাগ, কোন অনুতাপ তার উজ্জ্বল শান্ত আত্মাকে বিদ্ধ করতে পারে নি। লিজার উচ্চতা মাঝারি, দেহ-গঠন অনেকটাই গোলগাল, বাদামী চোখ দুটি খুব বড় নয়, নীচের পাতায় কিছুটা ছায়ার আভাষ ; মাথার চুল দীঘল ও সুন্দর ; চলনে একটা সহজ দোলনের ভঙ্গিমা। যখন কাজে ব্যস্ত থাকে এবং কোন কষ্টের কথা মনে না থাকে তখন তার মুখের ভাব যেন সকলকে ডেকে বলে : যার বিবেক পরিষ্কার, আর যার জীবনে আছে ভালবাসার মানুষ, তার কাছে তো জীবন সুন্দর, জীবন আনন্দময়। এমন কি বিরক্তি, বিক্ষোভ, ত্রাস বা দুঃখের মুহূর্তেও যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দুটি চোখ জলে ভরে আসে, ঠোঁট দুটি দৃঢ়বদ্ধ হয়, বাম ভুরু হয়ে ওঠে ভ্রূকুটি-কুটিল,—তখনও গালের ছোট্ট টোলে, ঠোঁটের কোনায় ও উজ্জ্বল দুটি চোখে ফুটে ওঠে এমন একটি দয়ালু সরল হৃদয়ের ছবি যাকে আধুনিকতার স্পর্শও নষ্ট করতে পারে নি।

॥ ১০ ॥

সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু গরম কমে নি ; এমন সময়ে স্কোয়াড্রনটি মরজভ্‌কায় পৌঁছল। তাদের আগে আগে গায়ে ফুট-ফুট দাগ একটা দলছাড়া গরু গ্রামের ধুলো-ভর্তি রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল ; মাঝে মাঝেই সেটা থেমে গিয়ে ডাকতে লাগল, যেন সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে

ঘোড়াগুলোকে পথ ছেড়ে দেওয়াই তার কর্তব্য। অশ্বারোহী সৈনিকরা ছোট লাগাম-আটা হ্রেষাধ্বনিমুখর কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ধুলোর ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, আর বুড়ো চাষীরা, গাঁয়ের বৌরা, ছেলেমেয়েরা ও বাড়ির চাকররা রাস্তার দুই পাশে ভিড় করে হাঁ করে তাদের দেখছে। স্কোয়াড্রনের ডান পাশে জিনের উপর আরাম করে বসে চলেছে দুজন অফিসার। তাদের মধ্যে একজন কাউণ্ট তুরবিন, সে সেনাপতি ; অপরজন পলোজভ, যুবকটি সবেমাত্র কমিশন পেয়েছে।

গ্রামের সব চাইতে ভাল কুটির থেকে বেরিয়ে এল সাদা ঢিলে জামা পরা একজন অশ্বারোহী সৈনিক ; মাথার টুপি খুলে সে অফিসারদের দিকে এগিয়ে গেল।

কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের থাকবার কি ব্যবস্থা হয়েছে ?"

কোয়ার্টার মাস্টারটি সারা শরীর শক্ত করে জবাব দিল, "ইয়োর এক্সেলেন্সির জন্য ? প্রবীণদের এই কুটিরটি আপনার জন্য পরিষ্কার করে রেখেছি। জমিদার-বাড়িতে একটা ঘর চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা পাওয়া যায় নি। কর্ত্রীটি নীচ প্রকৃতির মানুষ।"

ঘোড়া থেকে নেমে পা দুটি টান করে প্রবীণদের কুটিরের দিকে যেতে যেতে কাউণ্ট বলল, "ঠিক আছে। আমার গাড়িটা পৌঁচেছে কি ?"

"এসেছে ইয়োর ইক্সেলেন্সি," টুপিটাকে ফটকে দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে বাড়িয়ে জবাব দিল কোয়ার্টার মাস্টার, আর তার পরেই ফটকের দিকে ছুটে গেল। অফিসারদের দেখতে একটা চাষী পরিবার সেখানে ভিড় করেছিল। নতুন ঝাড়-পোছ করা কুটিরের দরজাটা হাট করে খুলে দিতে গিয়ে একটি বৃদ্ধাকে সে প্রায় ধাক্কা মেরেই ফেলে দিল। তারপর কাউণ্টকে পথ করে দেবার জন্য এক পাশে সরে দাঁড়াল।

কুটিরটি বেশ বড় ও খোলামেলা, কিন্তু ভাল করে পরিষ্কার করা হয় নি। ভদ্রলোকের মত পোষাক-পরা একটি জার্মান খানসামা একটা লোহার খাট পেতে ব্যাগের ভিতর থেকে বিছানার চাদর বের করছিল।

"উঃ, কী গরু-ছাগলের মত কোয়ার্টার।" বিরক্তকণ্ঠে কাউণ্ট বলে উঠল। "দিয়াদেংকো, জমিদার-বাড়িতে কোথাও আমাদের ঠেলে নিয়ে যাওয়া কি সত্যি অসম্ভব ?"

দিয়াংদেকো জবাব দিল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি হুকুম দিলে এখনই কাউকে সেখানে পাঠাতে পারি। কিন্তু জমিদার-বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ—এই কুটির থেকে খুব ভাল কিছু নয়।"

"দেরীও হয়ে গেছে। এখন যাও।"

মাথার নীচে দুই হাত রেখে কাউণ্ট শুয়ে পড়ল।

খানসামাকে ডেকে বলল, "জোহান! বিছানার মাঝখানে আবার একটা ঢেলা বের করে রেখেছ! ভাল করে বিছানাটাও কি করতে পার না?"

জোহান বিছানাটা ঠিক করতে গেল।

কাউণ্ট বিরক্ত গলায় বলে উঠল, "থাক, অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমার ড্রেসিং-গাউনটা কোথায়?"

খানসামা ড্রেসিং-গাউনটা দিল।

গায়ে চড়াবার আগেই কাউণ্ট তার সেলাইটা পরীক্ষা করতে লাগল।

"ঠিক এইটেই ভেবেছিলাম ; ঐ দাগটা তোল নি। তোমার চাইতে খারাপ কাজ কেউ করতে পারে বলে তো মনে হয় না।" লোকটার হাত থেকে গাউনটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলল, "এটা কি ইচ্ছা করে করেছ, না কি? চা হয়েছে?"

"সময় পাই নি," জোহান বলল।

"হাঁদারাম!"

সংগে আনা একখানি ফরাসী উপন্যাস নিয়ে কাউণ্ট নীরবে কয়েক মিনিট সেটা পড়তে লাগল ; জোহান সামোভারটা গরম করতে চলে গেল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, পথের ক্লান্তি, নোংরা চোখ-মুখ, আঁটো পোষাক আর খালি পেটের জন্যই কাউণ্টের মেজাজ শরিফ নেই।

সে আবার চেঁচিয়ে ডাকল, "জোহান! তোমাকে যে দশ রুবল দিয়েছিলাম তার হিসাব দাও। শহরে কি কি কিনেছ?"

কাউণ্ট হিসাবটার উপর চোখ বুলিয়ে জিনিসগুলি খুব বেশী দামে কেনা হয়েছে বলে কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য করল।

"চায়ের সংগে রাম খাব।"

"রাম তো কিনি নি," জোহান বলল।

"চমৎকার! কতবার তোমাকে বলেছি না হাতের কাছে রাম রাখতে?"

"আমার কাছে যথেষ্ট টাকা ছিল না।"

"পলোজভ কেন কিনল না? তাহলে তো তার লোকের কাছ থেকে নিতে পারতে?"

"কর্ণেট পলোজভ? আমি জানি না। তিনি তো শুধু চা আর চিনি কিনেছেন।"

"হতভাগা! বেরিয়ে যাও! তোমার মত আর কেউ আমাকে ভোগায় না। তুমি ভাল করেই জান যে পথে নামলে চায়ের সংগে রাম আমার চাই।'

খানসামা বলল, 'স্টাফ হেডকোয়ার্টার থেকে আপনার এই চিঠি দুটো এসেছে।"

বিছানায় শুয়েই কাউণ্ট খাম ছিঁড়ে চিঠিগুলি পড়তে লাগল। ঠিক

তখনই হাসি মুখে ঘরে ঢুকল কর্ণেট। এতক্ষণ সে লোকজনদের থাকবার ব্যবস্থা করছিল।

"এই যে তুরবিন? মনে হচ্ছে জায়গাটা খারাপ নয়। কিন্তু আমি ভীষণ ক্লান্ত। সারা দিন যা গরম।"

"খারাপ নয়! এই নোংরা, স্যাঁতসেতে কুঁড়ে, আর চায়ের সঙ্গে রামটুকু পর্যন্ত নেই। তোমাকে বহুৎ ধন্যবাদ। তোমার বোকাটাও রাম কিনতে ভুলে গেছে, আমারটাও তাই। তোমার লোকটাকে তো বলতে পারতে।"

সে আবার চিঠিতে মন দিল। প্রথম চিঠিটা পড়া শেষ করেই সেটাকে দলা পাকিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল।

ওদিকে দরজার বাইরে গিয়ে কর্ণেট তার চাকরকে ফিসফিস করে বলল, "কিছুটা রাম কেন নি কেন? তোমার কাছে তো টাকা ছিল; ছিল না?"

"সব কেনাকাটা আমরাই বা করব কেন? এমনিতেই তো সব খরচ আমি করি; ও'র জার্মান লোকটা তো কেবল পাইপ টানে।"

দ্বিতীয় চিঠিটা বোধ হয় খারাপ নয়. কারণ সেটা পড়তে পড়তে কাউন্ট হাসছিল।

পলোজভ ততক্ষণে ঘরে ফিরে এসেছে। স্টোভের পাশে বোর্ডের উপর নিজের জন্য একটা বিছানা করতে করতে সে বলল, "কার চিঠি?"

চিঠিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে কাউন্ট খুশি মনে জবাব দিল, "মিন্নার। পড়বে নাকি? কী মনোরমা নারী! আমাদের মেয়েদের চাইতে অনেক ভাল। দেখ না, এই চিঠিতেই কত বুদ্ধি আর ভাব ফুটে উঠেছে! শুধু একটা জিনিস খারাপ—সে বড় টাকা চায়।"

"ঠিক, সেটা খারাপ," কর্ণেট মন্তব্য করল।

"সত্যি বলতে কি, তাকে কিছু টাকা দেব কথা দিয়েছিলাম; কিন্তু তারপরই এই অভিযান শুরু হয়ে গেল, আর......মানে......কিন্তু যদি আরও তিন মাস আমি এই স্কোয়াড্রনের নেতৃত্বে থাকি, তাহলে টাকাটা তাকে পাঠাব। টাকা দিতে আমার কোন আপত্তি নেই; সে খুব মনোহরা, নয় কি?" পলোজভের পাঠরত মুখের ভাব লক্ষ্য করে সে হেসে প্রশ্ন করল।

কর্ণেট বলল, "একেবারেই গো-মুখ্খু, তবে বেশ মিষ্টি বটে, আর মনে হয় তোমাকে সত্যি ভালবাসে।"

"সত্যি ভালবাসে! ওর মত মেয়েরা যখন ভালবাসে তখন সত্যি ভালবাসে।'

চিঠি পড়া শেষ করে সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে কর্ণেট প্রশ্ন করল, "অপর চিঠিটা কে লিখেছে?"

"ওটা? ও একটি বাজে লোক; তার কাছে আমি তাস খেলায় অনেক টাকা হেরেছিলাম। এই তৃতীয়বার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এখনই তার

টাকা ফেরৎ দিতে পারছি না। একটা বাজে চিঠি," কথাটা মনে পড়ায় বিব্রত হয়ে কাউণ্ট বলে উঠল।

এর পর অফিসার দুজন কিছুক্ষণ কোন কথাই বলল না। কাউণ্টের মনের অবস্থার প্রভাবে পড়ে কর্ণেট আবার আলাপ শুরু করতে ভয় পেয়ে নিঃশব্দে চা খেতে লাগল, আর মাঝে মাঝেই তুরবিনের সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে লাগল; তুরবিন তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে রইল।

মাথাটা সামান্য ঝাঁকি দিয়ে পলোজভের দিকে ঘুরে কাউন্ট হঠাৎ বলে উঠল, "ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এ বছর যদি রেজিমেণ্টে সকলের পদোন্নতি ঘটে, তাছাড়া যদি যুদ্ধে চলে যাই, তাহলে আমার যে সব বন্ধু এখন রক্ষীবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হয়েছে তাদের সবাইকে আমি ছাড়িয়ে যেতেও পারি।"

দ্বিতীয় গ্লাস চা খেতে খেতে যখন এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল তখন বুড়ো দানিলো আন্না ফিয়োদরভ্নার বার্তা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অফিসারটির নাম শুনে এবং স্বর্গত কাউণ্টের কে-শহরে পরিদর্শনের কথা স্মরণ করে দানিলো নিজের থেকেই বলল, "তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আদেশ দিয়েছেন, আপনি কাউন্ট ফিয়োদর আইভানভিচ তুরবিনের ছেলে কি না। আমাদের কর্ত্রী আন্না ফিয়দরভ্না তাকে খুব ভাল চিনতেন।"

"তিনি আমার বাবা; তোমার কর্ত্রীকে বলো, আমাদের জন্য তিনি এতটা ভেবেছেন বলে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং কোন কিছু আমাদের চাইও না। তবে তাঁকে বলো, জমিদার-বাড়িতে বা অন্য কোথাও যদি আমাদের জন্য এর চাইতে পরিচ্ছন্ন একটা ঘর পাওয়া যায় তাহলে আমরা বাধিত হব।"

দানিলো চলে গেলে পলোজভ বলল, "তুমি ও কথা বললে কেন? তফাৎটা কি হবে? আমরা তো এখানে থাকব মাত্র একটা রাত, তার জন্য তাদের এত সব অসুবিধা ঘটাতে যাব কেন?"

"রেখে দাও তোমার ঐ সব নীতি-কথা! মুরগির ঘরে কি অনেক রাত কাটানো হয় নি? বোঝাই যাচ্ছে তোমার কোন বাস্তব বুদ্ধি নেই। একটা রাতের জন্য হলেও আরামে ঘুম দেবার একটা সুযোগ পেলে ছাড়ব কেন? আর তাতে তারাও কৃতার্থ বোধ করবে। শুধু একটা জিনিস আমার পছন্দ হচ্ছে না: এই যে তিনি আমার বাবাকে চিনতেন," স্মিত হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে কাউন্ট বলতে লাগল। "বাপির কথা মনে হলেই আমার লজ্জা হয়—সর্বত্রই হয় কোন কুৎসা, নয় তো ঋণ। সেই জন্যই তাঁর কোন পরিচিত জনের সান্নিধ্য আমি সইতে পারি না। অবশ্য তখন দিনকালই ঐ রকম ছিল," সে গম্ভীরভাবে বলল।

পলোজভ বলল, "তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, একদা ইল্‌য়িন নামক উহ্‌লান বাহিনীর জনৈক সেনাপতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে খুব উৎসুক, আর তোমার বাবার প্রতি খুব অনুরক্ত।"

"মনে হচ্ছে ঐ ইল্‌য়িন লোকটি খুবই বাজে। আসল কথা হল, যে সব লোক বাবার সঙ্গে পরিচয়ের দাবী নিয়ে আমার কাছে আসে, তারা চমৎকার ঘটনা হিসাবে তার সম্পর্কে যে সব কাহিনী আমাকে বলে সেগুলো শুনতে আমার লজ্জা করে। অস্বীকার করছি না—আমি সব সময় সব কিছুকেই শান্ত বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করি—যে তিনি খুবই বদমেজাজী লোক ছিলেন এবং মাঝে মাঝে এমন কাজ করে বসতেন যেটা তার করা উচিত নয়। কিন্তু সে সবই সময়ের দোষ। আমাদের কালে হয় তো তিনি খুবই সরলতা অর্জন করতে পারতেন, কারণ তাঁর প্রতি ন্যায় বিচার করলে বলতেই হবে যে তিনি প্রতিভাধর ছিলেন।"

পনেরো মিনিট পরে ফিরে এসে দানিলো জানালো, রাতটা তাঁর বাড়িতে কাটাবার জন্য কর্ত্রী তাদের আমন্ত্রণ করেছে।

॥ ১১ ॥

অশ্বারোহী বাহিনীর তরুণ অফিসারটি কাউন্ট ফিয়োদর তুরবিনের ছেলে, একথা জেনে আন্না ফিয়োদরভ্‌না উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল।

"কী ভাগ্যের কথা! বেঁচে থাক দানিলো। শিগগির সেখানে গিয়ে বলো, কর্ত্রী তাদের এখানে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে," এই কথা বলে লাফ দিয়ে উঠে ছুটতে ছুটতে সে দাসীদের ঘরে চলে গেল। 'লিজচকা! উস্তয়ুশ্‌কা! তোমার ঘরটাই ঠিকঠাক করতে হবে লিজা। তুমি তোমার মামার ঘরে যাবে, আর তুমি···দাদা···তুমি···তুমি রাতটা বসবার ঘরেই কাটিয়ে দিও। একটা রাতে তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

"সত্যি কষ্ট হবে না বোন, আমি মেঝেতেই শুতে পারব।"

"বাবার মত যদি দেখতে হয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চয় খুব সুন্দর হয়েছে। আহা বাপু আমার! তাকে দেখতে পাব! চোখ মেলে দেখিস লিজা! ওর বাবা যে দেখতে কী সুন্দর ছিল! ও টেবিলটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ওটাকে এখানেই রাখো," ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে আন্না ফিয়োদরভ্‌না কথাগুলি বলতে লাগল। "দুটো বিছানা নিয়ে এস—একটা আন নায়েব মশায়ের ওখান থেকে—আর জন্ম-দিনে দাদা আমাকে যে কাঁচের মোমবাতি-দানটা উপহার দিয়েছিল সেটা এনে তার মধ্যে একটা চর্বি-বাতি বসিয়ে দাও।"

শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক হল। মা যত যাই বলুক, লিজা তার নিজের পছন্দমতই দুজন অফিসারের জন্য তার ঘরটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিল। গন্ধ-মাখানো ধোয়া বিছানার চাদর এনে নিজের হাতে বিছানা করল; পাশেই টেবিলের উপর রাখল কাঁচের জলপাত্র আর মোমবাতি; দাসীদের ঘরেও কিছু সুগন্ধি কাগজ পোড়াল এবং নিজের বিছানা করল মামার ঘরে। ক্রমে মনটা শান্ত হয়ে এলে আন্না ফিয়োদরভ্না নিজের জায়গাটায় বসে তাস হাতে নিল। কিন্তু তাসগুলো পাতবার আগেই টেবিলের উপর ফুলো-ফুলো কনুইটা রেখে স্বপ্ন দেখতে লাগল। ফিস্ ফিস্ করে নিজেকেই বলতে লাগল, 'সময় কত দ্রুত উড়ে যায়! কত দ্রুত! মনে হয় যেন গতকাল··· তাকে যেন দেখতে পাচ্ছি···আঃ, কী বিবেচনাহীন লোকই সে ছিল!' তার দুটি চোখ জলে ভরে এল। "এবার লিজ্ঙ্কার পালা—কিন্তু তার বয়সে আমি যা ছিলাম সে তো তা নয়—সুন্দরী, কিন্তু···আমি যা ছিলাম তা নয়······"

"লিজচ্কা, আজ সন্ধ্যায় তোমার মসলিনের পোষাকটা পরলে ভাল হত।"

"আচ্ছা মাগো, তুমি কি তাদের খাওয়াতে চাইছ? আমার তো মনে হয় সেটা ঠিক হবে না," অফিসার দুজনের সঙ্গে দেখা হবার উত্তেজনা চাপতে না পেরে লিজা বলল। "সত্যি, আমার মনে হয় সেটা ঠিক হবে না মাগো।"

আসলে ব্যাপার হল, তাদের দেখতে তার ইচ্ছা যতটা, ভয়টা তার চাইতে বেশী, কারণ সে বুঝতে পারছিল, একটা মহৎ অশান্ত আনন্দ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

"হয় তো তারাও আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চায় লিজচ্কা," মেয়ের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আন্না ফিয়োদরভ্না বলল। তারপর আবার নিজের ভাবনায় ডুবে গেল: "এই বয়সে আমার চুল যে রকম ছিল সে রকম নয়।···আহা লিজচ্কা, আমার বড় সাধ তোমার যদি···" মেয়ের জন্য কিছু একটা বাসনা তার মনে জেগেছে, কিন্তু তরুণ কাউন্টের সঙ্গে তার বিয়ে হবে এটা সে আশা করতে পারে না, আবার বড় কাউন্টের সঙ্গে লিজার সেই সম্পর্ক হোক এটাও সে চাইতে পারে না। কিন্তু তার মন একটা কিছু চাইছে, একান্তভাবেই চাইছে। হয় তো স্বর্গত কাউন্টের প্রতি তার যে ভালবাসা ছিল মেয়ের ভিতর দিয়ে সেটাকেই সে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছে।

কাউন্টের আগমনে বুড়ো অফিসারটিও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। নিজের ঘরে ঢুকে সে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। পনেরো মিনিট পরে সামরিক পোষাক ও নীল রঙের রাইডিং-ট্রাউজার পরে সে ঘর থেকে বের হল। নতুন নাচের গাউনটি পরলে একটি তরুণীর মনে যে ভাব ফুটে ওঠে, সেই আত্ম-সচেতন তৃপ্তির আভাষ মুখে নিয়ে সে অতিথিদের ঘরে ঢুকল।

"আমরা দেখতে চাই বোন, নতুন যুগের অশ্বারোহী সৈনিকরা দেখতে কেমন। স্বর্গত কাউণ্টের মত আসল "হুজার" আর হয় না। তবু দেখাই যাক!"

অফিসাররা পিছনের দরজা দিয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকল।

ধুলোমাখা বুটশুদ্ধ নতুন-পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ে কাউণ্ট বলল, "তোমাকে বলি নি? ঝিঁঝিঁ-ডাকা ওই কুড়ে ঘর থেকে এটা কি ভাল নয়?"

"নিশ্চয় ভাল, কিন্তু এদের কাছে অনেক বাধ্যবাধকতায় পড়ে গেলাম যে..."

"ধুৎ-ধুৎ। সব কিছুকেই বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। তারা যে এতে ভয়ংকর খুশি হয়েছে এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হতে পার। বয়!" সে হাঁক দিল। "রাতে যাতে বাতাসের ঝাপ্টা না আসে সে জন্য জানালায় কিছু টাঙিয়ে দিতে বল!"

সেই সময় বৃদ্ধ লোকটি তাদের সংগে পরিচয় করতে এল। লজ্জায় খানিকটা লাল হলেও সে না বলে থাকতে পারল না যে, স্বর্গত কাউণ্টের সে বন্ধু ছিল, কাউণ্ট তাকে শ্রদ্ধা করত, এমন কি তার জন্য কাউণ্ট এমন কিছু করেছিল যার জন্য তার কাছে সে ঋণী হয়ে আছে। 'এমন কিছু' বলতে তার কি মনে পড়েছিল ধার-নেওয়া একশ' রুবল ফেরৎ না দেওয়ার কথা, না কি তাকে বরফের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া, বা তার প্রতি তিরস্কার বর্ষণ করার কথা, সেটা বলা শক্ত—আর বৃদ্ধও তা খুলে বলল না। তরুণ কাউণ্ট বৃদ্ধ অফিসারকে একান্ত বিনীতভাবে অভ্যর্থনা জানাল এবং তাদের আশ্রয় দেবার জন্য ধন্যবাদ দিল।

"ব্যবস্থাটা খুব বিলাসবহুল নয় বলে ক্ষমা করবেন কাউণ্ট (ইদানীং পদস্থ লোককে সম্বোধন করবার অভ্যাস না থাকায় সে প্রায় 'ইয়োর এক্সেলেন্সি' বলে ফেলেছিল), আমার বোনের বাড়িটা খুবই ছোট। তবে জানালায় কিছু একটা ঝুলিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে," এই কথা বলে পর্দা আনবার ছুতো করে, কিন্তু আসলে অফিসারদের বিবরণ শোনবার তাগিদে, সে দ্রুত চলে গেল।

ছোট্ট মিষ্টি উস্তয়ুশা তার কর্ত্রীর শালটা নিয়ে ঘরে ঢুকল জানালায় টাঙিয়ে দেবার জন্য। কর্ত্রী তাকে আরও বলে দিয়েছে, সে যেন জিজ্ঞাসা করে তাদের চা দরকার কি না।

ভাল থাকার ব্যবস্থা পেয়ে কাউণ্টের মেজাজ তখন খুব খুশ: সে হেসে হেসে উস্তয়ুশার সংগে এমন হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দিল যে উস্তয়ুশা তাকে এক ধমক লাগিয়ে দিল। কাউণ্ট জানতে চাইল, তার ছোট কর্ত্রীটি সুন্দরী কি না। তারপর মেয়েটি যখন চা আনবে কি না জানতে চাইল তখন সে বলল যে এতক্ষণ

নিয়ে এলেই তো হত, তবে তার চাকরটা যেহেতু এখনও আহার্য প্রস্তুত করে উঠতে পারে নি, সেজন্য চা অপেক্ষাও বেশী জরুরী বাড়িতে বাড়তি থাকলে কিছু ভদ্‌কা ও কিছু খাবার, আর ঘরে মজুত থাকলে কিছু শেরী।

তরুণ কাউণ্টের আচার-ব্যবহারে লিজার মামা একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল; নতুন যুগের অফিসারদের প্রশংসায় আকাশে তুলে দিয়ে বলল যে তাদের সঙ্গে তাদের বাবাদের তুলনাই হয় না।

আন্না ফিয়োদরভ্‌না সে কথা মানল না—কাউণ্ট ফিয়োদর আইভানভিচের চাইতে বড় কেউ হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে বিরক্ত হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠল, "দেখ দাদা, যে লোক সর্বশেষ তোমার প্রতি সদয় হয় তোমার কাছে তো সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য সকলেই জানে যে আজকালকার মানুষরা অনেক চালাক-চতুর হয়েছে, কিন্তু কাউণ্ট ফিয়োদর আইভানভিচ এত ভদ্র ছিল, আর 'একোশাস'টা এত সুন্দর নাচত যে, বলতে পারো, সকলের মুণ্ডু ঘুরে যেত; অথচ আমি ছাড়া আর কারও প্রতি সে নজর দেয় নি। কাজেই বুঝতেই পারছ যে সেকালেও ভাল লোক ছিল।"

ঠিক সেই সময় ভদ্‌কা, খাবার, আর শেরীর ফরমাস এসে পৌঁছল।

"এবার বোঝ দাদা! তুমি কখনও ঠিক কাজটি কর না! আগেই খাবারের ব্যবস্থা করা তোমার উচিত ছিল," আন্না ফিয়োদরভ্‌না বলল। "লিজা! মামণি! তুমি একটু হাত লাগাও।"

লিজা ব্যাঙের ছাতা ও টাটকা মাখন আনতে ভাঁড়ার ঘরে ছুটল, আর রাঁধুনিকে কিছু মাংসের টুকরো সিদ্ধ করতে হুকুম দিল।

"তোমার কাছে কি শেরী আছে দাদা?"

"না, বোন। আমি তো শেরী রাখি না।"

"সে কি? তুমি তো চায়ের সঙ্গে কি যেন খাও; খাও না?"

"সে তো রাম, আন্না ফিয়োদরভ্‌না।"

"দুটোর তফাৎ আর কি! ওদের ওই···মানে···রামই দাও; তাতে দোষ হবে না। কিন্তু ওদের এখানে ডেকে আনলে হয় না? তুমি তো সব বোঝ। ওরা কি অসন্তুষ্ট হবে?"

বৃদ্ধ অফিসার জানাল, কাউণ্ট এতদূর উদার যে তাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে না; সে এখুনি তাদের নিয়ে আসছে। আন্না ফিয়োদরভ্‌নাও মোটা সিল্কের পোষাক ও নতুন টুপিটা পরতে চলে গেল। কিন্তু লিজা এত ব্যস্ত ছিল যে গায়ের চওড়া-আস্তিন গোলাপি রঙের সুতির জামাটা ছেড়ে ফেলবার সময়টুকুও পায় নি। সে ভিতরে ভিতরে একটা ভয়ংকর অস্থিরতা বোধ করতে লাগল: তার কেবলই মনে হতে লাগল যে একটা প্রচণ্ড কিছু ঘটতে চলেছে। সেই সুদর্শন অশ্বারোহী কাউণ্টটি এক নতুন বোধাতীত আশ্চর্য

জীব। তার চাল-চলন, কথাবার্তা—সব কিছুই এমন যা সে আগে কখনও দেখে নি। তার সব ভাবনা, সব কথাই চাতুর্য ও সত্যে মণ্ডিত; তার সব কাজ ন্যায়নিষ্ঠ; তার প্রতিটি অঙ্গ সুন্দর। সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। খাদ্য ও শেরী ছাড়াও সে যদি একটা সুগন্ধি স্নানের জন্য দাবী জানাত, তাতেও লিজা আশ্চর্য হত না, বরং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে সেটাই সঠিক ও ন্যায্য।

বৃদ্ধ অফিসারের মুখে শোনামাত্রই আন্না ফিয়োদরভ্‌নার আমন্ত্রণ কাউণ্ট গ্রহণ করল। সে চুল আঁচড়াল, কোট পরল, আর সিগার-কেসটা নিল।

কর্ণেট জবাব দিল, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যাওয়াটা ঠিক হবে না। "Ils feront des frais pour nous recevoir."

"বাজে কথা। এতে তারা খুশি হবে। আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি—মনে হচ্ছে মহিলার একটি সুন্দরী কন্যা আছে। চলে এস," কথাগুলি কাউণ্ট ফরাসীতে বলল।

"Je vous en prie, messieurs!" সে যে ফরাসী জানে এবং তাদের বক্তব্য বুঝতে পেরেছে সেটা বোঝাবার জন্যই বৃদ্ধ অফিসার কথাগুলি বলল।

॥ ১২ ॥

মুখ লাল করে চোখ নামিয়ে লিজা এমন ভাব দেখাল যেন সে চা ঢালবার ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত; আসলে অফিসার দুজন ঘরে ঢুকলে তাদের দিকে চাইতেই সে ভয় পাচ্ছিল। অপর দিকে, আন্না ফিয়োদরভ্‌না লাফ দিয়ে উঠে মাথাটা একটু নোয়ালো এবং কাউণ্টের মুখের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই অনর্গল কথা বলতে লাগল: সে দেখতে ঠিক বাবার মত, মেয়েকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, চা, জ্যাম ও দেশী ফলের আচার খেতে দিল। কর্ণেটের চেহারা এতই সাদাসিদে যে কেউ তার দিকে মনোযোগই দিল না। অবশ্য সেজন্য সে কৃতজ্ঞ বোধ করল, কারণ লিজার রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে, আর সকলের মনোযোগ অন্যত্র থাকায় সে ভদ্রতাসম্মতভাবে যতটা সম্ভব লিজাকে ভালভাবে দেখবার সুযোগ পেয়ে গেল। বোনের কথা কতক্ষণে শেষ হবে মামাটি তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কারণ নিজের অশ্বারোহী সৈনিক জীবনের স্মৃতির কথা কাউণ্টকে শোনাবার জন্য সে এতই অধীর হয়ে উঠেছে যে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারছিল না। কাউণ্ট এমন কড়া একটা সিগার ধরাল যে লিজা কাশি চাপতে পারল না। কাউণ্ট যেমন বাকপটু,

তেমনিই ভদ্র। প্রথম দিকে আন্না ফিয়োদরভ্‌নার বাক্য-স্রোতের মধ্যে একটা-দুটো শব্দ জুড়ে দিতে দিতে ক্রমে সব কথাই নিজের মুখে তুলে নিল। একটা জিনিস তার শ্রোতাদের কাছে বরং বিস্ময়কর লাগছিল: যে সব শব্দ সে ব্যবহার করছিল সেগুলো তার অভ্যস্ত সমাজে দূষণীয় না হলেও এখানে খুবই আপত্তিকর। আন্না ফিয়োদরভ্‌না একটু ভয়ই পেল, আর লিজার কান লাল হয়ে উঠল। সেটা কিন্তু কাউণ্টের নজরে পড়ল না, সে গম্ভীর ভদ্রতার সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। লিজা নীরবে গ্লাস ভরে দিয়ে অতিথিদের হাতে না দিয়ে তাদের হাতের কাছে রেখে দিল। তখনও তার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা; কাউণ্টের প্রতিটি কথা সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। কিন্তু কাউণ্টের গল্পগুলি গতানুগতিক, তার বলবার ধরনেও কেমন একটা থতমত ভাব। ফলে লিজা ধীরে ধীরে মনের স্বাভাবিক ভাব যেন ফিরে পেল। যে সব জ্ঞানগর্ভ বাণী তার কাছ থেকে শুনবে বলে আশা করেছিল তা শুনতে পেল না; তার সব কিছুতেই যে সুরুচির প্রকাশ সে আশা করেছিল, তাও দেখতে পেল না। তৃতীয় গ্লাশ চা পরিবেশনের সময় সে যখন সলজ্জ ভঙ্গীতে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল, এবং অবিচলিতভাবে কথা বলতে বলতে ও লিজার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সামান্য একটুখানি হেসে কাউণ্টও তার দিকে তাকাল, তখন লিজার ভিতর থেকে একটা বিরূপ মনোভাব যেন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল; অনতিবিলম্বেই সে বুঝতে পারল যে কাউণ্টের মধ্যে অসাধারণ কিছু তো নেইই, বরং তার পরিচিত লোকদের থেকে তাকে পৃথক করে দেখবারও কিছু নেই; সুতরাং তাকে ভয় পাবারও কোন কারণ নেই; অবশ্য একথা ঠিক যে তার নখগুলো বড় বড় আর সযত্নে রক্ষিত, কিন্তু তাই বলে কোন বিশেষ সৌন্দর্যও তার মধ্যে নেই। এবং একান্ত দুঃখের ভিতর দিয়ে লিজা যখন বুঝতে পারল যে তার স্বপ্ন একেবারেই ভিত্তিহীন, তখন হঠাৎ সে শান্ত হয়ে গেল; তখন যে বস্তুটি তাকে বিচলিত করে তুলল তা হল তার প্রতি নীরব কর্ণেটের স্থির দৃষ্টি। সে ভাবল, "হয় তো সে নয়, এই সেই লোক।"

॥ ১৩ ॥

চা-পানের পরে বৃদ্ধ মহিলা অতিথিদের আমন্ত্রণ করে অপর একটি ঘরে নিয়ে গেল এবং সেখানে তার অভ্যস্ত জায়গায় আসন গ্রহণ করে বলল, "কাউণ্ট, এবার একটু বিশ্রাম করবেন কি?" জবাবে না বলায় সে আবার বলল, "কি ভাবে যে আপনাদের আনন্দ বিধান করব? আচ্ছা কাউণ্ট, তাস খেলেন কি? দাদা,

এ ব্যাপারে তুমি তো একটা ব্যবস্থা করতে পার।"

দাদা বলল, "কিন্তু তুমি নিজেই তো 'প্রেফারেন্স' খেল। তাহলে সেই খেলাই হবে কি? আপনি খেলবেন তো কাউন্ট? আর আপনিও?"

অফিসাররা জানিয়ে দিল, গৃহকর্তারা যা চান তাতেই তারা রাজী।

লিজা এক জোড়া পুরনো তাস নিয়ে এল। সেই তাস দিয়ে সে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে: আন্না ফিয়োদরভ্না দাঁতের ব্যথা শিগগির যাবে কিনা বুঝতে পারে, তার মামা শহর থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরবে কি না, কোন প্রতিবেশী তাদের বাড়ি আসবে কি না, এমনি সব কথা। এই তাসগুলো দু মাস ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে, তবু যে তাস দিয়ে সে আন্না ফিয়োদরভ্নার ভাগ্য গণনা করে থাকে তার থেকে এগুলো অনেক বেশী পরিষ্কার।

মামা প্রশ্ন করল, "কিন্তু অল্প পয়সার বাজি ধরে খেলতে আপনাদের আপত্তি নেই তো? আন্না ফিয়োদরভ্না ও আমি পয়েন্ট প্রতি আধ কোপেক বাজি ধরে খেলি! তাতেই সে আমাদের কাৎ করে দেয়।"

কাউন্ট বলল, "যা আপনাদের খুশি, তাতেই আমিও খুশি।"

তার চেয়ারে আরাম করে বসে লেসের শালখানা নীচে রেখে আন্না ফিয়োদরভ্না বলল, "তাহলে এক কোপেক হোক—নোট। এ রকম বিরল অতিথিদের জন্য আমি সব কিছুতে রাজি—আমার মত একটি বৃদ্ধাকে তারা না হয় দরিদ্রাশ্রমে ঠেলে দিক।" তারপর নিজেকে বলল, "হয়তো ওদের কাছ থেকে একটা রুবলই জিতে নেব।" মনে হয় ইদানিং কালে বৃদ্ধ বয়সে তার মনে কিছুটা জুয়ার নেশা লেগেছে।

কাউন্ট বলল, "আপনি যদি চান আমি আপনাকে "সম্মানের সঙ্গে" ও "দুঃখের সঙ্গে" এই দুরকম খেলা শিখিয়ে দেব। ভারি সুন্দর খেলা।"

নতুন সেন্ট পিতার্সবার্গ ধরনের খেলায় সকলেই খুব আমোদ পেল। মামা বলল, খেলাটা সে আগেই জানত, অনেকটা 'বোস্টন' ধরনের খেলা, তবে এখন প্রায় ভুলে গেছে। আন্না ফিয়োদরভ্না কিছুই বুঝল না, এবং সেই না বোঝাটা এত অধিক সময় চলল যে সে বুঝে নিল, একটু হাসা, একটু মাথা নাড়া, সব কিছু বুঝেছি, সব কিছু জলের মত পরিষ্কার এ কথা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। খেলতে খেলতে হাতে টেক্কা ও সাহেব পেয়ে আন্না ফিয়োদরভ্না যখন 'দুঃখ' ডাকল, আর তার হাতে রইল ছ'করা, তখন হাসির রোল পড়ে গেল। খুবই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে একটুখানি হেসে তাড়াতাড়ি বলে উঠল যে নতুন খেলাটা তার ঠিক ধাতস্থ হয় নি। তথাপি সে পয়েন্ট পেল; তার বিশেষ কারণ হল, বড় বাজি রেখে খেলতে অভ্যস্ত কাউন্ট খুবই সতর্ক এবং সঠিক হিসাবে পটু হলেও টেবিলের তলা দিয়ে কর্ণেটের পায়ের ঠোক্করের অর্থ ঠিকমত ধরতে পারল না, আর কর্ণেটও খেলায় অনেক

মারাত্মক ভুল করতে লাগল।

লিজা আরও ফলের আচার, তিন রকমের জ্যাম ও একটা বিশেষ ধরনের রসে-ডোবানো আপেল নিয়ে এল। মায়ের চেয়ারের পিছনের আসনে বসে সে খেলা দেখছিল আর মাঝে মাঝে অফিসারদের দেখছিল। বিশেষ করে কাউণ্ট যখন তাসগুলো ফেলছিল আর সুকৌশলে সুন্দর ভঙ্গীতে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পিঠগুলো তুলে নিচ্ছিল তখন তার গোলাপি নখ ও সাদা হাতের দিকেই তার দৃষ্টি ছিল।

অন্য সকলকে হারিয়ে দেবার বেপরোয়া প্রচেষ্টায় সাত পর্যন্ত ডেকে মাত্র চারের খেলা করে এবং দাদার ধমকানিতে পয়েণ্টের পাতায় দুর্বোধ্য কতকগুলি হিজিবিজি লিখে আন্না ফিয়োদরভ্‌না আবারও বিচলিত ও বে-হেড্‌ হয়ে উঠল।

এই হাস্যকর অবস্থা থেকে মাকে উদ্ধারের চেষ্টায় লিজা হেসে বলল, "চিয়ার আপ মামণি, আবার তুমি সব জিতে নেবে। তুমি মামার তাসগুলো নিয়ে নাও, তাহলে সে গাড্ডায় পড়ে যাবে।"

মেয়ের দিকে সভয়ে তাকিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্‌না বলল, "তুমি তো আমাকে একটু সাহায্য করতে পার লিজচকা। আমি তো জানি না কেমন করে……"

"এই নিয়মে কেমন করে খেলতে হয় তা তো আমিও জানি না," মনে মনে মায়ের হারের একটা হিসাব কষে লিজা বলল। "কিন্তু মামণি, এ ভাবে চললে তো তুমি সব হেরে যাবে।" তারপর ঠাট্টা করে বলল, "এমন কি পিমচ্‌কার জন্য একটা ফ্রক কেনার টাকাও থাকবে না।"

লিজার সঙ্গে কথা বলবার বাসনায় তার দিকে তাকিয়ে কর্ণেট বলল, "সত্যি, এভাবে খেললে আপনি অনায়াসেই দশটি রৌপ্য রুবল হারতে পারেন।"

খেলুড়েদের দিকে তাকিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্‌না জিজ্ঞাসা করল, "কেন? আমরা কি কাগজের টাকা নিয়ে খেলছি না?"

কাউণ্ট বলল, "হয় তো তাই, কিন্তু আমি তো কাগজের টাকার হিসাব জানিনা। আপনি কি……মানে, এই কাগজের টাকা ব্যাপারটা কি?"

. মামা তখন জিতছিল, সে বলল, "আজকাল কেউ কাগজের টাকা নিয়ে খেলে না।"

বৃদ্ধ মহিলাটি কিছু ফলের রস আনালো। নিজে দুই গ্লাস খেল। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, মনে হল যেন হতাশায় দুটি হাত সে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। এমন কি টুপির নীচ দিয়ে বেরিয়ে আসা পাকা চুলের গুচ্ছটিকে পর্যন্ত ঠিক করে নিতে ভুলে গেল। তার মনে হতে লাগল, সে

দশ লাখ হেরেছে, তার যথাসর্বস্ব খোয়া গেছে। বার বার কর্ণেট টেবিলের তলা দিয়ে কাউণ্টকে পা দিয়ে ঠুকে দিতে লাগল, আর কাউণ্টও নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধ মহিলার হারের হিসাব লিখে গেল।

শেষ পর্যন্ত খেলা সাঙ্গ হল। বিবেক বর্জন করে নিজের হিসাবে কিছু যোগ করতে আন্না ফিয়োদরভ্না অনেক চেষ্টা করল; সে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সে হিসাব ভুল করেছে, কিন্তু আসলে সে হিসাব করতেই জানে না। লোকসানের বহর দেখে সে খুব ঘাবড়েও গেল; তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হিসাব কষে দেখা গেল সে ন' শ' বিশ পয়েণ্ট হেরেছে। সে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কাগজের টাকায় এটা কি ন' রুবল নয়?" আসলে নিজের লোকসানের পুরো চেহারাটাই সে ধরতে পারছিল না। অবশেষে দাদা যখন বুঝিয়ে দিল যে, কাগজের টাকায় সে সাড়ে বত্রিশ রুবল হেরেছে এবং সে টাকাটা অবশ্য দিতে হবে, তখন তার আতংকের আর শেষ রইল না।

খেলা শেষ হলে কতটা জেতা গেল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কাউণ্ট জানালার ধারে চলে গেল। সেখানে লিজা খাবার পরিবেশন করছিল এবং প্লেটে করে ব্যাঙের ছাতা সাজিয়ে রাখছিল। সোজাসুজি এবং অত্যন্ত সহজেই সে সেই কাজটি করে ফেলল সারা সন্ধ্যা কর্ণেট যেটা করতে চাইছিল: সে লিজার সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে আলাপ জুড়ে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণেটের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল। এতক্ষণ লিজাই আন্না ফিয়োদরভ্নার মনোবলকে জীইয়ে রেখেছিল। এবার কাউণ্ট ও লিজা যখন উঠে গেল, বৃদ্ধ মহিলাটি একেবারেই ভেঙে পড়ল।

কিছু একটা বলা দরকার বলেই যেন পলোজভ বলল, "আপনার টাকাটা জিতে নেওয়ায় সত্যি আমি খুব দুঃখিত। আমাদের দিক থেকে কাজটা সঙ্গত হয় নি।"

মহিলাটি বলল, "আপনাদের ঐ সব 'সম্মান' আর 'দুঃখ'-এর কথাগুলিই ধরুন না। ও ধরনের খেলা তো আমি জানিই না। ভাল কথা; কাগজের টাকায় ওটা কত দাঁড়ায় যেন বললেন?"

খেলায় জিতে বৃদ্ধ অফিসারের মেজাজ বেশ খুশ ছিল। সে বলল, "বত্রিশ রুবল; ঠিক ঠিক সাড়ে বত্রিশ রুবল। টাকাটা দিয়ে দাও বোন; আমার হাতেই দেবে চল।"

"এই শেষবারের মত আমার টাকা দেওয়া। দেবার মত আর কিছুই হাতে থাকবে না। এত টাকা যে আর কখনও জিততে পারব সে আশাও নেই।"

আন্না ফিয়োদরভ্না দুলতে দুলতে চলে গেল এবং ন'খানি কাগজের

রুবল নিয়ে ফিরে এল। বৃদ্ধের পীড়াপীড়িতে সে পুরো টাকাটাই মিটিয়ে দিল।

পলোজভের ভয় হল যে কিছু বলতে গেলে আন্না ফিয়োদরভ্না তার উপরেই তেড়ে আসবে। তাই সে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়ল এবং খোলা জানালার ধারে যেখানে কাউণ্ট ও লিজা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেখানে হাজির হল।

খাবারের টেবিলে দুটো মোমবাতি জ্বলছিল। মে মাসের রাত্রি বেলাকার তাজা গরম হাওয়ায় মোমবাতির শিখাগুলো বারে বারেই কাঁপছিল। বাগানের দিকে খোলা জানালাটায় বেশ আলো পড়ছে, কিন্তু সে আলো ঘরের ভিতরকার আলোর চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রায় ভরা চাঁদ লেবুগাছের মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। চাঁদের সোনালি আভাটা চলে গেছে। আকাশের বুকে ভাসমান মেঘের সংগে ভাসতে ভাসতে চাঁদ তার কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই মেঘের উপর। পুকুরে ব্যাঙগুলো এক সুরে ডেকে চলেছে; গাছের ফাঁকে ফাঁকে পুকুরের যেটুকু চোখে পড়ছে তার উপর চাঁদের রুপোলি কিরণ পড়ে ঝিলমিল করছে। জানালার নীচে সুগন্ধি লিলাক ঝোপের ভেজা ফুলের স্তবকগুলি বাতাসে দুলছে; ছোট ছোট কয়েকটি পাখি সেখানে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর পালক ঝাড়ছে।

লিজার কাছে গিয়ে নীচু জানালার তাকে বসে কাউণ্ট বলল, "কী স্বর্গীয় আবহাওয়া! মনে হচ্ছে, আপনি প্রায়ই বেড়াতে যান।"

যে কারণেই হোক এখন আর কাউণ্টের সংগে কথা বলতে লিজার এতটুকু সংকোচ বোধ হচ্ছে না। সে বলল, "হ্যাঁ, গৃহস্থালির কাজকর্মে সকাল সাতটায় একবার বাইরে বেরুতে হয়। তাছাড়া মায়ের পালিতা কন্যা ছোট্ট পিমচুকাকে নিয়েও বেড়াই।"

এক-চোখ চশমাটাকে চোখে লাগিয়ে কখনও বাগানের দিকে, কখনও লিজার দিকে চোখ রেখে কাউণ্ট বলল, "গ্রামে বাস করার কত সুখ! আপনি কি কখনও চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরোন?"

"এখন আর যাই না। তিন বছর আগে মামা ও আমি প্রত্যেকটি জোছনা-রাতে বেড়াতে যেতাম; কিন্তু তারপরেই তার একটা অদ্ভুত অসুখ দেখা দিল—তিনি ঘুমুতে পারতেন না; পূর্ণিমার রাতে তিনি একটুও ঘুমুতে পারেন না। ও পাশের তাঁর ঘরটা একেবারে বাগানের উপরে; আর জানালাটাও নীচু; চাঁদের আলো তার সারা দেহের উপর এসে পড়ে।"

কাউণ্ট মন্তব্য করল, "আশ্চর্য তো! আমি ভেবেছিলাম ঐটেই আপনার ঘর।"

"শুধু আজকের রাতটা আমি ওখানেই ঘুমোব। যেটায় আপনারা ঘুমোবেন সেটাই আমার ঘর।"

"সত্যি! কী আশ্চর্য! আপনার এই অসুবিধা ঘটানোর জন্য আমি কোন দিন নিজেকে ক্ষমা করব না।" বুঝি বা তার কথার আন্তরিকতা প্রমাণের জন্যই কাউণ্ট তার এক-চোখ চশমাটা খুলে ফেলল। "যদি জানতাম আমরা আসায় আপনাদের এতটা অসুবিধা হবে—"

"না, না, কিছু অসুবিধা হয় নি। বরং আমি খুবই খুশি হয়েছি: মামার ঘরটা চমৎকার—খুব আলো-হাওয়া, আর জানালাটাও নীচু। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত আমি সেখানেই বসে থাকব, হয় তো শুতে যাবার আগে বাগানে একটু পায়চারিও করব।"

লিজাকে ভালভাবে দেখবার জন্য কাউণ্ট এক-চোখ চশমাটা আবার চোখে লাগাল এবং জানালার তাকে তার পাশে বসতে গিয়ে তার পায়ে আলতো করে ছোঁয়া লাগাবার চেষ্টা করে ভাবল, "কী মিষ্টি মেয়েটি! আর কেমন কায়দা করে আমাকে জানিয়ে দিল যে ইচ্ছা করলে জানালার কাছে তার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি।" আসলে এত সহজে সে তাকে জয় করে নিল যে তার প্রতি কাউণ্টের আকর্ষণের যেন অনেকখানিই হারিয়ে গেল।

অন্যমনস্কভাবে অন্ধকার রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "একজন মনের মানুষের সঙ্গে আজকের মত একটা রাত বাগানে কাটানো যে কী আনন্দের ব্যাপার!"

এ কথা শুনে এবং হঠাৎ তার পায়ের সঙ্গে কাউণ্টের পা ছুঁয়ে যাওয়ায় লিজা কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করল। সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠবার জন্য কোন কিছু চিন্তা না করেই সে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, "সত্যি, এমন চাঁদের আলোয় বেড়ানো খুবই খুশির ব্যাপার।" অস্বস্তিবোধ করায় লিজা তাড়াতাড়ি ব্যাঙের ছাতার পাত্রটির মুখ এঁটে দিয়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই কর্ণেট সেখানে হাজির হল। আর সেই বা লোকটা কেমন এ কথা জানবার একটা বাসনা হঠাৎই লিজার মনে জেগে উঠল।

সে বলল, "কী সুন্দর রাত।"

"এরা দেখছি আবহাওয়ার কথা ছাড়া কিছুই বলে না," লিজা ভাবল।

কর্ণেট বলতে লাগল, "আর দৃশ্যটাও কী চমৎকার! তবে মনে হচ্ছে এ সব দেখে দেখে আপনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।" যাকে ভাল লাগে তাকে অপ্রিয় কিছু বলার অদ্ভুত প্রবণতা থেকেই কথাগুলি সে যোগ করল।

"ও সব মনে করছেন কেন? রোজ একই জিনিস খেতে, বা একই ফ্রক পরতে মানুষ ক্লান্তি বোধ করে, কিন্তু একটা সুন্দর বাগান দেখে কেউ কখনও ক্লান্ত হয় না, বিশেষ করে আকাশে যখন চাঁদ ওঠে। মামার ঘর থেকে পুকুরের

সবটা চোখে পড়ে। আজ রাতে আমি তাই দেখব।"

ঠিক এই সময়ে পলোজভের আগমনে কাউণ্ট খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে ; কারণ দুজনে আরও কোন স্ফূর্তির ব্যবস্থা যা করতে পারত তাতে বাধা পড়ল। সে বলে উঠল, "মনে হচ্ছে এখানে নাইটিঙেগল পাখি নেই ; আছে কি ?"

"না। আগে থাকত, কিন্তু গত বছর একজন শিকারী একটাকে ধরে, আর এ বছরও—মানে ঠিক গত সপ্তাহেই—একদিন যখন শুনলাম একটা পাখি সুন্দর গান গাইছে, তখন একটি কনস্টেবল গাড়ির ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হাজির হওয়ায় পাখিটা ভয়ে উড়ে গেল। তার আগের বছর মামা আর আমি বাগানের রাস্তায় গাছের নীচে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখিদের গান শুনতাম।"

এমন সময় মামা এসে হাজির। বলল, "এই ছোট্ট বাক্যবাগীশটি আপনাদের কি বলছে এত ? মশাইদের কি কিছু খেতে হবে না ?"

খাবার সময় কাউণ্ট খাবার-দাবারের খুব প্রশংসা করল, আর খেলও প্রচুর। ফলে আন্না ফিয়োদরভ্‌না্র মেজাজ কিছুটা ভাল হল। খাওয়া শেষ করে অফিসার দুজন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের ঘরে চলে গেল। কাউণ্ট মামার সঙ্গে করমর্দন করল, আন্না ফিয়োদরভ্‌না দেখে বিস্মিত হল যে তার হাতে চুম্বন না করে তার সঙ্গেও সে করমর্দন করল এবং লিজার চোখের উপর চোখ রেখে মৃদু অথচ খুশির হাসি হেসে তার সঙ্গেও করমর্দন করল। তার দৃষ্টি আবার লিজাকে বিব্রত করে তুলল।

সে ভাবল, "লোকটি সুদর্শন, তবে নিজের সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন।"

॥ ১৪ ॥

ঘরে ঢোকার পর পলোজভ বলল, "তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত নয় কি ? হেরে যাবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, টেবিলের নীচ দিয়ে তোমার পায়ে কতবার ঠোক্কর দিলাম। তোমার বিবেক বলে কিছু নেই। ভদ্রমহিলা খুবই ব্যথা পেয়েছেন।"

কাউণ্ট হো-হো করে হেসে উঠল।

"তিনি তো খুব মজার মানুষ! এতে তিনি মনে আঘাত পাবেন কেন ?"

আবার সে এমন অট্টহাসি হেসে উঠল যে সামনে দাঁড়ানো যোহান পর্যন্ত চোখ নামিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল।

"পরিবারের পুরনো বন্ধুর ছেলে যে! হা-হা-হা!" কাউণ্ট হাসতে লাগল।

কর্ণেট বলল, "কিন্তু কাজটা ভাল হয় নি, তার জন্য আমি দুঃখিত বোধ করেছি।"

"ঘোড়ার ডিম! তুমি একেবারে খোকা! আমি হেরে যাই তাই কি তুমি আশা কর? কিন্তু হারব কেন? খেলা রপ্ত করার আগে আমিও অনেক হেরেছি। বন্ধু, ওই দশটি রুবল অনেক কাজে লাগবে। যে বোকাদের দলে ভিড়তে না চায় তাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেই জীবনটাকে দেখতে হবে।"

পলোজভ চুপ করে গেল। সে লিজার চিন্তায় ডুবে গেল। লিজাকে তার খুবই পবিত্র ও মনোরমা মনে হয়েছে। পোষাক ছেড়ে সে নতুন করে পাতা নরম পরিষ্কার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

জানালায় একখানা শাল ঝোলানো হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে কর্ণেট ভাবতে লাগল, "একটি শান্ত নীড়ে একটি সরল, নিপুণ, মনোরমা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধা—এই তো সুখ। এই তো প্রকৃত স্থায়ী সুখ।"

যে কারণেই হোক মনের এই গোপন কথা সে বন্ধুকে জানাল না, এমন কি এই পল্লীবালার কথাও তার কাছে উচ্চারণ করল না, যদিও সে জানে যে কাউন্টও তার কথাই ভাবছে।

কাউন্ট মেঝেতে পায়চারি করছিল। কর্ণেট বলল, "তুমি পোষাক ছাড়লে না?"

"কেন জানি না ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা করলে আলোটা নিভিয়ে দিতে পার; আমার কোন দরকার নেই।"

সে আবার পায়চারি শুরু করল।

"ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না," পলোজভ কথাগুলি পুনরায় উচ্চারণ করল। গত সন্ধ্যার ঘটনায় তার উপর কাউন্টের প্রভাবকে সে মেনে নিতে পারে নি; তার মন প্রতিরোধে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। মনে মনে সে তুরবিনকে বলল, "তোমার চতুর মাথার মধ্যে কি চিন্তা যে জমছে সেটা অনুমান করা শক্ত নয়! তার প্রতি তোমার যে কত টান তা তো দেখেছি! কিন্তু তার মত একটি সরল সৎ মানুষকে বোঝা তোমার কর্ম নয়। তুমি তো চাও শুধু মিন্নাদের মত মেয়ে আর কর্ণেলের ইউনিফর্মটি। কিন্তু এখানে, আমি জানতে চাই, তাকে তুমি কতটা পছন্দ কর।"

পাশ ফিরে কাউন্টকে ডাকতে গিয়েও সে মত পরিবর্তন করল। সে বুঝতে পারল, লিজার ব্যাপারে কাউন্টের মনোভাব যদি সে যা অনুমান করছে তাই হয় তাহলে সে তো প্রতিবাদ জানাতে পারবে না, উপরন্তু তার প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে সে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে সে হয়তো কাউন্টকে সমর্থনই করে বসবে, অথচ যতই দিন যাচ্ছে এই অবস্থাটা ততই অসঙ্গত ও

অসহ্য হয়ে উঠছে।

কাউণ্ট টুপিটা মাথায় দিয়ে দরজার দিকে এগোলে সে প্রশ্ন করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"আস্তাবলে। সব ঠিক আছে কিনা দেখতে যাচ্ছি।"

"আশ্চর্য," কর্ণেট ভাবল, তারপর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুল এবং প্রাক্তণ বন্ধুর প্রতি যে অকারণ ঈর্ষা ও বিরূপতা তার মনে বাসা বেঁধেছে সেটাকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

ও দিকে যথারীতি দাদা, মেয়ে ও পালিতাকে সাদরে চুম্বন করে তাদের মাথার উপরে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দিয়ে আন্না ফিয়োদরভ্‌নাও তার ঘরে চলে গেল। মাত্র একটি দিনে এত বিচিত্র রকমের অনুভূতি অনেক কাল তার হয় নি। স্বর্গত কাউণ্ট এবং এই যে তরুণ যুবকটি লজ্জাজনকভাবে তার সব টাকা জিতে নিয়েছে—তাদের বিষণ্ণ ও সুস্পষ্ট স্মৃতি তার মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যে শান্ত হৃদয়ে সে প্রার্থনা পর্যন্ত করতে পারে নি। তথাপি যথারীতি পোষাক ছেড়ে সে বিছানায় উঠল এবং অন্যান্য দিনের মতই পাশের টেবিলে রাখা আধ গ্লাস 'ক্‌ভাস' মদ পান করল। প্রিয় বিড়ালটি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। আন্না ফিয়োদরভ্‌না সেটাকে কাছে ডেকে নিল এবং ঘুম না আসায় ঘরর-ঘরর ডাক শুনতে শুনতে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"বিড়ালটাই আমাকে জাগিয়ে রেখেছে," এই কথা মনে হতেই সে বিড়ালটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বিড়ালটা আস্তে মেঝেতে পড়ে লোমওয়ালা লেজটাকে ফুলিয়ে দিয়ে লাফিয়ে স্টোভ-বাংকের উপর উঠে গেল। এই সময় চাকরাণীটি ঘরে ঢুকল। সে কর্ত্রীর ঘরেই মেঝেতে শোয়। মাদুর বিছিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে সে যীশুর মূর্তির আলোটা জেবলে দিল। একটু পরেই তার নাক ডাকতে শুরু করল, কিন্তু আন্না ফিয়োদরভ্‌নার ক্ষুব্ধ মনে ঘুম তার শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল না। চোখ বুজলেই সামনে ভেসে ওঠে হুজারের মুখ; আর চোখ খুললে ঘরের সব জিনিস—যীশু-মূর্তির আলোয় স্বল্প আলোকিত কমোড, টেবিল, ঝোলানো সাদা ফ্রকটা—সবই যেন বিচিত্র মূর্তিতে তাকেই ফুটিয়ে তুলছে। একবার বিছানার নীচেকার লেপটা যেন তার শ্বাসরোধ করে দিল, পরমুহূর্তেই ঘড়ির শব্দ বা চাকরাণীর নাক ডাকার শব্দ তার বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল। চাকরাণীকে ডেকে তুলে নাক-ডাকা বন্ধ করতে বলল। মেয়ের কথা, বৃদ্ধ কাউণ্ট ও তরুণ কাউণ্টের কথা, "প্রেফারেন্স" খেলার কথা—সব তার মনে তালগোল পাকিয়ে গেল। এই দেখল, স্বর্গত কাউণ্টের সঙ্গে সে ওয়াল্‌জ্‌ নাচছে, দেখল নিজের ফোলা-ফোলা সাদা গলাটা, মনে হল কারও ঠোঁট সেখানে চেপে বসেছে; আবার

দেখল, তার মেয়ে তরুণ কাউণ্টের বাহুলগ্না হয়েছে। উস্তুর্শ্কার নাক আবার ডাকতে শুরু করল……

"না, না; এখনকার মানুষেরা কেউ আগেকার মত নয়। আমার জন্য সে তো অসাধ্য সাধনেও রাজী ছিল। আর রাজী হবার যথেষ্ট কারণও ছিল। আর এটা, ঠিক জানবে, টাকা জেতার আনন্দেই হাঁদারামের মত ঘুমুচ্ছে, প্রেম করার জন্য এতটুকু নড়াচড়ার ইচ্ছাও নেই। কিন্তু তার বাবা নতজানু হয়ে আমার কাছে কী মিনতিই না করেছিল! 'তুমি আমাকে কি করতে বল? নিজেকে শেষ করে দেব? তোমার জন্য সানন্দে তাও করতে পারি।' আর আমি চাইলে তাই সে করত।"

হঠাৎ বাইরের হলে খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল; ড্রেসিং জ্যাকেটের উপর একখানি শাল মাত্র জড়িয়ে ম্লান মুখে কাঁপতে কাঁপতে লিজা দৌড়ে ঘরে ঢুকেই মায়ের বিছানায় প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল…

মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে লিজা একাকি ঘরে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সাদা ড্রেসিং-জ্যাকেটটা পরে, রুমাল দিয়ে দীর্ঘ চুলগুলি বেঁধে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল, জানালাটা খুলে দিল এবং পা গুটিয়ে একখানা চেয়ারে বসল। বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে রইল পুকুরের দিকে; সারা পুকুরটা চাঁদের রুপোলি আলোয় ঝিলমিল করছে।

এতকাল যে সব জিনিস, যে সব কাজকর্ম তার ভাল লাগত সে সব যেন তার কাছে নতুন রূপে ধরা দিল: তার বৃদ্ধ খেয়ালি মা যার প্রতি নিঃসংশয় ভালবাসা যেন তার অস্তিত্বেরই অঙ্গ, তার দয়ালু ও দুর্বল মামা, দাসদাসী যারা তাদের ছোট কর্ত্রীকে পুজো করে, দুধেলা গাই ও বাছুর—তারা সবাই, আর যে প্রাকৃতিক পরিবেশ বহু হেমন্তের অবসান ও বহু বসন্তের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেছে, যে পরিবেশে ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে সে মানুষ হয়েছে—সে সবই আজ তার কাছে মিথ্যা হয়ে দেখা দিল; তার মনে হল, সে সবই ক্লান্তিকর, অবাঞ্ছিত। কেউ যেন তার কানে কানে বলছে: 'তুমি নির্বোধ! তুমি নির্বোধ! বিশ বছর ধরে অন্যের সেবায় তুমি নিজেকে ক্ষয় করেছ, কখনও বোঝ নি প্রকৃত জীবন ও সুখ কি জিনিস!" এখন ঐ উজ্জ্বল স্তব্ধ বাগানের গভীরে চোখ মেলে বসে বসে এই সব চিন্তা সবেগে তার মনে ছড়িয়ে পড়ল; এমনটি ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নি। কেন এমন হল? হয় তো ভাবতে পারেন, কাউণ্টের প্রতি আকস্মিক ভালবাসাই এর কারণ, কিন্তু মোটেই তা নয়। সে কাউণ্টকে পছন্দই করে না। সে বরং আরও সহজেই কর্ণেটের প্রেমে পড়তে পারত, কিন্তু সে খুব সাদাসিদে আর স্বল্পবাক। এর মধ্যেই সে তাকে ভুলে গেছে। কিন্তু মনে রেখেছে কাউণ্টকে—ক্রোধে ও প্রতিবাদে। নিজেই নিজেকে বলেছে, "না, সে নয়।" তার আদর্শ

প্রেমিক হবে সেই যে পরম সুন্দর, যাকে আজকের মত রাতে, এই পরিবেশে, চারিদিকের সৌন্দর্যকে বিঘ্নিত না করেও ভালবাসা যায়—এমন এক আদর্শ যাকে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে কোন দিন মেলানো যায় নি।

প্রথম দিকে তার এই নির্জন জীবন, বাঞ্ছিত কোন মানুষের এই অনুপস্থিতি লিজার অন্তরে ভালবাসার সেই মহাশক্তিকে পরিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন করে রেখেছিল যে মহাশক্তিকে ঈশ্বর আমাদের সকলের অন্তরেই সমভাবে দান করেছেন , কিন্তু এখন সে যেন বুঝতে পেরেছে যে, নিজের মধ্যে একটা কিছুর উপস্থিতিকে উপলব্ধি করবার বিষণ্ন আনন্দকে নিয়ে সে জীবনের অনেকগুলি বছরই কাটিয়ে দিয়েছে (কখনও বা কদাচিৎ দৃষ্টি পড়েছে অন্তরের সেই রহস্যময় মঞ্জুষায় যেখানে রয়েছে এক আনন্দময় রত্নভাণ্ডার)—আরও বুঝতে পেরেছে, যে-কোন হঠাৎ-আসা প্রথম অতিথিকেই সে সম্পদ নির্বিচারে দান করা চলে না। ঈশ্বর করুন, জীবনের এই ছোট সুখকে সে যেন শেষ দিন পর্যন্ত ভোগ করতে পারে ! এটাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম আনন্দ নয় তাই বা কে বলতে পারে? কে বলতে পারে, এইটেই একমাত্র সত্য ও সম্ভাবিত আনন্দ নয় ?

সে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, "হায় পিতা! যৌবন ও সুখ কি আমাকে ফাঁকি দিয়েই চলে যাবে······তাদের আমি কোন দিন জানতেও পারব না? এ কি সত্যি হতে পারে ?" ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাল। ছিন্ন সাদা মেঘের দল চাঁদের দিকে এগিয়ে-আসা তারাগুলিকে মুছে দিচ্ছে। সে নিজেকেই বলল, "ঐ উপরের মেঘটা যদি চাঁদকে ছুঁতে পারে, তাহলে এটাই সত্যি। একটা কুয়াসাচ্ছন্ন ধোঁয়াটে মেঘ-খণ্ড উজ্জ্বল চাঁদটার নীচের অংশটা ঢেকে দিল ; ধীরে ধীরে ঘাসের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখা, লেবুগাছের মাথাগুলি, পুকুরটা—সব কিছু আবছা হয়ে এল ; গাছের কালো ছায়াগুলি পর্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং ঠিক যেন একটা বিষাদের ছায়া প্রকৃতিকে অন্ধকারে ঢেকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা মৃদু হাওয়া গাছের পাতায় পাতায় নাড়া দিল, আর শিশির-ভেজা পাতা, ভিজে মাটি ও লিলাক ফুলের গন্ধ সে বাতাসে ভেসে ভেসে জানালার কাছে এসে হাজির হল।

"না, এটা সত্যি নয়," সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল। "আজ রাতে যদি একটা নাইটিঙ্গেল পাখি গান গায়, তাহলে এই সব বিষণ্ন চিন্তা নিবুদ্ধিতামাত্র ; নিরাশ হবার কোন কারণ নেই," সে ভাবতে লাগল। দীর্ঘ সময় সে চুপচাপ সেখানে বসে রইল, যেন কারও প্রতীক্ষা করছে ; আর চাঁদটা কখনও মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চারিদিক উজ্জ্বল করে তুলছে, আবার কখনও মেঘের আড়ালে গিয়ে পৃথিবীকে ছায়ায় ঢেকে দিচ্ছে। সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়বে এমন

সময় শুনতে পেল পুকুরের ধার থেকে একটা নাইটিঙেল পাখি স্পষ্ট কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল। পল্লীবালা তার চোখ দুটি খুলল। আর একবার তার আত্মা যেন নীরব উল্লাসে জেগে উঠে চারিদিকের উজ্জ্বল প্রশান্ত প্রকৃতির সঙ্গে একটা রহস্যময় ঐক্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। দুটি কনুইতে ভর করে সে ঝুঁকে বসল। একটা সানন্দ দুঃখ তার বুকটাকে চেপে ধরল, আর পূর্ণতার কামনায় উদ্‌গ্রীব এক প্রচণ্ড পবিত্র ভালবাসার অশ্রুধারায়—যে অশ্রু সান্ত্বনার বাণীবহ—তার দুটি চোখ ভরে এল। জানালায় দুটি হাতকে ভাঁজ করে তার উপর সে মাথাটা রাখল। তার প্রিয় প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে স্বতঃই উৎসারিত হয়ে উঠল। সেই অবস্থায়ই সে যেন ঘুমিয়ে পড়ল। দুটি চোখ তখনও জলে ভেজা।

একটা হাতের স্পর্শে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে জেগে উঠল। নরম, প্রীতিপ্রদ একটা স্পর্শ। সে স্পর্শ তার হাতের উপর দৃঢ়ভাবে চেপে বসল। সহসা পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করেই সে অস্পষ্ট আর্তনাদ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, এ তো কাউণ্ট হতে পারে না, কারণ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল কাউণ্ট জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পর মুহূর্তেই সে দৌড়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

॥ ১৫ ॥

কিন্তু লোকটি কাউণ্টই। এক দিকে মেয়েটির চীৎকার, অন্য দিকে তা শুনে বেড়ার ওধার থেকে এগিয়ে-আসা রাতের পাহারাওলার কাশির শব্দ,—এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে কাউণ্ট তৎক্ষণাৎ ধরা-পড়া চোরের মত শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে বাগানের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে মনে বলল, "আমি কী বোকা! ওকে ভয় পাইয়ে দিলাম। আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল ওকে ডেকে ঘুম থেকে তোলা। কী অসভ্য জানোয়ার আমি! খানিকটা দূরে গিয়ে থেমে কান পাতল: পাহারাওলা গেটের ভিতর দিয়ে বাগানে ঢুকে গলির পথ ধরে লাঠি হাতে এগিয়ে আসছে। অতএব লুকিয়ে পড়তে হবে। দৌড়ে পুকুরের কাছে চলে গেল। একেবারে পায়ের নীচ থেকে ব্যাঙগুলো লাফিয়ে জলে পড়তে লাগল। সে চমকে উঠল। ভিজে পা নিয়েই সে বসে পড়ল আর মনে মনে নিজের কথাই ভাবতে লাগল: বেড়া ডিঙিয়ে জানালাটা খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সে তার ছায়াটা দেখতে পায়; বার কয়েক তার কাছে এগিয়ে গিয়েও সামান্যমাত্র খস-খস আওয়াজেই ভয় পেয়ে আবার পিছিয়ে যায়; তারপর এক সময় সে নিশ্চিত হয় যে মেয়েটি

তার জন্যই অপেক্ষা করে আছে; এমন কি এত দীর্ঘ সময় তাকে অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছে বলে সে হয় তো বিরক্তই হয়েছে; আবার পরমুহূর্তেই তার মনে হয় যে এ ধরনের স্ফূর্তির ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দেওয়া তার মত মেয়ের পক্ষে সম্ভবই নয়; শেষ পর্যন্ত একটি গ্রাম্য বালিকার সহজাত লজ্জাবশতঃই সে ঘুমের ভাণ করে আছে এ কথা মনে করে সে মেয়েটির কাছে যায়, এবং স্পষ্টই বুঝতে পারে যে সে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে আছে; যে কারণেই হোক তৎক্ষণাৎ সে দৌড়ে সেখান থেকে চলে যায়, কিন্তু এই কাপুরুষতায় লজ্জা বোধ করে আবার সেখানে ফিরে যায় এবং সাহসের সঙ্গে মেয়েটির হাত চেপে ধরে। রাতের পাহারাওলা আবার কাশল এবং সশব্দে গেটটা বন্ধ করে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটির ঘরের জানালাটাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল এবং ভিতর থেকে খড়খড়িও এঁটে দেওয়া হল। এতে কাউন্ট খুবই বিব্রত বোধ করল। সব কিছু নতুন করে শুরু করবার একটা সুযোগের জন্য সে সব কিছু দিতে প্রস্তুত। হায়, এ রকম বোকামি সে দ্বিতীয় বার কিছুতেই করত না। "কী মিষ্টি মেয়েটি? কী তাজা! ভালবাসার ধনই বটে! আর আমি তাকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিলাম! আমি কী আহাম্মক!" ততক্ষণে ঘুমোবার আশা একেবারেই ত্যাগ করে সে বিরক্ত মনে দৃঢ় পদক্ষেপে লেবু-গাছতলার পথ ধরে এগিয়ে চলল।

তথাপি এই রাতটা তার মনেও জাগিয়ে তুলল একটা প্রশান্ত বিষণ্নতা ও ভালবাসার বাসনা। মাটির পথের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে ঘাস ও শুকনো খড়ের ডাঁটা; লেবুগাছের ঘন পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্না এসে সরাসরি তাদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও বা একটা বাঁকানো ডালের এক পাশে চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছে যেন ডালের উপর সাদা শেওলা জন্মেছে। মাঝে মাঝেই রুপোলি পাতাগুলি যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। বাড়িটায় সব আলো নিভে গেল; সব শব্দ থেমে গেল; এই উজ্জ্বল, স্তব্ধ সীমাহীন দিগন্ত ভরে রইল শুধু মাত্র নাইটিঙ্গেল পাখির গান। "কী রাত! কী উজ্জ্বল রাত!" বাগানের তাজা সুগন্ধি বাতাসে ফুসফুসটা ভরে নিয়ে কাউন্ট ভাবতে লাগল। "কিন্তু কী যেন হারিয়ে গেছে। নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি, এমন কি জীবনের প্রতিও আমি যেন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি। কী মিষ্টি মেয়েটি! হয় তো সে সত্যি অপমান বোধ করেছে…।" এইখানে এসে তার ভাবনার মোড় ঘুরল; সে কল্পনায় দেখতে পেল, বাগানের মধ্যে গ্রাম্য বালিকাটিকে নিয়ে সে নানা বিচিত্র অবস্থায় কাটিয়ে দিচ্ছে; তারপর গ্রাম্য বালিকাটি মিন্নাতে রূপান্তরিত হল। "আমি কী বোকা! আমার উচিত ছিল সোজা কোমর জড়িয়ে ধরে চুম্বন করা।" এই অনুশোচনা মনের মধ্যে নিয়েই কাউন্ট তার ঘরে ফিরে গেল।

কর্ণেট তখনও ঘুমোয় নি। তৎক্ষণাৎ পাশ ফিরে কাউণ্টের দিকে তাকাল।

"এখনও ঘুমোও নি?" কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করল।

"না।"

"কী ঘটেছে বলব কি?"

"মানে?"

"হয় তো বলা উচিত নয়—কিন্তু বলব। এখানে সরে এস।"

হারানো সুযোগের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে মুখে একটা প্রাণবন্ত হাসি ফুটিয়ে সে বন্ধুর বিছানায় বসে পড়ল।

"তুমি কি বিশ্বাস করবে? ঐ তরুণীটি আমার সঙ্গে স্ফূর্তি করতে রাজী হয়েছিল!"

লাফিয়ে উঠে পলোজভ বলল, "কি বলছ তুমি?"

"ঠিক আছে, তা হলে শোন।"

"কেমন করে? কখন? আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না!"

"তোমরা যখন 'প্রেফারেন্স' খেলায় জেতা টাকার হিসাব করছিলে তখন সে আমাকে জানায় যে জানালার কাছে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে আর জানালা বেয়েই আমি তার ঘরে যেতে পারব। এটাই হল বাস্তববুদ্ধি থাকার সুবিধা! তুমি যখন বৃদ্ধার সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করছিলে আমি তখন কাজ গুছোচ্ছিলাম। কেন, তুমি নিজেই তো শুনেছ, সে বলল যে আজ রাতে জানালার ধারে বসে সে পুকুরের দিকে চেয়ে থাকবে।"

"কিন্তু সে কথার তো অন্য কোন মানে হয় না।"

"ঠিক বলেছ; আমিও বুঝতে পারি নি, সে হঠাৎই কথাগুলো বলেছে কি না। হয় তো ও সব ব্যাপার তার মনেও ছিল না, কিন্তু তার মুখের চেহারা বলেছিল অন্য কথা। অবশ্য পরিণতিতে সব কিছুই ভেস্তে গেল। একটা বোকার মত কাজ করে বসলাম আমি," একটা ঘৃণার হাসি হেসে সে কথাগুলো বলল।

"কিন্তু কি ঘটেছে? তুমিই বা গিয়েছিলে কোথায়?"

জানালার কাছে যাবার আগে নিজের অস্থিরচিত্ততার কথাটুকু ছাড়া আর সব কিছুই কাউণ্ট খুলে বলল।

"আমিই সব নষ্ট করেছি। আরও সাহসী হওয়া উচিত ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে গেল।"

"সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে গেল," কর্ণেট কথাগুলো আবার উচ্চারণ করল। এতকাল যে কাউণ্টের প্রভাব তার উপরে ছিল খুবই বেশী ও দীর্ঘস্থায়ী, আজ তার হাসির জবাবে সেও অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগল।

"ঠিক আছে। এখন শোবার সময় হয়ে গেছে।"

কর্ণেট দরজার দিকে পিছন ফিরে মিনিট দশেক চুপচাপ রইল। তার মনের মধ্যে তখন কি যে হচ্ছিল তা বলা শক্ত, কিন্তু আবার যখন সে পাশ ফিরল তখন তার মুখে বেদনা ও দৃঢ় সংকল্পের ছায়া পড়েছে।

"কাউণ্ট তুরবিন," হঠাৎ সে ফেটে পড়ল।

কাউণ্ট গম্ভীরভাবে বলল, "তুমি কি ভুল বকছ? কি হল কর্ণেট পলোজভ?"

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পলোজভ চেঁচিয়ে বলল, "কাউণ্ট তুরবিন, তুমি একটা বাজে লোক!"

॥ ১৬ ॥

সেনাবাহিনী পরদিনই চলে গেল। অফিসার দুজন বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করল না, বিদায় নেবার জন্য তাদের খোঁজও করল না নিজেরাও কোন কথা বলল না। তারা স্থির করেছিল, যেখানে তারা প্রথম যাত্রা-বিরতি করবে সেখানেই দুজনে লড়বে। দলে ছিল ক্যাপ্টেন শুলজ্‌ নামে একজন সৎ সহকর্মী, সে খুব দক্ষ অশ্বারোহী, হুজারদের প্রিয়পাত্রদের অন্যতম, আর কাউণ্ট তাকেই তার পরবর্তী নেতারূপে মনোনীত করে রেখেছিল। কিন্তু সে এমন ভাবে সব ব্যবস্থা করে দিল যে লড়াই তো হলই না, বরং রেজিমেণ্টের একটা লোকও এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারল না। তুরবিন ও পলোজভের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তা কখনও ফিরে এল না বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তার সময় তারা আগের মতই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ডাকাডাকি করত, এমন কি ভোজ-সভায় ও পার্টিতেও কখন কখন তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎও হত।

১৮৫৬

তুষার-ঝঞ্ঝা

The Snow-Storm

॥ ১ ॥

চা খাওয়া শেষ করে সন্ধ্যা ছ'টার পরে আমি গাড়ির আড্ডা থেকে যাত্রা করলাম। জায়গাটার নাম ভুলে গেছি, তবে একটুকু মনে আছে যে সেটা ডন

কসাক জেলার নভৎচের্কাস্ক-এর কাছে। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে ; লোমের জোব্বা ও লোমের কম্বলে মুড়ে-সুরে স্লেজের ভিতরে আলিয়োশ্কার পাশে বেশ আরাম করে বসেছি। আড্ডা-ঘরের ছাউনির তলাটা বেশ গরম ও চুপচাপ মনে হয়েছিল। বাইরে বরফ না পড়লেও মাথার উপরে একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না ; আমাদের সামনে প্রসারিত বরফ-ঢাকা প্রান্তরের তুলনায় আকাশটাকে অস্বাভাবিক রকমের নীচু ও কালো মনে হচ্ছে।

গাড়িটা গ্রাম ছেড়ে গেল ; কালো কালো বায়ু-কলগুলি পিছনে পড়ে রইল, তাদের একটার মাথার উপর একটা বড় পাল বিশ্রীভাবে উড়ছিল। তখন খেয়াল হল, রাস্তাটা ঘন বরফে ঢাকা ; বাঁ দিক থেকে একটা তীব্র বাতাস এসে গায়ে লাগছে, ঘোড়ার লেজ ও ঘাড়ের লোমকে একপাশে দুলিয়ে দিচ্ছে, এবং স্লেজের চাকায় ও ঘোড়ার ক্ষুরে যে বরফ ছিটকে উঠছে তাকে একপাশে উড়িয়ে দিচ্ছে। ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ মিলিয়ে গেল, ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা ঝলক আস্তিনের ফাঁক দিয়ে ঢুকে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। তখনই আড্ডার ওভারসিয়ারের পরামর্শটা মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল, রাত্রে রওনা না হওয়াই ভাল, কারণ হয় তো সারা রাত গাড়িতেই কাটাতে হতে পারে এবং পথের মধ্যেই বরফে জমেও যেতে পারি।

"তোমার কি মনে হয় না যে আমাদের পথ ভুল হতে পারে," কোচয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম। কোন জবাব না পেয়ে আরও স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করলাম, "কি বল, পরবর্তী আড্ডায় পেঁছতে পারব তো ? পথ ভুল হবে না তো ?"

ঘাড় না ফিরিয়েই সে জবাব দিল, "ঈশ্বর জানেন। যে ভাবে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না। এখন প্রভুর দয়া !"

"আরে, পরের আড্ডায় পেঁছবার আশা আছে, না নেই ?" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম। "সেখানে পেঁছতে পারব তো ?"

"পেঁছতে তো হবেই," কোচয়ান বলল ; সে আরও কি যেন বলল, বাতাসের জন্য বুঝতে পারলাম না।

ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই ; কিন্তু এই শীতে বরফ-ঝড়ের মধ্যে ডন কসাক জেলার সেই একান্ত নির্জন তৃণ-প্রান্তরে স্লেজ চালিয়ে রাত কাটানো তো ভয়ংকর কথা। অন্ধকারে কোচয়ানকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তা ছাড়া তার উপর কোন রকম ভরসাও করতে পারছি না। তার আসনের একপাশে না বসে ঠিক মাঝখানটায় সে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার গলার স্বর নির্লিপ্ত ; ঢেউ-তোলা কোণওয়ালা একটা বড় টুপি সে মাথায় পরেছে, ঠিক কোচয়ানদের টুপি নয় ; গাড়িটাও সে ঠিকভাবে চালাচ্ছে না, উপরের বক্সে কোচয়ানের বদলে কোন চাকর বসলে সে যে ভাবে লাগাম ধরে সেই ভাবে দুই হাতে লাগামটা ধরেছে। কিন্তু সে কান দুটো ঢেকে একটা

রুমাল বেশ-শক্ত করে বেঁধেছে বলেই তার প্রতি আমার মন বেশী বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এক কথায়, আমার চোখের সামনে পিঠ বেঁকিয়ে বসা লোকটিকে আমার মোটেই ভাল লাগছে না, তার কাছ থেকে ভাল কিছু আশাও করতে পারছি না।

আলিয়োশ্‌কা বলল, "দেখ, আমার মনে হচ্ছে ফিরে যাওয়াই ভাল; পথ হারানোটা বড়ই বাজে ঠাট্টার ব্যাপার।"

"প্রভু দয়া করুন! কী ভাবে বরফ ছুটছে; রাস্তা চোখেই পড়ছে না; চোখ একেবারে ঢেকে গেছে।……প্রভু দয়া করুন!" কোচয়ান গম গম করে বলল।

আরও সিকি ঘণ্টা যাবার আগেই কোচয়ান ঘোড়া থামিয়ে লাগাম আলিয়োশ্‌কার হাতে দিয়ে বক্সের উপর থেকে পা নামিয়ে রাস্তাটা ভাল করে দেখার জন্য নেমে গেল; বরফে তার মস্ত বড় বুটের খচ্‌-খচ্‌ শব্দ উঠল।

"কোথায় যাচ্ছ? আমরা কি রাস্তা ভুল করেছি, অ্যাঁ?" আমি প্রশ্ন করলাম কিন্তু কোচয়ান জবাব দিল না। বাতাস তার মুখে সোজা এসে লাগছিল, তাই মাথাটা ঘুরিয়ে সে স্লেজের কাছ থেকে এগিয়ে গেল।

ফিরে এলে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে, রাস্তা পেলে?"

"না, কিছু না," হঠাৎ অধৈর্য হয়ে বিরক্তির সঙ্গে সে বলে উঠল, যেন তার রাস্তা হারাবার জন্য আমিই দায়ী। ইচ্ছা করে বক্সের নীচে পা ঠুকে সে বরফ-লাগা দস্তানা-পরা হাতে লাগাম তুলে নিল।

গাড়ি চালাতে শুরু করলে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কি করা হবে?"

"কি করা হবে? ঈশ্বর যে দিকে নিয়ে যাবেন সেই দিকেই যাব।"

সেই একই দুলকি চালে আমরা চলতে লাগলাম। পায়ের নীচে কোন পথ নেই; এক সময়ে নরম ও গভীর বরফ, আবার কখনও বা চাকার নীচে বরফ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

বেশ ঠাণ্ডা হলেও কোটের কলারে বরফ পড়লেই গলে যাচ্ছে; বরফের ঝাপ্টা ক্রমেই ঘণ হয়ে মাটিতে পড়ছে; কিছু জমা বরফের টুকরো মাথার উপরেও পড়ছে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমরা ভুল পথে চলেছি, কারণ আরও সিকি ঘণ্টা গাড়ি চালিয়েও আমরা কোন ভার্স্ট (প্রায় ⅔ মাইল) খুঁটি দেখতে পেলাম না।

আবার কোচয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বল তো, তুমি কি মনে করছ; আড্ডায় পেঁছনো যাবে তো?"

"কোন্ আড্ডায় ?······ফিরে যেতে পারব ঠিকই ; ঘোড়াগুলোকে ইচ্ছামত চলতে দিলেই তারা ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে ; কিন্তু সামনের দিকে কোন আড্ডায় পৌঁছতে পারব কি না আমার সন্দেহ আছে ; হয় তো আমাদের প্রাণটাই যাবে।"

আমি বললাম, "তাহলে ফিরেই যাওয়া যাক ; আর সত্যি সত্যি······"

"তাহলে ফিরে যাব ?" কোচয়ান কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফিরে চল !"

কোচয়ান হাতের লাগাম ছেড়ে দিল। ঘোড়াগুলি আরও জোরে ছুটতে লাগল। কখন যে ঘুরে গেছি খেয়াল করি নি, তবে বাতাসের গতি বদলে গেল এবং শীঘ্রই বরফের ভিতর দিয়ে বায়ু-কলগুলি দেখা গেল। কোচয়ানের মনের বল ফিরে এল, সেও কথাবার্তা বলতে শুরু করল। বলল, "এই তো সেদিন তারাও এই রকম বরফ-ঝড়ে পড়ে পরের আড্ডা থেকেই ফিরে এসেছিল ; রাতটা একটা খড়ের গাদায় কাটিয়ে তারা ফিরেছিল পরদিন সকালে। খড়ের গাদায় ঢুকে খুবই ভাল করেছিল, নইলে যা বরফ পড়ছিল, ঠাণ্ডায় মরে যেত। তাতেই একজনের পায়ে বরফ-ঘা হয়েছিল ; আর তিন সপ্তাহ পরে তাতেই সে মারা গেল।"

আমি বললাম, "কিন্তু এখন তো সে রকম ঠাণ্ডা নয় ; মনে হচ্ছে বাতাসটাও পড়েছে ; চেষ্টা করে দেখবে নাকি ?"

"একটু গরম হতে পারে, কিন্তু বরফ সেই রকমই ছুটছে। হাওয়াটা এখন আমাদের পিছনে, তাই একটু শান্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু বাতাস খুব জোর বইছে। ডাক বা অন্য কিছু থাকলে আমাদের হয় তো যেতেই হত, কিন্তু নিজেদের মত করে যখন যাচ্ছি তখন ব্যাপারটা আলাদা ; যাত্রীদের ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়া তো কোন কাজের কথা নয়। আপনার জন্যই যদি পরে আমাকে জবাবদিহি করতে হয়, তখন কি হবে ?"

॥ ২ ॥

ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা কয়েকটি স্লেজ-এর ঘণ্টা শুনতে পেলাম ; গাড়িগুলি পিছন দিক থেকে জোর ছুটতে ছুটতে আমাদের ধরে ফেলবার চেষ্টা করছে।

আমাদের কোচয়ান বলল, "ওটা মেল এক্সপ্রেস-এর ঘণ্টা ; আড্ডায় এ রকম গাড়ি মাত্র একটাই আছে।"

সত্যি, প্রথম স্লেজটার ঘণ্টার শব্দ বিশেষভাবে শ্রুতিমধুর ; ঘণ্টাগুলির

স্পষ্ট, সুরেলা এবং কিছুটা জোরালো শব্দ বাতাসে ভেসে এসে আমাদের কানে বেশ ভালভাবেই পেঁছিচ্ছিল। পরে জেনেছিলাম, ক্রীড়াবিদদের স্লেজে যে ধরনের তিনটে ঘণ্টা থাকে—মাঝখানে একটা বড় ঘণ্টা, তাতে বাজে যাকে বলে "র‍্যাস্পবেরি" সুর, এবং দুদিকে দুটো তৃতীয় ঘণ্টার মাঝখানে দুটো ছোট ঘণ্টা, এই স্লেজের ঘণ্টাগুলিও সেই রকম। দুটি তৃতীয় ঘণ্টা এবং শেষের কর্কশ ঘণ্টা মিলে এমন একটা স্বর-লহরী সৃষ্টি হয় যা নির্জন, নিঃশব্দ তৃণভূমিতে অত্যন্ত অসাধারণ মনে হয় এবং অদ্ভুত রকমের মিষ্টি শোনায়।

তিনটি স্লেজের প্রথমটা আমাদের সমানে সমানে এসে পেঁছলে আমাদের কোচয়ান বলল, "এটা ডাক-গাড়ি।...রাস্তা কেমন গো? শেষ পর্যন্ত যাওয়া যাবে কি?" সকলের শেষের কোচয়ানকে ডেকে সে শেষের কথাগুলি বলল, কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে সে ঘোড়াগুলিকে লক্ষ্য করে হাঁক ছাড়ল।

ডাক-গাড়িটা আমাদের পার হয়ে যেতেই তার ঘণ্টার ধ্বনিও বাতাসে মিলিয়ে গেল। মনে হল, আমাদের কোচয়ান একটু লজ্জিত হয়েছে।

আমাকে সে বলল, "আমরা এগিয়ে গেলে কেমন হয় স্যার? ওরা তো এই রাস্তায়ই গাড়ি চালিয়ে এসেছে, তাই ওদের চাকার দাগ এখনও স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাবে।"

আমি সম্মতি দিতেই গাড়িটা ঘুরে গেল; আমরা আবার বাতাসের মুখোমুখি হলাম; পুরু বরফের ভিতর দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। যাতে আগেকার স্লেজের চাকার দাগ থেকে আমরা সরে না যাই সেজন্য আমি রাস্তার উপর নজর রেখে চললাম। দুই ভার্স্ট পর্যন্ত তাদের চাকার দাগ বেশ স্পষ্ট দেখা গেল; তারপরই চাকার নীচে শুধু একটু নীচু জায়গা চোখে পড়তে লাগল; সেটা কি পথ, না বাতাসে বরফ উড়ে গিয়ে একটা খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে মাত্র, তা আমি কোন মতেই ঠাহর করতে পারলাম না। আমাদের গাড়ির নীচ থেকে এমন ভাবে অবিশ্রান্ত বরফের টুকরো ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল যে সে দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম হল; তাই আমি সোজা সামনের দিকে তাকাতে লাগলাম। তৃতীয় ভার্স্ট-খুঁটিটাও দেখলাম, কিন্তু চতুর্থটা দেখতে পেলাম না; আগের মতই আমরা কখনও বাতাসের বিপক্ষে কখনও স্বপক্ষে, কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে এগোতে লাগলাম; শেষে এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল যে কোচয়ান বলল আমরা অনেকটা বেশী ডাইনে চলে এসেছি, আর আমি বললাম অনেকটা বেশী বাঁয়ে, আর আলিয়োশ্‌কা বলল যে আমরা সোজা পিছন দিকে চলেছি। আবার বার কয়েক গাড়ি থামানো হল, কোচয়ান তার পা দুটো তুলে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা খুঁজল, কিন্তু সব বৃথা। আমিও একটা কি যেন দেখতে পেয়েছিলাম—সেটা সত্যি রাস্তা কিনা জানবার জন্য আমিও একবার

গাড়ি থেকে নামলাম। কিন্তু বাতাস ঠেলে সবে ছ' পা এগিয়েছি এবং বেশ বুঝতে পেরেছি যে চার দিকে সাদা বরফ ছাড়া আর কিছুই নেই, রাস্তটা আমার কল্পনা মাত্র, এমন সময় স্লেজটাও আর দেখতে পেলাম না। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম "কোচয়ান! আলিয়োশ্‌কা!" কিন্তু আমার মনে হল, বাতাস আমার কণ্ঠস্বরকে আমার ঠোঁট থেকেই ধরে নিয়ে এক সেকেণ্ডের মধ্যে অনেক দূরে ছড়িয়ে দিল। যেখানে স্লেজটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই দিকে ছুটে গেলাম—স্লেজটা সেখানে নেই। ডাইনে গেলাম, সেখানেও নেই। যে রকম উচ্চ, কর্কশ, ও হতাশ কণ্ঠে তখন আমি আর একবার "কোচয়ান!" বলে চীৎকার করেছিলাম সে কথা মনে হলে এখনও আমি লজ্জা বোধ করি, কারণ সে তখন আমার কয়েক পা দূরেই দাঁড়িয়েছিল। তার কালো চেহারা, হাতে চাবুক, মাথায় এক দিকে নীচু করে পরা মস্ত বড় টুপি, সবই হঠাৎ আমার সামনে এসে দেখা দিল। সে আমাকে নিয়ে স্লেজের কাছে এগিয়ে গেল।

সে বলল, "এটা যে অন্তত গরম আছে এ জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; বরফ যদি আরও জোর পড়তে শুরু করে তাহলে অবস্থা কাহিল হবে···ঈশ্বরের দয়া!"

স্লেজে বসে আমি বললাম, "তাহলে ঘোড়া ছেড়ে দাও, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলুক। ওরা আমাদের ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, কি বল?"

"তা পারা উচিত।"

লাগাম রেখে দিয়ে সে চাবুক তুলে প্রথম ঘোড়াটার পিঠে তিন ঠোকর মারল; আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। আরও আধ ঘণ্টা কাটল। হঠাৎ আমাদের সামনেও ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলাম; বুঝতে ভুল হল না যে এও সেই ক্রীড়াবিদ্‌দের গাড়ির মত ঘণ্টা। কিন্তু এবার ঘণ্টাগুলি সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সেই তিনখানি স্লেজই তাদের আড্ডায় ফিরে চলেছে; শুধু ঘোড়াগুলি বদলে নিয়েছে। এক্সপ্রেস গাড়ির তিনটে বড় ঘোড়া জোর কদমে ছুটে বেরিয়ে গেল। গাড়িতে মাত্র একজন কোচয়ান। বক্স-সিটে বসে ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে সে অবিরাম চেঁচাচ্ছে। তার পিছনে খালি স্লেজে এক জোড়া কোচয়ান বসে আছে; তাদের সরল ফুর্তিবাজ কথাবার্তা শুনতে পেলাম। তাদের একজনের মুখে পাইপ; তার আগুনটা বাতাস লেগে জ্বলতে থাকায় তার মুখের খানিক অংশে আলো পড়েছে। তাদের দিকে তাকিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে ভয় পেয়েছিলাম বলে আমাদের লজ্জা করতে লাগল; আমাদের কোচয়ানেরও বোধ হয় লজ্জা করছিল; আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম, "ওদের পিছন পিছনই আমরা যাব।"

॥ ৩ ॥

সকলের পিছনের স্লেজটা আমাদের পাশ কাটিয়ে যাবার আগেই আমাদের কোচয়ান অদ্ভুতভাবে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে তার শকট-দণ্ডটাকে সেই স্লেজটার ঘোড়াগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ফলে তার তিনটে ঘোড়া লাগাম ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

"আঃ, এ রাত-কানাটা কি চোখেও দেখে না; কোথায় ঢুকিয়ে দিল—একেবারে লোকের শরীরের মধ্যে।...ব্যাটা শয়তান!" বেঁটে কোচয়ানটা চেরা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল—তার চেহারা দেখে ও গলা শুনে বুঝতে পারলাম লোকটা বুড়ো। সর্বশেষ স্লেজটা থেকে অনায়াসে লাফিয়ে নেমে আমাদের কোচয়ানের উদ্দেশে কাঁচা খিস্তি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে ঘোড়াগুলোর পিছনে ছুটে গেল।

কিন্তু ঘোড়াগুলো সহজে ধরা দেবার পাত্র নয়। বুড়ো লোকটা তাদের পিছনে ছুটতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই বরফ-ঝড়ের সাদা অন্ধকারে সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

"ভাসিলি—ই। এদিকে পথ আটকে দাঁড়াও, নইলে এ ভাবে ওদের ধরা যাবে না," আবার তার গলা শুনতে পেলাম।

একজন খুব ঢ্যাঙা কোচয়ান স্লেজ থেকে নেমে ঘোড়া তিনটেকে জোয়াল থেকে খুলে তারই একটায় সওয়ার হয়ে বরফের উপর মচ্ মচ্ শব্দ করতে করতে জোর কদমে সেই দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাকি দুটো স্লেজের সঙ্গে ভিড়ে আমরাও পথ ছাড়াই এগিয়ে চললাম। আমাদের সামনে ঠুন-ঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে জোর কদমে পথ দেখিয়ে ছুটে চলল এক্সপ্রেস স্লেজটা।

যে লোকটা ঘোড়া ধরতে গিয়েছে তাকে উদ্দেশ করে আমাদের কোচয়ান বলল, "বটে! ও ধরবে ঘোড়া! নিজের থেকে যদি অন্য ঘোড়ার সঙ্গে এসে না জমে, তাহলে ওটা যা বিচ্ছু জানোয়ার, ওকে তুর্কী নাচন নাচিয়ে ছাড়বে; কিছুতেই ও ধরতে পারবে না।"

এতক্ষণে আমাদের কোচয়ানের মেজাজ ভাল হয়েছে, মুখে কথা ফুটেছে। আমারও ঘুম আসছিল না, তাই সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথা থেকে এসেছে, কেমন করে এসেছে, আর করেই বা কি; আর অচিরেই জানতে পারলাম যে, সে আমার জেলারই মানুষ, 'তুলা''র লোক, "কিরপিচনি" গাঁয়ের একজন ভূমিদাস, যৎসামান্য জমি আছে, তাতেও গত কলেরার বছর থেকে কোন ফসলই হয় নি। বাড়িতে থাকে দুই ভাই, আর এক ভাই গেছে সৈন্য হয়ে; বড়দিন পর্যন্ত চলবার মত খাবারও তাদের ছিল না, তাই সকলে রোজগারের ধান্দায় বেরিয়েছে। সে জানাল, ছোট ভাইই বাড়ির কর্তা,

কারণ সে বিয়ে-থা করেছে, আর সে নিজে মৃতদার। প্রত্যেক বছর তাদের গাঁ থেকে দলে দলে লোক এখানে কোচয়ানি করতে আসে, যদিও সে নিজে এর আগে কখনও আসে নি; কিন্তু এবার সেও এসে নাম লিখিয়েছে যাতে ভাইদের কিছুটা সাহায্য হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখানে সে এক বছরে এক শ' ত্রিশ রুবল আয় করেছে, আর তার থেকে এক শ' রুবল বাড়িতে পাঠিয়েছে; তাছাড়া, এখানে বেশ ভালই কাটত, কিন্তু এই ডাক-গাড়ির লোকগুলো বড়ই নৃশংস, আর এ অঞ্চলের লোকজনরাই বড় চড়া মেজাজের।"

"দেখুন না, ঐ কোচয়ানটা কেন আমাকে গালাগাল দিল? প্রভু, ওদের দয়া কর! আমি কি ইচ্ছা করে ওর ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়েছি? আমি কি অন্যের ক্ষতি করবার মত লোক? আর ওই বা ঘোড়াগুলোর পিছনে ছুটল কেন? ওরা তো নিজের থেকেই বাড়ি চলে যেত। অকারণেই ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে মারছে, আর নিজেও খেটে মরছে," ঈশ্বর-ভীরু লোকটি বলতে লাগল।

আমাদের সামনে কিছু কালো কালো জিনিস দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওই কালো বস্তুটা কি?"

"কেন, এক সার মালগাড়ি। ও ভাবে পথ চলা ভারি মজার!" শনের বস্তা বোঝাই বড় বড় মালগাড়ি একের পর এক চলেছে। আমরা তাদের কাছাকাছি পেঁছিতে সে বলে উঠল, "দেখুন, একটা মানুষও দেখা যাচ্ছে না—সবাই ঘুমিয়ে আছে। চালাক ঘোড়াগুলো ঠিক পথ চিনে চলে যাবে, একটু ভুল করবে না। আমি মালগাড়িও চালিয়েছি কি না, তাই জানি।"

সত্যি বড় বড় গাড়িগুলো বোঝাই বস্তার উপর থেকে একেবারে চাকা পর্যন্ত আগাগোড়া বরফে ঢাকা অবস্থায় কেমন আপনা থেকেই এগিয়ে চলেছে, দেখতে অবাক লাগে। যখন মালগাড়িগুলোর ঠিক পাশাপাশি আমাদের গাড়ির ঘণ্টা বাজতে লাগল তখন একেবারে প্রথম গাড়ির বরফ-ঢাকা বস্তাগুলোর একটা কোণ দুটো আঙুলে একটুখানি তুলে ধরে তার ফাঁকে মুহূর্তের জন্য একটা টুপি দেখা দিল। ফুট্ ফুট্ দাগওয়ালা বড় ঘোড়াটা গলা বাড়িয়ে বরফ-ঢাকা পথ দিয়ে সমান তালে এগিয়ে চলেছে; সাদা জোয়ালের নীচে তার লোমশ মাথাটা তালে তালে দুলছে। আমরা কাছাকাছি পেঁছে গেলে সে তার একটা বরফ-ঢাকা কান খাড়া করল।

আরও আধা ঘণ্টা পথ চলবার পরে আমাদের কোচয়ান আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি মনে করেন স্যার, আমরা ঠিক পথে চলেছি তো?"

"আমি জানি না," জবাব দিলাম।

"বাতাসটা স্যার আগে এই দিকে ছিল, কিন্তু এখন বাতাসটা আমাদের

পিঠে লাগছে। না, আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি না, আবার পথ ভুল হয়েছে,” গম্ভীর মুখে সে বলল।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যদিও সে খুব ভীরু, তবু কথায় বলে সদলে মরেও সুখ, যেহেতু এখন আমরা দলে বেশ ভারী এবং পথ দেখানোর দায়-দায়িত্ব এখন আর তার নেই, তাই এখন সে বেশ শান্ত হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা মাথায় সে প্রথম স্লেজের কোচয়ানের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে মন্তব্য করতে লাগল, যেন এ বিষয়ে তার কোন আগ্রহই নেই। আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে, প্রথম স্লেজটাকে কখনও আমার বাঁয়ে, কখনও বা ডাইনে দেখতে পাচ্ছি; তাতেই বুঝতে পারছি যে একটা খুব ছোট জায়গায় আমরা ঘুরে ঘুরে চলেছি। অবশ্য এটা আমার দৃষ্টি-বিভ্রমও হতে পারে; যেমন তৃণভূমিটা সর্বত্র সমতল হলেও আমার মনে হচ্ছিল যে প্রথম স্লেজটা কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই ধরে চলেছে।

আরও বেশ কিছুটা পথ পার হবার পরে—আমার মনে হল, অনেক দূরে, একেবারে দিগন্ত-রেখার কাছে—একটা দীর্ঘ কালো সচল রেখা দেখতে পেলাম। কিন্তু এক মিনিট পরেই বুঝতে পারলাম, যে মালগাড়িগুলিকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছিলাম ওটা সেই শ্রেণীবদ্ধ মালগাড়ীর দৃশ্য। ঠিক আগের মতই বরফ লেগে চাকাগুলি ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ করছে, কোনটা বা একেবারেই ঘুরছে না। আগের মতই বস্তা চাপা দিয়ে সবাই ঘুমুচ্ছে, এবং আগের মতই সামনের ফুট্ ফুট্ দাগওয়ালা ঘোড়াটা নাক ফুলিয়ে রাস্তাটা শুঁকছে আর কান খাড়া করে রয়েছে।

অসন্তুষ্ট গলায় আমাদের কোচয়ান বলে উঠল, “ঐ যাঃ, আমরা ঘুরছি তো ঘুরছি, আবার সেই মালগাড়িগুলোর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। ডাক-গাড়ির ঘোড়াগুলো ভাল, তাই এমন পাগলাটে পথেও তাদের ভালভাবে চালানো যায়; কিন্তু আমরা যদি সারা রাত এই করতে থাকি তাহলে আমাদের ঘোড়ার দফা রফা হয়ে যাবে।”

সে গলা খাঁকারি দিল।

“আরও বিপদ ঘটবার আগে, চলুন স্যার, আমরা ফিরেই যাই।”

“কেন? কোন না কোন স্থানে তো আমরা পেঁছিবই।”

“কোন স্থানে পেঁছিবই! কে জানে, হয় তো সারাটা রাত আমাদের এই তৃণভূমিতেই কাটাতে হবে। কী প্রচণ্ডভাবে বরফ পড়ছে!......প্রভু ক্ষমা কর!”

সামনের কোচয়ান রাস্তা ও নিশানা হারিয়ে ফেললেও রাস্তার হদিশ করার চেষ্টা না করে ঘোড়াগুলোকে আদর করতে করতে জোর কদমে গাড়ি চালাতে লাগল। এতে বিস্মিত হলেও আমি অন্য স্লেজগুলিকে ছেড়ে দিয়ে এখানে

থেমে যেতে চাইলাম না।

"ওদের পিছনে চল," আমি বললাম।

কোচয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল ; কিন্তু গাড়ি চালাবার সেই আগ্রহ যেন এখন আর তার মধ্যে নেই। আমাকেও সে আর একটি কথাও বলল না।

॥ ৪ ॥

ঝড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। আকাশ থেকে জমাট বরফ পড়ছে। মনে হল, সব বুঝি জমে যাবে ; নাকে ও গালে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে ; মাঝে মাঝেই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা আমার লোমের কোটের মধ্যে ঢুকে পড়ায় আমাকে আরও ভালভাবে মুড়িশুড়ি দিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বরফের চাঁই ভেঙে যাওয়ায় স্লেজটা তার উপর ধাক্কা খাচ্ছে। এ যাত্রা শেষ কি ভাবে হবে সেটা দেখবার যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও যেহেতু একটি রাতও বিশ্রাম না নিয়ে আমি ছ শ' ভার্স্ট পথ পার হয়েছি, তাই আমার চোখ দুটি বুজে এল, আর আমিও তন্দ্রায় ঢলে পড়লাম। একবার চোখ খুলতেই সারাটা সাদা প্রান্তর জুড়ে একটা উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখতে পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দিগন্ত-রেখা স্পষ্টতই অনেকটা দূরে সরে গেছে ; ঝুলে-পড়া কালো আকাশটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে ; চারদিকেই চোখে পড়ছে পড়ন্ত বরফের সাদা, বাঁকা রেখাগুলি ; সামনের স্লেজের ঘোড়াগুলির দেহ-রেখা আরও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ; মাথার উপরে তাকিয়ে এই প্রথম আমার মনে হল যে, ঝড়ো মেঘ কেটে গেছে, আর শুধুমাত্র পড়ন্ত বরফেই আকাশটা ঢাকা পড়েছে। আমি যতক্ষণ বসে বসে ঝিমুচ্ছিলাম ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে ; তার ঠাণ্ডা, উজ্জ্বল আলো হাল্কা মেঘ ও পড়ন্ত বরফের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি শুধু আমাদের স্লেজ, তার ঘোড়া ও কোচয়ানকে, এবং আমাদের সামনেকার তিনটি স্লেজ ও তার ঘোড়াগুলোকে। প্রথম স্লেজটা ডাক-গাড়ি ; কোচয়ানটি তখনও বক্সে বসে দুলকি চালে গাড়ি চালাচ্ছে। দ্বিতীয় স্লেজে দুটো লোক লাগাম রেখে দিয়ে জোব্বার মধ্যে ঢুকে বসে আছে ; তাদের পাইপের আগুনেই দেখতে পাচ্ছি তারা একটানা ধূমপান করে চলেছে। তৃতীয় স্লেজে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না ; কোচয়ান সম্ভবত গাড়ির মাঝখানে ঘুমিয়ে আছে। আমি জেগে উঠে দেখলাম, সামনের কোচয়ান ঘোড়া থামিয়ে রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু যেই আমরা থেমেছি অমনি বাতাসের হাহাকার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আশ্চর্য রকমের বড় বড় চাঁই বাতাসে ছুটে যাচ্ছে। ছুটন্ত বরফে আবৃত চাঁদের আলোয় দেখলাম,

কোচয়ানের ছোট মূর্তিটি হাতের বড় চাবুকটা দিয়ে বরফগুলোকে সরাবার চেষ্টা করছে। সেই সাদা অন্ধকারের মধ্যে কখনও পিছিয়ে, কখনও এগিয়ে স্লেজের কাছে পেঁৗছে পাশ থেকে লাফিয়ে সে সামনের সিটে উঠে বসল। বাতাসের একটানা শোঁ-শোঁ শব্দের ভিতর দিয়ে আবার আমরা শুনতে পেলাম সে সুর করে ঘোড়াগুলোকে ডাকছে; আর ঘণ্টাগুলি ঠুন্ ঠুন্ করে বাজছে। সামনের কোচয়ান যতবার রাস্তার খোঁজে নীচে নামছে ততবারই দ্বিতীয় স্লেজ থেকে একটি আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর হাঁক দিয়ে বলছে—

"আমি বলছি ইগ্নাশ্কা, আমরা অনেকটা বাঁয়ে চলে এসেছি। ঝড়কে বাঁচিয়ে আরও ডাইনে চল"; অথবা "বোকার মত ঘুরে মরছ কেন? বরফ যে দিকে ছুটছে সেই দিকে যাও, তাহলেই ঠিক পেঁৗছে যাবে?" অথবা, "ডাইনে, ডাইনে চল বাপধন। দেখ, ওখানে কালো ওটা কি—হয় তো ভার্স্ট-খুঁটি।" অথবা "এ ভাবে ঘুরে মরছ কেন? ছিট্-ছিট্ ঘোড়াটাকে জোয়াল থেকে খুলে দাও, তাকে আগে যেতে দাও; সেই তোমাকে ঠিক পথে পেঁৗছে দেবে। সেটাই সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা।"

যে লোকটি এই পরামর্শ দিচ্ছিল সে নিজে কিন্তু ঘোড়াকেও ছেড়ে দেয় নি, বা রাস্তা খুঁজতে গাড়ি থেকে নামেও নি; এমন কি জোব্বার নিরাপদ আশ্রয়ের বাইরে সে একবারও নাকটিও বের করে নি। একবার তার এই সব পরামর্শের জবাবে ইগ্নাশ্কা যখন চেঁচিয়ে বলল যে বাজে পরামর্শ না দিয়ে সে বরং নিজেই সামনে এসে গাড়িটা চালিয়ে পথ দেখিয়ে দিক, তখন এই সৎ পরামর্শদাতা জবাবে জানাল, সে যদি ডাক-গাড়ি চালাত তাহলে সে নিশ্চয় সামনে গিয়ে তাদের সঠিক রাস্তায় তুলে দিত। চেঁচিয়ে বলল, "আমাদের ঘোড়া ঝড়ের মধ্যে ঠিক চলতে পারে না! এগুলো তেমন জাতের নয়!"

নিজের ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে শিস দিতে দিতে ইগ্নাশ্কা বলল, "তাহলে আর কথা বলতে এস না।"

পরামর্শদাতার স্লেজের অপর কোচয়ান ইগ্নাশ্কাকে কিছুই বলে নি; আলোচনায় যোগই দেয় নি; তাই বলে সে যে ঘুমিয়ে ছিল তাও নয়; তার পাইপের আগুন তখনও জ্বলছে; তাছাড়া, আমরা যখন থেমেছিলাম তখন তার কথা আমার কানে এসেছে। সে একটা গল্প বলছিল। শুধু একবার, যখন ইগ্নাশ্কা ষষ্ঠ বা সপ্তম বার গাড়ি থামিয়েছিল, তখন পথ চলার আনন্দে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়ে সে চেঁচিয়ে বলেছিল—

"আরে, আবারও থামলে কেন?...রাস্তা খুঁজতে বুঝি! দেখতে পাচ্ছ না, বরফ-ঝড় বইছে! স্বয়ং কানুনগোও এখন পথ চিনতে পারবে না; যতক্ষণ ঘোড়া ছুটবে ততক্ষণ গাড়ি চালিয়ে যাও। আমরা ঠাণ্ডায় জমে মরে যাব

না।...এগিয়ে চল!"

"বটে! কিন্তু এটা তো ঠিক যে গেল সন ডাক-গাড়ির এক কোচয়ান ঠাণ্ডায় মারা গিয়েছিল!" আমার কোচয়ান পাল্টা জবাব দিল।

তৃতীয় স্লেজের লোকটির ঘুমই ভাঙল না। শুধু একবার আমরা থামলে পরামর্শদাতা হাঁক দিল—

"ফিলিপ, হেই...ফিলিপ!" কোন জবাব না পেয়ে বলল, "ও কি জমে গেল নাকি?...ইগ্‌নাশ্‌কা, একবার দেখ তো।"

ইগ্‌নাশ্‌কা সব কাজেই রাজী। স্লেজের কাছে গিয়ে সে ঘুমন্ত লোকটিকে খোঁচা দিল।

"মনে হচ্ছে, এক পাত্রেই ওর হয়ে গেছে।" তাকে নাড়া দিয়ে বলল, "যদি জমে গিয়ে থাক তো সে কথা বল!"

ঘুমন্ত লোকটি গালাগালি দিয়ে উঠল।

"বেঁচে আছে হে!" বলে ইগ্‌নাশ্‌কা ছুট দিল। আমরা আবার ছুটে চললাম; এত জোরে ছুটতে লাগলাম যে আমাদের স্লেজের যে ছোট ঘোড়াটাকে অনবরত চাবুক কসতে হচ্ছিল সেটাও এবার বেখাপ্পা কদমে ছুটতে লাগল।

॥ ৫ ॥

যে বুড়ো লোকটি ও ভাসিলি পালিয়ে-যাওয়া ঘোড়ার খোঁজে গিয়েছিল তারা যখন ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল তখন প্রায় মাঝরাত। ঘোড়া দুটোকে ধরে তাতে সওয়ার হয়ে তারা আমাদের ধরে ফেলল। নির্জন তৃণভূমিতে এই অন্ধকার, এই চোখ-ধাঁধানো বরফ-ঝড়ের মধ্যে এটা কি করে তারা সম্ভব করল আজও সেটা আমার কাছে রহস্যময় হয়ে রয়েছে। আমাদের কাছে পেঁছেই সে আবার আমার কোচয়ানকে চেপে ধরল।

"চেয়ে দেখ, রাত-কানা শয়তান, তুমি কি..."

"হেই মিত্রিচ খুড়ো," দ্বিতীয় স্লেজের গল্প-কথক বলে উঠল, "তুমি এখনও বেঁচে আছ?...এস, আমাদের কাছে উঠে এস।"

বুড়ো কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে গালাগালি করেই চলল। তারপর যখন তার মনে হল যে যথেষ্ট হয়েছে, তখন সে দ্বিতীয় স্লেজের কাছে গেল।

"সব ক'টাকে ধরেছ?" স্লেজের ভিতর থেকে প্রশ্ন হল।

"তাই তো মনে হচ্ছে!"

ছোট মানুষটি সামনে ঝুঁকে ঘোড়ার পিঠের উপর বুকটা রেখে বরফের

মধ্যে নেমে পড়ল। তারপর এক দৌড়ে স্লেজের কাছে গিয়ে এক লাফে ভিতরে ঢুকে গেল। ঢ্যাঙা ভ্যাসিলি আগের মতই নিঃশব্দে প্রথম স্লেজে ইগ্‌নাশ্‌কার পাশে বসে রাস্তার খোঁজে বাইরে তাকাল।

আমার কোচয়ান বলল, "দেখলে তো, কি রকম খিস্তি করা স্বভাব লোকটার…প্রভু আমাদের দয়া করুন!"

তারপর বেশ কিছু সময় কোথাও না থেমে সেই সাদা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে বরফ-ঝড়ের ঠাণ্ডা, মিটমিটে আলোয় আমরা এগিয়ে চললাম।

আমার চোখ দুটি খোলা। বরফে ঢাকা সেই একই বেখাপ্পা টুপি ও পিঠ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে; সেই একই বাঁকানো জোয়ালের নীচে একই দূরত্বে ঘোড়ার মাথাটা উঠছে আর নামছে, আর তার ঘাড়ের কালো লোমগুলি বাতাসের তালে তালে এক পাশে দুলছে। যদি নীচে তাকাই—সেই একইভাবে স্লেজের চাকার নীচে বরফ গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে এবং বাতাসে সেগুলি একই দিকে ছিটকে পড়ছে। সামনের প্রথম স্লেজটা একই দূরত্বে ছুটে চলেছে; ডাইনে, বাঁয়ে, সব কিছু সাদা ও চঞ্চল। বৃথাই নতুন কিছুর খোঁজ করা; খুঁটি নেই, খড়ের গাদা নেই, বেড়া নেই—কিছুই চোখে পড়ে না। সর্বত্র সব কিছুই সাদা, আর চলমান। এক সময় মনে হয় দিকচক্র-রেখা অনেক—অনেক দূরে; পর মুহূর্তেই সে রেখাটি ঘিরে এসে সব দিকেই মাত্র দু পা দূরে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটা উঁচু, সাদা দেয়াল যেন ডান দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে স্লেজের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকে, আর হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যায়—লাফ দিয়ে উঠে দূরে সরতে সরতে আবারও অদৃশ্য হয়। উপরের দিকে তাকাও; প্রথমে মনে হয় যেন আলো—মনে হয় কুয়াসার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে তারারা ঝিকমিক করছে; কিন্তু সেই তারারা চোখের সামনে থেকে দূরে, আরও দূরে পালিয়ে যায়; তারপর শুধু বরফ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। আকাশটা সর্বত্রই সমান আলোকিত, সমান সাদা, বর্ণহীন, চিরচঞ্চল। বাতাসও দিক পাল্টায়; এক সময় মুখের উপরে পড়ে বরফে চোখ দুটো ঢেকে দেয়, তারপরই লোমের কলারটাকে উড়িয়ে নিয়ে বিরক্তিকরভাবে মাথার উপর ঠেলে দেয়, মুখের উপর আছড়ে ফেলে যেন তামাসা করে, তারপর আবার পিছন থেকে গুন গুন করতে থাকে।

আমার একটা পা ঠাণ্ডায় জমে যেতে শুরু করল। উপুড় হয়ে যেই পাটাকে আরও ভালভাবে মুড়ি দিতে চেষ্টা করলাম অমনি আমার কলার ও টুপির বরফ গলা বেয়ে নীচে নামতেই শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল; কিন্তু লোমের জোব্বাটা শরীরের উত্তাপে মোটামুটি গরম থাকায় তখনও বেশ আরামই লাগছিল, আর তাই ধীরে ধীরে চোখে তন্দ্রা নেমে এল।

॥ ৬ ॥

নানা স্মৃতি ও ধারণা দ্রুত গতিতে আমার কল্পনায় ভেসে যেতে লাগল।

দ্বিতীয় স্লেজ থেকে যে পরামর্শদাতাটি অনবরত উপদেশ বর্ষণ করে চলেছে সে কি রকম চাষী হতে পারে? নিশ্চয় লাল চুল, শক্ত দেহ ও খাটো পা আছে, অনেকটা আমাদের খানসামা ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্-এর মত। তারপরই দেখতে পেলাম, আমাদের মস্ত বড় বাড়ির সিঁড়িটাকে আর পাঁচটি ভূমিদাসকে; ভারী পা ফেলে তারা বাড়ি থেকে একটা পিয়ানোকে টেনে বের করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, কোটের আস্তিনটা গুটিয়ে হাতে একটি মাত্র পা-দান নিয়ে সে দৌড়ে চলেছে,—মানুষের পায়ের ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে, সকলকে চলতে বাধা দিয়ে এবং উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে।

"এই, সামনে কে আছ! ঠিক আছে, লেজের দিকটা তোল, তোল, তোল; দরজা দিয়ে ঢোক! ঠিক আছে।"

যথাশক্তিতে পিয়ানোর একটা কোণ ধরে পরিশ্রমে লাল হয়ে বাগানের মালীটা বলে উঠল, "আমাদের উপর ছেড়ে দাও ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্, আমরা নিজেরাই সব ঠিক করে নেব।"

কিন্তু ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ কিছুতেই ছাড়বে না।

আমি ভাবতে লাগলাম, "এটা কি? সে কি সত্যি মনে করে যে এ কাজে তাকে দরকার আছে, নাকি ঈশ্বর তাকে বক্‌বক্ করবার শক্তি দিয়েছে বলেই সেটাকে সে কাজে লাগাচ্ছে? আসলে তাই হবে।"

কেন জানি না আমার মনে পড়ছে কুকুরটাকে, পরিশ্রান্ত চাকরগুলোকে, হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে তারা জাল টানছে, আর ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ্ একটা জলের পাত্র নিয়ে তীর বরাবর ছুটে চলেছে; সকলকে হাঁক-ডাক করছে, মাঝে মাঝে সোনালী মাছ ধরতে জলের কাছে যাচ্ছে, কাদাগোলা জল ফেলে নতুন জল ভরে নিচ্ছে।

আবার দেখছি, জুলাই মাসের দুপুর। বাগানের সদ্য-কাটা ঘাসের উপর দিয়ে আমি বেড়াচ্ছি; মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্য। আমি তখন যুবক; মনের মধ্যে একটা শূন্যতা, কিসের জন্য একটা ব্যাকুলতা। পুকুরের কাছে বুনো গোলাপের ঝোপ ও বার্চ-বীথির মাঝখানে একটা মনের মত জায়গায় চলে যাই; ঘুমোবার জন্য সেখানে শুয়ে পড়ি। আমার চারদিকে সব কিছু সুন্দর; সে সৌন্দর্য আমাকে এতদূর অভিভূত করে যে মনে হয় আমি নিজেও সুন্দর; আমার একমাত্র দুঃখ যে আমাকে প্রশংসা করবার কেউ নেই।

বেশ গরম। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ঘুমোতে চাই। কিন্তু মাছিরা, অসহ্য মাছিরা এখানে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না; আমার চারদিকে জড় হয়ে কপাল থেকে হাত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়ায়। বেশ কাছেই সব চাইতে গরম জায়গাটায় একটা মৌমাছি গুনগুন করে; হলুদে প্রজাপতিরা ডালে ডালে উড়ে বেড়ায়। উপরে তাকালে চোখ ব্যথা করে; বার্চ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে; আমার ভীষণ গরম বোধ হয়। রুমালে মুখটা ঢাকি; দম বন্ধ হয়ে আসে; মাছিগুলো ভেজা হাতের সঙ্গে লেপ্টে যায়। গোলাপ বাগানে চটক পাখিরা কিচির-মিচির করে। পুকুর থেকে পাটার উপর ভিজে কাপড় আছড়ে ধোয়ার শব্দ আসে; সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে পুকুরের বুকে ভেসে বেড়ায়। স্নানার্থীদের হাসি, গল্প ও জল ছিটানোর শব্দ আসে। দূরে গাছের মাথায় বাতাসের শন্-শন্ শব্দ ওঠে; সে বাতাস আরও কাছে আসে, ঘাসের উপর দিয়ে সর্-সর্ করে বয়ে যায়; বুনো গোলাপের পাতাগুলো কাঁপতে কাঁপতে বৃন্তের উপর আছড়ে পড়ে; বাতাসে আমার রুমালের একটা কোণ উড়ে যায় আর এক ঝলক তাজা বাতাস আমার ভেজা মুখে সুড়সুড়ি দেয়। রুমালের ফাঁক দিয়ে একটা মাছি ঢুকে পড়ে আমার ভেজা মুখের চারদিকে গুনগুন করতে থাকে। শিরদাঁড়ার নীচে একটা শুকনো ডাল ফোটে। না, শুয়ে থেকে লাভ নেই; উঠে গিয়ে স্নান করতে হবে। সহসা দ্রুত পায়ের শব্দ কানে এল; ভয়ার্ত নারী-কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

"দয়া কর! আমরা কি করব! এখানে কি কেউ নেই!"

"ওটা কি, ওটা কি?" ছুটে রোদ্দুরে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি দাসীকে আর্তনাদ করে ছুটে যেতে দেখে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম। সে ফিরে তাকিয়ে হাত দুটি মোচড়াল, তারপর দৌড়ে চলে গেল। তারপরেই এল সত্তর বছরের মাত্রোনা, মাথার উপর থেকে খসেপড়া রুমালটা চেপে ধরে পশমের মোজা পরা একটা পা টানতে টানতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে পুকুরের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। হাত-ধরাধরি করে দুটো ছোট মেয়েও দৌড়চ্ছে; আর তাদের এক জনের শনের ঘাঘরার কোণ চেপে ধরে একটি দশ বছরের বালক তার বাবার কোট গায়ে চড়িয়ে তাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

"কি হয়েছে?" তাদের জিজ্ঞাসা করলাম।

"একটা চাষী ডুবে যাচ্ছে।"

"কোথায়?"

"আমাদের পুকুরে।"

"কে? আমাদের কেউ?"

"না; অপরিচিত লোক!"

কোচয়ান আইভান মস্ত বড় বুট পায়ে সদ্য-কাটা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে গেল ; নায়েব ইয়াকভ হাঁপাতে হাঁপাতে পুকুরের দিকে দৌড়ে গেল ; আমিও তাদের সঙ্গে দৌড়ে গেলাম।

মনে পড়ে, আমার ভিতর থেকে কে যেন বলল, "এস, ঝাঁপ দাও, লোকটাকে টেনে তোল, তাকে বাঁচাও, সকলে তোমার প্রশংসা করবে।" আমারও ঠিক সেই ইচ্ছাই হয়েছিল।

পুকুর-পারে যে সব চাকর-বাকর জমা হয়েছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় ? সে কোথায় ?"

ভেজা কাপড়ের বাঁক কাঁধে একটি ধোবানি বলল, "ওই তো ও পারে; যেখানে সব চাইতে বেশী জল, স্নান-ঘরের একেবারে কাছে। আমি দেখলাম সে ডুব দিল, আবার উঠল, আবার ডুবল, আবার উঠেই চেঁচিয়ে উঠল, "আমি ডুবে যাচ্ছি, বাঁচাও !" তারপর আবার ডুবে গেল, উঠে এল শুধু বুদ্‌বুদ্‌। তখন বুঝলাম, লোকটা ডুবে যাচ্ছে। আর অমনি হাঁক দিলাম; "দয়া কর; একটি চাষী ডুবে যাচ্ছে।"

বাঁকটা কাঁধে নিয়ে ধোবানি পুকুর-পার থেকে বেঁকে বেঁকে চলে গেল।

নায়েব ইয়াকভ আইভানভ হতাশ সুরে বলল, "কী লজ্জার কথা ! এখন জেলা-আদালতে কী হাঙ্গামায়ই না পড়তে হবে—তার কি আর শেষ থাকবে !"

স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদের ভিড় ঠেলে কাস্তে হাতে একটি চাষী সেখানে হাজির হল ; একটা উইলো গাছের ডালে কাস্তেটা ঝুলিয়ে রেখে সে জুতো খুলতে লাগল।

আমার তখন মনের ইচ্ছা, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, একটা অসাধারণ কিছু করি ; তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম; "কোথায় ? কোথায় ডুবেছে ?"

তারা পুকুরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল ; জোরালো হাওয়ায় জলের উপরে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। পুকুরের জল শান্ত, স্থির, দুপুরের রোদে চিক চিক করছে ; তাহলে এর মধ্যে সে ডুবল কেমন করে তাও ভেবে পেলাম না। তা ছাড়া, আমি ভাল সাঁতার জানি না, কাজেই আমি কিছু করে কাউকে তাক লাগিয়েও দিতে পারব না। ও দিকে চাষীটা শার্ট খুলে ফেলেছে, এখনই ঝাঁপ দেবে। আশা ও নিরাশা নিয়ে সকলেই তাকে দেখছে ; কিন্তু গলা জলে যাবার পরে চাষীটি ফিরে এসে আবার শার্ট গায়ে দিল—সে সাঁতার জানে না।

লোকজন তখনও দৌড়ে আসছে ; ভিড় ক্রমেই বাড়ছে ; মেয়েরা গা-ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু কেউ সাহায্য করতে যাচ্ছে না। যারা সবে এসেছে তারা নানা রকম পরামর্শ দিচ্ছে, হায়-হায় করছে, তাদের চোখেমুখে

উদ্বেগ ও হতাশা ফুটে উঠেছে। যারা আগেই এসেছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে তাদের কেউ ঘাসের উপর বসে পড়ছে, কেউ বা চলে যাচ্ছে। বুড়ি মাত্রোনা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, রান্না ঘরের দরজা বন্ধ করেছে কি না ; বাবার কোট-পরা ছেলেটি ঠিক নিশানায় পুকুরে পাথর ছুঁড়তে লাগল।

এবার ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ-এর কুকুর ত্রেজর্কা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে পাহাড় বেয়ে নেমে এল ; বুনো গোলাপের ঝোপের ও পাশে দেখা গেল ফিয়োদরও কি যেন বলতে বলতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে।

দৌড়তে দৌড়তে কোটটা খুলে সে হাঁক দিল, "তোমরা সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? একটা লোক ডুবে যাচ্ছে, আর কেউ কিছু করছে না!…একটা দড়ি আন।"

সকলেই আশায় ও আতংকে ফিয়োদর ফিলিপ্পিচকে দেখছে। একজন চাকরের গায়ে ভর দিয়ে সে তখন বাঁ পায়ের এক ঠোক্করে ডান পায়ের বুটটা খুলে ফেলল।

কে একজন বলতে লাগল, "ওখানে, ওই যেখানে ভিড় জমেছে ; ওখানে, উইলো গাছটার একটু ডাইনে ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ, হ্যাঁ ওখানে।"

"আমি জানি," ভুরু কুঁচকে সে জবাব দিল। শার্ট ও ক্রুশটা খুলে বাগানের মালীর ছেলের হাতে দিল। তারপর কাটা ঘাসের উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে পুকুরের ধারে গেল।

জলের ধার থেকে কিছু ঘাস খেতে খেতে ত্রেজর্কা এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সোল্লাসে চীৎকার করে সেও তার মনিবের সংগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মিনিটখানেক শুধু বুদবুদ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। একটু পরে দেখা গেল ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ সাঁতার কেটে ও পারের দিকে যাচ্ছে ; তার দুটি হাত সুন্দরভাবে জল কাটছে, তার পিঠটা তালে তালে উঠছে আর নামছে। এক মুখ জল খেয়ে ত্রেজর্কা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ভিড়ের মধ্যে গাটা ঝেড়ে পুকুর পাড়ে গড়াতে লাগল। ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ যখন সাঁতরে ও পারে যাচ্ছে তখন দুটি কোচয়ান লাঠির মাথায় একটা জালকে জড়িয়ে উইলো গাছটার দিকে দৌড়তে লাগল। যে কারণেই হোক মাথার উপর একটা হাত তুলে ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ জলে ডুব দিল—একবার, দু'বার, তিনবার ; প্রতিবারেই তার মুখ থেকে এক গলা জল বের করে, সুন্দর ভংগীতে চুলগুলি পেছনে ঠেলে দেয়, চারিদিকের অজস্র প্রশ্নের কোন জবাবই দেয় না। অবশেষে তীরে পেঁছে সে জাল ফেলবার আদেশ দিল। জাল ফেলা হল, কিন্তু তাতে কিছু শেওলা আর কয়েকটা বাটা মাছ ছাড়া আর কিছু উঠল না। দ্বিতীয়বার জাল ফেলবার সময় আমি ঘুরে সেদিকে গেলাম।

ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ-এর হুকুম, ভেজা দড়ির টানে জলের ছলছলাৎ শব্দ

আর আতংকিত দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। জালটা যতই জলের ধারে আসছে ততই বেশী করে তাতে শেওলা জমছে।

ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ চেঁচিয়ে বলল, "এবার টান লাগাও, সকলে এক সংগে।"

একজন বলল, "নিশ্চয় কিছু আছে ; বেশ ভারী লাগছে।"

জাল টেনে তীরে তোলা হল। কয়েকটা মাছ তার মধ্যে কিলবিল করছে। কর্দমাক্ত জলের ভিতর দিয়ে একটা সাদা জিনিস চোখে পড়ল। সেই মৃত্যুর মত স্তব্ধতার মধ্যে একটা চাপা অথচ স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস ভিড়ের ভিতর ছড়িয়ে পড়ল।

কঠিন গলায় ফিলিপ্পিচ বলল, "সকলে এক সংগে টান, শুকনো মাটিতে টেনে আন।" একটা লোহার হুক লাগিয়ে আগাছা ও লতাপাতার কাটা ডালপালার উপর দিয়ে জলে ডোবা মানুষটাকে উইলো গাছটার কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হল।

এইখানে রেশমী গাউন-পরা স্নেহময়ী বুড়ি পিসীকে আমি দেখতে পাচ্ছি। এই মৃত্যুর দৃশ্যের সংগে বেশ বেমানান হলেও তার লিলাক-রঙের গোটানো ছোট ছাতাটাও দেখতে পাচ্ছি। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তার মুখের হতাশ ভাব দেখে মনে হল, এ ক্ষেত্রে আর্ণিকা-তে কোন কাজ হবে না। মনে পড়ছে, সে যখন একান্ত স্বার্থপর ভালবাসায় আমাকে বলেছিল, "চলে এস সোনা, কী ভয়ংকর ব্যাপার! আর তুমি সর্বদাই একলা স্নান কর, সাঁতার কাট!" তখন আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম।

মনে পড়ছে, সূর্য সেদিন কী উজ্জ্বল ও গরম ছিল ; আমাদের পায়ের নীচে শুকনো মাটি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ; পুকুরের আরশিতে রোদ ঝিলমিল করছে ; বড় বাটা মাছটা পুকুর-পাড়ে ছটফট করছে ; পুকুরের মাঝখানে এক ঝাঁক মাছ খেলা করছে ; জলের মাঝখানে যে পাতিহাঁসগুলি নল-বনের মধ্যে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে তাদের মাথার উপরে অনেক উঁচুতে একটা বাজপাখি ভেসে বেড়াচ্ছে ; সাদা ঝড়ো-মেঘগুলি দিগন্তে জমা হচ্ছে ; জালের টানে যে কাদা তীরে উঠে এসেছিল সেটা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে ; নালাটা পার হবার সময় আমি শুনতে পেলাম ধোবার পাটাটার শব্দ পুকুরের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

পাটার একটা শব্দ ক্রমে দুটো হল, তিনটে হল ; সে শব্দ আমাকে বিরক্ত করে, ব্যথিত করে, বিশেষ করে আমি যখন জানি যে পাটাটা একটা ঘণ্টা, আর ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ সেটা থামাতে পারে না। আর সেই পাটা একটা যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্র হয়ে আমার জমে-যাওয়া পাটাকে মুচড়ে দিচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

গাড়িটা জোর কদমে অত্যন্ত দ্রুত চলার দরুণ এবং ঠিক পাশেই দুজন কথা বলতে থাকায়ই আমার ঘুম ভেঙে গেল বলে মনে হল।

আমার কোচয়ানের গলা শোনা গেল, "আমি বলি কি ইগ্‌নাশ, এই…… ইগ্‌নাশ! আমার যাত্রী তোমার গাড়িতে নাও; তোমাকে তো যেতেই হবে; আমি কেন আর মিছিমিছি যাই—তাকে নিয়ে নাও!"

আমার ঠিক পাশ থেকে ইগ্‌নাশ-এর গলা জবাব দিল—

"একজন যাত্রী নিয়ে আমার কি লাভ……এক পাঁইট ভদ্‌কা দেবে কি?"

"রাখ তোমার পাঁইট বোতল।……এক ড্রাম চাও তো কথা পাকা!"

আর একজন চেঁচিয়ে বলল, "এক ড্রাম!…কী যে বল! এক ড্রামের জন্য ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপান চলে!"

আমি চোখ খুললাম। চোখের সামনে সেই একই দুঃসহ বরফের ঢেউ বয়ে চলেছে, সেই একই কোচয়ান ও ঘোড়া, কিন্তু আমার পাশেই একটা স্লেজ। আমার কোচয়ান ইগ্‌নাশকে ধরে ফেলেছে; বেশ কিছুক্ষণ হল আমরা পাশাপাশি চলেছি। অন্য স্লেজ থেকে এক পাঁইটের কম না নেবার পরামর্শ দিলেও ইগ্‌নাশ সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামিয়ে দিল।

"জিনিসপত্র তুলে দাও। কথা পাকা। তোমার কপাল ভাল। কাল ফিরে এলে এক ড্রাম লাগিয়ে দিও। জিনিসপত্র কি খুব বেশী আছে?"

আমার কোচয়ান ঝট্ করে বরফের মধ্যে লাফিয়ে নামল; আমাকে অভিবাদন জানিয়ে ইগ্‌নাশ-এর স্লেজ-এ উঠতে বলল। আমি তো যেতে খুবই রাজী। কিন্তু ঈশ্বর-ভীরু চাষীটি এতই খুশি হল যে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমাকে, এলিয়োশ্‌কাকে ও ইগ্‌নাশ্‌কাকে অভিবাদন জানিয়ে সে অনেক ধন্যবাদ দিল।

"এই তো, ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ! ঈশ্বরের দয়া; অর্ধেক রাত গাড়ি চালিয়েও আমরা জানি না কোথায় চলেছি! ও আপনাদের ঠিক নিয়ে যাবে স্যার; আমার ঘোড়াগুলো একেবারেই ভেঙে পড়েছে।"

নতুন উৎসাহে সে আমার জিনিসগুলি তুলে নিল। আমিও যেন বাতাসের ধাক্কাতেই এগোতে এগোতে দ্বিতীয় স্লেজটার কাছে গেলাম। স্লেজটার সিকি ভাগেরও বেশী বরফে ডুবে গেছে, বিশেষ করে যে দিকটায় বাতাস আটকাবার জন্য কোচয়ান দুজনের মাথার উপরে একটা জোব্বা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে; তার ভিতরটা বেশ ঢাকা-দেওয়া ও আরামদায়ক। বুড়ো লোকটি আগের মতই পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে; গল্প-কথকটি তখনও তার গল্পই বলে চলেছে: কাজেই সেনাপতি যখন রাজার নাম করে কারাগারে মারিয়ার কাছে এল তখন মারিয়া তাকে বলল, 'সেনাপতি! আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমাকে ভালবাসি না, তুমি আমার প্রেমিক নও; আমার প্রেমিক সেই

রাজপুত্র।”......কাজেই তখন আমাকে দেখে সে থেমে গেল ; পাইপটা তুলে নিল।

আমি যাকে পরামর্শদাতা নাম দিয়েছি সেই লোকটি বলল, “আপনি কি গল্প শুনতে এলেন স্যার ?”

আমি বললাম, “এখানে তোমরা তো বেশ মজায় আছ দেখছি।”

“তা—এতে বেশ সময়টা কাটে ; আজেবাজে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।”

“তোমরা কি সত্যি জান না আমরা এখন কোথায় আছি ?” বুঝতে পারলাম, এ প্রশ্নটা কোচয়ানদের ভাল লাগে নি।

পরামর্শদাতা জবাব দিল, “কেন, কে বলবে আমরা কোথায় এসেছি ? হয় তো কালুমুখ-এই পেঁছে গিয়েছি।”

“এখন আমরা কি করব ?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“কি করব ? কেন, এগিয়ে যাব, এবং কোন না কোন জায়গায় তো পেঁছে যাবই,” অসন্তুষ্ট গলায় সে বলল।

“কিন্তু ধর যদি কোথাও পেঁছতে পারলাম না, অথচ এই বরফের মধ্যে ঘোড়াও আর যেতে চায় না, তখন কি হবে ?”

“তখন ? কিছুই হবে না।”

“ঠাণ্ডায় আমরা জমে যেতে পারি।”

“তা তো হতেই পারে, কারণ কোথাও কোন খড়ের গাদাও চোখে পড়ছে না ; আমরা হয় তো বা কালুমুখ-এর দিকেই চলেছি। আসল কথা হল, বরফের মধ্যে চোখ ঠিক রাখতে হবে।”

বৃদ্ধ লোকটি কাঁপা গলায় বলল, “আচ্ছা স্যার, আপনারা সকলেই কি জমে যাবার ভয়ে ভীত নন ?”

যদিও আমাকে ঠাট্টা করেই সে কথাটা বলল, তবু তার যে হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম।

বললাম, “সত্যি, খুব ঠাণ্ডা পড়েছে।”

“হ্যাঁ স্যার ! আমি যা করছি আপনারও তাই করা উচিত ; মাঝে মাঝেই খানিকটা দৌড়ে নেবেন।

“আচ্ছা কথা বলেছ ; ঠিক তুমি যেমন দৌড়েছিলে স্লেজের পিছনে,” পরামর্শদাতা বলল।

॥ ৭ ॥

সামনের স্লেজ থেকে এলিয়োশ্‌কা আমাকে ডাকল, "দয়া করে ভেতরে এস ; সব ঠিক হয়েছে।"

ঝড়ো হাওয়া এমন প্রচণ্ডভাবে বইছে যে উপুড় হয়ে দুই হাতে কোটের কোণ্‌টা চেপে ধরে আপ্রাণ চেষ্টায় কোনক্রমে বরফের ভিতর দিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে স্লেজটার কাছে গেলাম। আমার আগেকার কোচয়ান ফাঁকা গাড়ির মধ্যে হাঁটু ভেঙে বসে ছিল। আমাকে দেখে বড় টুপিটা মাথা থেকে নামাতেই বাতাসে তার চুলগুলো ভীষণভাবে উড়তে লাগল। সে আমার কাছে কিছুটা পানীয় চাইলেও আমি যে তাকে কিছু দেব এটা সে আশা করে নি, কারণ আমি অস্বীকার করায় সে মোটেই হতাশ হল না। তথাপিও আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুপিটা পরে সে বলল, "আপনার সৌভাগ্য কামনা করি স্যার"; তারপর হাতে লাগাম নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেল। তার পরে ইগ্‌নাশ্‌কোও সমস্ত শরীরটা সামনের দিকে দুলিয়ে ঘোড়াগুলির উদ্দেশে হাঁক দিল। পুনরায় বাতাসের হা-হা শব্দের পরিবর্তে কানে বাজতে লাগল ঘোড়ার ক্ষুরের খট্‌-খট্‌ শব্দ, চীৎকার ও ঘণ্টার শব্দ, কারণ যতক্ষণ আমরা থেমেছিলাম ততক্ষণ ঝড়ের শব্দটাই বেশী করে কানে বাজছিল।

গাড়ি চলবার পর সিকি ঘণ্টা আমি ঘুমুতে গেলাম না ; আমার নতুন কোচয়ান ও ঘোড়াগুলিকে দেখতেই মজা লাগছিল। ইগ্‌নাশ্‌কা বসে বসেই অনবরত লাফাচ্ছে, হাতের চাবুকটাকে ঘোড়াগুলোর উপর ঘোরাচ্ছে, একটা পা দিয়ে অপর পাটা ঠুকছে। লোকটা লম্বা না হলেও বেশ মজবুত গড়নের। কোটের উপরে একটা জোব্বা পড়েছে, কিন্তু সেটাকে কোমরের কাছে বাঁধে নি ; কলারটা খোলা থাকায় গলাটা পুরো খোলা ; বুটজোড়া চামড়ার, আর টুপিটা খুবই ছোট ; টুপিটাকে সে বার বার খুলছে আর পরছে। চুল ছাড়া কান দুটো ঢাকবার আর কিছু ছিল না।

তার সব কাজের মধ্যে শুধু শক্তি নয়, শক্তিটাকে বাড়িয়ে তুলবার একটা চেষ্টা আমার চোখে পড়ল। সে যত এগোচ্ছে ততই মাঝে মাঝে বক্সের উপর ওঠ-বস করছে, জায়গা বদলে নিচ্ছে। একটা পা দিয়ে অন্য পাটাকে আঘাত করছে, আমাকে ও এলিয়োশ্‌কাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে। মনে হল, তারও ভয় হয়েছে পাছে ভরসা হারিয়ে ফেলে। তার যথেষ্ট কারণও ছিল ; আমাদের ঘোড়াগুলো বেশ ভাল হলেও প্রতি পদক্ষেপেই রাস্তা খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে, আর ঘোড়াগুলোও যে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই চলেছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই ; মাঝে মাঝেই তাকে চাবুক চালাতে হচ্ছে। চোখের সামনে বরফের ঝড় ক্রমেই 'প্রচণ্ডতর হচ্ছে, ঘোড়াগুলো ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছে, রাস্তার অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, অথচ আমরা কোথায় আছি,

আড্ডায় পৌঁছতে পারব কি না, বা কোন রকম আশ্রয় মিলবে কি না তার কিছুই জানি না—এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা। শুনতে যেমন হাস্যকর তেমনি অদ্ভুত লাগছে যে ঘণ্টাগুলি এমন নির্লিপ্ত আনন্দে বাজছে, ইগনাশ্কা এমনভাবে কথাবার্তা বলছে যেন কোন রৌদ্রস্নাত বরফ-ঝরা বড় দিনের দুপুরে গ্রামের রাস্তা ধরে আমরা ছুটি কাটাতে চলেছি; আরও বেশী অদ্ভুত লাগছে এই ভেবে যে, সারাক্ষণই যেখানে আমরা রয়েছি তার থেকে দূরে কোথাও যাবার জন্যই যেন আমরা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছি। এমন বিকৃত স্বরে উচ্চকণ্ঠে ইগ্নাশ্কা একটা গান গেয়ে উঠল; আর গানের মাঝে মাঝে শিস্ দিতে লাগল যে সেটা কানে এলে আপনিতেই ভয় ধরে।

"হেই, হেই, ইগ্নাশ্কা, কেন গলাটাকে ভাঙছ? অন্তত ঘণ্টা-খানেকের জন্য তোমার রাগিনী থামাও।"

"কি?"

"চুপ কর।"

ইগ্নাশ থামল। আবার সব চুপচাপ। শুধু বাতাসের গর্জন ও শোঁ-শোঁ শব্দ; পড়ন্ত বরফ স্লেজের উপর ভারী হয়ে জমতে লাগল। পরামর্শ-দাতা আমাদের কাছে এগিয়ে এল।

"আচ্ছা, এ সব কি হচ্ছে?"

"তা বটে; কোন্ দিকে যাচ্ছ?"

"কে জানে?"

"সে কি, তোমার পা দুটো কি জমে গেছে যে অনবরত ঠুকছ?"

"একেবারেই অসার হয়ে গেছে।"

"তাহলে একটু দৌড়ে এস। দেখে এস তো ওটা কি; কাল্মুখ-এর ছাউনি নয় তো? যাই হোক, তোমার পা দুটো তো গরম হবে।"

"ঠিক আছে। লাগামটা ধর···এই যে।"

ইগ্নাশ সেই দিকেই দৌড় দিল।

পরামর্শদাতা আমার দিকে চেয়ে বলল, "চারদিকে চোখ রেখে হাঁটলে কিছু না কিছু চোখে পড়বেই; বোকার মত গাড়ি ছুটিয়ে লাভ কি? দেখুন, ঘোড়াগুলোর গা থেকে কেমন ভাঁপ বেরুচ্ছে!"

ইগ্নাশ নেমে যাবার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল; সময়টা এত বেশী যে আমার ভয় হতে লাগল সে বুঝি হারিয়েই গেল। এদিকে সারাক্ষণ পরামর্শদাতাটি শান্ত, আত্ম-বিশ্বাসে ভরা সুরে আমাকে বোঝাতে লাগল, তুষার-ঝড়ে পড়লে কি করা উচিত; সব চাইতে ভাল কাজ হল ঘোড়াকে খুলে দিয়ে তার ইচ্ছামত যেতে দেওয়া; ঈশ্বর করুণাময়, কাজেই ঘোড়া ঠিক পথেই চলবে; অথবা কেউ কেউ নক্ষত্র দেখে পথ চিনতে পারে; আর সে যদি

এই স্লেজের কোচয়ান হত তাহলে আমরা অনেক আগেই আড্ডায় পেঁছে যেতাম।

হাঁটু পর্যন্ত গভীর বরফের ভিতর দিয়ে অনেক কষ্টে পা ফেলে ইগ্‌নাশ ফিরে এল। পরামর্শদাতা জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখলে?"

হাঁপাতে হাঁপাতে ইগ্‌নাশ জবাব দিল, "হ্যাঁ, একটা ছাউনিই বটে, কিন্তু কিসের ছাউনি তা জানি না। নির্ঘাৎ আমরা প্রল্‌গভ্‌স্কি বস্তির দিকে চলে এসেছি স্যাঙাৎ। আরও বাঁয়ে যেতে হবে।"

"বাজে কথা!...গ্রামের পিছনে ওটা আমাদের ছাউনি!" পরামর্শদাতা পাল্টা জবাব দিল।

"কিন্তু আমি বলছি তা নয়!"

"আরে, আমি দেখে তবে বলছি; আমি চিনি। ওটা তাই হবে, আর যদি নাও হয় তাহলে ওটা তামিশেভ্‌স্কো। আমাদের আরও ডাইনে যেতে হবে, তাহলেই সোজা আট ভার্স্ট পরের সেই বড় সেতুটা পেয়ে যাব!"

"আমি বলছি তা নয়! আরে, আমি নিজে দেখে এলাম।" ইগ্‌নাশ বিরক্ত হয়ে বলল।

"আরে স্যাঙাৎ, এই জ্ঞান নিয়ে তুমি কোচয়ান বলে পরিচয় দাও!"

"হ্যাঁ, দেই।...নিজে গিয়ে দেখে এস!"

"কিসের জন্য যাব? আমি এমনিতেই জানি।"

ইগ্‌নাশ-এর মেজাজ বিগড়ে গেল; কোন কথা না বলে বক্সের উপর লাফিয়ে উঠে সে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বারে বারে পায়ে-পায়ে ঠোকাঠুকি করতে করতে এবং বুটের ডগার উপরে জমা বরফ ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে এলিয়োশ্‌কাকে বলল; "আমার পা দুটো অসার হয়ে গেছে; কিছুতেই গরম হচ্ছে না।"

আমার ভীষণ ঘুম পেতে লাগল।

॥ ৮ ॥

"আমি কি সত্যি সত্যি জমে যেতে শুরু করলাম?" ঘুম-ঘুম ভাবের মধ্যেই কথাটা আমার মনে হল। "লোকে বলে, জমে যাবার আগে ঘুম-ঘুম ভাব হয়। জমে যাওয়ার চাইতে ডুবে যাওয়া ভাল—তারা আমাকে টেনে নিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিক। ডুবে যাওয়াই হোক, আর জমে যাওয়াই হোক, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না; শুধু ঐ কাঠি না কি ওটা যদি

আমার পিঠে না লাগত তাহলেই আমি সব কিছু ভুলে থাকতে পারতাম।"

এক সেকেণ্ডের জন্য আমি চৈতন্য হারালাম।

এক মিনিটের জন্য চোখ খুলে চারদিকের সাদা বরফের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, "এ সব কিছুর শেষ কোথায়? ইতিমধ্যে যদি কোন খড়ের গাদা দেখতে না পাই, আর ঘোড়াগুলো যদি থেমে যায়, আমার তো মনে হয় শীঘ্রই সেরকমটা ঘটবে, তাহলে এ যাত্রার শেষ কি ভাবে হবে? আমরা সকলেই জমে যাব।" আমি কিছুটা ভয় পেয়ে থাকলেও একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, একটা অসাধারণ এবং শোচনীয় কিছু ঘটুক এই ইচ্ছাটাই আমার মনে সামান্য ভয়ের চাইতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমার মনে হল, সকাল নাগাদ আধা জমাট-বাঁধা অবস্থায় বা কেউ কেউ পুরো জমাট-বাঁধা অবস্থায় আমাদের নিয়ে ঘোড়াগুলি যদি কোন বহুদূরবর্তী অজ্ঞাত গ্রামে পেঁছিয় তাহলে ব্যাপারটা মন্দ হয় না। অসাধারণ দ্রুততায় ও স্পষ্টভাবে এই ধরনের স্বপ্ন আমার কল্পনায় ভেসে বেড়াতে লাগল। ঘোড়াগুলোর কান আর জোয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না; হঠাৎ তিনটে ঘোড়া নিয়ে ইগ্‌নাশ্‌কো সেই বরফের উপর দেখা দিয়েই আমাদের পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। আমরা কত অনুনয়-বিনয় করলাম, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালাম; কিন্তু বাতাসে আমাদের কণ্ঠস্বর উড়ে গেল, কিছুই শোনা গেল না। ইগ্‌নাশ্‌কো হাসল, ঘোড়াগুলোকে ডাকল, শিস দিল, তারপর বরফে ঢাকা গভীর গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুড়ো লোকটি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, তার কনুই দুটো ওঠা-নামা করছে, সে জোর কদমে ছুটতে চাইছে, কিন্তু নড়তেও পারছে না। আমার আগেকার কোচয়ান মাথায় বড় টুপিটা পরে তার দিকে ছুটে গেল, তাকে টেনে নামাল, তারপর তাকে পা দিয়ে বরফের উপর চেপে ধরল। সে চীৎকার করে বলল, "তুই একটা পিশাচ, একটা দুর্মুখ, আমরা সবাই এক সঙ্গে মরব।" কিন্তু বুড়ো লোকটি বরফের ভিতর থেকে মাথাটা বের করল; এখন সে আর তত বুড়ো নেই; খরগোসের মত লাফ দিয়ে সে আমাদের কাছ থেকে চলে গেল। কুকুরগুলো তার পিছনে দৌড়চ্ছে। পরামর্শদাতা এখন ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ হয়ে গেছে; সে বলল, আমাদের সকলকে গোল হয়ে বসতে হবে; বরফ যদি আমাদের কবরও দেয় তাতে কিছু আসে-যায় না; আমরা গরম তো হতে পারব। সত্যি সত্যি আমরা গরম হলাম, আরাম পেলাম, শুধু তেষ্টা পেয়েছে। আমি এক বাক্স মদ পেয়ে গেলাম; সকলকে চিনি মেশানো "রাম" খেতে দিলাম, নিজেও মজা করে খেলাম। গল্প-কথক আমাদের একটা রামধনুর গল্প বলল—আমাদের

মাথার উপরকার ছাদটা বরফ ও রামধনু দিয়ে গড়া। আমি বললাম, "এবার চল সকলেই বরফের মধ্যে একটা করে ঘর বানিয়ে ঘুমোতে যাই!" বরফটা লোমের মতই নরম ও গরম; নিজের জন্য একটা ঘর বানিয়ে তার ভিতর ঢুকতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ মদের বাক্সের মধ্যে আমার টাকা দেখতে পেয়ে বলল, "থাম, টাকাটা আমাকে দাও—তোমাকে তো মরতেই হবে!" সে আমার পা টেনে ধরল। আমি টাকাটা দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বললাম; কিন্তু এই যে আমার সব টাকা সেকথা বিশ্বাস না করে তারা আমাকে মেরে ফেলতে চাইল। বুড়ো লোকটির হাত চেপে ধরে অবর্ণনীয় আনন্দে আমি তাকে চুমো খেতে লাগলাম; বুড়োর হাতটা কী নরম আর মিষ্টি। প্রথমে সে হাতটা ছিনিয়ে নিল, কিন্তু তার পর আমার দিকে বাড়িয়ে দিল; শুধু তাই নয়, অপর হাতটি দিয়ে আমাকে আদর করতে লাগল। কিন্তু ফিয়োদর ফিলিপ্পিচ এগিয়ে এসে আমাকে ভয় দেখাতে লাগল। আমার ঘরে ছুটে গেলাম। সেটা এখন আর ঘর নেই, একটা লম্বা, সাদা করিডর। কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। আমি নিজেকে ছিনিয়ে নিলাম, কিন্তু আমার বুট, মোজা ও চামড়ার কিছু অংশ লোকটির হাতের মধ্যেই রয়ে গেল। আমার বেশ শীত করছে; লজ্জাও হচ্ছে,—কারণ আমার পিসী তার ছোট ছাতা আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স নিয়ে সেই জলে-ডোবা লোকটার হাত ধরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। তারা হাসছে; আমি যে ইসারা করছি তা বুঝতেও পারছে না। লাফ দিয়ে একটা স্লেজে উঠে পড়লাম; আমার পা দুটো বরফের উপর ঘসটাতে লাগল; কিন্তু বুড়ো লোকটি আমার পিছু নিল, তার কনুই দুটো উঠছে আর নামছে। বুড়ো লোকটি খুব কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু আমি শুনতে পেলাম আমার সামনে দুটো ঘণ্টা বাজছে; আমি জানি ওখানে পৌঁছতে পারলেই আমি নিরাপদ। ঘণ্টা দুটো আরও স্পষ্টভাবে বাজছে; কিন্তু বুড়ো লোকটি আমাকে ধরে ফেলেছে, আমার মুখের উপর চেপে বসেছে; কাজেই ঘণ্টার শব্দ আমি আর শুনতে পাচ্ছি না। আবার তার হাতটা চেপে ধরে চুমো খেতে লাগলাম; কিন্তু এ তো বুড়ো নয়, এ যে সেই ডুবে-যাওয়া লোকটা; সে চেঁচিয়ে বলছে, "ইগ্‌নাশ্‌কা, থাম, আমার মনে হচ্ছে ঐ তো আহ্‌মেত্‌কিন-এর খড়ের গাদা। ছুটে যাও, ভাল করে দেখ!" কী সাংঘাতিক। না, এর চাইতে জেগে ওঠাই ভাল।

চোখ খুললাম। এলিয়োশ্‌কার কোটের কোণটা বাতাসে উড়ে এসে আমার মুখের উপর পড়েছে; আমার হাঁটুটা খোলা; বরফের মাঠের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে; ঘণ্টাগুলোর ঠুন ঠুন শব্দ বাতাসে আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে।

খড়ের গাদাটা খুঁজতে লাগলাম; তার বদলে দেখতে পেলাম একটা বাড়ি, তার বারান্দা আর দুর্গের মত বুরুজাকৃত দেয়াল। এই দুর্গের মত বাড়িটা দেখার কোন আগ্রহ আমার নেই। আমি দেখতে চাই সেই সাদা করিডরটা যেটা ধরে আমি দৌড়ে যাচ্ছি, শুনতে চাই গীর্জার ঘণ্টা-ধ্বনি, আর চাই সেই বুড়ো লোকটার হাতে চুমো খেতে। আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ ৯ ॥

গভীর ঘুম ঘুমোলাম; কিন্তু ঘণ্টার ধ্বনিটা সারাক্ষণ শুনতে পেলাম; সে ধ্বনি আমার স্বপ্নের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল; কখনও সে একটা কুকুর হয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আমাকে তাড়া করল; কখনও একটা অর্গান হয়ে গেল, আর আমি হলাম তার নল; তারপর সে হয়ে গেল আমার রচিত ফরাসি কবিতা। তারপর মনে হল ঘণ্টার ধ্বনিটা এমন একটি যন্ত্রণার যন্ত্র যা দিয়ে আমার ডান গোড়ালিটাকে অনবরত মুচড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বপ্নটা এতই স্পষ্ট যে আমি জেগে উঠে পাটা টিপতে টিপতে চোখ মেলে তাকালাম। পাটা বরফে অসার হতে শুরু করেছে। তখনও রাতটা সেই একই রকম আলোকিত, অস্পষ্ট, সাদা। স্লেজসহ আমিও সেই একই ভাবে দুলছি; পায়ে পা ঠুকতে ঠুকতে ইগ্‌নাশ্‌কা সেই একই ভাবে কাৎ হয়ে বসে আছে। বরফের ঝড় বইছে; এক দিককার চাকাগুলো ঢেকে গেছে; ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত বরফের মধ্যে বসে যাচ্ছে; আমাদের কলারে ও টুপিতেও বরফ জমেছে। বাতাস প্রথমে ডাইনে, তারপর বাঁয়ে বইতে লাগল; আমার কলার, ইগ্‌নাশ্‌কার কোটের কোণ্‌ ও ঘোড়ার লোমের উপর খেলা করতে লাগল; জোয়াল ও শকট-দণ্ডের ভিতর দিয়ে শন্‌-শন্‌ শব্দ করতে লাগল।

বাইরে ভয়ানক ঠাণ্ডা; লোমের কলারের ভিতর দিয়ে একটুখানি উঁকি দিতেই শুকনো, জমাট, ছুটন্ত বরফ আমার ভুরু, নাক ও মুখের উপর জমে উঠল, ঘাড় বেয়ে নীচে নেমে গেল। চারদিকে তাকালাম—সব সাদা, আবছা, বরফে ঢাকা। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। স্লেজের একেবারে নীচে আমার পায়ের কাছে এলিয়োশ্‌কা ঘুমিয়ে আছে; তার সারা পিঠ বরফে ঢেকে গেছে। ইগ্‌নাশ্‌কা কিন্তু দমে যায় নি; সে অনবরত লাগাম টানছে, হাঁক দিচ্ছে, দুটো পায়ে ঠোকাঠুকি করছে। ঘণ্টাগুলো আগের মতই অদ্ভুত সুরে বেজে চলেছে। ঘোড়াগুলি হাঁপাচ্ছে, তবু ছুটছে; আগের থেকে কিছুটা ধীর গতিতে; মাঝে মাঝেই হোঁচট খাচ্ছে। ইগনাশ্‌কা আবার ওঠ-বস করছে, দস্তানা

ঘসছে; কর্কশ, বেসুরো গলায় গান গাইছে। গান শেষ না করেই গাড়ি থামিয়ে লাগামটা স্লেজের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে সে নেমে গেল। বাতাস ভীষণভাবে গর্জন করছে; আমার লোমের জোব্বার উপর বরফ যেন বেলচা-ভর্তি হয়ে ঝরে পড়ছে। তৃতীয় স্লেজটা নেই (পিছনে কোথাও পড়ে আছে)। বরফাচ্ছন্ন কুয়াসার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম; বুড়ো লোকটি দ্বিতীয় স্লেজের পাশ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। ইগনাশ্কা স্লেজ থেকে তিন পা এগিয়ে বরফের উপর বসে পড়ল; বেল্টটা খুলে বুটজোড়া খুলতে শুরু করল।

"তুমি কি করছ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

নিজের কাজ করতে করতেই সে জবাব দিল, "বুট জোড়া খুলে ফেলতেই হবে; নইলে ঠাণ্ডায় পা দুটো অসার হয়ে যাবে।"

এত ঠাণ্ডা যে কলারের ভেতর থেকে গলা বের করে সে যে কি করছে সেটা দেখাও সম্ভব নয়। আমি সোজা হয়ে বসলাম। সামনের ঘোড়াটার দিকে চেয়ে দেখি, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর বরফ-ঢাকা লেজটা নড়ছে। ইগনাশ্কা লাফ দিয়ে গাড়িতে ওঠায় সেই ধাক্কায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আরে, আমরা এখন কোথায়? সকাল পর্যন্তই চলব নাকি?"

সে জবাব দিল, "আপনি ভাববেন না, আপনাকে ঠিক নিয়ে যাব। বুট-জোরা খুলে পা দুটো এখন বেশ গরম হয়েছে।"

গাড়ি ছেড়ে দিল; ঘণ্টা বাজতে শুরু করল; স্লেজটা এপাশ-ওপাশ দুলছে; চাকার ভিতর দিয়ে বাতাস শোঁ-শোঁ শব্দ তুলেছে। আবার আমরা সেই সীমাহীন বরফের সমুদ্রের ভিতর দিয়ে ভেসে চললাম।

॥ ১০ ॥

বেশ ভাল ঘুম হল। এলিয়োশ্কা যখন ঠেলা দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিল তখন চোখ মেলে দেখলাম, সকাল হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাটা যেন রাতের চাইতেও বেশী। উপর থেকে বরফ পড়ছে না; কিন্তু তীক্ষ্ণ, শুকনো বাতাসে তখনও বরফ উড়ছে, বিশেষ করে চাকার নীচে ও ঘোড়ার ক্ষুরে। ডান দিকে পুবের আকাশে ভারী নীল রং; উজ্জ্বল কমলা রঙের তির্যক সূর্য-কিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার উপরে চলমান ঈষৎ লালের ছোপ লাগা সাদা মেঘের ওপারে ফ্যাকাসে নীল আকাশটা দেখা যাচ্ছে, বাঁ দিকে উজ্জ্বল মেঘগুলি দ্রুততর গতিতে ভেসে চলেছে। চারদিকে যত দূরে

চোখ যায় সারা দেশ সাদা বরফে ঢেকে আছে ; বরফের চাঁইগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে ধুসর পাহাড়ের গায় শুকনো বরফ উড়ে উড়ে পড়ছে। কোন স্লেজ বা মানুষ, বা পশুর চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না। সাদা পশ্চাৎ-পটের উপর শুধু দেখা যাচ্ছে কোচয়ানের পিঠ আর ঘোড়া। ...ইগ্নাশকার গাঢ় নীল টুপির কোণ, তার কলার, তার চুল, এমন কি বুট-জোড়া পর্যন্ত সাদা। স্লেজটা সম্পূর্ণ চাপা পড়েছে, শুধু একটা নতুন জিনিস আমার চোখে পড়ল—একটা ভার্স্ট-খুঁটি। তার উপর থেকে বরফ গাড়িয়ে পড়ছে। অবাক হয়ে দেখলাম, একই ঘোড়া নিয়ে আমরা সারা রাত ছুটেছি, কোথায় যাচ্ছি না জেনেও বারো ঘণ্টার মধ্যে কোথাও থামি নি, অথচ যে করেই হোক, আমরা পেঁাছে গেছি। ঘণ্টাগুলি খোস মেজাজে বাজছে। নিজেকে ভাল করে ঢেকেঢুকে ইগ্নাশ হাঁক পাড়ছে ; আমাদের পিছনের যে স্লেজে বুড়ো লোকটি ও পরামর্শদাতা রয়েছে তার ঘোড়ার হ্রেষা ও ঘণ্টার শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি ; কিন্তু যে লোকটি ঘুমিয়েছিল সে এই তৃণভূমিতে পথ হারিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। আরও আধা-ভার্স্ট চলবার পরে একটা স্লেজ ও তিনটে ঘোড়ার চলার দাগ চোখে পড়ল ; দাগগুলি তখনও বরফে ঢাকা পড়ে নি ; এখানে-ওখানে কিছু রক্তের দাগও দেখলাম ; সম্ভবত কোন আহত ঘোড়ার রক্ত হবে।

"নিশ্চয় ফিলিপ। আরে, সে দেখছি আমাদের আগেই এসেছে!" ইগনাশ্কা বলল। এতক্ষণে রাস্তার পাশে বরফের মাঝখানে সাইনবোর্ড-ঝোলানো একটা ছোট বাড়ি চোখে পড়ল ; বাড়িটার ছাদ ও জানালা পর্যন্ত বরফে ঢেকে গেছে। ছোট সরাইখানাটার পাশেই তিনটে ধুসর ঘোড়াসহ একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কাছ থেকে বরফ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে ; পাশেই একটা কোদাল পড়ে আছে ; কিন্তু বাতাসের গর্জন তখনও চলেছে ; ছাদ থেকে বরফ ঝরে পড়ছে।

আমাদের ঘণ্টা শুনে একটি লালমুখ, লাল চুল কোচয়ান দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ; তার হাতে এক গ্লাস ভদ্কা ; আমাদের ডেকে কি যেন বলছে। ইগ্নাশ্কা আমার দিকে ফিরে এখানে গাড়ি থামাবার অনুমতি চাইল ; তখনই এই প্রথম আমি তার মুখটা দেখতে পেলাম।

॥ ১১ ॥

তার চুল ও আকৃতি দেখে আমি ভেবেছিলাম তার মুখটা ধোঁয়াটে, সরু আর খাড়া নাক হবে ; কিন্তু আসলে তা নয়। মুখটা গোল, হাসিখুসি, নাকটা

থ্যাবড়া, মুখটা বড়, চোখ দুটো গোল, উজ্জ্বল ও হাল্কা নীল। মুখ ও ঘাড়ের রং লাল, দেখলে মনে হয় কেউ কাপড় দিয়ে ঘসেছে ; তার ভুরু, চোখের পাতার লোম. মুখের নিম্নাংশের দাড়ি সব কিছু বরফে ঢাকা—একেবারে সাদা ; জায়গাটা আড্ডা থেকে আধা ভার্স্ট দূরে ; আমরা সেখানেই থামলাম।

বললাম, "একটু তাড়াতাড়ি কর হে।"

"এক মিনিট," লাফ দিয়ে বক্স থেকে নামতে নামতে কথাটা বলে ইগনাশ্‌কা ফিলিপের কাছে এগিয়ে গেল।

ডান হাতের দস্তানাটা খুলে চাবুকশুদ্ধ বরফের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, "এখানেই দাও স্যাঙাৎ" ; তারপরই মাথাটা চিৎ করে ভদ্‌কার গ্লাসটা একবারেই গলায় ঢেলে দিল।

সরাইওলা সম্ভবত একজন বুড়ো কসাক ; একটা পাঁইট বোতল হাতে নিয়ে সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

বলল, "এটা কাকে দেব ?"

ঢ্যাঙা, সরু, মাথায় শনের মত চুল ও মুখে ছাগুলে দাড়ি চাষী ভাসিলি এবং শক্ত গড়ন, হাল্কা ভুরু, ঘন দাড়িভর্তি লাল মুখ পরামর্শদাতা এগিয়ে গেল ও এক গ্লাস করে খেল। বুড়ো লোকটিও এগিয়ে গেল, কিন্তু তাকে কেউ কিছু দিল না ; তাই সে ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে একটার পিঠ চাপড়াতে লাগল।

ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম বুড়ো লোকটি দেখতে ঠিক সেই রকম—সরু ছোট মানুষটি, কোঁচ্‌কানো নীল্‌চে মুখ, পাতলা দাড়ি, খাড়া নাক ও ক্ষয়ে যাওয়া হল্‌দে দাঁত। মাথায় কোচয়ানদের টুপিটা আন্‌কোরা নতুন, কিন্তু গ্রেটকোটটা নোংরা, আলকাত্‌রার দাগ লাগা, কাঁধের কাছে ও নীচের দিকে ছেঁড়া। তাতে তার হাঁটু ও মোটা শনপাটের তলবাস ঢাকা পড়ে নি। তার শরীরটা কুঁচকে বেঁকে গেছে, মুখটা নড়ছে, আর হাঁটু দুটো কাঁপছে। শরীরটা গরম করবার জন্য সে স্লেজের কাছে ঘুরতে লাগল।

পরামর্শদাতা তাকে বলল, "আরে মিত্রিচ, এক ফোঁটা খাও ; শরীরটা গরম হবে।"

মিত্রিচ কাঁধটা ঝাঁকুনি দিল। ঘোড়ার পিঠে ভর দিয়ে শরীরটাকে টান করে সে জোয়ালটা ঠিক করে আমার কাছে এল।

সাদা মাথার উপর থেকে টুপিটা নামিয়ে নীচু হয়ে অভিবাদন করে সে বলল, "দেখুন স্যার, আপনার সঙ্গে আমরাও সারারাত পথে কাটিয়েছি, পথ খুঁজেছি ; আপনি তো আমাকে এক গ্লাস খাওয়াতে পারেন। নিশ্চয় পারেন ইয়োর এক্সেলেন্সি ! নইলে আমার গরম হবার কোন উপায় নেই," হতাশার হাসি হেসে সে কথাগুলি যোগ করল।

আমি তাকে পঁচিশ কোপেক দিলাম। সরাইওলা একটা গ্লাস এনে বুড়ো লোকটির হাতে দিল। লোকটি চাবুকসহ দস্তানাটা খুলে তার ঠাণ্ডা নীল হয়ে যাওয়া হাড় বের করা কালো হাতে গ্লাসটা নিল ; কিন্তু বুড়ো আঙুলটা বশে না থাকায় গ্লাসটা ধরতে পারল না ; গ্লাসটা পড়ে গেল ; ভদ্‌কাটা বরফের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

কোচয়ানরা হেসে উঠল।

"মিত্রিচ এতই জমে গেছে যে ভদ্‌কার গ্লাসটাও ধরতে পারল না।"

পানীয়টা ফেলে দিয়ে মিত্রিচ খুবই মর্মাহত হল।

যা হোক, তারাই আর এক গ্লাস ঢেলে তার ঠোঁটের কাছে ধরল। এতে সে ভারী খুসি হয়ে গেল। দৌড়ে সরাইখানায় ঢুকল, পাইপটা ধরাল, হল্‌দে দাঁত বের করে হাসতে লাগল, আর প্রতিটি কথার সঙ্গে ঈশ্বরের নামে শপথ করতে লাগল। শেষ গ্লাস শেষ করে কোচয়ানরা স্লেজে উঠল ; গাড়ি ছেড়ে দিল।

বরফ ক্রমেই এত সাদা ও উজ্জ্বল হতে লাগল যে সে দিকে চেয়ে থাকলে চোখ ব্যথা করে। মাথার উপরে আকাশে কমলা-লাল রেখাগুলো ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। গাঢ় নীল মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের লাল গোলকটি দিগন্তে উদয় হল। নীল রংটা আরও গাঢ়, আরও উজ্জ্বল হতে লাগল। আড্ডার কাছাকাছি একটা হল্‌দেটে পথের রেখা দেখা দিল ; তাতে চাকার গভীর দাগ পড়েছে। জমাট বাতাসে একটা অদ্ভুত তাজা, হাল্কা ভাব।

আমার স্লেজটা দ্রুত ছুটতে লাগল। প্রধান ঘোড়াটার মাথার লোম জোয়ালের উপর উড়ে উড়ে পড়ছে। অন্য ঘোড়াগুলোও জোর কদমে ছুটছে। পেট ও পাছার নীচে তাদের ঝোম্পাগুলো তালে তালে নাচছে। কখনও কখনও একটা ঘোড়া হয় তো রাস্তা ছাড়িয়ে পা পিছলে বরফের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, আর তখনি উঠে দাঁড়াচ্ছে ; তার চোখে-মুখে বরফের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে। ইগনাশ্‌কা খোস মেজাজে হাঁক দিচ্ছে ; চাকার তলায় শুকনো বরফ গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে ; পিছন থেকে দুটো ঘণ্টার উৎসবের সুর ভেসে আসছে ; কোচয়ানদের মাতলামির হল্লাও শুনতে পাচ্ছি। চারদিকে তাকালাম। ঘোড়াগুলি তালে তালে শ্বাস টানতে টানতে ঘাড় ও মুখ বেঁকিয়ে বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। ফিলিপ চাবুক কসতে কসতে টুপিটা সোজা করে নিল। আগের মতই পা দুটো তুলে দিয়ে বুড়ো লোকটি স্লেজের মাঝখানে শুয়ে আছে।

দু' মিনিট পরে স্লেজটা আড্ডায় ঢুকবার মুখে কাঠের ভেজা পাটাতনের উপর সশব্দে থেমে গেল। শিশির ও বরফে সম্পূর্ণ ঢাকা হাসি-হাসি মুখ

তুলে ইগ্‌নাশ্‌কা আমার দিকে তাকাল। "শেষ পর্যন্ত আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দিলাম স্যার," সে বলল।

১৮৫৬

তিনটি মৃত্যু

Three Deaths

॥ ১ ॥

হেমন্তকাল। বড় রাস্তায় দু'খানি গাড়ি জোর কদমে ছুটে চলেছে। সামনের গাড়িতে বসে আছে দুটি স্ত্রীলোক। একটি মহিলা, কৃশকায়, বিবর্ণ; অপরটি দাসী, মোটাসোটা, চকচকে লাল গাল। তার ছোট করে ছাঁটা রুক্ষ চুল বিবর্ণ টুপিটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে; ছেঁড়া দস্তানায় ঢাকা লাল হাত দিয়ে বারে বারেই সে চুলগুলি ঠিক করে নিচ্ছে; কাজ-করা রুমালে ঢাকা তার উদ্ধত বুকে স্বাস্থ্যের স্বাক্ষর; কালো চোখের চপল দৃষ্টি মেলে সে কখনও জানালা দিয়ে বাইরের ধাবমান মাঠঘাট দেখছে, কখনও ভীরু চোখে তাকাচ্ছে তার মনিবের দিকে, কখনও বা অস্বস্তির সঙ্গে গাড়ির কোণের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে। উপরের তাক থেকে মহিলার টুপিটি ঝুলছে ঠিক তার নাকের উপর; তার কোলের উপর একটা পোষা কুকুর। গাড়ির মেঝেতে ছড়ানো বাক্সগুলির উপর সে পা রেখেছে; স্প্রিং-এর দোলানি ও জানালার খট্‌ খট্‌ শব্দকে ছাপিয়ে বাক্সের উপর তার পায়ের ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে।

হাঁটুর উপরে দুই হাত একত্র করে মহিলাটি চোখ বুজে পিঠের নীচে রাখা কুশনে একটু একটু দুলছে; চোখ দুটো একটু কুঁচকে সে ধীরে ধীরে সামান্য কাশল। তার মাথায় সাদা নাইটক্যাপ, আর নরম, ফর্সা গলায় হাল্কা নীল রঙের রুমাল বাঁধা। তার সুন্দর, পমেড-মাখা পাকা চুলের মাঝখান দিয়ে সোজা সিঁথি কাটা হয়েছে; মাঝখানের সাদা চামড়াটা কেমন যেন শুকনো মরার মত দেখতে। তার সূক্ষ্ম, সুন্দর শরীরের উপর ফ্যাকাসে, হলুদ চামড়াটা ঝুলে পড়েছে; শুধু গাল দুটোতে লালের ছোপ। তার ঠোঁট দুটি শুকনো ও অস্থির, চোখের পাতা সরু ও সোজা, সুতীর বেড়াবার জোব্বাটা তার ঝুলে-পড়া বুকের উপর ভাঁজ হয়ে পড়েছে। চোখ দুটো বোজা থাকলেও মহিলাটির মুখে শ্রান্তি, বিরক্তি ও দীর্ঘ যন্ত্রণার

ছাপ সুস্পষ্ট। পরিচারকটি বক্সের উপর বসে রেলিং-এ অথবা আসনের উপর কনুই রেখে ঝিমুচ্ছে। ভাড়া-করা কোচয়ান চারটে বলবান, ঘর্মাক্ত ঘোড়াকে লক্ষ্য করে অনবরত হাঁক পাড়ছে, এবং পিছনের গাড়ির কোচয়ানের ডাকে সাড়া দিয়ে মাঝে মাঝেই পিছনে তাকাচ্ছে। কর্দমাক্ত পথ বেয়ে গাড়ির চাকাগুলো সহজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আকাশ ধূসর ও ঠাণ্ডা; একটা ভেজা কুয়াসা মাঠঘাট ও রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ধ গাড়িতে ইউ-ডি-কোলোন ও ধুলোর গন্ধ। রুগ্ন মহিলাটি মাথাটা পিছনের দিকে টানটান করে চোখ খুলল। বড় বড় সুন্দর, কালো চোখ দুটি খুবই উজ্জ্বল।

"আবার," মহিলাটি বলল। দাসীর জোব্বার একটা কোণা মহিলাটির হাঁটুর উপর এসে পড়ছিল; তাতেই তার মুখখানি ব্যথায় কুঁচকে গেল; সুন্দর সরু, কাঁপা হাতে মহিলা জোব্বার কোণটা সরিয়ে দিল। মাত্রিয়োশা দুই হাতে জোব্বাটাকে নিজের কোলের উপর রেখে আরও কোণে সরে গেল। তার উজ্জ্বল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল। রুগ্ন স্ত্রীলোকটি তার সুন্দর কালো চোখ দুটি তুলে সাগ্রহে দাসীর কাজকর্মের উপর নজর রেখেছিল। আসনের উপর দুই হাতে ভর দিয়ে নিজেকে একটু তুলে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু শক্তিতে কুলোল না। তার মুখটা বেঁকে গেল, সারা মুখে ফুটে উঠল একটা অসহায়, ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের ভাব। "আমাকে একটু সাহায্য তো করতে পারতে!……আঃ, তোমাকে কিছু করতে হবে না! আমি একাই পারব, শুধু দয়া করে তোমার এই সব পোঁটলা-পুঁটলি, আজেবাজে জিনিস আমার পিঠের কাছে রেখ না। তুমি যা উজবুক, আমার গায়ে হাত না দিলেই ভাল ছিল!"

মহিলাটি চোখ বুজল; আবার তখনই চোখ খুলে দাসীর দিকে তাকাল। মাত্রিয়োশা তার দিকে তাকিয়ে নীচের লাল ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। রুগ্ন স্ত্রীলোকটির বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই কাশি দেখা দিল। সে মুখ ফিরিয়ে চোখ কুঁচকে দুই হাতে বুকটা চেপে ধরল। কাশি থামলে সে আবার চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইল। গাড়ি গ্রামে ঢুকল। মাত্রিয়োশা রুমালের নীচ থেকে সবল হাত দুটি বের করে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

"কি হল?" মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল।

"একটা স্টেশন ম্যাডাম।"

"আমি জানতে চাই, তুমি ক্রুশ-চিহ্ন করলে কেন?"

"একটা গীর্জা ম্যাডাম।"

রুগ্ন স্ত্রীলোকটি জানালার কাছে সরে গিয়ে ধীরে ধীরে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

গাড়িটা চলতে চলতেই সে গ্রামের বড় গীর্জাটিকে এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

দুটো গাড়িই স্টেশনে গিয়ে থামল। রুগ্ন স্ত্রীলোকটির স্বামী ও ডাক্তার অন্য গাড়ি থেকে নেমে তার কাছে এল।

নাড়িটা দেখতে দেখতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, "কেমন বোধ করছেন?"।

তার স্বামী ফরাসিতে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ গো—খুব ক্লান্ত লাগছে না তো? গাড়ি থেকে নামবে তো?"

পোটলা-পুটলি গুছিয়ে মাত্রিয়োশা এক পাশে সরে গেল, যাতে তাদের কথাবার্তা বলতে কোন বাধা না হয়।

মহিলাটি বলল, "এক রকমই আছি। আমি নামব না।"

তার স্বামী গাড়ির পাশে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে স্টেশনের দিকে চলে গেল। মাত্রিয়োশা গাড়ি থেকে নেমে কাদার মধ্যে পা টিপে টিপে গেটের দিকে দৌড়ে গেল।"

ডাক্তার তখনও গাড়ির জানালার পাশেই দাঁড়িয়েছিল; ম্লান হেসে রুগ্ন মহিলাটি বলল, "আমি অসুস্থ, তাই বলে আপনি লাঞ্চ খাবেন না তা তো হয় না।"

ডাক্তার ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে স্টেশনের সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে গেল। তখন মহিলাটি নিজের মনেই বলল, "আমাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তারা সুস্থ মানুষ, তাই আমার কথা ভাবে না। হে ঈশ্বর!"

ডাক্তারকে দেখে খুসির হাসি হেসে হাত ঘসতে ঘসতে তার স্বামী বলল, "এডোয়ার্ড আইভানভিচ, মদের পেটিটা আনতে বলেছি; এক বোতল চলবে তো?"

"না বলা তো উচিত না," ডাক্তার জবাব দিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুরু তুলে নীচু গলায় স্বামীটি জিজ্ঞাসা করল, "ওকে কেমন দেখলে?"

"আমি তো বলেছি, ইতালী পর্যন্ত তিনি যেতে পারবেন না; মস্কো পর্যন্ত যদি পেঁছতে পারেন তাহলেই আশ্চর্য হব, বিশেষত এই আবহাওয়ায়।"

চোখের উপর হাত রেখে স্বামী বলল, "এখন আমরা কি করি! ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!"

সেই সময় চাকরটা মদের পেটি নিয়ে ঘরে ঢুকলে সে বলল, "এখানে রাখ।"

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ডাক্তার বলল, "ওকে বাড়িতে রেখে আসাই উচিত ছিল।"

স্বামী বাধা দিল, "কিন্তু সেটা কি করে করব বল? তুমি তো জান, ওকে রেখে আসতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের আর্থিক অবস্থার কথা, ছেলেমেয়েদের যে রেখে যেতে হবে সে কথা, আমার ব্যবসার কথা—সবই তাকে বলেছি, কিন্তু ও কোন কথাই শুনতে চায় না। সুস্থ, সবল মানুষের মতই ও বিদেশে গিয়ে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখে। ওর যা সত্যিকারের অবস্থা তা বললে তো মরণ-আঘাত দেওয়া হত।"

"কিন্তু ভাসিলি দিমিত্রিচ, তোমার তো জানা উচিত যে সে আঘাত নেমে এসেছে। ফুসফুস ছাড়া কোন মানুষ বাঁচতে পারে না, আর ফুসফুস দুইবার জন্মে না। এটা দুঃখের কথা, কিন্তু কি করা যাবে? ওর শেষের দিনগুলি যাতে ভালভাবে কাটে সেটা দেখাই এখন তোমার-আমার কর্তব্য। এখন দরকার একজন পুরোহিত।"

"হে ঈশ্বর! কিন্তু অবস্থাটা ভাব, শেষ ধর্মানুষ্ঠানের কথা ওকে বলতে হবে। আমি বলতে পারব না, তাতে যা হয় হবে। তুমি তো জান, ও কত ভাল।"

অর্থপূর্ণভাবে মাথা নেড়ে ডাক্তার বলল, "রাস্তায় যতদিন বরফ জমে থাকবে ততদিন অপেক্ষা করে থাকার কথা তো ওকে তোমাকে বলতেই হবে; নইলে রাস্তায়ই হয় তো একটা বিপদ ঘটে যাবে।"

মাথার উপরে একটা কুর্তা ওড়াতে ওড়াতে স্টেশনের পিছন দিককার নোংরা সিঁড়িতে লাফাতে লাফাতে ওভারসিয়ারের মেয়ে হাঁক দিল, "আক্সয়ুশা, হেই আক্সয়ুশা! শার্কিন থেকে যে মহিলা এসেছে, চল্ তাকে দেখে আসি; সকলে বলছে ফুসফুসের চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়-রোগীদের কেমন দেখতে আমি কখনও দেখি নি।"

আক্সয়ুশা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল; দুজন হাত ধরাধরি করে গেট পার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে গাড়ির কাছে গিয়ে তারা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। রুগ্ন স্ত্রীলোকটি তাদের দিকে মুখ ফেরাল, কিন্তু তাদের কৌতূহল দেখে ভুরু কুঁচকে ঘুরে বসল।

তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে ওভারসিয়ারের মেয়ে বলে উঠল, "হায় ক-পাল! উনি কী সুন্দরীই ছিলেন, আর এখন দেখতে কী হয়েছেন। সত্যি, দেখলে ভয় করে। তুই দেখেছিস আক্সয়ুশা, দেখেছিস?"

আক্সয়ুশা ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁরে, খুব শুকিয়ে গেছে! চল্ আবার যাই; যেন কুয়ো থেকে জল আনতে যাচ্ছি এমনি ভাব দেখিয়ে আর একবার দেখে আসি। ভাল করে দেখবার আগেই উনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ওঁর জন্য সত্যি কষ্ট হয় মাশা!"

"আঃ, কী ভীষণ কাদারে বাবা," মাশা বলল, তারপর দুজনই দৌড়ে

গেটের দিকে চলে গেল।

পঙ্গু স্ত্রীলোকটি ভাবল, "আমাকে দেখলেও লোকে ভয় পায়। আঃ, তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাইরে যেতে হবে, তাহলেই আমি ভাল হয়ে উঠব!"

কি যেন চিবুতে চিবুতে গাড়ির কাছে এসে তার স্বামী বলল, "এখন কেমন আছ গো?"

রুগ্ন স্ত্রীলোকটি মনে মনে বলল, "সব সময় সেই একই প্রশ্ন; অথচ এখনও খেয়েই চলেছে!"

"একই রকম", সে চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল।

"দেখ, আমার আশংকা হচ্ছে এই আবহাওয়ার মধ্যে এতটা পথ যাওয়া তোমার পক্ষে খারাপ হবে; এডোয়ার্ড আইভানভিচও তাই বলছে। আমরা কি তাহলে ফিরে যাব?"

সে রেগে চুপ করে রইল।

"আবহাওয়া পাল্টাবে, রাস্তাগুলোও শক্ত হবে, তখন তোমার পক্ষে যাবার সুবিধা হবে, আর তখন আমরা সকলে এক সঙ্গেই যাব।"

"মাফ কর। আগেই যদি তোমার কথা না শুনতাম তাহলে এতদিনে আমি বার্লিনে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যেতাম।"

"দেখ সোনা, কোন উপায় ছিল না; তুমি তো জান সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এখন, তুমি যদি আর মাসখানেক অপেক্ষা কর তাহলে তুমি অনেকটা ভাল হয়ে উঠবে। ততদিনে আমিও ব্যবসাপত্রের একটা বিলি-ব্যবস্থা করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিতে পারব।"

"ছেলেমেয়েরা তো ভালই আছে; অসুস্থ তো আমি।"

"কিন্তু ভেবে দেখ, এই আবহাওয়ায় তোমার শরীর যদি পথের মাঝখানে খারাপ হয়ে পড়ে……সেখানে অন্তত তোমার বাড়িতে তো থাকবে।"

"বাড়িতে থাকব?……বাড়িতে থেকে মরব?" রুগ্ন স্ত্রীলোকটি রেগে বলল। কিন্তু "মরব" কথাটা তাকেও ভয় পাইয়ে দিল; জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে তাকাল। স্বামী চোখ নামাল, কোন কথা বলল না, রুগ্ন স্ত্রীলোকটি হঠাৎ ছোট শিশুর মত মুখটা ফোলাল, তার দুই চোখে জল ঝরতে লাগল। তার স্বামী রুমালে মুখ ঢেকে কোন কথা না বলে গাড়ির কাছ থেকে সরে গেল।

আকাশের দিকে মুখ তুলে রুগ্ন স্ত্রীলোকটি বলল, "না, আমি যাবই"; তারপর সে ফিস্‌ফিস্ করে অসংলগ্ন সব কথা বলতে শুরু করল। "হে ঈশ্বর, কিসের জন্য?" বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে দর্‌দর্ করে জল ঝরতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে সে একান্ত মনে প্রার্থনা করল, কিন্তু তার

বুকের মধ্যে সেই ব্যথা ও চাপটা রয়েই গেল। আকাশ, মাঠঘাট, রাস্তা সব কিছুই ধূসর ও নিরানন্দ; সেই একই হৈমন্তী কুয়াসা রাস্তার কাদা, কুটিরের ছাদ, গাড়ি এবং কোচয়ানদের ভেড়ার চামড়ার উপর ছড়িয়ে আছে। কোচয়ানরা গাড়ির চাকায় তেল দিচ্ছে, ঘোড়া জুতছে আর মনের সুখে প্রচণ্ডভাবে কথাবার্তা চালাচ্ছে।

॥ ২ ॥

ঘোড়াগুলো গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু কোচয়ান গাড়িতে ওঠে নি। সে কোচয়ানদের কুঁড়ের মধ্যে ঢুকল। ঘরের ভিতরটা যেমন গরম, তেমনি দম বন্ধ করা, অন্ধকার, ভ্যাপসা। সেখানে মানুষের গন্ধ, রুটি সেঁকার গন্ধ, বাঁধাকপির গন্ধ, ভেড়ার চামড়ার গন্ধ। একই ঘরে বেশ কয়েক জন কোচয়ান থাকে; রাঁধুনি স্টোভের কাছে কাজে ব্যস্ত; স্টোভের উপরে তাকের উপর ভেড়ার চামড়ায় শরীর ঢেকে একটি রুগ্ন লোক শুয়ে আছে।

কোচয়ান ঘরে ঢুকে ডাকল, "ফিয়োদর খুড়ো! হেই ফিয়োদর খুড়ো!" কোচয়ানটি যুবক, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, তার বেল্টে একটা চাবুক গোঁজা। সে ঐ রুগ্ন লোকটিকেই ডাকছিল।

একজন কোচয়ান বলল, "তোমার কি চাই ফেদিয়া? সবাই গাড়িতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"ওর বুটজোড়া আমার চাই; আমার বুটের তলায় গর্ত হয়ে গেছে," চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিয়ে যুবকটি জবাব দিল। তারপর স্টোভের কাছে গিয়ে আবার হাঁক দিল, "তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? হেই ফিয়োদর খুড়ো?"

"কি বলছ?" জবাবে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল; স্টোভের উপর থেকে লাল দাঁড়িওয়ালা একটি শুকনো মুখ বেরিয়ে এল। একটা বড়, শুকিয়ে যাওয়া, লোমে-ঢাকা ফর্সা হাত ময়লা শার্টের উপর একটা কোট চাপাল। "আমাকে একটু জল দাও ভাই; তুমি কি চাও?"

যুবকটি তাকে এক হাতা জল দিল।

তারপর ইতস্তত করে বলল, "দেখ ফেদিয়া, নতুন বুটজোড়া তো তোমার এখন লাগছে না; ওটা আমাকে দাও; তুমি তো আর এখন কোথাও যাচ্ছ না।"

চকচকে হাতাটা চেপে ধরে সেই ময়লা জলে ঝুলন্ত গোঁফটাকে ডুবিয়ে রুগ্ন লোকটি সাগ্রহে ধীরে ধীরে জলটা খেল। তার জট-পাকানো দাড়িটা নোংরা। অনেক কষ্টে বসে-যাওয়া অনুজ্জল চোখ দুটো তুলে যুবকটির

মুখের দিকে তাকাল। জল খাওয়া শেষ করে ভেজা ঠোঁট মুছবার জন্য হাতটা তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; তখন কোটের আস্তিন দিয়ে ঠোঁট মুছল। কোন রকম শব্দ না করে নাক দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে বৃদ্ধ লোকটি সোজা যুবকটির চোখের দিকে তাকাল।

যুবকটি বলল, "ইতিমধ্যেই যদি সেটা আর কাউকে দেবার কথা দিয়ে থাক, তাহলে কোন কথা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে, বাইরে সব জলে-কাদায় সপ্‌-সপ্‌, আর আমাকেও একটা কাজে বাইরে যেতে হবে; তাই ভাবলাম ফেদিয়ার বুটজোড়াই চেয়ে নেব, তার তো আর এখন ওটা লাগছে না। অবশ্য যদি তোমার নিজের দরকার থাকে তো বল।"

রুগ্ন লোকটির গলার মধ্যে একটা ঘর্‌-ঘর্‌ শব্দ হল; সে পাশ ফিরল; একটা কাশির দমকে তার দম বন্ধ হয়ে এল।

হঠাৎ রেগে উঠে রাঁধুনিটি গম্‌-গম্‌ করে বলে উঠল, "ওর দরকারে লাগবে! দু'মাস হল ও স্টোভ ছেড়ে উঠতে পারছে না! কাশতে কাশতে তো বুক ফেটে যাবার যোগাড়। তা শুনেই তো আমার পিলে চমকে ওঠে। বুট দিয়ে ও কি করবে? নতুন জুতো পরে তো আর কবরে যাবে না! অথচ একদিন ছিল, সে অনেক দিন আগে—সে পাপের জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন! আরে, কাশতে কাশতে তো ওর বুক ফেটে যাবার যোগাড় হয়। ওকে অন্য কোথাও সরানো দরকার! শুনেছি এ ধরনের লোকের জন্য শহরে হাসপাতাল আছে। ও তো সবটা জায়গা জুড়ে থাকে, তাহলে অন্যরা কি করে? চলা-ফেরার জায়গাটা পর্যন্ত নেই। আর সবাই বলে কি না ঘরটা পরিষ্কার রাখতে হবে।"

স্টেশনের ওভারসিয়ার দরজার কাছে হাঁক দিল, "হেই সেরুয়োগা! নিজের জায়গায় যাও; ভদ্রলোকরা অপেক্ষা করছেন।"

সেরুয়োগা জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই চলে যেত, কিন্তু রুগ্ন লোকটি কাশতে কাশতে যে ভাবে তাকাল তাতে মনে হল সে কিছু বলতে চায়।

কাশি থামিয়ে মিনিটখানেক শ্বাস টেনে সে বলল, "তুমি বুটজোড়া নিয়ে নাও সেরুয়োগা; শুধু আমি মরলে আমার জন্য একখানা পাথর কিনে দিও; বুঝলে?"

"ধন্যবাদ খুড়ো, তাহলে বুটজোড়া নিয়ে যাচ্ছি; আর পাথর, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কিনে দেব।"

"এই ছেলেরা, শুনলে তো?" কোন রকমে কথাটা বলেই রুগ্ন লোকটি আবার উপুড় হয়ে কাশতে লাগল।

একজন কোচয়ান বলল, "ঠিক আছে, শুনলাম। চলে চল সেরুয়োগা, নইলে ওভারসিয়ার আবার তাড়া লাগাবে। শার্কি'ন থেকে আগত মহিলাটি

অসুস্থ হয়ে পড়েছে।”

সেরুয়োগা তাড়াতাড়ি তার ছেঁড়া ও বেখাপ্পা রকমের বড় বুটজোড়া পা থেকে খুলে একটা দেরাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ফিয়োদর খুড়োর নতুন বুটজোড়া তার পায়ে ঠিক-ঠিক লেগে গেল। বুটজোড়া দেখতে দেখতে সে গাড়ির কাছে হাজির হল।

সেরুয়োগা গাড়ির বক্সে উঠে চাবুকটা হাতে নিতেই চর্বির পাত্র হাতে একজন কোচয়ান বলল, “বাঃ, কী চমৎকার বুটজোড়া! এস, চর্বি লাগিয়ে দি। তোমাকে কি এমনি দিয়ে দিল?”

উঠে দাঁড়িয়ে কোটের কোণটা ঝাড়তে ঝাড়তে সে বলল, “কেন, তোমার চোখ টাটাচ্ছে না কি?…হাই বাছাধনরা, উঠে দাঁড়াও!” চাবুকটা দোলাতে দোলাতে সে ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিতেই যাত্রী, বাক্স-পেটেরা ও বিছানাপত্র নিয়ে গাড়ি দুটো ভেজা রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে হেমন্ত কালের ধূসর কুয়াসার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই দম বন্ধ-করা কুঁড়ে ঘরে রুগ্ন কোচয়ানটি একাকি স্টোভের উপর শুয়ে রইল। অনেকবার কেশেও কোন রকম স্বস্তি না পেয়ে সে বেশ চেষ্টা করে পাশ ফিরে শুয়ে চুপচাপ পড়ে রইল। সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত সারাটা দিন কত মানুষ ঘরে এল-গেল, খাওয়া-দাওয়া করল, কিন্তু রুগ্ন লোকটির সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। রাত হলে রাঁধুনিটি একটা ভেড়ার চামড়া খুঁজতে স্টোভের উপরটা হাতড়াতে হাতড়াতে তার পায়ের উপর হাত দিল। তখন রুগ্ন লোকটি বলল, “আমার উপর রাগ করো না নাস্তাসিয়া; শিগ্‌গিরই আমি তোমার এখান থেকে চলে যাব।”

নাস্তাসিয়া জবাবে বলল, “ঠিক আছে; ঠিক আছে; আরে, সে কথা আমি বলি নি। কিন্তু তোমার কি হয়েছে খুড়ো? আমাকে খুলে বল তো।”

“আমার ভিতরটা সব যেন ক্ষয়ে গেছে। এটা যে কি তা ঈশ্বরই জানে।”

“সে কি কথা! তুমি যখন কাশ তখন কি গলা জ্বালা করে?”

“সারা শরীর জ্বালা করে। আমি মরতে বসেছি—তা ছাড়া আর কি। আঃ আঃ আঃ!” রুগ্ন লোকটি গোঙাতে লাগল।

স্টোভের উপর থেকে নামতে নামতে তাকে একটা কোট দিয়ে চাপা দিয়ে নাস্তাসিয়া বলল, “এই ভাবে পা দুটো ঢেকে রাখ।”

ঘরের মধ্যে সারারাত একটা আবছা আলো জ্বলতে লাগল। নাস্তাসিয়া ও দশটি কোচয়ান মেঝে ও দেরাজের উপর শুয়ে সরবে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল। শুধু রুগ্ন লোকটি অস্পষ্ট সুরে গোঙাতে লাগল, কাশল, স্টোভের উপর এপাশ-ওপাশ করল। সকালের দিকে সে একেবারে নিঃসাড় হয়ে গেল।

পরদিন সকালের আধো আলোয় শরীরটা টানটান করতে করতে রাঁধুনি

বলল, "রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখলাম, ফিয়োদর খুড়ো স্টোভ থেকে নীচে নেমে কাঠ কাটতে বাইরে গেল। আমাকে বলল, 'নাস্তাসিয়া, তোমার জন্যও কিছু কেটে দেব'; আর আমি বললাম, 'তুমি কেমন করে কাঠ কাটবে?' সে তখন কুড়ুলটা তুলে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি কাঠ কাটতে লাগল যে চ্যালাগুলো ছিটকে যেতে লাগল। আমি বললাম, 'সে কি, তুমি তো অসুস্থ ছিলে, তাই না?' সে বলল, 'না, আমি ঠিক আছি'; বলেই সে এমন ভাবে কুড়ুল চালাতে লাগল যে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। চীৎকার করে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল। সে কি তাহলে মারা গেছে? ফিয়োদর খুড়ো! হেই খুড়ো!'

ফিয়োদর কোন জবাব দিল না।

আর একটি কোচয়ানেরও ঘুম ভেঙে গেল। সে বলল, "হয় তো সে মারা গেছে। আমি উঠে দেখছি।"

লাল লোমে ঢাকা সরু হাতটা স্টোভের উপর থেকে ঝুলছে; হাতটা ঠাণ্ডা, ফ্যাকাসে।

কোচয়ানটি বলল, "আমি গিয়ে ওভারসিয়ারকে বলছি। মনে হচ্ছে সে মারা গেছে।"

ফিয়োদর অনেক দূর থেকে এসেছিল—তার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। ঝোপটা পেরিয়ে যে নতুন কবরখানাটা আছে পরদিন সেইখানে তাকে কবর দেওয়া হল। তারপর বেশ কয়েক দিন নাস্তাসিয়া সকলকে তার স্বপ্নের কথা, সেই যে সর্বপ্রথম ফিয়োদর খুড়োর মরার খবর জানতে পেরেছিল সে কথা বলে বেড়াতে লাগল।

॥ ৩ ॥

বসন্ত এল। শহরের ভেজা রাস্তার জমাট গোবরের স্তূপের ভিতর দিয়ে কল্‌কল্ শব্দে জলের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। সুন্দর সাজে সেজে লোকজনরা সব মনের সুখে গল্প করতে করতে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছোট ছোট বাগানের বেড়ার ওপাশে গাছে গাছে ফুলের কুঁড়ি ফুটতে শুরু করেছে, তাজা বাতাসে ডালপালাগুলি সড়্‌সড়্ করে নড়ছে। সর্বত্র দৌড়-ঝাপ, ফোটা ফোটা জলের শব্দ…চড়ুই পাখিরা কিচির-মিচির করছে, ছোট ছোট পাখা মেলে ফুরুৎ ফুরুৎ উড়ছে। রোদ্দুরে, বেড়ার ধারে, গাছে-গাছে, বাড়িতে-বাড়িতে—সর্বত্রই চলা আর চলা। আকাশে, মাটিতে, মানুষের মনে—সর্বত্রই যৌবন আর খুসির মেলা। বড় রাস্তায় একটা

বাড়ির সামনে অনেক খড় জমা করা রয়েছে; বাড়ির মধ্যে দূরপথযাত্রিণী একটি মুমূর্ষু স্ত্রীলোক শুয়ে আছে।

তার ঘরের বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বামী ও একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক; চোখ নীচু করে সোফায় বসে আছে পুরোহিত, তার হাতে চাদরে জড়ানো একটা কি যেন। ঘরের এক কোণে রুগ্ন স্ত্রীলোকটির মা একটা নীচু চেয়ারে বসে ভীষণভাবে কাঁদছে। একটি দাসী পরিষ্কার খোয়া রুমাল হাতে নিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সে চাইলেই সেটা তার হাতে দেবে। আর একটি দাসী মহিলাটির মাথায় কি যেন মালিশ করতে করতে তার টুপি-পরা পাকাচুলভর্তি মাথায় বাতাস করছে।

দরজায় তার পাশে দাঁড়ানো বয়স্কা স্ত্রীলোকটিকে স্বামী বলল, "খৃস্ট তোমার সহায় হোন; তোমাকে ও খুব বিশ্বাস করে, ওর সংগে কি ভাবে কথা বলতে হয় সেটা তুমি খুব ভালই জান; ভিতরে গিয়ে ওর সংগে বেশ ভালভাবে কথাবার্তা বল।" সে দরজাটা খুলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু তার বোন তাকে বাধা দিল, হাতের রুমালে বার কয়েক চোখ মুছে মাথা নাড়তে লাগল।

"এবার চল; মনে হচ্ছে, আমি যে কাঁদছিলাম সেটা এখন আর বোঝা যাচ্ছে না," এই কথা বলে সে নিজেই দরজা খুলে রোগিণীর ঘরে ঢুকল।

স্বামীটি খুবই উত্তেজিত; দেখে মনে হচ্ছে, সে একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছে। বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে গিয়েও তার থেকে বেশ কয়েক পা দূরেই থেমে গেল, তারপর ঘরময় একটু পায়চারি করে পুরোহিতের কাছে গেল। তার দিকে তাকিয়ে আকাশের দিকে ভুরু দুটি তুলে পুরোহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার ঈষৎ ধূসর ঘন দাড়িও উপরের দিকে উঠে আবার নেমে এল।

"হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!" স্বামীটি বলল।

"কিছুই করবার নেই," পুরোহিত বলল; সেই সংগে আবারও তার ভুরু ও দাড়ি একবার উঠল, আবার নামল।

হতাশ হয়ে স্বামীটি বলল, "আর ওর মা এখানে বসে আছেন। তিনি তো এটা কিছুতেই মানবেন না। তিনি ওকে ভালবাসেন, এত ভালবাসেন যে···আমি কিছু জানি না। ফাদার, দেখুন আপনি যদি ওকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ ঘর থেকে নিয়ে যেতে পারেন।"

পুরোহিত উঠে বৃদ্ধা মহিলাটির কাছে গেল।

বলল, "এ কথা খুবই সত্য যে মাতৃ-হৃদয়ের গভীরতার পরিমাপ কেউ করতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়।"

বৃদ্ধার মুখটা হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল; সে পাগলের মত কাঁদতে লাগল।

বৃদ্ধা কিছুটা শান্ত হলে পুরোহিত বলতে শুরু করল, "ঈশ্বর করুণাময়। আপনাকে বলছি, আমার পল্লীতে একটি লোক অসুস্থ হয়েছিল, মারিয়া দিমিত্রেভ্নার চাইতেও খারাপ অসুখ, কিন্তু একটি সাধারণ মজুর গাছ-গাছড়া দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাকে সারিয়ে তুলেছিল। সেই মজুরটি এখন মস্কোতে আছে। ভাসিলি দিমিত্রেভিচকে আমি বলেছি—তাকে দিয়ে একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অন্তত রোগিণী তাতে কিছুটা সান্ত্বনা তো পাবে। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে সবই হতে পারে।"

বৃদ্ধা বলে উঠল, "না, ও বাঁচবে না; হায়, এর চাইতে যদি আমি যেতে পারতাম; কিন্তু ঈশ্বর ওকেই নেবে।"

রোগিণীর স্বামী দুই হাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে ছুটে চলে গেল।

করিডরে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটি ছ'বছরের ছেলের; তার চাইতেও বয়সে ছোট একটি মেয়ের পিছন পিছন সে জোরে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

"ছেলেমেয়েদের তাদের মায়ের কাছে নিয়ে যাব কি?" নার্স জিজ্ঞাসা করল।

"না, তিনি ওদের দেখতে চান না। তাঁর কষ্ট হয়।"

বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছেলেটি এক মুহূর্ত দাঁড়াল, তারপরই পা ঠুকে হৈ-হৈ করতে করতে দৌড় দিল।

বোনকে দেখিয়ে ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, "জান বাপি, ওকে আমি কালো ঘোড়া বানিয়েছি।"

ওদিকে পাশের ঘরে বোনটি তখন রোগিণীর বিছানার পাশে বসে খুব কৌশলের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তার কাছে মৃত্যুর কথাটা উত্থাপনের চেষ্টা করছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্তার একটি ওষুধ তৈরি করছে।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "দেখ সোনা, আমার মনকে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করো না। আমাকে ছেলেমানুষ ভেব না। আমি খৃস্টান! সব বুঝি! আমি জানি, আর বেশী দিন বাঁচব না; আমার স্বামী যদি আরও আগে আমার কথা শুনত তাহলে এতদিনে আমি ইতালিতে থাকতাম এবং খুব সম্ভব ভাল হয়েও যেতাম। তাকে সকলেই তাই বলেছিল। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই; হয় তো এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি জানি, আমরা সকলেই মহাপাপী; কিন্তু ঈশ্বরের করুণায় আমি বিশ্বাস করি, তিনি সকলকেই ক্ষমা করবেন—সব্বাইকে! নিজেকে বুঝতে আমি চেষ্টা করি! আমিও মহাপাপ করেছি। কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুঃখও তো অনেক পেয়েছি। সব দুঃখকে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে চেষ্টাও করেছি…"

তখন বোনটি বলল, "তাহলে ফাদারকে পাঠিয়ে দেব কি সোনা? ধর্মা-

নুষ্ঠানের পরে তুমি অনেক স্বস্তি বোধ করবে।" রোগিণী সম্মতি জানিয়ে মাথা নীচু করল।

অস্পষ্ট স্বরে বলল, "আমি পাপী, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।"

বোনটি বেরিয়ে গিয়ে পুরোহিতকে ইঙ্গিতে ডাকল।

অশ্রুসিক্ত চোখে সে স্বামীটিকে বলল, "ও তো দেবদূত!" স্বামীটি কাঁদিতে লাগল। পুরোহিত ঘরে ঢুকল। বৃদ্ধা মহিলাটি তখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। বাইরের ঘরে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পাঁচ মিনিট পরে পুরোহিত বেরিয়ে এল। গায়ের চাদরটা খুলে চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিল।

বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উনি এখন অনেক শান্ত হয়েছেন; আপনাদের দেখতে চাইছেন।"

বোন ও স্বামী ঘরে ঢুকল। পবিত্র ছবির দিকে তাকিয়ে রোগিণী নীরবে কাঁদছে।

স্বামী বলল, "তোমাকে অভিনন্দন জানাই সোনা।"

দুই সরু ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে রোগিণী বলল, "ধন্যবাদ! এখন আমি কত সুখী। কী যে অবর্ণনীয় আনন্দ আমার হচ্ছে! ঈশ্বর কী করুণাময়! তাই নয় কি? তিনি কি করুণাময় সর্বশক্তিমান নন?" দুই অশ্রুসিক্ত চোখে আকুল প্রার্থনায় আবার সে পবিত্র ছবির দিকে তাকাল।

তখনই হঠাৎ কি যেন তার মনে পড়ে গেল। ইসারায় স্বামীকে কাছে ডাকল। দুর্বল বিরক্ত গলায় বলল, "আমি যা বলি তা তো তুমি কোন দিন করবে না।" গলাটা বাড়িয়ে একান্ত অনুগতভাবে স্বামী তার কথাগুলি শুনল।

"তুমি কি বলতে চাও সোনা?"

"কতবার তোমাকে বলেছি এই ডাক্তারগুলো কিছু জানে না; অনেক সাধারণ লোক আছে যারা রোগ সারাতে পারে···ফাদার আমায় বললেন··· একজন মজুর···তাকে ডেকে আন।"

"কার জন্য সোনা?"

"হায় ভগবান, এ লোক কিছু বোঝে না!"

রোগিণী ভুরু কুঁচকে মুখ ঢাকল। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা তুলে নিল। নাড়ি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। স্বামীর দিকে ইসারা করল। সেটা লক্ষ্য করে রোগিণী সভয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। বোনটি মুখ ফিরিয়ে কেঁদে উঠল।

রোগিণী বলল, "কেঁদ না; নিজেদের দুঃখ দিও না, আমাকেও না; তাতে আমার মনের শান্তি আরও নষ্ট হয়ে যায়।"

তার হাতে চুমো খেয়ে বোন বলল, "তুমি একটি দেবদূত!"

"না, এখানে চুমো খাও, শুধু মৃতদেরই হাতে চুমো খায়। হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!"

সেই সন্ধ্যায়ই রুগ্ন স্ত্রীলোকটি মারা গেল। মস্ত বড় বাড়ির বসবার ঘরে শবাধারে তার মৃতদেহ শুইয়ে দেওয়া হল। বড় ঘরটির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল; ঘরের মধ্যে একা বসে ডিয়েকন নাকি সুরে তালে তালে ডেভিডের স্তোত্রাবলী পাঠ করতে লাগল। লম্বা রুপোর মোমদানিতে রাখা মোমবাতির উজ্জ্বল আলো মৃতার ম্লান ভুরুর উপর পড়ল; হাঁটু ও গোড়ালির কাছে শবাবরণের শক্ত ভাঁজগুলো ভয়ানকভাবে ঠেলে উঠেছে। কথার অর্থ না বুঝেই ডিয়েকন সুর করে পড়ে চলেছে; স্তব্ধ ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে কণ্ঠস্বর ও মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরের কোন ঘর থেকে মাঝে মাঝে শিশুদের কণ্ঠস্বরও তাদের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে।

স্তোত্র-পাঠকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "তোমার মুখের আবরণ উন্মোচন করলে, আর সকলে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তাদের নিঃশ্বাস তুমি গ্রহণ করলে, তারা মারা গেল, যে মাটি থেকে তারা এসেছিল সেই মাটিতেই মিশে গেল। তোমার আত্মাকে তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করালে—তাদের সৃষ্টি হল, তারা নতুন করে পৃথিবীতে এল। এই মুহূর্তে এবং চিরকাল ঈশ্বরের জয় হোক।"

মৃতার মুখখানি কঠিন ও গম্ভীর। কিছুতেই তার ঠাণ্ডা ভুরু ও দৃঢ়-বদ্ধ ঠোঁট নড়ল না। সকলেই তাকে দেখছে। কিন্তু এখন কি সে ওই বড় বড় কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারছে?

॥ ৪ ॥

এক মাস পরে সেই মৃত স্ত্রীলোকটির কবরের উপর একটি পাথরের স্মৃতি-স্তম্ভ গড়ে উঠল। কিন্তু কোচয়ানটির কবরের উপর একখানি পাথরও চাপান হল না; সেই স্তূপের উপরে উজ্জ্বল, সবুজ ঘাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না; একটি মানুষের অতীত অস্তিত্বের সেইটিই একমাত্র নির্দেশক।

স্টেশনের রাঁধুনিটি একদিন বলল, "দেখ সেরুয়োগা, তুমি যদি ফিয়োদর-এর জন্য একটা পাথর না কেন তাহলে তোমার পাপ হবে। এত দিন শীত-কালের দোহাই দিয়েছ, কিন্তু এখন কথা রাখছ না কেন? আমি তো তখন কাছেই ছিলাম। ইতিমধ্যেই সে একদিন এসে তোমার কাছে পাথর চেয়ে গেছে; এখনও যদি সেটা না কেন তাহলে আবার সে আসবে, তোমার ঘাড় মটকাবে।"

সেরয়োগা জবাব দিল, "আরে, আমি কি বলেছি যে কিনব না? যখন কথা দেয়েছি তখন নিশ্চয় কিনব; রূপোর দেড় রুবল দিয়ে পাথর কিনব। আমি ভুলি নি, তবে তুমি তো জান সেটা অনেক দূর থেকে আনতে হবে। শহরে যাবার একটা সুযোগ এলেই কিনে আনব।"

একটি বুড়ো কোচয়ান বলল, "কোন রকমে একটা ক্রুশও বসিয়ে দিতে পারবে, নইলে খুবই লজ্জার কথা হবে। তার বুটজোড়া তো তুমিই পরেছ।"

"ক্রুশ কোথায় পাব? জ্বালানি কাঠ কেটে তো আর ক্রুশ বানানো যায় না?"

"কি বাজে কথা বলছ? জ্বালানি থেকে আবার ক্রুশ হয় নাকি। একদিন খুব ভোরে উঠে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও, তাহলেই একটা ক্রুশ কেটে আনতে পারবে। একটা আস্পেন বা ঐ ধরনের গাছ কাটলেই হবে। আর তাতে একটা সুন্দর কাঠের স্মৃতি-স্তম্ভও হবে। আর না হয় তো তোমাকে গিয়ে বন-রক্ষককে একপাত্র ভদ্‌কা খাওয়াতে হবে। যখন-তখন যে কোন কাজের জন্য তো আর কেউ তাকে ভদ্‌কা খাওয়ায় না। এই তো সেদিন গিয়ে আমি একটা বেশ ভাল গোছের কাঠ কেটে নিয়ে এলাম, কেউ কিচ্ছু বলল না।"

খুব ভোরে তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি এমন সময় সেরয়োগা তার কুড়ুলটা নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। চারদিকে একটা ঠাণ্ডা এক-রঙা শিশিরের চাদর বিছানো, তার উপর সূর্যের আলো পড়েছে। পূব দিকটা ধীরে ধীরে আলো হয়ে আসছে, তার ম্লান আলো মেঘে-ঢাকা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। নীচের একটি ঘাস বা গাছের মগডালের একটা পাতাও নড়ছে না। শুধু মাঝে মাঝে গাছ-গাছালির ফাঁকে পাখির ডানার শব্দে অথবা মাটিতে খস্ খস্ শব্দে জঙ্গলের শান্ত স্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে। সহসা বনের প্রান্তে একটা বিচিত্র শব্দ, কোন প্রাকৃতিক শব্দ নয়, উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। কিন্তু আবার সেই শব্দটা শোনা গেল; একটি নিশ্চল গাছের গুঁড়ির কাছে বার বার সেই শব্দটা শোনা যেতে লাগল। একটা গাছের মাথা বিচিত্র ভঙ্গীতে কাঁপতে লাগল; তার পাতাগুলি যেন ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে; একটা মুখর পাখি তার শাখায় আশ্রয় নিয়েছিল; সেটাও বার দুই গাছটাকে প্রদক্ষিণ করে শিস দিতে দিতে ও লেজ নাড়তে নাড়তে আর একটা গাছে গিয়ে বসল।

কুড়ুলের একঘেয়ে শব্দ হতে লাগল; ছোট ছোট সরস কাঠের টুকরোগুলো শিশির-ভেজা ঘাসের উপর ছিটকে পড়তে লাগল; প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু মড়্-মড়্ শব্দ উঠল। গাছটার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, মাথাটা নীচু করল, সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথাটা উঁচু করল, শিকড়গুলো ব্যথায় কাঁপতে লাগল। মুহূর্তের জন্য সব চুপচাপ, কিন্তু

আবার গাছটা নীচু হতে শুরু করল ; গুঁড়িতে একটা মড়্-মড়্ শব্দ উঠল, শাখা-প্রশাখাগুলি পাতাসমেত কাঁপতে লাগল, তারপর গাছটা সশব্দে পড়ে গেল, তার মাথা লুটিয়ে পড়ল ভেজা মাটিতে। কুড়ুলের শব্দ ও পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। মুখর পাখিটা শিস্ দিতে দিতে আরও উঁচুতে উড়ে গেল। যে ডালে সে তার পাখা গুটিয়ে বসেছিল, তার পাতাগুলি কাঁপতে কাঁপতে এক সময় নিথর হয়ে গেল। গাছগুলি যেন মনের সুখে খোলা আকাশে তাদের নিশ্চল ডালপালাগুলিকে মেলে ধরল। স্বচ্ছ মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে সূর্যের প্রথম কিরণরাশি আকাশে ছড়িয়ে পড়ল, তীব্রবেগে নেমে এল মাটিতে। কুয়াসা পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল ; সবুজ ঘাসের উপর শিশির-বিন্দুগুলি ঝিকমিক করতে লাগল ; স্বচ্ছ মেঘের দল সাদা হয়ে নীলাভ আকাশের বুকে দ্রুত ভেসে যেতে লাগল। পাখিগুলো ঝোপে-ঝাড়ে উড়তে উড়তে যেন পাগল হয়ে খুসির গান শুরু করে দিল। গাছের আগায় সরস পাতাগুলি মনের সুখে শান্তভাবে ফিস্ ফিস্ করতে লাগল, আর জীবন্ত গাছের ডালপালাগুলি ভূপাতিত মৃত গাছটার উপর ধীরে ধীরে রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে দুলতে লাগল।

১৮৫৯

সর্বতশ্চক্ষু

God sees the truth, but waits

ভ্লাদিমির শহরে এক বণিক যুবক বাস করত। তার নাম আইভান দিমিত্রিচ আকসিয়নভ। দুটো দোকান ও একটা বাড়ির মালিক সে। লালচে রঙ, কোকড়ানো চুল, ছিমছাম চেহারা। তাছাড়া সে গাইতে পারত, আর হাসি-ঠাট্টায় ছিল পটু। আরও ছোট বয়সে সে মদ খেত প্রচুর মাতাল হয়ে ঝগড়াঝাটিও করত। কিন্তু বিয়ে করার পর থেকে মাঝে মধ্যে ছাড়া মদ খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল।

একদা গ্রীষ্মকালে নিঝ্নির মেলায় যাত্রার প্রাক্কালে পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তার স্ত্রী বলল, "আইভান দিমিত্রিচ, আজ তুমি যেয়ো না। কাল রাতে তোমাকে নিয়ে একটা বড় খারাপ স্বপ্ন আমি দেখেছি।"

আকসিয়নভ হেসে বলল, "তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে মেলায় গিয়ে আমি খুব মজা লুটে বেড়াব ?"

সে বলল, "না, কিন্তু কিসের যে ভয় তা আমি নিজেই ঠিক জানি না। কিন্তু বড়ই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমি দেখেছি। শহর থেকে ফিরে এসে তুমি যখন টুপিটা খুললে আমি যেন দেখলাম তোমার মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে।"

আকসিয়নভ আবার হেসে উঠল।

"—তার মানে মেলায় আমার খুব লাভ হবে। তুমি দেখে নিও, আমার কপাল এবার খুলে যাবে, আর তোমার জন্যও দামী উপহার নিয়ে আমি বাড়ি ফিরব।"

তারপর সবাইকে চুম্বন করে সে যাত্রা করল।

মাঝপথে আর একজন পরিচিত বণিকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। রাত কাটাবার জন্য দুজনে একই সরাইখানায় উঠল। একসঙ্গে চা খেয়ে পাশাপাশি ঘরে ঘুমুতে গেল। আকসিয়নভ বেশীক্ষণ ঘুমনো পছন্দ করত না। মাঝরাতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পথ চলতে সুবিধে হবে বলে সে গাড়োয়ানকে ডেকে ঘোড়া জুড়তে বললো। তারপর মালিকের ঘরে গিয়ে বিলপত্র চুকিয়ে যাত্রা করল।

প্রায় চল্লিশ ভার্স্ট (১ ভার্স্ট=১১৬৬ গজ) যাবার পর সে আবার থামল। ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে সরাইখানার সামনের বারান্দায় একটা ঘুম লাগিয়ে খাবার সময় ভিতরের বারান্দায় গিয়ে বসল। এক সামোভার চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা গিটার নিয়ে বাজাতে লাগল।

হঠাৎ ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে একটা "ত্রয়কা" এসে সরাইখানার সামনে থামল। গাড়ি থেকে নামল একজন "সিনোভ্নিক" ও দুজন সৈনিক। লোকটি আকসিয়নভের কাছে গিয়ে জানতে চাইল সে কে, কোথা থেকে এসেছে। আকসিয়নভ যথাযথ জবাব দিয়ে জানতে চাইল, তিনি চা খাবেন কিনা। কর্মচারীটি কিন্তু একের পর এক প্রশ্ন করেই চলল: গত রাত্রে সে কোথায় ঘুমিয়েছিল, সে একা ছিল না একজন বণিক সঙ্গে ছিল, যাত্রা করবার আগে সকালে সে-বণিকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কিনা, এত ভোরে সে কেন যাত্রা করেছিল, এমনি সব প্রশ্ন। এই ভাবে জেরা করায় আকসিয়নভ্ বেশ বিস্মিত হলেও সে যা যা জানত সবই বলল। তারপর শুধাল, "এ সব খবর আপনি জানতে চাইছেন কেন? আমি চোরও নই, ডাকাতও নই। নিজের ব্যবসার কাজে আমি চলেছি। আমাকে এত সব প্রশ্ন করবার তো কারণ নেই।"

সিনোভ্নিক সৈনিক দুজনকে ডেকে বলল, "আমি একজন ইস্প্রাভনিক। তোমাকে এ সব প্রশ্ন করছি, কারণ যে বণিকের সঙ্গে তুমি কাল রাত কাটিয়েছ তাকে গলা-কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তোমার জিনিসপত্র দেখাও। এই, খানাতল্লাসি করু।"

তারা ঘরের ভিতর ঢুকে তার স্যুটকেস ও থলে নিয়ে এল। সেগুলোর মুখ খুলে সব খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ ইস্‌প্রাভনিক থলের ভিতর থেকে একখানি ছুরি বের করে চেঁচিয়ে উঠল, "এ কার ছুরি?"

আর্কসিয়নভ চোখ তুলে তাকাল। একখানি রক্তমাখা ছোরা তার থলের ভিতর থেকে বার করা হয়েছে। দেখে সে খুব ভয় পেল।

ইস্‌প্রাভনিক প্রশ্ন করল, "ছুরিতে রক্ত এল কোত্থেকে?"

আর্কসিয়নভ জবাব দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সব কথা তার গলায় আটকে গেল।

—আমি···আমি জানি না···আমি···ছুরি···আমি···ছুরি···আমার নয়···"

ইস্‌প্রাভনিক বলল, "বণিককে আজ সকালে তার বিছানায় খুন হওয়া অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না কারণ শোবার কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল এবং সে ছাড়া একমাত্র তুমিই ভিতরে ছিলে। এখন এই রক্তমাখা ছুরি পাওয়া গেল তোমার থলেয়। তাছাড়া, তোমার চোখ-মুখই তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। বল, কেমন করে তাকে খুন করেছ, আর তার কাছ থেকে কত টাকা চুরি করেছ?"

আর্কসিয়নভ দিব্যি করে বলল একাজ সে করে নি, একসঙ্গে চা খাবার পরে সে-বণিকের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি, তার কাছে শুধু তার নিজস্ব আট হাজার রুবল আছে, আর ছুরিটা তার নয়। কিন্তু তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, মুখ বিবর্ণ হল, এমনভাবে ভয়ে সে কাঁপতে লাগল যেন সে প্রকৃতই দোষী।

তার চোখের জল এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইস্‌প্রাভনিক সৈন্যদের আদেশ দিল হাত-কড়া পরিয়ে তাকে বাইরের গাড়িতে তুলে দিতে। তার সব জিনিসপত্র এবং টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে পার্শ্ববর্তী শহরের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার চরিত্র সম্পর্কে ভ্লাদিমিরে তদন্ত করা হল। সেখানকার সব অধিবাসী ও ব্যবসায়ীরা একবাক্যে বলল যে, যদিও ছোটবেলায় সে মদ খেত ও গোলমাল করত, তবু তার মত ভাল লোক হয় না।

বিচার আরম্ভ হল, এবং শেষ পর্যন্ত খুন ও কুড়ি হাজার রুবল চুরির অপরাধে তার শাস্তি হয়ে গেল।

তার স্ত্রী শোকে ভেঙে পড়ল। কি যে করবে ভেবে পেল না। ছেলে-মেয়েরা সব ছোট, বাচ্চাটা তো একেবারে কোলে। যে শহরে তার স্বামীকে বন্দী করে রেখেছে, সবাইকে নিয়ে সে সেখানে গেল। প্রথমে তো তাকে ঢুকতেই দিল না। শেষে কারা-কর্তৃপক্ষকে অনেক অনুনয়-বিনয় করায় তারা তাকে তার স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। একদল চোরের সঙ্গে স্বামীকে কয়েদীর পোষাকে হাতে পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় দেখে বেচারী মূর্ছিত হয়ে মাটিতে

পড়ে গেল! কিছুক্ষণ পরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বামীর পাশে বসে বাড়ির সব কথা বলল, আর স্বামীর কথাও সব জিজ্ঞাসা করল। সেও তাকে সব কথা খুলে বলল।

স্ত্রী বলল, "তাহলে কি হবে?"

"আমরা জারের কাছে দরখাস্ত করব। একটা নিরপরাধ লোককে তারা মেরে ফেলতে পারে না।"

স্ত্রী বলল, "জারের বরাবর দরখাস্ত সে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেটা তাঁর কাছে পেঁছে দেওয়া হয় নি।"

আকসিয়নভ কিছুই বলল না। মাটির দিকে চোখ রেখে বসে রইল। স্ত্রী বলল, "তাহলে দেখ, আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমার সব চুল সাদা হয়ে গেছে সেটা বাজে কথা নয়। চেয়ে দেখ, দুঃখে তোমার চুল এরই মধ্যে সাদা হতে আরম্ভ করেছে। তোমার যাওয়া উচিত হয় নি।"

তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে স্ত্রী বলল, "ভানিয়া, প্রিয়তম, তোমার স্ত্রীকে সত্যি কথা বল। এ কাজ কি তুমি কর নি?"

"তুমিও সন্দেহ করছ?" দুহাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে উঠল।

রক্ষী এসে বলল, এবার তাদের যেতে হবে। আকসিয়নভ শেষ বারের মত তার পরিবারকে বিদায় দিল।

স্ত্রী চলে গেলে আকসিয়নভ সব কথা ভাবতে লাগল। যখন তার মনে পড়ল স্ত্রীও তাকে সন্দেহ করেছে এবং সে বণিককে খুন করেছে কিনা এ প্রশ্নও করেছে, তখন সে আপন মনে বলে উঠল:

"স্পষ্টতঃ একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত সত্যকে জানেন। একমাত্র ঈশ্বরের দিকে চেয়ে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পাবার জন্যই অপেক্ষা করা উচিত।"

সেই মুহূর্ত থেকে সে দরখাস্ত পাঠানো বন্ধ করে দিল, আশা করা ছেড়ে দিল, এবং একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করতে লাগল।

তার শাস্তি হল চাবুকের ঘা আর কঠোর পরিশ্রম। প্রথমে তাকে চাবুক মারা হল। পরে চাবুকের ঘা শুকিয়ে গেলে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সাইবেরিয়ায়।

সাইবেরিয়ায় সে ছাব্বিশ বছর কারাদণ্ড ভোগ করল। মাথার চুল বরফের মত সাদা হয়ে গেল। মুখের দাড়িও লম্বা, পাতলা ও সাদা হয়ে গেল। কোথায় গেল তার হাসিখুসি ভাব। শরীর কুঁজো হয়ে গেল, চুপচাপ চলাফেরা করে, কম কথা বলে, হাসে না, শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

জেলে থাকতে আকসিয়নভ জুতো তৈরী করতে শিখল। সেই উপার্জনের পয়সা দিয়ে 'সাধু-সন্তদের জীবনী' কিনল এবং জেলখানার মধ্যে যখনই

একটু আলো আসত সেই আলোয় বইখানি পড়ত। ছুটির দিনে সে কারাগারের গীর্জায় গিয়ে 'সুসমাচার' পড়ত আর সমবেত সংগীতে যোগ দিত।

বিনয়-নম্র ব্যবহারের জন্য কারাগারের কর্মচারীরা আর্কাসিয়নভকে পছন্দ করত। কয়েদীরা তাকে সম্মান করত, কেউ ডাকত 'ঠাকুর্দা,' কেউ ডাকত 'সাধুবাবা'। কারা-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন দরখাস্ত পাঠাবার দরকার হলে কয়েদীরা আর্কাসিয়নভকেই পাঠাত কর্মচারীর কাছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে তার কাছেই যেত বিচারের জন্য।

আর্কাসিয়নভের বাড়ি থেকে কেউ তাকে চিঠিপত্র লিখত না। সে জানতও না তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা বেঁচে আছে কি না।

একদিন কারাগারে কয়েকটি নতুন কয়েদী আমদানী করা হল। সন্ধ্যা-বেলায় পুরোনো কয়েদীরা নতুনদের ঘিরে বসল এবং তারা কোন্ শহর বা গ্রাম থেকে এসেছে, কেন তাদের নির্বাসন হয়েছে, এমনি সব প্রশ্ন করতে লাগল। নতুন কয়েদীদের কাছেই একটা উঁচু লম্বা বাংকে বসে আর্কাসিয়নভ বিষণ্ন মনে তাদের কথাবার্তা শুনছিল।

নতুন কয়েদীদের মধ্যে একজন ছিল বেশ লম্বা দশাসই চেহারার বৃদ্ধ। বয়স প্রায় ষাট। ছাঁটা পাকা দাড়ি। সে তার গ্রেপ্তারের গল্প বলছিল।

"দেখ ভাইসব, অকারণেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সরাইখানার চত্বর থেকে একজন ডাকহরকরার স্লেজ-গাড়ির একটা ঘোড়া শুধু আমি নিয়েছিলাম। আমি ওটা চুরি করেছি এই বলে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করল। অবশ্য আমি ওদের বলেছিলাম যে তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার জন্যই আমি ঘোড়াটা নিয়েছিলাম, কাজ হয়ে গেলেই ফিরিয়ে দিতাম। তবু তারা বলল, না, তুমি ওটা চুরি করেছিলে; তবু তো তারা জানতও না কোথা থেকে কেমন করে আমি চুরি করেছিলাম। অবশ্য এমন কাজ আমি এর আগে করেছি যার জন্য অনেক আগেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল; কিন্তু তখন তারা আমাকে ধরতেই পারে নি।"

একজন কয়েদী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"ভ্লাদিমির থেকে। স্থানীয় ব্যবসাদার আমরা। আমার নাম মাকার, উপাধি সেমেনোভিচ্।"

আর্কাসিয়নভ মাথা তুলে প্রশ্ন করল, "সেমেনোভিচ, ভ্লাদিমিরের আর্কাসিয়নভ বণিকদের কোন খবর জান? তারা কি বেঁচে আছে?"

"তাদের কথা কে না জানে। তারা তো মস্ত ধনী লোক, যদিও তাদের বাবা আছে সাইবেরিয়ায়। নিশ্চয় সেও আমাদেরই মত একজন পাপী। আর তুমি দাদু, তুমি এখানে কি জন্যে এসেছ?"

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা করতে ইচ্ছা করছিল না আকসিয়নভের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "আমার পাপের জন্য এই ছাব্বিশটা বছর আমি কঠোর পরিশ্রমে কাটিয়েছি।"

মাকার সেমেনোভিচ জিজ্ঞাসা করল, "কি পাপ?"

"এই শাস্তির উপযুক্ত পাপ।" এর বেশী কিছু বলতে চাইল না। অন্য কয়েদীরা নতুনদের কাছে সব খুলে বলল। বলল, "কে একজন জনৈক ব্যবসায়ীকে খুন করে ছুরিটা আকসিয়নভের থলেয় রেখে দিয়েছিল, আর সেই জন্যই আকসিয়নভকে ভুল করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।"

এই কথা শুনে মাকার বড় বড় চোখ করে আকসিয়নভের দিকে তাকিয়ে দুই হাতে হাঁটু বাজাতে বাজাতে বলে উঠল, "আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! তুমি কত বুড়ো হয়ে গেছ দাদু!"

সকলে যখন জিজ্ঞাসা করল এতে সে এতটা বিস্মিত হল কেন, আকসিয়নভকে এর আগে সে কোথায় দেখেছে, তখন কিন্তু সে কোন জবাব দিল না। শুধু বলল, "ভাইসব, মানুষের সঙ্গে কখন যে কি ভাবে দেখা হয়! সবই দৈবের ব্যাপার!"

কথাগুলো শুনে আকসিয়নভের তৎক্ষণাৎ মনে হল, এ লোকটা হয়তো আসল খুনী কে তা জানে। তাই সে বলল, "আচ্ছা সেমেনোভিচ, ঘটনাটা কি তুমি এর আগে শুনেছ, বা আমাকে কখনও দেখেছ?"

"আগে কখনও শুনেছি কি না? আরে বাপ্‌রে, এ কথা তো তখন জগৎময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। তবে সে তো অনেক কাল আগেকার কথা, তখন শুনলেও এখন অনেক কথাই ভুলে গেছি।"

আকসিয়নভ তবু প্রশ্ন করল, "সেই বণিককে সত্যি কে খুন করেছিল সে কথা কি কখনও শুনেছ?

মাকার সহাস্যে বলল, "যার থলের মধ্যে ছুরিটা পাওয়া গিয়েছিল নিশ্চয়ই সেই খুন করেছিল। কেউ যদি ছুরিটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েও থাকে তাহলে অন্তত ডাকাতির দায়ে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হত না। তাছাড়া, ছুরিটা তোমার ঘাড়ে চাপাতে হলে তো খুনিকে তোমার বিছানার পাশে গিয়েও দাঁড়াতে হত, কেমন কি না? আর সে ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয়ই তার শব্দ শুনতে পেতে?"

মাকারের কথা শোনামাত্রই আকসিয়নভের সন্দেহ হল, মাকারই আসল খুনী। সে তখনই উঠে সেখান থেকে চলে গেল।

সারারাত সে ঘুমুতে পারল না। অস্থিরতা তাকে পিষে ধরল। অতীতের সব ছবি তার মনের সামনে ভেসে উঠল। প্রথমে ভেসে উঠল তার স্ত্রীর ছবি—ঠিক যেমনটি সে দেখেছিল মেলায় যাবার আগে বিদায় নেবার সময়। সে যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল—সেই চোখ, সেই মুখ, তার হাসি ও কথা

যেন কানে বাজতে লাগল। তারপর দেখতে পেল ছেলেমেয়েদের; ঠিক যেমনটি তখন তারা ছিল—ছোট ছোট শিশু সব, একজনের গায়ে ছোট ফার-কোট, একেবারে ছোটটা মায়ের দুধ খাচ্ছে। তারপর দেখতে পেল নিজের ছবি—যুবক, উৎসাহে ভরা। মনে পড়ল যে সরাইখানায় সে গ্রেফতার হয়েছিল তার বারান্দায় বসে তার সেই গীটার বাজানো। কী রকম হাসিখুসি ছিল সে তখন। তারপর সেই জায়গার কথা মনে পড়ল যেখানে তাকে চাবুক মারা হয়েছিল—সেই চাবুকওয়ালা, সমবেত জনতা, শৃঙ্খল, অন্য সব কয়েদী, জেলখানার ছাব্বিশ বছরের জীবন, বার্ধক্য—সব। নৈরাশ্যের আঘাত তাকে এমন করে ধাক্কা দিল যে সে নিজেকেই মেরে ফেলতে উদ্যত হল।

মনে মনে বলল, এ সবের জন্য দায়ী ওই শয়তানটা। বস্তুত সেই মুহূর্তে মাকার সেমেনোভিচের উপর তার এত ক্রোধ জেগেছিল যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জন্মের মত সব শোধ নিতে পারত।

সারা রাত সে প্রার্থনা করল, তবু মন শান্ত হল না। পরদিন সে একবারও মাকারের কাছে গেল না, তার দিকে তাকালও না। আরও দু সপ্তাহ পার হয়ে গেল। রাতে আকসিয়নভ্ ঘুমুতে পারে না। অস্থিরতা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে সে যে কি করবে তাই বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন রাত্রে সে যখন জেলখানার ব্যারাকের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল তখন দেখতে পেল, কয়েদীদের ব্যবহৃত লম্বা বাংকগুলোর একটার নীচে থেকে খানিকটা ধুলো-বালি ছিটকে পড়ছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ বাংকের নীচ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মাকার সেমেনোভিচ্। ভীত চোখে তাকাল আকসিয়নভের দিকে।

পাছে তার দিকে তাকাতে হয় তাই আকসিয়নভ্ যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু মাকার তার হাতটা ধরে ফেলে বলল, সে দেয়ালের নীচে একটা পথ খুঁড়ছে। রোজ সে খোঁড়া মাটিটা জুতোর ভিতরে করে বাইরে নিয়ে যায় এবং কাজে যাবার সময় সেগুলো পথের মধ্যে ফেলে আসে।

সে আরও বলল, "এ কথা কাউকে বল না। তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কিন্তু যদি বলে দাও, বুঝতেই তো পারছ তাহলে তোমাকে খুন না করে আমি ছাড়ব না।"

শয়তানটার দিকে চেয়ে আকসিয়নভের সারা শরীর রাগে কাঁপতে লাগল। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "এখান থেকে পালিয়ে আমার কোন লাভ নেই, আর তুমিও আমাকে আবার খুন করতে পারবে না। সে তো তুমি অনেক আগেই করেছ। আর, খবরটা জানাব কি না সেটা নির্ভর করে ঈশ্বরের নির্দেশের উপর।"

পরদিন, কয়েদীদের যখন কাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সৈনিকদের

নজরে পড়ল যে মাকার সেমেনোভিচ্ রাস্তার উপর মাটি ছড়াচ্ছে। ফলে জেল-খানা সার্চ করা হল এবং একটা গর্ত আবিষ্কার করা হল।

গভর্নর এলেন। একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে গর্ত খুঁড়েছে? সকলেই অস্বীকার করল। যারা জানত তারাও মাকারের নাম বলল না, কারণ সকলেই জানত এ-হেন অপরাধের জন্য মাকারকে চাবুকে আধমরা করে ফেলা হবে।

গভর্নর তখন আকসিয়নভের দিকে তাকালেন। তিনি জানতেন আক-সিয়নভ সত্যবাদী। তাই বললেন, "বুড়ো, যারা সত্য কথা বলে তুমি তাদের একজন। ঈশ্বর সাক্ষী করে আমাকে বল এ কাজ কে করেছে।"

মাকার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে মনে হবে সে যেন কিছুই জানে না। তার দুটো চোখ গভর্নরের দিকে। আকসিয়নভের দিকে সে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

আকসিয়নভের ঠোঁট এবং হাত কাঁপছে। অনেকক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারল না। মনে মনে ভাবল: যে আমার জীবনটা নষ্ট করেছে, আমি কেন তাকে রক্ষা করব, তাকে ক্ষমা করব? আমার যন্ত্রণার দাম সে দিক। কিন্তু যদি আমি বলে দিই, তারা ওকে চাবুক মারবে। তাছাড়া আমার সন্দেহ যদি ভুল হয়? যাই হোক না কেন, আমার দুঃখ এতে কমবে কি?"

গভর্নর আবার বললেন, "সত্য কথা বল বুড়ো। কে গর্ত খুঁড়েছে?"

আকসিয়নভ এক মুহূর্ত মাকারের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, "হুজুর, আমি বলতে পারব না। ঈশ্বর আমাকে সে নির্দেশ দিচ্ছেন না, কাজেই আমি বলব না। আপনার যা খুশি করুন। আমি আপনার অধীন।"

গভর্নর অনেক ভয় দেখালেন, কিন্তু আকসিয়নভ আর কিছুই বলল না। কাজেই গর্ত কে খুঁড়েছে তাও বার করা গেল না।

সেদিন রাতে আকসিয়নভের চোখে সবে ঘুম এসেছে, এমন সময় শব্দ শুনে সে বুঝতে পারল কেউ যেন এসে বাংকের উপরে তার পায়ের কাছে বসল। অন্ধকারেও সে মাকারকে চিনতে পারল, বলল, "আমার কাছে তুমি কি চাও? ওখানে বসেছ কেন?"

মাকার জবাব দিল না। আকসিয়নভ একটু উঠে আবার বলল, "কি চাও তুমি? এখান থেকে চলে যাও, নইলে সৈন্যদের ডাকব।"

মাকার একটু ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি বলল, "আইভান, আমাকে ক্ষমা কর!"

"কিসের ক্ষমা?" আকসিয়নভ প্রশ্ন করল।

"আমিই সেই বণিককে খুন করে ছুরিটা তোমার ঝোলায় রেখে দিয়ে-ছিলাম। তোমাকেও খুন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাইরে একটা আওয়াজ হওয়ায় ছুরিটা তোমার থলেতে ঢুকিয়ে দিয়ে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাই।"

আকসিয়নভ কোন কথা বলল না। কি বলবে তার জানা নেই। মাকার বাংক থেকে নেমে মেঝেতে মাথা ঠুকে বলল, "আইভান, আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! আমি স্বীকার করব যে আমি সেই বণিককে খুন করেছি। তাহলেই ওরা তোমাকে ক্ষমা করবে। তুমি বাড়িতে যেতে পারবে।"

আকসিয়নভ বলল, "তোমার পক্ষে এ কথা বলা সোজা, কিন্তু আমার যা ভোগ তা তো ভুগেছি। তাছাড়া কোথায় আমি যাব আজ?...আমার স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেমেয়েরা আমাকে ভুলে গেছে। আমার যাবার কোন জায়গা নেই।"

মাকার সেমেনোভিচ্ তবু উঠল না। মেঝেতে মাথা ঠুকে বলতে লাগল, "আইভান, আইভান, ক্ষমা কর! ওদের চাবুকের ঘা আমার যত না লেগেছে তার চেয়ে বেশী লাগছে এখন তোমার দৃষ্টি। এখনও আমার প্রতি তোমার করুণা আছে; তবু তুমি বলনি—এ কথা ভাবলে...খৃস্টের দোহাই, আমাকে ক্ষমা কর, এই হতভাগাকে ক্ষমা কর!"

কথা বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। তাকে কাঁদতে দেখে আকসিয়নভও কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন! কে জানে হয়তো আমি তোমার চেয়েও শতগুণ খারাপ!"

তখন অকস্মাৎ তার অন্তর শান্ত হল। বাড়ির মায়া কেটে গেল। কারাগার ছেড়ে যাবার ইচ্ছাও আর রইল না। শুধু রইল শেষের দিনের ভাবনা।

আকসিয়নভ যাই বলুক, মাকার সেমেনোভিচ্ তার দোষ স্বীকার করল। তবু যখন আকসিয়নভের বাড়ি ফিরে যাবার সরকারী হুকুম এল, সে আর তখন ইহজগতে নেই।

১৮৭২

ককেসাস-এর বন্দী

A Prisoner in the Caucasus

॥ ১ ॥

ঝিলিন নামক একজন অফিসার ককেসাস-এ সেনাবাহিনীতে কাজ করত।

একদিন সে বাড়ি থেকে চিঠি পেল। চিঠিটা তার মায়ের; মা লিখেছে: "আমি বুড়ি হয়ে যাচ্ছি, মরবার আগে আমার আদরের ছেলেকে

আর একবার দেখে যেতে চাই। বাড়ি এসে আমাকে বিদায় জানাও, ও কবর দাও; তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমার আশীর্বাদ নিয়ে আবার চাকরিতে ফিরে যেয়ো। কিন্তু আমি তোমার জন্য একটি মেয়ে দেখেছি; মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সৎ, এবং তার কিছু সম্পত্তিও আছে। তাকে যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে তাকে বিয়ে করে বাড়িতে থেকে যেতেও পার।"

ঝিলিন বিষয়টা ভেবে দেখল। সত্যি, বৃদ্ধ মহিলাটির স্বাস্থ্য খুবই তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছে; হয় তো তাকে জীবিত দেখবার আর একটা সুযোগ সে নাও পেতে পারে। তার যাওয়াই ভাল; আর মেয়েটি যদি ভাল হয় তাহলে তাকে বিয়ে করতেই বা আপত্তি কি?

কাজেই সে কর্ণেলের কাছে গেল, ছুটির ব্যবস্থা করল, সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিল, বিদায়-ভোজ হিসাবে সৈনিকদের চার বাল্‌তি ভদ্‌কা খাওয়াল, এবং যাত্রার জন্য তৈরি হল।

ককেসাস-এ তখন যুদ্ধ চলেছে। দিনে বা রাতে রাস্তাঘাট কোন সময়ই নিরাপদ নয়। কোন রুশ যদি কখনও ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটে দুর্গ ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে যায় তাহলে তাতাররা তাকে হয় মেরে ফেলে নয় তো পাহাড়ের ভিতরে নিয়ে যায়। তাই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাত্রীদের এক জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় পেঁছে দেবার জন্য প্রতি সপ্তাহে একদল সৈনিক এক দুর্গ থেকে পরবর্তী দুর্গ পর্যন্ত দল বেঁধে যাবে।

তখন গ্রীষ্মকাল। সকাল হতেই একটা মাল-গাড়ি দুর্গের কাছে হাজির হল; সৈনিকরা দল বেঁধে বেরিয়ে এল; সকলে যাত্রা শুরু করল। ঝিলিন একটা ঘোড়ায় চাপল; তার মালপত্র নিয়ে একটা গাড়ি মাল-গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলল। তাদের ষোল মাইল পথ যেতে হবে। মাল-গাড়িটা ধীর গতিতে চলেছে; সৈনিকরা মাঝে মাঝে থামছে; হয় কোন গাড়ির একটা চাকা খুলে গেল, নয় তো একটা ঘোড়া চলতে চাইছে না; তখন সকলকেই অপেক্ষা করতে হয়।

সূর্য দেখে বোঝা গেল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে; কিন্তু তখনও তারা অর্ধেক পথও পার হতে পারে নি। পথটা ধুলোয় ভরা ও গরম, সূর্য থেকে আগুন ঝরছে, কোথাও কোন আশ্রয়ও নেই: চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর—রাস্তার ধারে একটা গাছ নেই, একটা ঝোপ নেই।

ঝিলিন আগে আগে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে; মাল-গাড়িটা এসে পৌঁছবার জন্য সে একটু থামল। তখন পিছন থেকে একটা শিঙা-ধ্বনির সংকেত সে শুনতে পেল: তাদের দলটা আবার থেমেছে। তাই সে

ভাবতে লাগল : "আমি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাই না ? আমার ঘোড়াটা ভাল ; তাতাররা যদি আক্রমণ করেই আমি জোর কদমে চলে যেতে পারব। না কি অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ ?"

বসে বসে এই সব ভাবছে এমন সময় কস্তিলিন নামক একজন বন্দুকধারী অফিসার ঘোড়ায় চড়ে সেখানে হাজির হল। বলল :

"চলে এস ঝিলিন, আমরা দুজনেই চলে যাই। অবস্থা ভয়ংকর ; একে খাবার নেই, তায় ভীষণ গরম। আমার শার্টটা ভিজে জবজব করছে।"

কস্তিলিন মজবুত, ভারী গড়নের মানুষ ; তার লাল মুখ বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। ঝিলিন একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বন্দুকে গুলি ভরা আছে তো ?"

"হ্যাঁ, তা আছে।"

"তাহলে চল ; কিন্তু একটা শর্ত, দুজন এক সঙ্গে থাকব।"

তখন তারা প্রান্তরের ভিতরকার পথ ধরে এগিয়ে চলল। দুজনে কথা বলছে, আর দুদিকেই নজর রাখছে। চারদিকেই অনেক দূর পর্যন্ত নজরে আসছে। কিন্তু সমতল প্রান্তরটা পার হবার পরে রাস্তাটা দুটো পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ঝিলিন বলল : "চল, ওই পাহাড়ের উপরে উঠে চারদিকটা একবার দেখে নেই, নইলে আমরা বুঝবার আগেই তাতাররা হয়তো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।"

কিন্তু কস্তিলিন জবাব দিল : "তার কি দরকার ? এগিয়ে চল।"

ঝিলিন অবশ্য একমত হল না।

সে বলল, "না ; ইচ্ছা হলে তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি গিয়ে চারদিকটা দেখে আসি।" ঘোড়ার মুখ বাঁ দিকে ঘুরিয়ে সে পাহাড়ে উঠে গেল। ঝিলিন-এর ঘোড়াটা ছিল শিকারী জাতের ; যেন দুটো পাখায় উড়ে সেটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। (একটা দলের ভিতর থেকে বেছে বাচ্চা বয়সেই সে ওটাকে একশ' রুবল দিয়ে কিনেছিল, আর নিজেই সেটার উপরে প্রথম সওয়ার হয়েছিল।) পাহাড়ের চূড়ায় পেঁছামাত্রই সে দেখতে পেল তার থেকে একশ' গজ দূরেই প্রায় জনা ত্রিশেক তাতার দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখেই সে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু ততক্ষণে তাতাররাও তাকে দেখতে পেয়ে বন্দুক উঁচিয়ে জোর কদমে তাকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। ঘোড়ার পা যতটা জোর ছুটতে পারে ততখানি জোর কদমে নীচে নামতে নামতে ঝিলিন চেঁচিয়ে কস্তিলিনকে বলল : "তোমার বন্দুকটা বাগিয়ে ধর!"

আর মনে মনে ঘোড়াটাকে বলল : "এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর বাপধন ;

যেন হোঁচট খেয়ো না, কারণ তাহলেই দফা রফা হয়ে যাবে। একবার যদি বন্দুকের কাছে পেঁছিতে পারি, তাহলে আর আমাকে বন্দী করতে পারবে না।"

কস্তিলিন কিন্তু অপেক্ষা না করে তাতারদের দেখামাত্রই সবেগে দুর্গের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; কখনও এ পাশে কখনও ও পাশে ঘোড়াটাকে চাবুক মারতে লাগল; ধুলোর ঝড়ে ঘোড়ার লেজটা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

ঝিলিন বুঝল, অবস্থা সঙ্গীণ; বন্দুকটাও চলে গেল, এখন শুধু তলোয়ার নিয়ে সে কি করবে? পালাবার জন্য সে আশ্রয়ের দিক লক্ষ্য করে ঘোড়ার মুখ ফেরাল। কিন্তু ছ'জন তাতার তাকে বাধা দিতে ছুটে আসছে। তার ঘোড়াটা ভাল, কিন্তু তাদের ঘোড়াগুলো আরও ভাল; তাছাড়া তারা আসছে আড়াআড়ি ভাবে। ঘোড়ার লাগাম টেনে সে অন্য দিকে চালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘোড়াটা এত দ্রুত ছুটছে যে তাকে থামান গেল না; তীব্র গতিতে সে তাতারদের দিকেই ছুটে চলল। সে দেখতে পেল, একটা ধূসর রঙের ঘোড়ায় লাল-দাড়িওলা একজন তাতার বন্দুক উঁচিয়ে দাঁত বের করে হৈ-হৈ করতে করতে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ঝিলিন ভাবল, "হায়, তোমাদের আমি চিনি, তোমরা শয়তান। আমাকে জীবন্ত ধরতে পারলে গর্তের মধ্যে ফেলে চাবুক মারবে। বেঁচে থাকতে আমি ধরা দেব না!"

চেহারাটা জবরদস্ত না হলেও ঝিলিন সাহসী। তলোয়ার উঁচিয়ে সে লাল-দাড়ি তাতারটার দিকে ছুটে গেল। মনে মনে বলল: "হয় তাকে ঘোড়ায় চাপা দেব, নয় তো তলোয়ারের আঘাতে অকেজো করে দেব।"

সে যখন লোকটা থেকে এক ঘোড়ার দূরত্বে তখন পিছন থেকে একটা গুলি এসে তার ঘোড়াটার গায়ে লাগল। ঘোড়াটা ধপাস করে মাটিতে পড়ল, আর সেও ছিটকে পড়ে গেল। সে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু দুর্গন্ধ তাতারগুলো ততক্ষণ তার উপর চেপে বসে তাকে পিছ-মোড়া করে বাঁধার চেষ্টা করছে। অনেক চেষ্টায় তাদের ঠেলে ফেলে দিতেই আরও তিন জন তাতার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় ঘা দিতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে এল, সে মাটিতে পড়ে গেল। তাতাররা তাকে পাকড়াও করে জিন থেকে কিছু বাড়তি দড়ি নিয়ে তার হাত দুটো পিছনে নিয়ে তাতার-গিঁট দিয়ে ভাল করে বেঁধে ফেলল। তার মাথার টুপিটা উড়িয়ে দিল, বুটজোড়া খুলে নিল, সারা দেহে তল্লাসী চালাল, জামা-কাপড় ছিঁড়ে দিল এবং তার টাকা ও

ঘাড়টা হাতিয়ে নিল।

ঝিলিন মুখ ঘুরিয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল। বেচারি ঠিক যে ভাবে পড়েছিল তেমনি একপাশে পড়ে আছে; পা দুটো উপরের দিকে তোলা; বৃথাই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। মাথার ভিতরে একটা ফুটো হয়ে গেছে; সেখান থেকে কালো রক্ত বেরুচ্ছে; চারদিকের দু'ফুট জায়গার ধুলো রক্তে কাদা হয়ে গেছে।

একজন তাতার ঘোড়াটার কাছে গিয়ে জিনটা খুলে নিল; ঘোড়াটা তখনও পা ছুঁড়ছে দেখে একটা ছোরা বের করে তার শ্বাস-নালীটা কেটে দিল। তার গলার ভিতর থেকে একটা শিসের মত শব্দ বের হয়ে এল; একটা লাফ দিল, তারপর সব শেষ।

তাতাররা জিন ও সাজ-সরঞ্জামগুলো নিয়ে নিল। লাল-দাড়ি তাতারটা ঘোড়ায় চাপলে অন্যরা ঝিলিনকে তার জিনের পিছনে তুলে দিল। যাতে সে পড়ে না যায় সে জন্য তারা তাতারটির কোমড়ের সঙ্গে তাকে বেঁধে দিল। তারপর সকলেই পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

কাজেই সেইখানে বসে ঝিলিন এ পাশে ও পাশে দুলতে লাগল; তার মাথাটা তাতারটির দুর্গন্ধ পিঠের সঙ্গে ঠোকর খাচ্ছে। তার পেশীবহুল পিঠ ও গলা এবং পরিষ্কার-কামানো গর্দান ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। ঝিলিনএর মাথায় আঘাত লেগেছে; চোখের উপর রক্ত জমাট বেঁধে আছে; কিন্তু সে নিজে সরতে-নড়তেও পারছে না, রক্তটাও মুছে ফেলতে পারছে না। বাহু দুটো এত শক্ত করে বেঁধেছে যে তার কণ্ঠাস্থি ব্যথা করছে।

দীর্ঘ পথ তারা পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামা করল। পথে একটা নদী পড়ায় সেটাকে পার হয়ে তারা উপত্যকার ভিতর দিয়ে একটা পথে এসে পড়ল।

তারা কোন্ দিকে যাচ্ছে ঝিলিন দেখতে চেষ্টা করল; কিন্তু রক্তে তার চোখের পাতা জুড়ে আছে, কাজেই সে চোখ খুলতে পারল না।

গোধুলি নেমে এল; আর একটা নদী পার হয়ে তারা একটা পাথুরে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। এখানে ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এল; কুকুরগুলো ডাকছে। তারা একটা আউল-এ (তাতার গ্রাম) পৌঁচেছে। তাতাররা ঘোড়া থেকে নামল; তাতার ছেলেমেয়েরা এসে ঝিলিনকে ঘিরে দাঁড়াল, খুসিতে হল্লা করতে করতে তারা তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল।

তাতারটি ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দিল; ঝিলিনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে চাকরকে ডাকল। একটি নোগা (তাতার উপজাতি) সাড়া দিল। তার হনুর হাড় উঁচু, পরনে একটি মাত্র শার্ট (তাও এত ছেঁড়া যে সারা বুকটাই

খোলা)। তাতার কি যেন হুকুম করল। সে গিয়ে পা-বেড়ি নিয়ে এল; লোহার আংটা লাগানো দুটো ওক কাঠের টুকরো; একটা আংটার সঙ্গে তালা লাগানো।

তারা ঝিলিন-এর হাতের বাঁধন খুলে দিল, পায়ে বেড়ি পড়িয়ে দিল, তারপর টানতে টানতে একটা গোলাঘরের কাছে নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

ঝিলিন গিয়ে পড়ল এক গাদা সারের মধ্যে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হাতড়ে হাতড়ে একটা নরম জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল।

॥ ২ ॥

সারারাত ঝিলিন একটুও ঘুমুতে পারল না। বছরের এই সময়টাতেই রাত খুব ছোট হয়। এক সময় দেওয়ালের ফোকড় দিয়ে দিনের আলো দেখা গেল। সে উঠল; হাত দিয়ে আঁচড়ে ফোকরটাকে আরও একটু বড় করে বাইরে উঁকি দিল।

ছিদ্রের ভিতর দিয়েই সে দেখতে পেল একটা রাস্তা পাহাড় বেয়ে নেমে গেছে; ডান দিকে তাতারদের একটা কুঁড়ে ঘর, তার পাশে দুটো গাছ, চৌকাঠের কাছে একটা কালো কুকুর শুয়ে আছে, একটা ছাগল ও কতকগুলি বাচ্চা লেজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আরও দেখল, একটি কমবয়সী তাতার স্ত্রীলোক লম্বা, ঢিলে, ঝকঝকে রঙিন গাউন পরে আছে, তার নীচ দিয়ে ট্রাউজার ও উঁচু বুটও দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর একটা কোট ভাঁজ করে পেতে তার উপর একটা জল-ভরা বড় পেতলের কুঁজো নিয়ে যাচ্ছে। একটি ছোট নেড়া মাথা তাতার ছেলেকে সে হাত ধরে নিয়ে চলেছে; ছেলেটার গায়ে একটা শার্ট ছাড়া আর কিছু নেই। সহজেই ভারসাম্য বজায় রেখে স্ত্রীলোকটি চলেছে, আর তার পিঠের মাংসপেশীগুলি কাঁপছে। সে জল নিয়ে কুড়ের ভিতর ঢুকবার পরেই গত কালের সেই লাল-দাড়ি তাতারটি রেশমের পোষাক পরে বেরিয়ে এল; তার কোমরে রুপোর হাতলওয়ালা একটা ছোরা ঝুলছে, খালি পায়ে জুতো পরেছে, একটা কালো রঙের উঁচু ভেড়ার চামড়ার টুপি মাথার একেবারে পিছন দিকে পরেছে। বাইরে এসে শরীরটাকে টানটান করে সে লাল-দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। একটু দাঁড়িয়ে চাকরকে একটা হুকুম করে চলে গেল।

তারপর দুটো ছেলে ঘোড়াকে জল খাইয়ে চলে গেল। ঘোড়াগুলোর

মুখ ভেজা। কয়েকটা নেড়া-মাথা ছেলে দৌড়ে এল; পরনে ট্রাউজার নেই; গায়ে শুধু একটা শার্ট। তারা ভিড় করে গোলাঘরের কাছে এল, একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে দেয়ালের ফোকড়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। ঝিলিন হাঁক দিতেই তারা চীৎকার করে ছুটে পালাল; তাদের ছোট ছোট খোলা হাঁটুগুলো চিকচিক করে উঠল।

ঝিলিন-এর খুব তেষ্টা পেয়েছে; গলাটা শুকিয়ে গেছে; সে ভাবল: "ওরা যদি এসে আমাকে একবার দেখেও যেত!"

তখন শুনতে পেল কে যেন গোলাঘরের তালা খুলছে। লাল-দাড়ি তাতারটি ঘরে ঢুকল; তার সঙ্গে আর একটি লোক; ছোটখাট, কালো, ঝকঝকে কালো চোখ, লাল গাল, ছোট দাড়ি। মুখটা হাসিখুসি, সব সময়ই হাসছে। এই লোকটি অপর লোকটির চাইতেও দামী পোষাক পরেছে। সোনালী পাড় বসানো নীল রেশমের ফতুয়া গায়ে, কোমরে একখানি বড় রুপোর ছোরা, রুপোলি কাজ-করা লাল মরোক্কোর চটির উপর মোটা জুতো পায়, ভেড়ার চামড়ার সাদা টুপি মাথায়।

লাল-দাড়ি তাতারটি ঘরে ঢুকল, বিরক্তির সঙ্গে কি যেন বলল; দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোরাটা নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেকড়ের মত ঝিলিন-এর দিকে তাকাতে লাগল। ময়লা লোকটি অনেক বেশী চটপটে, যেন স্প্রিং-এর উপর চলছে-ফিরছে; সোজা ঝিলিনএর কাছে এসে সামনেই বসে পড়ল, ঘাড়ের উপর চাপড় মারল, ও নিজের ভাষায় অনর্গল কথা বলতে লাগল। সে দাঁত বের করল, চোখ পিটপিট করল, জিভ চুক চুক করল, আর বারবার বলতে লাগল, "ভাল রুশ। ভাল রুশ!"

ঝিলিন একটি বর্ণও বুঝতে পারল না; বলল, "জল খাব! আমাকে জল দাও!"

কালো লোকটি হেসে উঠল। 'ভাল রুশ" বলেই সে নিজের ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

ঝিলিন ঠোঁট ও হাত দিয়ে ইসারায় জানাল যে সে জল খেতে চায়।

কালো লোকটি বুঝতে পেরে হেসে উঠল। তারপর দরজার বাইরে তাকিয়ে কাকে যেন ডাকল: "দিনা!"

একটি ছোট মেয়ে ছুটে এল: বছর তেরো বয়স, একহারা চেহারা, মুখখানি কালো তাতারটির মত। বোঝা যাচ্ছে, লোকটির মেয়ে। তারও চোখ দুটি কালো, মুখখানি সুন্দর। ঢোলা আস্তিনের একটা লম্বা নীল গাউন পরেছে, কোন ঘাবরা নেই গাউনের নীচে, সামনে ও আস্তিনে লাল পাড় বসানো। পরনে ট্রাউজার ও চটি, আর চটির উপরে শক্ত উঁচু গোড়ালির জুতো। গলায় পরেছে রুশ রুপোর টাকা দিয়ে তৈরি একটা হার। মাথাটা

খালি, কালো চুল ফিতে দিয়ে বাঁধা এবং সোনালী সুতো ও রুপোর মুদ্রা দিয়ে বিনুনি করা।

তার বাবা কি হুকুম করতেই সে দৌড়ে গিয়ে একটা পিতলের জগ নিয়ে এল। জগটা ঝিলিন-এর হাতে দিয়ে এমনভাবে গুড়ি মেরে বসল যে তার হাঁটু দুটো আর মাথাটা সমান-সমান হল। সেইখানে বসে সে অবাক চোখে ঝিলিন-এর জল খাওয়া দেখতে লাগল; সে যেন একটা বুনো জন্তু।

ঝিলিন যখন খালি জগটা তাকে ফিরিয়ে দিল তখন মেয়েটি হঠাৎ একটা বুনো ছাগলের মত এমনভাবে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল যে তার বাবাও হেসে উঠল। আরও কি যেন আনবার জন্য সে তাকে পাঠিয়ে দিল। জগটা নিয়ে সে দৌড়ে চলে গেল এবং একটা গোল থালায় করে খানিকটা আটা নিয়ে এল। তারপর সেখানেই গুড়িসুড়ি মেরে বসে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

তারপর তাতাররা চলে গেল। দরজায় আবার তালা পড়ল।

একটু পরে নোগা এসে বলল: "আইদা, মনিব, আইদা!"

সেও রুশ ভাষা জানে না। ঝিলিন শুধু এইটুকু বুঝল যে তাকে বাইরে কোথাও যেতে বলা হচ্ছে।

ঝিলিন নোগা-কে অনুসরণ করল; কিন্তু খোঁড়াতে লাগল, কারণ পা-বেড়ির জন্য সে মোটেই পা ফেলতে পারছিল না। গোলাঘরের বাইরে এসে সে দেখতে পেল একটা তাতার গ্রাম, তাতে খান দশেক বাড়ি, ও ছোট গম্বুজ-ওয়ালা একটি তাতার মসজিদ। একটা বাড়ির সামনে তিনটে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে; তাদের পিঠে জিন চাপানো; ছোট ছোট ছেলেরা লাগাম ধরে আছে। কালো তাতারটি সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঝিলিনকে হাতের ইসারায় বলল তাকে অনুসরণ করতে। তারপর সে হেসে উঠল, নিজের ভাষায় কি যেন বলে ঘরে ফিরে গেল।

ঝিলিন ঘরে ঢুকল। ঘরটা ভাল; দেয়ালগুলি মাটি দিয়ে সমান করে লেপা। সামনের দেয়ালের কাছে একগাদা ঝকঝকে রঙের পালকের বিছানা পাতা রয়েছে; পাশের দেয়ালগুলিতে দামী কার্পেট ঝোলানো রয়েছে; তাতে রুপোর কাজ-করা বন্দুক, পিস্তল ও তলোয়ার আটকানো রয়েছে। একটা দেয়ালের পাশে মাটির মেঝের সমতলে একটা ছোট স্টোভ রয়েছে। মেঝেটাও ধান-মড়াইয়ের উঠোনের মত পরিষ্কার। এক কোণে অনেকটা জায়গা জুড়ে সতরঞ্চি বিছানো; তার উপর কম্বল পাতা; আর কম্বলের উপর রয়েছে লোম-ভর্তি সব আসন। এই পাঁচটি আসনে বসে আছে পাঁচটি তাতার—একজন কালো, একজন লাল-চুল ও তিনজন অতিথি। সকলেরই পায়ে ঘরের ভিতর চলবার চপ্পল, আর প্রত্যেকেরই পিছনে একটা করে তাকিয়া। তাদের সামনে

গোল থালায় সাজানো রয়েছে জোয়ারের পিঠে, বাটিতে গলানো মাখন আর এক কুঁজো বুজা বা তাতার বিয়ার। তারা হাত দিয়ে পিঠে ও মাখন খেতে লাগল।

কালো লোকটি লাফ দিয়ে উঠে হুকুম করল, ঝিলিনকে এক পাশে এনে বসানো হোক—কার্পেটের উপর নয়, খালি মাটিতে। তারপর নিজে কার্পেটের উপর বসে অতিথিদের জোয়ারের পিঠে ও বুজা পরিবেশন করল। চাকররা ঝিলিনকে এনে বসাল। সেও জুতো খুলে দরজার পাশে যেখানে অন্য জুতোগুলো ছিল সেখানে রেখে দিল, সতরঞ্জির উপর মনিবদের কাছাকাছি বসল, এবং তাদের খাওয়া দেখতে দেখতে নিজের ঠোঁট চাটতে লাগল।

তাতাররা যত খুসি খেল; সেই মেয়েটির মত লম্বা গাউন ও ট্রাউজার পরা, মাথায় রুমাল বাঁধা একটি স্ত্রীলোক এসে ভুক্তাবশিষ্ট সব কিছু নিয়ে গেল এবং একটা সুন্দর পাত্র ও একটা সরু-মুখ বদনা এনে দিল। তাতাররা হাত ধুল, তারপর হাত জোর করে হাঁটু ভেঙে বসে, চারদিকে ফুঁ দিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে একজন অতিথি ঝিলিন-এর কাছে গিয়ে রুশ ভাষায় কথা বলতে লাগল।

লাল-দাড়ি তাতারকে দেখিয়ে সে বলল, "কাজী-মহম্মদ তোমাকে গ্রেপ্তার করে এনেছে।" তারপর কালো লোকটিকে দেখিয়ে বলল, 'আর কাজী-মহম্মদ তোমাকে দিয়েছে এই আব্দুল মুরাদকে। এখন আব্দুল মুরাদই তোমার মনিব।"

ঝিলিন নীরব। তখন আব্দুল মুরাদ ঝিলিনকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বার বার বলতে লাগল, 'সৈনিক রুশ, ভাল রুশ।"

দোভাষী বলল, "সে হুকুম দিচ্ছে, তুমি বাড়িতে মুক্তি-পণ পাঠাতে লিখে দাও; টাকাটা এলেই সে তোমাকে মুক্তি দেবে।"

এক মুহূর্ত ভেবে ঝিলিন বলল, "কত মুক্তি-পণ সে চাইছে?"

তাতাররা একটু আলোচনা করল; তারপর দোভাষী বলল, "তিন হাজার রুবল।"

"না", ঝিলিন বলল, "অত আমি দিতে পারব না।"

আব্দুল লাফ দিয়ে উঠে হাত-পা নেড়ে ঝিলিন-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল; ভাবখানা এমন যেন সে তার কথা বুঝতে পারছে। দোভাষী ভাষান্তর করে দিল: "তুমি কত দেবে?"

ঝিলিন ভেবে চিন্তে বলল, "পাঁচ শ' রুবল।"

একথা শুনে তাতাররা সকলে মিলে হৈ-হৈ করতে লাগল। আব্দুল লাল-দাড়ি লোকটার দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে এত তাড়াতাড়ি কথা বলতে লাগল যে তার মুখ থেকে থুথু ছিটকে বেরুতে লাগল। লাল-দাড়ি লোকটি

শুধু চোখ কুঁচকে মুখে চুক-চুক শব্দ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তারা একটু ঠাণ্ডা হলে দোভাষী বলল, "পাঁচ শ' রুবলে তোমার মনিব মানছে না। তোমার জন্য সেই তো দু শ' দিয়েছে। কাজী-মহম্মদ তার কাছ থেকে কর্জ করেছিল, সেই টাকা বাবদ সে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। তিন হাজার রুবল! তার কমে হবে না। যদি লিখতে রাজী না হও, তোমাকে গর্তের ভিতর ফেলে চাবুক মারা হবে।"

"হুঁ!" ঝিলিন ভাবল, "ওদের যত বেশী ভয় করব ততই খারাপ হবে।"

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "কুত্তাটাকে বলে দাও, সে যদি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করে তাহলে আমি মোটেই লিখব না, আর সেও কিছুই পাবে না। তোমাদের মত কুত্তাদের আমি কোন দিন ভয় করি নি, করবও না!"

দোভাষী কথাগুলি ভাষান্তর করে দিল; তারাও আবার আলোচনা শুরু করল।

অনেক কথার কচকচানির পরে কালো লোকটি লাফ দিয়ে উঠে ঝিলিন-এর কাছে এসে বলল: "সাহসী রুশ, সাহসী রুশ!" তার পর সে হেসে দোভাষীকে কি যেন বলতেই সে জানিয়ে দিল: "এক হাজার রুবল পেলেই সে খুসি হবে।"

ঝিলিন বলল: "পাঁচ শ' রুবলের বেশী আমি দেব না। আমাকে মেরে ফেললে তুমি কিছুই পাবে না।"

তাতাররা কিছুক্ষণ কথা বলে চাকরটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে একবার ঝিলিন-এর দিকে একবার দরজার দিকে তাকাতে লাগল। পায়ে বেড়ি লাগানো একটি মজবুত, খালি পা, ছেঁড়া পোষাক পরা লোককে সংগে নিয়ে চাকরটা ফিরে এল।

ঝিলিন বিস্ময়ে ঢোক গিলল: লোকটি কস্তিলিন। তাহলে তাকেও ধরেছে। তাদের পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হল। তারাও পরস্পরের কাছে ঘটনার বিবরণ দিতে লাগল। তাতাররা চুপচাপ তাদের দেখতে লাগল। ঝিলিন তার দুর্ভাগ্যের কথা বলল; কস্তিলিনও জানাল যে, তার ঘোড়াটা থেমে গিয়েছিল; তার বন্দুকের গুলি ফস্কে গিয়েছিল এবং এই আব্দুলই তাকে গ্রেপ্তার করেছিল।

আব্দুল লাফ দিয়ে উঠে কস্তিলিন-এর দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন বলল। দোভাষী ভাষান্তর করে জানিয়ে দিল, তারা দুজন একই মনিবের সম্পত্তি, আর যে আগে মুক্তি-পণ এনে দেবে তাকেই সে আগে মুক্তি দেবে।

তারপর ঝিলিনকে বলল, "এই তো দেখ, তুমি রেগে যাচ্ছ, কিন্তু তোমার

এই বন্ধুটি কেমন শান্তশিষ্ট ; সে বাড়িতে লিখে দিয়েছে, তারা পাঁচ হাজার রুবল পাঠাবে। কাজেই তাকে ভাল খাওয়ানো হবে; তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হবে।"

ঝিলিন জবাব দিল : "আমার বন্ধু যা ইচ্ছা করতে পারে ; হয় তো সে ধনী, আমি তা নই। আমি যা বলেছি তাই হবে। ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেলতে পার—তাতে তোমাদের কোনই লাভ হবে না ; কিন্তু আমি পাঁচ শ' রুবলের বেশীর জন্য কিছুতেই লিখব না।"

তারা চুপ করে রইল। হঠাৎ আব্দুল লাফ দিয়ে উঠল, একটা ছোট বাক্স এনে তার ভিতর থেকে কালি, কলম ও এক টুকরো কাগজ বের করে ঝিলিনকে দিল ; তার ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে ইসারায় তাকে লিখতে বলল। সে পাঁচ শ' রুবল নিতেই রাজী।

ঝিলিন দোভাষীকে বলল, "একটু দেরী কর ; ওকে বল যে আমাদের ভালভাবে খাওয়াতে হবে, ভাল জামাজুতো দিতে হবে এবং দুজনকে একসঙ্গে থাকতে দিতে হবে। তাহলেই আমাদের মন ভাল থাকবে। আর আমাদের পা থেকে এই বেড়ি খুলে ফেলতে হবে।" এই কথা বলে সে মনিবের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মনিবও হাসল ; দোভাষীর কথা শুনে বলল : "আমি তাদের সব চাইতে ভাল পোষাক দেব : এমন জোব্বা আর জুতো দেব যে একেবারে বিয়ের সাজ হয়ে যাবে। তাদের রাজপুত্তুরের মত খাওয়াব, আর ইচ্ছা করলে গোলা-ঘরে তারা এক সঙ্গেই থাকতে পারবে। কিন্তু পায়ের বেড়ি খুলতে পারব না, কারণ তারা পালিয়ে যাবে। অবশ্য রাতে বেড়ি খুলে দেব।" সে লাফ দিয়ে উঠে ঝিলিন-এর কাঁধে চাপড় মারতে মারতে বলে উঠল : "তুমি ভাল, আমি ভাল!"

ঝিলিন চিঠি লিখল, কিন্তু ঠিকানাটা ভুল লিখল যাতে সেটা গন্তব্যস্থলে না পেঁছিয় ; মনে মনে ভাবল : "আমি ঠিক পালিয়ে যাব!"

ঝিলিন ও কস্তিলিনকে গোলাঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তাদের খানিকটা খড়, এক জগ জল, কিছু রুটি, দুটো পুরনো জোব্বা ও ছেঁড়া সামরিক বুট দেওয়া হল—জিনিসগুলি সবই মৃত রুশ সৈনিকদের দেহ থেকেই খুলে নেওয়া বলে মনে হয়। রাতের বেলা তাদের পা থেকে বেড়ি-গুলি খুলে দিয়ে গোলাঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল।

॥ ৩ ॥

ঝিলিন ও তার বন্ধু এইভাবে এক মাস কাটাল। মনিব সব সময়ই হেসে হেসে বলে: "তুমি আইভান ভাল! আমি আব্দুল ভাল!" কিন্তু সে তাদের খুব খারাপ খাবার দিতে লাগল: কখনও দেয় শুধু জোয়ারের মোটা পিঠে, আর কখনও বা শুধুই মাখানো কাঁচা আটা।

কস্তিলিন বাড়িতে দ্বিতীয় চিঠি লিখল; টাকার জন্য অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। দিনের পর দিন সে গোলাঘরে বসে ও ঘুমিয়ে কাটাতে লাগল; আর কবে তার টাকা আসবে সেই দিন গুণতে লাগল।

ঝিলিন জানে তার চিঠি কারও হাতে পৌঁছবে না, তাই সে আর কোন চিঠি লেখে নি। সে ভাবত: "আমাকে খালাস করবার মত এত টাকা মা কোথায় পাবে? আমি যা পাঠাতাম তাতেই তার দিন কাটত। পাঁচ শ' রুবল যোগাড় করতে হলে তার সব শেষ হয়ে যাবে। ঈশ্বর সহায় হলে আমি ঠিক পালিয়ে যাব!"

কাজেই সে পালবার মতলব ভাঁজতে লাগল।

সে শিস দিতে দিতে "আউল"-এ ঘুরে বেড়ায়; অথবা বসে বসে হাতের কাজ করে; কখনও মাটি দিয়ে পুতুল বানায়, কখনও বা গাছের ডাল দিয়ে ঝুড়ি বোনে; হাতের কাজে ঝিলিন খুব ওস্তাদ।

একদিন সে একটা পুতুল বানিয়ে তাতে নাক, হাত, পা বসিয়ে ও একটা তাতার গাউন পরিয়ে ছাদের উপর রেখে দিল। তাতার মেয়েরা যখন জল নিতে এল তখন মনিবের মেয়ে দিনা পুতুলটা দেখতে পেয়ে মেয়েদের ডাকল; তারাও কুঁজো নামিয়ে সেটা দেখে হাসাহাসি করতে লাগল। ঝিলিন পুতুলটা নামিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে দিল। তারা হাসল, কিন্তু কেউ সাহস করে এগিয়ে এল না। তখন সে পুতুলটা নামিয়ে রেখে গোলাঘরের ভিতরে চলে গেল; সেখান থেকেই দেখতে লাগল, ওরা কি করে।

দিনা দৌড়ে পুতুলটার কাছে গেল, চারদিক দেখল, তারপর সেটা তুলে নিয়ে দৌড় দিল।

সকালে দিনের আলো ফুটলে সে বাইরে তাকাল। দিনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুতুলটা নিয়ে চৌকাঠের উপর বসল। পুতুলটাকে সে লাল কাপড় দিয়ে সাজিয়েছে। সেটাকে ছোট মেয়ের মত দোলাতে দোলাতে সে একটা ঘুম-পাড়ানি গান গাইতে লাগল। একটি বুড়ি বেড়িয়ে এসে তাকে বকুনি দিল এবং পুতুলটা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল। তারপর দিনাকে তার কাজে পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু ঝিলিন আগের চাইতেও ভাল করে আর একটা পুতুল বানিয়ে দিনাকে দিল। এক সময় দিনা একটা ছোট কুঁজো এনে মাটির উপর রেখে দিল। তারপর বসে বসে ঝিলিন-এর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুঁজোটা দেখিয়ে হাসতে লাগল।

"ওকে এত খুসি দেখাচ্ছে কেন?" ঝিলিন অবাক হয়ে ভাবল। কুঁজোয় জল আছে ভেবে সে ওটা তুলে দিল। জল নয়, ওতে ছিল দুধ। দুধটা খেয়ে সে বলল: "খুব ভাল!"

দিনা কি খুসি! "ভাল আইভান, ভাল!" বলে সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাততালি দিতে লাগল। তারপর কুঁজোটা নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। সেই থেকে রোজ সে লুকিয়ে কিছুটা দুধ তাকে এনে দিত।

তাতাররা ছাগলের দুধ থেকে এক ধরনের পনির তৈরি করে; শুকোবার জন্য সেগুলোকে বাড়ির ছাদে রেখে দেয়। মেয়েটি কখনও কখনও লুকিয়ে সেই পনির ঝিলিনকে এনে দেয়। একদিন আব্দুল একটা ভেড়া জবাই করলে সে আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে খানিকটা মাংস ঝিলিনকে এনে দিল। জিনিসগুলি ছুঁড়ে দিয়েই সে পালিয়ে গেল।

একদিন খুব ঝড় উঠল। এক ঘণ্টা ধরে তুমুল বৃষ্টি হল। সব নদী ফুলে-ফেঁপে উঠল। খাঁড়িতে সাত ফুট উঁচু জল দাঁড়িয়ে গেল; তার প্রচণ্ড স্রোতে পাথরগুলোও গড়িয়ে যেতে লাগল। সর্বত্র জলের স্রোত বইতে লাগল। পাহাড়ে গুম্-গুম্ শব্দের বিরাম নেই। ঝড় থেমে গেলে গ্রামের পথে জলের স্রোত বইতে লাগল। মনিবের কাছ থেকে একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে সে একটি ছোট গোলাকার বস্তু বানাল, কাঠের টুকরো কেটে একটা চাকা তৈরি করল, আর তার দু'দিকে দুটো পুতুল বসিয়ে দিল। ছোট ছোট মেয়েরা কিছু জিনিসপত্র এনে দিল আর তাই দিয়ে সে পুতুল দুটোকে সাজাল একটি চাষী ও একটি চাষী-বৌয়ের মত করে। তারপর যথাস্থানে সে দুটিকে বেঁধে দিয়ে চাকাটাকে জলে ভাসিয়ে দিল যাতে স্রোতের টানে চাকাটা ঘুরতে থাকে। চাকাটা সত্যি ঘুরতে লাগল আর পুতুল দুটিও নাচতে শুরু করল।

সারা গ্রাম সেখানে জমায়েত হল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাতার নারী-পুরুষরা সবাই এসে জিভ চুকচুক করতে লাগল।

"আহা রুশ, আহা আইভান!"

আব্দুলের একটা ভাঙা রুশ ঘড়ি ছিল। ঝিলিনকে ডেকে জিভ চাটতে চাটতে সে ঘড়িটা তাকে দেখাল।

"আমাকে দাও; আমি এটা মেরামত করে দেব", ঝিলিন বলল।

ছুরির সাহায্যে সে ঘড়িটাকে খুলে ফেলল, অংশগুলি সাজিয়ে নিল,

তারপর আবার এমন ভাবে জুড়ে দিল যে ঘড়িটা ঠিক মত চলতে লাগল।

মনিব খুসি হয়ে তাকে একটা পুরনো শতচ্ছিন্ন জামা উপহার দিল। ঝিলিনকে সেটা নিতেই হল। রাতে অন্তত গায়ে তো ঢাকা দেওয়া যাবে।

এরপর ঝিলিন-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। দূর দূর গ্রাম থেকে তাতাররা তার কাছে আসতে লাগল ; মেরামতের জন্য কেউ আনল বন্দুক বা পিস্তল, কেউ বা আনল ঘড়ি। তার মনিব কিছু যন্ত্রপাতি তাকে দিল—সাঁড়াশি, ভ্রমর, উখো।

একদিন একটি তাতার অসুস্থ হয়ে পড়ল। সকলে ঝিলিন-এর কাছে এসে বলল, "চল, তাকে ভাল করে তোল!" ঝিলিন চিকিৎসার কিছুই জানে না, তবু সে লোকটিকে দেখতে গেল, ভাবল, "হয় তো সে এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে।"

গোলাঘরে ফিরে এসে কিছুটা জল আর বালি মিশিয়ে তাদের সামনেই ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলে অসুস্থ লোকটিকে সেই জল খেতে দিল। তার ভাগ্য ভাল, লোকটি সেরে উঠল।

ঝিলিন ক্রমে তাদের ভাষাও কিছু কিছু শিখে ফেলল ; কিছু তাতারের সঙ্গে তার পরিচয়ও হল। দরকার হলেই তারা তাকে ডাকত : "আইভান! আইভান!" অন্যরা অবশ্য তখনও তাকে সন্দেহের চোখেই দেখত, যেন সে একটা বুনো জন্তু।

লাল-দাড়ি তাতারটা ঝিলিনকে পছন্দ করত না। তাকে দেখলেই সে ভুরু কোঁচকাত, মুখ ঘুরিয়ে নিত, শাপান্ত করত। সেখানে একটি বুড়ো লোকও ছিল। সে "আউল"-এ থাকত না, কিন্তু পাহাড়ের নীচ থেকে এখানে আসত। সে যখন মসজিদে যেত তখনই ঝিলিন তাকে দেখতে পেত। লোকটি বেঁটে, তার টুপির চারদিকে ঘুরিয়ে একটা সাদা কাপড়ের পট্টি বাঁধা। তার দাড়ি ও গোঁফ সরু করে ছাঁটা, বরফের মত সাদা। ইটের মত লাল মুখটা বলীরেখায় ভরা। নাকটা বাজপাখির মত বাঁকা, ধূসর চোখ দুটো নিষ্ঠুরতায় ভরা, দুটো গজদন্ত ছাড়া আর কোন দাঁত নেই। পাগাড়িটা মাথায় বেঁধে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে নেকড়ের মত চারদিক তাকাতে তাকাতে সে পথ চলত। ঝিলিনকে দেখলেই রাগে গরগর্ করতে করতে সে অন্য দিকে চলে যেত।

বুড়ো লোকটা কোথায় থাকে দেখার জন্য ঝিলিন একদিন পাহাড় বেয়ে নেমে গেল। পথ ধরে নামতে নামতে একটা ছোট বাগানে হাজির হল। তার চারদিকে পাথরের দেয়াল। দেয়ালের পিছনে চেরি ও খুবানির গাছ; আর সমতল ছাদের একটা কুঁড়েঘর। আরও কাছে গিয়ে সে খড় ও মাটি

দিয়ে তৈরি মৌচাক দেখতে পেল; মৌমাছিরা গুণ গুণ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। বুড়ো লোকটি হাঁটু ভেঙে বসে একটা চাক নিয়ে কি যেন করছিল। সেটা দেখবার জন্য শরীরটা টান করতেই তার পায়ের বেড়িতে শব্দ হল। বুড়ো লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েই চীৎকার করে উঠে কোমর থেকে পিস্তল বের করে ঝিলিনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল; ঝিলিন কোন ক্রমে পাথরের দেয়ালের আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করল।

বুড়ো লোকটা ঝিলিন-এর মনিবের কাছে গিয়ে নালিশ করল। মনিব ঝিলিনকে ডেকে হেসে বলল, "বুড়ো লোকটার বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?"

ঝিলিন জবাব দিল, "আমি তো ওর কোন ক্ষতি করি নি। ও কি ভাবে থাকে তাই দেখতে গিয়েছিলাম শুধু।"

মনিব ঝিলিন-এর কথাগুলিই তাকে বলল।

কিন্তু বুড়ো লোকটি ভীষণ রেগে গেছে; সে হিস্‌হিসিয়ে উঠল; গজ-দন্ত দুটো বের করে ঝিলিনের দিকে ঘুসি পাকিয়ে গজর গজর করতে লাগল।

ঝিলিন তার সব কথা বুঝতে পারল না; কিন্তু এটুকু বুঝল যে সে আব্দুলকে বলছে, আউল-এ রাশিয়ানদের রাখা উচিত নয়, আর তার উচিত তাদের মেরে ফেলা। যা হোক, শেষ পর্যন্ত বুড়ো লোকটা চলে গেল।

ঝিলিন মনিবকে জিজ্ঞাসা করল, বুড়ো লোকটা কে।

মনিব বলল, "সে একজন মহাপুরুষ! সে আমাদের মধ্যে সব চাইতে সাহসী; অনেক রাশিয়ানকে সে মেরেছে। এক সময় সে খুব ধনী ছিল। তার তিনটি বৌ ও আটটি ছেলে ছিল। সকলে এক গ্রামেই বাস করত। তারপর রাশিয়ানরা এসে গ্রামটা ধ্বংস করে দিল, তার সাতটা ছেলেকে মেরে ফেলল। শুধু একটা ছেলে বেঁচে ছিল, সেও রাশিয়ানদের হাতে ধরা দিল। বুড়ো লোকটিও গিয়ে ধরা দিল এবং রাশিয়ানদের সঙ্গে তিন মাস কাটাল। সেই সময় পার হলে সে তার ছেলেকে খুঁজে পেল, নিজের হাতে তাকে খুন করল, তারপর পালিয়ে চলে এল। তারপরই সে যুদ্ধ করা ছেড়ে দিল; আল্লার কাছে দোয়া মাঙতে মক্কা গেল; সেই জন্যই তো সে পাগড়ি পরে। যে মক্কায় যায় লোকে তাকে বলে "হাজী", আর সেই পাগড়ি পরে। সে তোমাদের দেখতে পারে না। সে আমাকে বলল তোমাকে মেরে ফেলতে। কিন্তু তোমাকে আমি মারতে পারি না। তোমার জন্য আমি টাকা দিয়েছি; তাছাড়া, তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি আইভান। তোমাকে মারা তো দূরে কথা, যদি কথা না দিতাম তাহলে তোমাকে চলে যেতেও দিতাম না।" সে হেসে উঠল; রুশ ভাষায় বলল, "তুমি আইভান ভাল; আমি আব্দুল ভাল!"

॥ ৪ ॥

এই ভাবে ঝিলিন একটি মাস কাটাল। দিনের বেলা সে আউল-এর ভিতর ঘুরে বেড়ায়, অথবা কোন হাতের কাজ করে, কিন্তু রাতের বেলা সারা আউল যখন নিস্তব্ধ হয়ে আসে তখন সে গোলাঘরের মেঝে খুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু পাথরের মেঝে খোঁড়া খুব সহজসাধ্য নয়; তবু উখোটা দিয়ে সে কাজ চালিয়ে গেল, এবং শেষ পর্যন্ত দেয়ালের নীচে এমন একটা গর্ত করল যার ভিতর দিয়ে গলে যাওয়া যায়।

মনে মনে ভাবল, "শুধু যদি এখানকার জমির মাপ-জোকটা আর কোন্ দিকে যেতে হবে সেটা জানতে পারতাম! কিন্তু কোন তাতারই তো সে কথা আমাকে বলে দেবে না।"

কাজেই একদিন মনিব বাড়ি থেকে দূরে কোথাও গেলে সেই সুযোগে খাবার পরেই সেও বেরিয়ে পড়ল—গ্রাম ছাড়িয়ে ওই পাহাড়টায় উঠে চারদিকটা একবার দেখে আসবে। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মনিব সর্বদাই ছেলেকে হুকুম দিয়ে যায় ঝিলিন-এর উপর নজর রাখতে, সে যাতে দৃষ্টির বাইরে যেতে না পারে। কাজেই ছেলেটা এসে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "যেয়ো না! বাবার নিষেধ আছে। তুমি যদি না ফের, তাহলে আমি প্রতিবেশীদের ডাকব।"

ঝিলিন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল; বলল, "আমি বেশী দূরে যাচ্ছি না—শুধু ওই পাহাড়টায় চড়তে চাই। একটা ওষুধ খুঁজব—তাতে লোকের রোগ সারবে। ইচ্ছা হয় তো তুমিও সঙ্গে এস। এই বেড়ি পায়ে কি আমি দৌড়ে পালাতে পারি? কালই তোমাকে একটা তীর-ধনুক বানিয়ে দেব।"

এই ভাবে ছেলেটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দু'জনে গেল। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চূড়াটা খুব দূরে মনে হয় নি, কিন্তু পায়ে বেড়ি নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু ঝিলিনকে তো হাঁটতেই হবে, না হেঁটে কেমন করে সে চূড়ায় উঠবে। চূড়ায় বসে জমির অবস্থানটা সে ভাল করে লক্ষ্য করল। দক্ষিণ দিকে একটা গোলাঘর ছাড়িয়ে যে উপত্যকাটা রয়েছে সেখানে একদল ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে, আর তার নীচেই আর একটা আউল দেখা যাচ্ছে। সেটা ছাড়িয়ে আরও খাড়া একটা পাহাড়, তারপর আরও একটা। পাহাড় দুটোর মাঝখানের নীল জায়গাটা হল জঙ্গল; সেটাও ছাড়িয়ে আরও দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় উঠে গেছে। সব চাইতে উঁচু পাহাড়টা চিনির মত সাদা বরফে ঢাকা; আর একটি বরফ-ঢাকা চূড়া অন্য সবগুলোকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পূবে এবং পশ্চিমেও পাহাড়ের সারি, আর তারই খাঁজে খাঁজে আউল-এর ধোঁয়া উঠছে। সে

ভাবল, "হায়, এ সবই তো তাতারদের দেশ।" তখন সে রাশিয়ার দিকটায় মুখ ফেরাল। সে দেখল, পাহাড়ের নীচে একটা নদী, বাগান-ঘেরা একটা আউল যেখানে সে থাকে। সে দেখতে পেল, ছোট ছোট পুতুলের মত মেয়েরা নদীর পারে বসে কাপড় কাচছে। আউল ছাড়িয়ে একটা পাহাড়; দক্ষিণ দিককার পাহাড়ের চাইতে নীচু; সেটা ছাড়িয়ে গাছপালায় ঢাকা আরও দুটো পাহাড়; তাদের মাঝখানে একটা নীলাভ সমতল জায়গা, আর সেই প্রান্তর পেরিয়ে দূরে—অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ধোঁয়ার মেঘ। ঝিলিন মনে করতে চেষ্টা করল, সে যখন দুর্গের ভিতর বাস করত তখন সূর্য কোন্ দিকে উঠত আর কোন্ দিকে অস্ত যেত। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল এতে আর কোন ভুল নেই: ঐ প্রান্তরেই আছে রুশ দুর্গ। পালাবার পরে ঐ দুটো পাহাড়ের ভিতর দিয়েই তাকে পথ খুঁজে চলতে হবে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সাদা, বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলো রাঙা হয়ে উঠল; কালো পাহাড়গুলো হয়ে উঠল গাঢ় কাল; পাহাড়ের খাঁজ থেকে কুয়াসা উঠে আসছে, আর যেখানে রুশ দুর্গটা আছে বলে তার অনুমান সূর্যাস্তের আলোয় সেই উপত্যকাটা জুড়ে যেন আগুন জ্বলছে। ঝিলিন খুব ভাল ভাবে তাকাল। চিমনির ধোঁয়ার মত কিছু যেন সেই উপত্যকার মধ্যে কাঁপছে বলে মনে হল। সে নিশ্চিত হল, রুশ দুর্গটা ওখানেই আছে।

অনেক দেরী হয়ে গেছে। মোল্লাদের আজান শোনা যাচ্ছে। সকলেই ঘরে ফিরছে, গরুগুলো ডাকছে, ছেলেটি বার বার বলছে, "বাড়ি চল!" কিন্তু ঝিলিন-এর ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না।

অবশেষে তারা ফিরে গেল। ঝিলিন ভাবতে লাগল, "ঠিক আছে, রাস্তা যখন চিনেছি, এবার পালাবার সময় হয়েছে।" সেই রাতেই পালাবার কথা সে ভাবল। অন্ধকার রাত—চাঁদ ক্ষীণ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত সেদিন সন্ধ্যায় তাতাররা ঘরে ফিরে এল। সাধারণত তারা গবাদি পশু নিয়ে খোস মেজাজে ফিরে আসে। কিন্তু সেদিন তাদের সঙ্গে কোন গবাদি পশু ছিল না। তারা বয়ে আনল একটি তাতারের মৃতদেহ—লাল-দাড়ির ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। বিষণ্ণ মুখে তারা ফিরে এল, মৃতদেহ কবর দিতে সমবেত হল। ঝিলিনও সেখানে গেল।

কোন শবাধার ছাড়াই এক খণ্ড কাপড়ে মৃতদেহটি ঢেকে তারা গ্রামের বাইরে নিয়ে গেল এবং একটা গাছের নীচে ঘাসের উপর শুইয়ে দিল। মোল্লা এবং বুড়ো লোকটিও এল। টুপির চারদিকে কাপড় জড়িয়ে, জুতো খুলে তারা মৃতদেহের কাছে হাঁটু ভেঙে সকলে পাশাপাশি বসে পড়ল।

সকলের সামনে মোল্লা : তার পিছনে এক সারিতে পাগড়ি-মাথায় তিনজন বৃদ্ধ, তাদের পিছনে অন্য সব তাতাররা। সকলেই চোখ নীচু করে নীরবে বসে রইল। এই ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলে মোল্লা মাথা তুলে বলল : 'আল্লাহ্!' এই একটি মাত্র কথাই সে বলল ; তারপরই সকলে আবার চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারা স্থির হয়ে বসে রইল, নিশ্চল, নিঃশব্দ।

পুনরায় মোল্লা মাথা তুলে বলল, "আল্লাহ্!" আর সকলেই আবৃত্তি করল : "আল্লাহ্! আল্লাহ্!" তারপর আবার সব চুপ।

মৃতদেহ অচল হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে ; সকলেই এমন নিশ্চল হয়ে বসে আছে যেন তারাও মৃত। একজনও নড়ছে না। বাতাসে গাছের পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তখন মোল্লা আবার তার প্রার্থনা উচ্চারণ করলে সকলে উঠে দাঁড়াল। মৃতদেহটিকে হাত দিয়ে তুলে ধরে একটা গর্তের কাছে নিয়ে গেল। সাধারণ গর্ত নয়, গর্তটা করা হয়েছে আচ্ছাদনবিশিষ্ট একটি ঘরের মত করে। হাত-পা-ধরে মৃতদেহটিকে ধীরে ধীরে সেই গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে উপবেশনের ভঙ্গীতে যুক্ত-করে তাকে মাটির নীচে ঠেলে দেওয়া হল।

নোগা কিছু কাঁচা ঘাস-পাতা নিয়ে এলে সেগুলোকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি মাটি দেওয়া হল ; তারপর মাটিটাকে সামান করে বিছিয়ে দিয়ে কবরের মাথার দিকে একটা পাথরকে খাড়া করে বসিয়ে দেওয়া হল। তারপর তারা পা দিয়ে মাটিটাকে চেপে দিয়ে কবরের পাশে আবার সারি দিয়ে বসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

অবশেষে তারা উঠে দাঁড়াল ; "আল্লাহ্! আল্লাহ্! আল্লাহ্!" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লাল-দাড়ি তাতারটা বুড়ো লোকটিকে টাকা দিল ; তারপর সেও উঠে দাঁড়াল, একটা চাবুক হাতে নিয়ে তিনবার নিজের কপালে ঠুকে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন সকালে ঝিলিন দেখল, লাল তাতারটি আরও তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঘোটকীকে গ্রামের বাইরে নিয়ে চলেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে গিয়ে লাল-দাড়ি তাতার তার জোব্বা খুলে ফেলে আস্তিন গুটিয়ে শক্ত হাত দুটি বের করল। তারপর একটা ছোরা বের করে শাণ-পাথরে সেটাকে শাণ দিল। অন্য তাতাররা ঘোটকীটার গলাটা উঁচু করে ধরল আর সে তার গলাটা কেটে ধড়টা মাটিতে ফেলে দিল, এবং বড় বড় হাতে তার ছাল-চামড়া তুলে নিল। স্ত্রীলোক ও মেয়েরা এসে তার নাড়িভুঁড়ি ও পেটের ভিতরটা ধুয়ে ফেলে পরিষ্কার করল। ঘোটকীটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে মাংসগুলি কুঁড়ে ঘরে

নিয়ে যাওয়া হল এবং লাল তাতারের বাড়িতে অন্ত্যেষ্টি-ভোজসভায় সারা গাঁয়ের লোক জড় হল।

তিন দিন ধরে সকলে সেই মাংস আর বুজা খেল, মৃতের জন্য প্রার্থনা করল। সব তাতাররা সেখানেই থেকে গেল। চতুর্থ দিন খাবার সময় ঝিলিন দেখল, তারা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ঘোড়া আনা হল, তারা তৈরি হয়ে নিল, আর জনা দশেক লোক (লাল তাতারও তাদের একজন) ঘোড়ায় চেপে চলে গেল; কিন্তু আব্দুল বাড়িতেই থেকে গেল। সবে শুক্ল পক্ষের শুরু, কাজেই রাতটা এখনও অন্ধকার।

ঝিলিন ভাবল, "আঃ! আজ রাতেই পালাবার উপযুক্ত সময়।" কথাটা সে কস্তিলিনকে বলল; কিন্তু কস্তিলিন ভরসা পেল না।

বলল, "কেমন করে পালাব? আমরা তো রাস্তাও চিনি না।"

"আমি রাস্তা চিনি," ঝিলিন বলল।

কস্তিলিন বলল, "তা চিনলেও এক রাতে তো আমরা দুর্গে পৌঁছতে পারব না।"

ঝিলিন বলল, "তা যদি না পারি, বনের মধ্যে ঘুমিয়ে নেব। এই দেখ, আমি কিছু পানির যোগাড় করে রেখেছি। এখানে থেকে ঘুরে বেরিয়ে লাভ কি? তারা যদি তোমার মুক্তি-পণ পাঠায় তো ভাল কথা, কিন্তু ধর যদি টাকাটা তারা যোগাড় করতে না পারে তাহলে? তাতাররা এখন রেগে আছে, কারণ রাশিয়ানরা তাদের একজনকে মেরে ফেলেছে। তারা আমাদের মেরে ফেলবার কথাও বলছে।"

কস্তিলিন ভাবতে লাগল।

"ঠিক আছে, চল পালাই," সে বলল।

॥ ৫ ॥

ঝিলিন গর্তের মধ্যে ঢুকল। গর্তটাকে একটু বড় করল যাতে কস্তিলিনও ঢুকতে পারে। সারা আউল নিশুতি হওয়া পর্যন্ত তারা বসে রইল।

সব চুপচাপ হয়ে গেলে ঝিলিন দেয়ালের নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চুপি চুপি কস্তিলিনকে ডাক দিল, "এস!" কস্তিলিনও হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল, কিন্তু একটা পাথরে তার পা লেগে ঠক্ করে শব্দ হল। মনিবের একটা বিচ্ছু কুকুর ছিল; গায়ে ফুটি-ফুটি দাগ; নাম উল্যাশিন। ঝিলিন কিছুদিন থেকেই তাকে খাইয়ে-পরিয়ে বশ করে রেখেছিল। উল্যাশিন শব্দটা শুনতে পেয়েই ঘেউ-ঘেউ করে লাফাতে শুরু

করে দিল। অন্য কুকুরগুলোও যোগ দিল। ঝিলিন একটা শিস মেরে এক টুকরো পনির ছুঁড়ে দিল। উলয়াশিন ঝিলিনকে চিনত; সেটা লেজ নাড়তে শুরু করল; ঘেউ-ঘেউ বন্ধ হল।

কিন্তু মনিব কুকুরের ডাক শুনে কুড়ের ভিতর থেকেই হাঁক দিল; "হেত্—হেত্ উলয়াশিন!"

ঝিলিন কুকুরটার কানের পাশটা চুলকে দিতেই সেটা চুপ করে গেল; ঝিলিন-এর পা ঘসতে ঘসতে লেজ নাড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ দুজন এক কোণে লুকিয়ে রইল। আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। চালার ভিতরে ভেড়ার কাশি শোনা গেল; গর্তের ভিতরকার পাথরের উপর জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। অন্ধকার। মাথার অনেক উপরে তারাগুলি জ্বলছে। পাহাড়ের ওপারে নতুন চাঁদ লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে, তার শিং দুটো উপরের দিকে তোলা। উপত্যকার বুকে কুয়াসা দুধের মত সাদা।

উঠে দাঁড়িয়ে ঝিলিন সঙ্গীকে বলল, "বন্ধু, চলে এস।"

তারা যাত্রা করল; কিন্তু কয়েক পা যেতেই শুনতে পেল ছাদ থেকে মোল্লা হাঁকছে, "আল্লাহ্! বিস্মিল্লাহ! ইল্‌রহ্‌মান!" তার অর্থ, লোকজন এখন মসজিদে যাবে। কাজেই তারা একটা দেয়ালের পাশে লুকিয়ে পড়ল এবং লোকজন চলে যাওয়া পর্যন্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। শেষ পর্যন্ত আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল।

"এইবার! ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন!" ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দুজন আবার যাত্রা শুরু করল। একটা উঠোন পেরিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে নদীর ধারে পৌঁছল; নদী পার হয়ে উপত্যকার পথ ধরে চলল।

মাটির কাছে কুয়াসা ঘন হয়ে নেমেছে, কিন্তু মাথার উপরে তারাগুলি ঝকঝক করছে। তারা দেখে দেখে ঝিলিন পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। কুয়াসার জন্য বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই হাঁটতে ভাল লাগছে; শুধু বুটগুলো ছেঁড়া বলে চলতে অসুবিধা হচ্ছে। ঝিলিন জুতো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল; তারার দিকে চোখ রেখে খালি পায়ে সে একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। কস্তিলিন পিছিয়ে পড়ল।

বলল, "আস্তে হাঁটো; ছেঁড়া জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে।"

ঝিলিন বলল, "জুতো খুলে ফেল। তাহলে আরও আরামে হাঁটতে পারবে।"

কস্তিলিন খালি পায়ে হাঁটতে লাগল; কিন্তু তাতে আরও খারাপ হল। পাথরে পা কেটে যাওয়ায় সে আরও পিছিয়ে পড়ল। ঝিলিন বলল, "পা কাটলে আবার সেরে যাবে; কিন্তু তাতাররা যদি ধরতে পারে তাহলে শেষ

করে ফেলবে। তাহলে যে অবস্থা আরও খারাপ হবে!"

কস্তিলিন কথা বলল না; গোঙাতে গোঙাতে চলতে লাগল।

উপত্যকা ধরে অনেকক্ষণ পথ চলবার পরে ডান দিকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। ঝিলিন থামল, চারদিকে তাকিয়ে হাতের উপর ভর দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

বলল, "আরে! আমরা যে ভুল পথ ধরেছি; অনেকটা ডাইনে চলে এসেছি। এখানে তো আরেকটা আউল; পাহাড়ের উপর থেকে আমি আগেই এটা দেখেছি। পিছনে ঘুরে ঐ পাহাড়টা বেয়ে বাঁ দিকে যেতে হবে। ওখানে একটা জঙ্গল থাকবার কথা।"

কিন্তু কস্তিলিন বলল, "এক মিনিট দাঁড়াও! একটু শ্বাস নিয়ে নি। আমার পা কেটে রক্ত পড়ছে।"

"কিছু ভেবনা বন্ধু। ও সব সেরে যাবে। আরও আস্তে লাফ দাও। এই ভাবে!"

পিছন ফিরে ঝিলিন বাঁ দিকে মোড় নিয়ে জঙ্গলটা লক্ষ্য করে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

কস্তিলিন তখনও গোঙাতে গোঙাতেই চলেছে। ঝিলিন শুধু বলল, "চুপ!" তারপর এগিয়েই চলল।

পাহাড় বেয়ে উঠে ঝিলিন-এর কথামতই তারা একটা জঙ্গল পেয়ে গেল। জঙ্গলে ঢুকে লতাপাতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলতে তাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল। অবশেষে একটা পথের হদিস পেয়ে সেটা ধরে চলতে লাগল।

"থাম!" পথের উপর ক্ষুরের শব্দ শুনে তারা থামল, কান পাতল। শব্দটা ঘোড়ার পায়ের মত, কিন্তু আর শোনা যাচ্ছে না। তারা এগিয়ে চলল। আবার সেই শব্দ। তারা যখন থামে, শব্দটাও থেমে যায়। ঝিলিন গুঁড়ি মেরে আরও কাছে গিয়ে দেখল, পথের উপর কি যেন দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা তত অন্ধকার নয়। জন্তুটা ঘোড়ার মতই দেখতে, কিন্তু ঠিক সে রকমও নয়; তার উপরে একটা অদ্ভুত কি যেন রয়েছে, ঠিক মানুষ নয়। জন্তুটা নাক দিয়ে শব্দ করল। "ওটা তাহলে কি হতে পারে?" ঝিলিন আস্তে শিস্ দিতেই সেটা রাস্তা থেকে ছুটে ঝোপের ভিতরে ঢুকে গেল; গাছপালা ভাঙার মড়্মড়্ শব্দ শোনা গেল, একটা ঝড় যেন ডালপালা ভেঙে ছুটে চলেছে।

কস্তিলিন ভয় পেয়ে মাটিতেই বসে পড়ল। কিন্তু ঝিলিন হেসে বলল; "ওটা তো হরিণ। শুনতে পাচ্ছ না, শিং দিয়ে ডালপালা ভাঙছে? আমরা ওকে দেখে ভয় পেয়েছি, ও আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে।"

তারা চলতে লাগল। সপ্তর্ষি নক্ষত্র অস্ত যাচ্ছে। সকাল হয়ে আসছে।

কিন্তু ঠিক পথেই যাচ্ছে কিনা তা তারা জানে না। ঝিলিন-এর মনে হল, এই পথেই তাতাররা তাকে ধরে এনেছিল ; রুশ দুর্গটা থেকে তারা এখনও সাত মাইল দূরে আছে। কিন্তু তাদের তো সঠিক পথ চিনবার কোন উপায় নেই, আর রাত্রিবেলা সহজেই পথ ভুল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে তারা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। কাস্তিলিন বসে পড়ে বলল : "তোমার যা খুসি কর, আমি আর চলতে পারছি না! আমার পা চলছে না।"

ঝিলিন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

"না, আমি কোন দিন পেঁছিতে পারব না ; কিছুতেই না।"

ঝিলিন রেগে তাকে ধমক দিয়ে উঠল।

"ঠিক আছে, তাহলে আমি একাই যাব। বিদায়!"

কস্তিলিন লাফ দিয়ে উঠে তার পিছু নিল। তারা আরও তিন মাইল হাঁটল। জঙ্গলের মধ্যে কুয়াসা আরও ঘন হয়ে নেমেছে ; তারারাও নিভু-নিভু হয়ে এসেছে ; ফলে একগজ দূরের কিছুও তাদের নজরে পড়ছে না।

হঠাৎ ঠিক সামনে তারা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল। পাথরের উপর খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছে। ঝিলিন সোজা শুয়ে পড়ে মাটিতে কান পাতল।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই! একজন ঘোড়সওয়ার আমাদের দিকে আসছে।"

পথ ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে তারা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঝিলিন হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে দেখল একটি তাতার ঘোড়ায় চেপে আপন মনে গুন গুন করতে করতে একটা গরুকে নিয়ে যাচ্ছে। তাতারটা তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। ঝিলিন কস্তিলিন-এর কাছে ফিরে গেল।

"ঈশ্বর ওকে আমাদের পাশ কাটিয়ে নিয়ে গেছে। উঠে পড়, এবার যাওয়া যাক।"

কস্তিলিন উঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু আবার পড়ে গেল।

"আমি পারছি না ; বিশ্বাস কর আমি পারছি না। আমার কোন শক্তি নেই।"

সে বেশ মোটা আর শক্ত-সমর্থ ; সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। সে কুয়াসায় জমে গেছে, তার পা কেটে রক্ত ঝরছে ; সত্যি সে পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

ঝিলিন তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করতেই কস্তিলিন হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল : "উঃ, কী ভীষণ লাগছে!"

ঝিলিন-এর বুক কেঁপে উঠল।

"চেঁচাচ্ছ কেন? তাতারটা এখনও কাছেই আছে; তোমার গলা শুনতে পাবে যে!" তারপর নিজের মনে ভাবল, "ও সত্যি ভেঙে পড়েছে। ওকে

নিয়ে এখন কি করি? একজন বন্ধুকে তো ফেলে যেতে পারি না।"

"ঠিক আছে, উঠে পড়, আমার কাঁধে চড়। তুমি যদি সত্যি হাঁটতে না পার, আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব।"

সে কস্তিলিনকে ধরে তুলল; তার উরুর নীচে হাত ঢুকিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে পথে নামল।

ঝিলিন বলল, "দোহাই ঈশ্বরের, আমার গলাটা চেপে ধরো না। কাঁধ দুটো চেপে ধর।"

তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর; ঝিলিনের নিজের পা থেকেও রক্ত পড়ছে, সেও ক্লান্ত। মাঝে মঝেই একটু উপুড় হয়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে কস্তিলিনকে আরও একটু তুলে সে চলতে লাগল।

তাতারটি হয় তো কস্তিলিন-এর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ ঝিলিন দেখতে পেল, তাতার ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে পিছন দিক থেকে কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। তীরের মত সে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। তাতার বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু তার গায়ে লাগল না। নিজের ভাষায় চীৎকার করতে করতে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ঝিলিন বলল, "সর্বনাশ হয়েছে বন্ধু! ওই কুত্তাটা দলবল নিয়ে এসে আমাদের ধরে ফেলবে! অন্তত মাইল দুই ছুটতে না পারলেই মরেছি!" তারপরেই মনে মনে ভাবল, "এই বোঝার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছি কিসের জন্য? একা হলে আমি অনেক আগেই এদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারতাম।"

কস্তিলিন বলল, "তুমি একাই চলে যাও। আমার জন্য তুমি কেন মরবে?"

"না, আমি যাব না! একজন বন্ধুকে ফেলে যেতে পারি না।"

পুনরায় কস্তিলিনকে পিঠে তুলে তারা অনেক কষ্টে এগিয়ে চলল। আরও আধ মাইল বা তারও বেশী পথ পার হল। তখনও তারা বনের মধ্যেই আছে; সে বনের শেষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কুয়াসা কেটে গিয়ে মেঘ জমতে শুরু করেছে, আকাশে একটা তারাও চোখে পড়ছে না। ঝিলিনও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। পথের পাশে পাথর দিয়ে ঘেরা একটা ঝরনার ধারে পৌঁছে ঝিলিন থামল। কস্তিলিনকে পিঠে থেকে নামাল।

বলল, "এস, একটু বিশ্রাম করে জল খেয়ে নি; কিছুটা পনিরও খাওয়া যাক। আর বেশী দূর নেই।"

কিন্তু সবে জল খাবার জন্য উপুড় হয়েছে এমন সময় তার পিছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল। তীরবেগে তারা আবার ঝোপের

ভিতর ঢুকে একটা খাড়া উৎরাইয়ের উপর শুয়ে পড়ল।

তাতারদের গলা কানে এল। পথের যে জায়গাটা থেকে নেমে এসে তারা লুকিয়েছে ঠিক সেইখানে এসে তাতাররা থামল। কি যেন কথাবার্তা বলে একটা কুকুরকে লেলিয়ে দিল। ডালপালার সর-সর শব্দ হল, আর ঝোপটা পার হয়ে একটা অপরিচিত কুকুর তাদের সামনে হাজির হল। সেখানেই থেমে কুকুরটা ডাকতে লাগল।

তখন কতকগুলি অপরিচিত তাতার পাহাড় বেয়ে নেমে এসে ঝিলিন ও কস্তিলিনকে ধরল, তাদের বেঁধে ফেলে ঘোড়ায় তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

প্রায় দু'মাইল যাবার পর তাদের সঙ্গে আব্দুল-এর দেখা হল, তার সঙ্গে আরও দুজন তাতার। অপরিচিতদের সঙ্গে কি সব কথা বলে আব্দুল ঝিলিন ও কস্তিলিনকে তার নিজের দুটো ঘোড়ায় চাপিয়ে আউল-এ ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

এবার আব্দুল হাসল না, একটা কথাও বলল না।

ভোরবেলা তারা আউল-এ পৌঁছে গেল। রাস্তার উপরেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে তাদের ঘিরে ধরল, পাথর ছুঁড়তে লাগল, চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের চাবুক মারতে লাগল।

তাতাররা গোল হয়ে বসল। পাহাড়ের নীচ থেকে বুড়ো লোকটিও এসেছে। তাদের আলোচনা শুরু হল; ঝিলিন শুনতে পেল, তাকে ও কস্তিলিনকে নিয়ে কি করা হবে সেই কথাই তারা বলাবলি করছে। কেউ বলল, তাদের পাহাড়ের আরও ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত; কিন্তু বুড়ো লোকটি বলল: "তাদের মেরে ফেলা উচিত।"

আব্দুল প্রতিবাদ করে বলল: "আমি তাদের জন্য টাকা দিয়েছি, কাজেই মুক্তি-পণ আমাকে পেতেই হবে।" বুড়ো লোকটি বলল: "তারা তোমাকে কিছুই দেবে না, শুধু দুর্ভাগ্যই ডেকে আনবে। রুশদের খাওয়ানো পাপ। তাদের মেরে ফেল, শেষ করে দাও!"

তারা চলে গেল। সকলে চলে গেলে মনিব এসে ঝিলিনকে বলল: "এক পক্ষ কালের মধ্যে যদি তোমার মুক্তি-পণের টাকা না আসে তাহলে তোমাকে চাবুক মারব; আর যদি আবারও পালাতে চেষ্টা কর, তোমাকে কুকুরের মত খুন করে ফেলব! চিঠি লিখে দাও, আর ঠিক-ঠিক লিখো।"

তাদের কাছে কাগজ এনে দেওয়া হল; তারা চিঠি লিখল। তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে মসজিদের পিছনকার প্রায় বারো বর্গ ফুট একটা গভীর গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল।

॥ ৬ ॥

এখন বড় কষ্টে তাদের দিন কাটতে লাগল। কোন সময়ই তাদের পা থেকে বেড়ি খোলা হয় না ; কোন সময়ই তাদের খোলা হাওয়ায় যেতে দেওয়া হয় না। আ-সেঁকা ময়দা তাদের খেতে দেওয়া হয়, তারা যেন কুকুর ; একটা পাত্রে করে জলটাও নামিয়ে দেওয়া হয়।

গর্তের ভিতরটা ভেজা, আর জায়গাও অল্প ; তায় ভয়ংকর দুর্গন্ধ। কস্তিলিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার শরীর ফুলে গেল, সর্বাঙ্গে ব্যথা হল ; সারা দিন সে হয় আর্তনাদ করে, নয় তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঝিলিনও খুব মুসড়ে পড়েছে ; সে বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই ; পালাবার কোন পথই নেই।

একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু মাটিটা ফেলবার জায়গাও নেই। মনিব সেটা দেখতে পেয়ে তাকে খুন করবে বলে ভয় দেখাল।

একদিন সে গর্তের মেঝেতে বসে মুক্তির কথাই ভাবছে, মন-মেজাজ খুব খারাপ, এমন সময় একখানা পিঠে তার কোলের উপর পড়ল, তারপর আর একখানা, এবং তারপরে অনেকগুলো চেরি ফল। সে মুখ তুলে দিনাকে দেখতে পেল। তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেই সে পালিয়ে গেল। আর ঝিলিন ভাবল ঃ "দিনা কি আমাকে সাহায্য করতে পারে না ?"

গর্তের মধ্যে একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে কিছু মাটি খুঁড়ে তাই দিয়ে সে পুতুল তৈরি করতে বসল। মানুষ বানাল, ঘোড়া বানাল, কুকুর বানাল। ভাবল, "দিনা এলে এগুলো তাকে ছুঁড়ে দেবে।"

কিন্তু পরদিন দিনা এল না। ঝিলিন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ; কিছু লোক ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল ; মসজিদের কাছে তাতারদের আলোচনা-সভা বসল। তারা উঁচু গলায় তর্কাতর্কি করতে লাগল ; "রুশিয়ান" শব্দটা বার বার শোনা গেল। সেই বুড়ো লোকটার গলাও শোনা গেল। সে সব কথাবার্তা বুঝতে না পারলেও ঝিলিনের মনে হল যে রুশ সৈন্যদল কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে গেছে এবং তারা আউল-এও আসতে পারে এই কথা ভেবে তারা ভয় পেয়ে গেছে ; এখন বন্দীদের নিয়ে কি করবে তাই ভাবছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে তারা চলে গেল। হঠাৎ মাথার উপরে একটা সর্ সর্ শব্দ শুনে চোখ তুলে সে দিনাকে দেখতে পেল ; সে এমন ভাবে গর্তটার উপর হামাগুড়ি দিয়ে আছে যে তার হাঁটু দুটো মাথার চাইতে উঁচু হয়ে আছে এবং তার চুলের সঙ্গে আটকানো মুদ্রাগুলো গর্তের উপর ঝুলে পড়েছে। দিনার চোখ দুটি তারার মত ঝিকমিক করছে। আস্তিনের

ভিতর থেকে দু' টুকরো পনির বের করে সে ঝিলিনকে ছুঁড়ে দিল। সেগুলো ধরে নিয়ে সে বলল "তুমি আগে আস নি কেন? তোমার জন্য পুতুল বানিয়ে রেখেছি। নাও, ধর!" একে একে সে সবগুলি পুতুল ছুঁড়ে দিল।

কিন্তু দিনা তার মাথাটা সরিয়ে নিল; পুতুলের দিকে ফিরেও তাকাল না। বলল, "আমি কিছু চাই না।" একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, "আইভান, ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!" সে নিজের গলাটা দেখাল।

"কে আমাকে মারবে?"

"বাবা; বুড়ো বলেছে, মারতেই হবে। তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

ঝিলিন বলল: "আচ্ছা, আমার জন্য যদি তোমার কষ্টই হচ্ছে, তাহলে আমাকে একটা লম্বা লাঠি এনে দাও।"

সে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, "আমি পারব না!"

দুই হাত জোড় করে ঝিলিন মিনতি করে বলল: "দিনা, দয়া করে এ কাজটা কর! প্রিয় দিনা, আমি তোমাকে মিনতি করছি।"

সে তবু বলল, "আমি পারব না! লাঠি আনতে গেলে ওরা আমাকে দেখে ফেলবে। সবাই বাড়িতে আছে।" দিনা চলে গেল।

সন্ধ্যা হল। ঝিলিন বসে বসে মাঝে মাঝে উপরের দিকে তাকাচ্ছে। না জানি কি হবে। আকাশে তারা ফুটেছে কিন্তু এখনও চাঁদ ওঠে নি। মোল্লাদের গলা শোনা গেল; তারপর সব চুপচাপ। ঝিলিন ঢুলতে ঢুলতে ভাবছিল: "এ কাজ করতে মেয়েটি ভয় পাবে!"

হঠাৎ তার মনে হল, তার মাথার উপর মাটি পড়ল। তাকিয়ে দেখল, একটা লম্বা লাঠি গর্তের উল্টো দিকের দেয়ালে খোঁচা মারছে। একটু পরে সেটা বাঁকা হয়ে গর্তের মধ্যে নেমে এল। ঝিলিন খুব খুসি। লাঠিটা ধরে সে নামিয়ে নিল। লাঠিটা বেশ শক্ত; মনিবের ঘরের ছাদের উপর এই লাঠিটাই সে দেখেছিল।

সে উপরে তাকাল। আকাশে তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করছে; আর গর্তের ঠিক উপরে দিনার চোখ দুটি বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে। ঝুঁকে পড়ে গর্তের একেবারে কিনারে মুখ এনে সে চুপি চুপি ডাকল, "আইভান! আইভান!" নিজের মুখের উপর হাত নেড়ে সে ইসারায় ঝিলিনকে জানাল, সে যেন আস্তে কথা বলে।

"কি?" ঝিলিন জবাব দিল।

"দু'জন ছাড়া সবাই চলে গেছে।"

তখন ঝিলিন বলল, "কস্তালিন, ওঠ; এস, শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক;

আমি তোমাকে তুলে ধরছি।"

কিন্তু কস্তিলিন তার কথায় কান দিল না।

বলল, "না ; আমি ভালই জানি যে এখান থেকে আমি পালাতে পারব না। আমার যখন পাশ ফিরবার শক্তিটুকুও নই তখন এখান থেকে যাব কেমন করে ?"

"ঠিক আছে ; তাহলে বিদায়। আমাকে ভুল বুঝো না।" তারা পরস্পরকে চুমো খেল। ঝিলিন বাঁশটা চেপে ধরল ; দিনাকেও উপর থেকে ধরতে বলে সে বাঁশটা বেয়ে উঠতে লাগল। দু' একবার তার হাত ফস্কে গেল ; বেড়ির জন্যও খুবই অসুবিধা হল। তবু কস্তিলিন-এর সহায়তায় সে উপরে উঠে গেল। দিনা তার ছোট্ট হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে যথাশক্তি তার শার্ট ধরে টেনে তুলল।

ঝিলিন বাঁশটা টেনে তুলে বলল, "দিনা, এটাকে যথাস্থানে রেখে দাও গে, নইলে তারা দেখতে পেলে তোমাকে মারবে।"

দিনা বাঁশটা টানতে টানতে চলে গেল ; ঝিলিনও পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। খাড়া পাহাড়টার নীচে পেঁছে একটা ধারালো পাথর তুলে নিয়ে পায়ের বেড়িটা ভাঙতে চেষ্টা করল। কিন্তু বেড়িটা বেশ শক্ত, ভাঙা সহজ নয়, তাছাড়া তার হাতও জায়গামত পেঁাচচ্ছে না। এমন সময় সে শুনতে পেল, আস্তে লাফিয়ে লাফিয়ে কে যেন পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। ভাবল : "নিশ্চয় দিনাই আবার এসেছে !"

দিনা এসে একটা পাথর নিয়ে বলল, "আমি চেষ্টা করে দেখি।"

হাঁটু ভেঙে বসে সে বেড়িটা ভাঙতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার হাত দুটো গাছের কাঁচ ডালের মত নরম, আর তার শক্তিই বা কতটুকু। পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে কাঁদতে লাগল। তখন ঝিলিন নিজেই আবার চেষ্টা করতে লাগল। দিনা তার কাঁধের উপর হাত রেখে পাশেই বসে রইল।

ঝিলিন চারদিকে তাকিয়ে বাঁ দিকে পাহাড়ের ওপারে একটা লাল্চে আলো দেখতে পেল। চাঁদ উঠেছে। সে ভাবল, "হায়! চাঁদ উঠবার আগেই আমাকে উপত্যকা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।" সে উঠে দাঁড়াল। পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বেড়ি থাক আর যাক, তাকে যেতেই হবে।

"বিদায় প্রিয় দিনা ! তোমাকে কোন দিন ভুলব না !" সে বলল।

দিনা তাকে জড়িয়ে ধরল। তাকে কিছুটা পনির দিল। সে নিল।

"ধন্যবাদ সোনা মেয়ে। আমি চলে গেলে কে তোমাকে পুতুল বানিয়ে দেবে ?" সে দিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

দুই হাতে মুখ ঢেকে দিনা কেঁদে উঠল। মেষ শাবকের মত সে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। তার বিনুনির মুদ্রাগুলি পিঠের উপর টুং-টাং করে বাজতে লাগল।

ঝিলিন ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল ; পাছে শব্দ হয় তাই বেড়ির শিকলটা হাতে তুলে নিল ; তারপর বেড়িশুদ্ধু পা দুটো টানতে টানতে যেখান থেকে চাঁদ উঠছে সেই দিকে এগিয়ে চলল। এবার সে পথ চিনেছে। সোজা পথে গেলে তাকে প্রায় ছ' মাইল পথ হাঁটতে হবে। এখন চাঁদ উঠবার আগে জঙ্গলে পেঁছুতে পারলেই হয়। নদী পার হল। পাহাড়ের ওপারের আলো ক্রমেই সাদা হয়ে আসছে। সেই দিকে চোখ রেখে সে উপত্যকা ধরে চলতে লাগল। চাঁদ এখনও দেখা যাচ্ছে না। আলোটা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হচ্ছে ; উপত্যকার একটা দিকে ক্রমেই বেশী করে আলো পড়ছে ; ছায়াগুলি ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ছায়ার আড়ালে আড়ালে ঝিলিন এগিয়ে চলল। সে দ্রুত এগোচ্ছে, কিন্তু চাঁদের গতি তার চাইতেও দ্রুততর ; ডান দিককার পাহাড়ের চূড়াগুলি ইতিমধ্যেই আলোকিত হয়ে উঠেছে। সে যখন জঙ্গলের কাছে পেঁছুল তখন পাহাড়ের আড়াল থেকে সাদা চাঁদ দেখা দিল ; চারদিক দিনের মত আলো হয়ে উঠল। গাছের পাতাগুলিও দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর আলো পড়েছে, কিন্তু সব নিস্তব্ধ, যেন কেউ বেঁচে নেই ; নীচের নদীটার কলকল ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

জঙ্গলে ঢুকবার মুখে কারও সঙ্গে ঝিলিন-এর দেখা হল না। একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে সে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ল।

বিশ্রাম হল। একটুকরো পনির খাওয়া হল। কাছে একটা পাথর দেখতে পেয়ে আবার বেড়িটা ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল। ঠুকতে ঠুকতে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল, কিন্তু বেড়ি ভাঙল না। উঠে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলতে লাগল। আধ মাইলেরও বেশী পথ চলবার পরে তার শরীর একেবারেই ভেঙে পড়ল, পা ব্যথা করতে লাগল। প্রতি দশ পা এগিয়েই তাকে থামতে হল। ভাবল, "তবু এ ছাড়া উপায় নেই। যতক্ষণ শরীরে এতটুকু শক্তি আছে ততক্ষণ এই ভাবে পা টেনে টেনে চলতেই হবে। একবার বসলে আর উঠতে পারব না। দুর্গে পেঁছুতে পারব না ঠিকই ; কিন্তু সকাল হলে বনের মধ্যে শুয়ে পড়তে পারব, সেখানে সারাটা দিন কাটাতে পারব, তারপর রাত হলে আবার পথ চলতে পারব।"

সারা রাত সে পথ চলল ! দুজন তাতার ঘোড়ায় চড়ে তাকে পার হয়ে গেল। অনেক দূর থেকেই তাদের আওয়াজ পেয়ে সে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

চাঁদ ক্রমেই ম্লান হয়ে এল। শিশির পড়া শুরু হল। ভোর হয়ে এল। কিন্তু ঝিলিন তখনও বনের কিনারে পেঁছুতে পারল না। ভাবল, "দেখা যাক ; আরও ত্রিশ পা এগোতে পারলেই গাছপালার ভিতর ঢুকে বসে পড়ব।"

আরও ত্রিশ পা হাঁটতেই সে দেখতে পেল, বন এসে গেছে। বনের শেষ প্রান্তে এগিয়ে গেল। তখন বেশ আলো হয়ে গেছে। তার সামনেই প্রান্তর ও দুর্গ।

বাঁদিকে পাহাড়ের ঢালুটার ঠিক নীচে একটা আগুন নিভে যাচ্ছে। তার ধোঁয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আগুনকে ঘিরে কিছু লোক বসে আছে।

ভাল করে তাকিয়ে সে দেখতে পেল বন্দুকগুলো চকচক করছে। ওরা সৈনিক—কসাক।

ঝিলিন-এর মন আনন্দে নেচে উঠল। গায়ের সবটুকু শক্তি একত্র করে সে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। মনে মনে বলল: "ঈশ্বর করুন, এখন এই খোলা মাঠে কোন অশ্বারোহী তাতার যেন আমাকে দেখতে না পায়! যত কাছেই এসে থাকি, তাহলে আর ঠিক সময়ে ওখানে পেঁছিতে পারব না।"

এ কথা বলার সংগে সংগেই শ' দুই গজ দূরে বাঁদিকের একটা পাহাড়ের উপর সে তিনটি তাতারকে দেখতে পেল।

তারাও তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসতে লাগল। তার বুক ভেঙে গেল। হাত নাড়তে নাড়তে সে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে উঠল, "ভাইসব, ভাইসব! বাঁচাও!"

কসাকরা শুনতে পেল। তাদের একটা দল ঘোড়ায় চড়ে তীরবেগে ছুটতে লাগল তাতারদের বাধা দিতে। কসাকরা অনেক দূরে, কিন্তু তাতাররা বেশ কাছে; তবু ঝিলিনও শেষ চেষ্টা করতে লাগল। বেড়িটা হাতে নিয়ে সেও কসাকদের দিকে ছুটে চলল। সে যে কি করছে তা সে নিজেই জানে না। শুধু ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে আর চীৎকার করছে, "ভাইসব! ভাইসব! ভাইসব!"

দলে কসাক প্রায় পনেরো জন। তাতাররা ভয় পেয়ে ঝিলিনের কাছে পেঁছিবার আগেই থেমে গেল। ঝিলিন হোঁচট খেতে খেতে কসাকদের কাছে পেঁছে গেল।

তাকে ঘিরে ধরে সকলে প্রশ্ন করতে লাগল। "তুমি কে? তুমি কে? কোত্থেকে আসছ?"

কিন্তু ঝিলিন-এর কোন জ্ঞান নেই। সে শুধু কাঁদছে আর বলছে, "ভাইসব! ভাইসব!"

অন্য সৈনিকরাও ছুটে এসে ঝিলিনকে ঘিরে ধরল—কেউ রুটি দিল, কেউ গম দিল, একজন দিল ভদ্কা: কেউ বা একটা জোব্বা তার গায়ে জড়িয়ে দিল, আর একজন তার পায়ের বেড়ি ভাঙতে শুরু করল।

অফিসাররা তাকে চিনতে পারল। ঘোড়ায় চাপিয়ে দুর্গে নিয়ে গেল। তাকে ফিরে পেয়ে সকলেই খুসি। বন্ধুরা তাকে ঘিরে বসল।

ঝিলিন তাদের সব কথা খুলে বলল।

"এই ভাবেই আমি বাড়ি গিয়ে বিয়ে করলাম! না হে, বোঝাই যাচ্ছে যে, আমার ভাগ্যে ও সব নেই।"

কাজেই সে ককেসাসেই চাকরি করতে লাগল। একমাস পরে পাঁচ হাজার রুবল মুক্তি-পণ দিয়ে কস্তিলিনও ছাড়া পেল। তারা যখন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল তখন সে মৃতপ্রায়।

১৮৭০

ভালুক-শিকার

The Bear-Hunt

[এখানে বর্ণিত অভিযানটি ১৮৫৮ সালে তলস্তয়-এর নিজের জীবনেই ঘটেছিল। বিশ বছর পরে মানবিক কারণে তিনি শিকার করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।]

একবার আমরা ভালুক-শিকারে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু একটা ভালুককে গুলি করল, কিন্তু তাতে সেটা আহত হল মাত্র। বরফের উপর রক্তের দাগ দেখা গেল, কিন্তু ভালুকটা পালিয়ে গেল।

বনের মধ্যে গোল হয়ে বসে আমরা ভাবতে লাগলাম, তখনই ভালুকটার পিছনে ধাওয়া করা হবে, না কি পুনরায় স্থিত হয়ে বসতে সেটাকে দু' তিন দিন সময় দেওয়া হবে। ভালুক-তাড়ুয়া চাষীদের জিজ্ঞাসা করলাম, সেই দিনই ভালুকটার পাত্তা করা সম্ভব হবে কি না।

একজন বুড়ো ভালুক-তাড়ুয়া বলল, "না, সেটা অসম্ভব। ওকে শান্ত হতে সময় দিতে হবে। পাঁচ দিনের মধ্যে ওকে ঘেরাও করা সম্ভব হলেও এখনই যদি ওর পিছনে ধাওয়া করেন তাহলে ভালুকটা ভয় পেয়ে যাবে এবং কোথাও স্থিত হয়ে বসবে না।"

কিন্তু একটি যুবক ভালুক-তাড়ুয়া বুড়োর কথার প্রতিবাদ করে বলল, এখনই ভালুকটাকে ঘেরাও করা সম্ভব।

সে বলল, "এ রকম বরফে সেটা অনেক দূর যাবে না, কারণ ভালুকটা বেশ মোটাসোটা। সন্ধ্যার আগেই সেটা কোথাও বসে যাবে; আর তাও যদি না যায় তাহলে বরফ-জুতো পরেই আমি তাকে ধরতে পারব।"

যে বন্ধুটির সঙ্গে গিয়েছিলাম সে তখনই ভালুকটার পিছু নেবার বিরোধী; সে অপেক্ষা করতেই পরামর্শ দিল। কিন্তু আমি বললাম:

"তর্ক করে কি হবে। তোমার যেমন ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু আমি দেমিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে ভালুকটার খোঁজে বের হব। যদি পেয়ে যাই, ভাল কথা। যদি না পাই, তাতেও লোকসান কিছু নেই। সবে দিন শুরু হয়েছে, আর আজ আমাদের হাতে কোন কাজও নেই।"

সেই ব্যবস্থাই করা হল।

অন্য সকলে স্লেজ-এ চেপে গাঁয়ে ফিরে গেল। দেমিয়ান ও আমি কিছু রুটি নিয়ে বনের মধ্যেই রয়ে গেলাম।

সকলে চলে যাবার পরে দেমিয়ান ও আমি আমাদের বন্দুক দুটো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম, এবং আমাদের গরম কোটের কোণাগুলি বেল্টের মধ্যে গুঁজে নিয়ে ভালুকের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চললাম।

আবহাওয়া সুন্দর; বরফ পড়ছে; বেশ শান্ত। কিন্তু বরফ-জুতো পরে চলা খুব শক্ত কাজ। বরফ বেশ গভীর ও নরম। বনের মধ্যে বরফ মোটেই শক্ত হয়ে ওঠে নি; আগের দিনও নতুন করে বরফ পড়েছে; কাজেই আমাদের বরফ-জুতো বরফের মধ্যে ছ' ইঞ্চি, কোথাও বা আরও বেশী ডুবে যাচ্ছিল।

দূর থেকে ভালুকটাকে চলতে দেখা গেল। তার চলার ভঙ্গীটাও আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম; কখনও তার পেট পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে, আর সে যেন বরফের ভিতর দিয়ে লাঙল টেনে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেটা যখন ছোট ছোট ফার-এর ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল তখন দেমিয়ান থেমে গেল।

"আর পিছনে ধাওয়া করা নয়", সে বলল। "সেটা হয় তো কোথাও চুপচাপ বসে আছে। বরফ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। কাজেই ওর পায়ের দাগ ছেড়ে চলুন আমরা ঘুরে যাই; কিন্তু খুব চুপি চুপি যেতে হবে। কোন রকম শব্দ করবেন না, বা কাশবেন না। তাহলে ওটা ভয় পেয়ে যাবে।"

কাজেই পথ ছেড়ে আমরা বাঁ দিকে ঘুরে গেলাম। কিন্তু প্রায় পাঁচ শ' গজ যাবার পরে ঠিক আমাদের সামনে আবার ভালুকের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। সেই দাগ ধরে চলতে চলতে আমরা রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। সেখানে থেমে ভালুকটা কোন্ দিকে গেছে বুঝবার জন্য আমরা পথটা ভাল করে দেখতে লাগলাম। বরফের মধ্যে এখানে-ওখানে ভালুকের থাবা, নখ, সব কিছুরই দাগ রয়েছে; আবার কোন চাষীর বাকলের জুতোর দাগও এখানে-ওখানে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে, ভালুকটা গ্রামের দিকেই গেছে।

রাস্তা ধরে যেতে যেতে দেমিয়ান বলল:

"এখন রাস্তার উপর নজর রেখে কোন লাভ নেই। রাস্তার পাশে

বরফের উপর যে দাগ রয়েছে তাই দেখে আমাদের জানতে হবে বাঁয়ে না ডাইনে কোন্ দিকে সে রাস্তা থেকে নেমে গেছে। কোন জায়গা থেকে সে নিশ্চয় নেমে গেছে, কারণ গ্রামের দিকে সে কিছুতেই যাবে না।"

প্রায় এক মাইল পথ যাবার পরে ভাল্লুকটার রাস্তা থেকে নেমে যাবার দাগ আমাদের চোখে পড়ল। দাগগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলাম। কী আশ্চর্য! সেগুলো ভাল্লুকের পায়ের দাগ ঠিকই, কিন্তু রাস্তা থেকে বনের দিকে না গিয়ে সেগুলো বন থেকে রাস্তায় এসে উঠেছে! আঙুলগুলো রাস্তার দিকে মুখ করা।

"এটা নিশ্চয় অন্য কোন ভাল্লুক", আমি বললাম।

দেমিয়ান কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

তারপর বলল, "না, সেই একই ভাল্লুক। ভাল্লুকটা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে; রাস্তা ছেড়ে যাবার সময় পিছন দিকে হেঁটেছে।"

ভাল করে নজর করে দেখলাম, ঠিক তাই! ভাল্লুকটা দশ পা'র মত পিছন দিকে হেঁটেছে; তারপর একটা ফার গাছের পিছনে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে সোজা সামনে চলে গেছে। দেমিয়ান থেমে বলল:

"এবার সেটাকে ঠিক ঘেরাও করতে পারব। আমাদের সামনেই একটা জলাভূমি আছে; ভাল্লুকটা নিশ্চয় সেখানেই আস্তানা পেতেছে। চলুন ঘুরে যাই।"

ফারের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমরা ঘুরে চললাম। ততক্ষণে আমি বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়েছি; পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কখনও জুনিপার-এর ঝোপে আমার বরফ-জুতো আটকে যাচ্ছে, কখনও বা ছোট ফার-এর চারা পায়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, অনভ্যাসবশত বরফ-জুতো পা থেকে ফস্কে যাচ্ছে, আবার কখনও বা বরফের ভিতর লুকানো কাঠের টুকরোয় পায়ে ঠোক্কর লাগছে। ক্রমেই শ্রান্ত হয়ে পড়ছি; ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে; লোমের জোব্বাটা খুলে ফেললাম। কিন্তু দেমিয়ান কেমন সুন্দর এগিয়ে চলছে, যেন নৌকোয় চড়ে ভেসে যাচ্ছে, তার বরফ-জুতো যেন আপনা থেকেই চলছে, কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কাও লাগছে না, বা পা থেকে ফস্কেও যাচ্ছে না। বরং আমার লোমের কোটটা নিয়ে নিজের কাঁধে ফেলে আমাকে চলতে সাহায্য করল।

আরও দু'মাইল পথ চলে আমরা জলাভূমির অপর পারে পৌঁছে গেলাম। আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমার বরফ-জুতো বারে বারে ফস্কে যাচ্ছিল, আমার পা দুটোও কাঁপছিল। হঠাৎ দেমিয়ান আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত নাড়তে লাগল। আমি তার কাছে হাজির হলে সে উপুড় হয়ে আঙুল বাড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল:

"ঐ ঝোপটার উপরে ছাতারে পাখিটা কিচির-মিচির করছে দেখতে

পাচ্ছেন? ওরা দূর থেকে ভালুকের গন্ধ পায়। সেটা নিশ্চয় ওখানেই আছে।”

আমরা মুখ ঘুরিয়ে আরও আধ ঘণ্টা চলবার পরে আবার সেই পুরনো রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। আমরা তাহলে ভালুকটাকে এক পাক ঘুরে এসেছি; যে রাস্তাটা আমরা ছেড়ে এলাম সেখানেই সে আছে। আমরা থামলাম; আমি টুপি খুলে জামাগুলো একটু ঢিলে করে নিলাম। আমি যেন গরম জলে নেয়ে গেছি, জলে-ডোবা ইঁদুরের মত আমার অবস্থা। দেমিয়ান-এর মুখও লাল হয়ে উঠেছে; সে আস্তিনে মুখ মুছে নিল।

বলল, “আমাদের কাজ সারা হয়েছে স্যার, এবার বিশ্রাম করব।”

সন্ধ্যার লালচে আলো এর মধ্যেই বনের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। বরফ-জুতো খুলে তার উপর বসে পড়লাম; থলে থেকে রুটি ও নুন বের করলাম। প্রথমে কিছুটা বরফ খেয়ে তারপর রুটি খেলাম; রুটিটা এতই সুস্বাদু লাগল যে মনে হল এমনটি জীবনে কোন দিন খাই নি। ক্রমে গোধূলি নেমে এল। তখন আমি দেমিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, গ্রামটা বেশ দূর কি না।

সে বলল, “হ্যাঁ। প্রায় আট মাইল হবে। আজ রাতেই সেখানে যাব, তবে আপাতত বিশ্রাম। লোমের কোটটা পড়ে নিন স্যার, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।”

দেমিয়ান বরফটাকে সমান করে নিয়ে কিছু ফারের ডালপালা ভেঙে নিয়ে একটা বিছানা তৈরি করে ফেলল। হাতের উপর মাথা রেখে আমরা পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। দু'ঘণ্টা পরে একটা কিছু ভাঙার শব্দে জেগে উঠলাম।

ঘুমটা এত গাঢ় হয়েছিল যে আমি কোথায় আছি তাই বুঝতে পারছিলাম না। চারদিকে তাকালাম। কী আশ্চর্য! আমি একটা হলের মধ্যে শুয়ে আছি; সব ঝক্ঝক্ করছে; সাদা থামগুলো জ্বলজ্বল করছে; উপরে তাকিয়ে দেখলাম, কাক-কুচ্কুচে কালো ছাদটা রঙিন আলোয় ঝিলমিল করছে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই মনে পড়ল, আমরা বনের মধ্যে রয়েছি, আর যাকে আমি হল ও থাম মনে করেছিলাম সেগুলো বরফ ও জমাট কুয়াশায় ঢাকা গাছ, আর রঙিন আলোগুলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক-করা তারা।

সারা রাত কুয়াশা জমেছে; ডালে ও পাতায় ঘন হয়ে পড়েছে, দেমিয়ানকে ঢেকে দিয়েছে, আমার লোমের কোটের উপরেও জমেছে, গাছ থেকে ঝরে পড়ছে। দেমিয়ানকে জাগিয়ে তুলে বরফ-জুতো পরে আমরা রওনা দিলাম। বনের মধ্যে সব চুপচাপ। নরম বরফের ভিতর দিয়ে চলতে

আমাদের জুতোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না ; তবে মাঝে মাঝে বরফের চাপে গাছগুলোর কট্-কট্ শব্দ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শুধু একবারই জীবন্ত প্রাণীর ডাক শুনতে পেলাম। আমাদের পাশেই খস্-খস্ শব্দ করে কি যেন ছুটে চলে গেল। নির্ঘাৎ ভালুক। কিন্তু যেখান থেকে শব্দটা এসেছিল সেখান পেঁছে দেখলাম খরগোসের পায়ের দাগ এবং কয়েকটা আস্পেন চারাগাছের বাকলে দাঁতের দাগ। কয়েকটা খরগোস খেতে খেতে আমাদের পায়ের শব্দে চমকে উঠল।

আমরা রাস্তায় উঠে এলাম। বরফ-জুতোগুলো টানতে টানতে এগিয়ে চললাম। এখন হাঁটিতে অনেক আরাম লাগছে। আমাদের বুটের নীচে বরফ সশব্দে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ; ঠাণ্ডা জমাট কুয়াসা দাড়ির মত আমাদের মুখের উপর জমে উঠছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে তারাগুলো আমাদের সংগে মিলিত হবার জন্য ছুটছে ; কখনও ঝিক্‌মিক্ করছে, কখনও উধাও হয়ে যাচ্ছে ; সারা আকাশটাই যেন এগিয়ে চলেছে।

পেঁছে দেখি আমার বন্ধুটি ঘুমোচ্ছে। তাকে জাগিয়ে তুলে জানালাম যে আমরা ভালুকের খোঁজ পেয়েছি। সংগী চাষীটিকে সকালেই "বীটার" যোগাড় করার হুকুম দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা শুয়ে পড়লাম।

বন্ধু জাগিয়ে না দিলে গভীর ক্লান্তিতে আমি হয় তো মাঝরাত পর্যন্তই ঘুমিয়ে থাকতাম। লাফ দিয়ে উঠে দেখি, ইতিমধ্যেই পোষাক পরে সে বন্দুকটা নিয়ে কি যেন করছে।

"দেমিয়ান কোথায় ?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"অনেক আগেই বনের মধ্যে চলে গেছে। তোমরা যে পথ ধরে গিয়েছিলে এর মধ্যে সে একবার সে-পথটা ঘুরে এসেছে। এখন 'বীটার'-দের খোঁজে গেছে।"

আমিও হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরলাম ; বন্দুকে গুলি ভরলাম ; তারপর স্লেজে চেপে রওনা হলাম।

তখনও ঘন হয়ে বরফ পড়ছে। চারদিক নিস্তব্ধ। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। মাথার উপরে ঘন কুয়াসা। জমাট বরফে সব কিছু ঢাকা।

প্রায় দু'মাইল পথ স্লেজ চালাবার পরে বনের কাছাকাছি পেঁছে একটা ফাঁকা জায়গা থেকে ধোঁয়ার মেঘ উঠতে দেখলাম ; তারপরই দেখা হল স্ত্রী-পুরুষ মিলে একদল চাষীর সংগে ; তাদের প্রত্যেকের হাতেই মোটা লাঠি।

স্লেজ থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। পুরুষরা আলু সিদ্ধ করতে করতে মেয়েদের সংগে হাসি-তামাসা করছে।

দেমিয়ানও সেখানেই ছিল। আমরা পেঁছতেই লোকগুলি উঠে

দাঁড়াল। দেমিয়ান তাদের নিয়ে গিয়ে পরপর দাঁড় করিয়ে দিল। ত্রিশটি নারী ও পুরুষ একের পর এক সার বেঁধে এগিয়ে চলল। বরফ এত গভীর হয়ে পড়েছে যে তাদের কোমর থেকে উপরটাই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা বনের দিকে ঘুরে গেল, আর বন্ধু ও আমিও তাদের পথ ধরলাম।

তাদের পায়ে-পায়ে একটা পথ পড়লেও হাঁটা বেশ শক্ত; কিন্তু অন্য দিকে পড়ে যাওয়াও শক্ত: আমরা যেন দুটো বরফের দেয়ালের ভিতর দিয়ে হেটে যাচ্ছি।

এই পথ ধরে প্রায় আধ মাইল চলবার পর হঠাৎ দেখি অন্য দিক থেকে দেমিয়ান আসছে—বরফ-জুতো পায়ে আমাদের দিকে দৌড়তে দৌড়তে সে ইসারায় আমাদেরও তার সঙ্গে যোগ দিতে বলছে। তার কাছে এগিয়ে যেতেই সে জায়গাটার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি যথাস্থানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম।

আমার বাঁ দিকে লম্বা ফার গাছের সারি। তাদের গুঁড়ির মাঝখান দিয়ে একটা ভাল পথ চোখে পড়ল, আর গাছগুলোর পিছনে একজন "বীটার"-কেও দেখতে পেলাম। আমার সামনে মানুষ-সমান উঁচু ছোট ছোট ফার গাছের একটা ঝোপ; তার ডালপালাগুলো বরফের ভারে নুয়ে পড়ে পরস্পরের গায়ে জুড়ে গেছে। সেই ঝোপের ভিতর দিয়ে ঘন বরফে-ঢাকা একটা পথ ঠিক আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে এসে শেষ হয়েছে। ঝোপটা আমার ডান দিকে খানিকটা গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় শেষ হয়েছে। সেখানে দেমিয়ান আমার বন্ধুকে জায়গামত দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

বন্দুক দুটো ভাল করে দেখে নিয়ে কোথায় ঠিক মত দাঁড়ানো যায় ভাবতে লাগলাম। আমার তিন পা পিছনেই একটা লম্বা ফার গাছ ছিল।

ভাবলাম, "ওখানেই দাঁড়াব, তাহলে দ্বিতীয় বন্দুকটাকে ওই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখতে পারব।" প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবিয়ে গাছটার দিকে এগিয়ে গেলাম। পা দিয়ে বরফ সরিয়ে দাঁড়াবার মত এক বর্গ গজ জায়গা পরিষ্কার করে নিলাম। একটা বন্দুক হাতে নিলাম; অপরটা গুলি-ভরা অবস্থায় গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে দিলাম। তারপর ছোরাটাকে খাপ থেকে খুলে আবার ভরে রাখলাম, যাতে দরকারের সময় সহজেই সেটাকে টেনে বের করা যায়।

সবে এই সব প্রস্তুতি শেষ করেছি এমন সময় বনের মধ্যে দেমিয়ান-এর গলা শুনতে পেলাম।

"সে আসছে! সে আসছে!"

তার গলা শুনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চাষীরা নানা সুরে জবাব দিল।

"আসছে; আসছে, আসছে! আউ! আউ! আউ!" লোকগুলি

চেঁচাতে লাগল।

উঁচু গলায় মেয়েরাও চীৎকার করে উঠল, "আই! আই! আই!"

ভাল্লুকটা বৃত্তের মধ্যে পড়ে গেছে; দেমিয়ান তার দিকে এগিয়ে চলেছে আর চারদিক থেকে লোকগুলো চীৎকার করছে। ভাল্লুকটা কখন আমাদের দিকে আসে তার জন্য অপেক্ষা করে শুধু আমার বন্ধু ও আমি নীরব, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কান পেতে সেদিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতরটা প্রচণ্ডভাবে দপ্ দপ্ করতে লাগল। বন্দুকটা চেপে ধরে আমি কাঁপতে লাগলাম।

"এই—এই", আমি ভাবতে লাগলাম। "সে হঠাৎ হাজির হবে। আমি নিশানা ঠিক করে গুলি ছুঁড়ব, আর সে পড়ে যাবে—"

সহসা আমার বাঁ দিকে বেশ কিছুটা দূরে বরফের উপর কিসের যেন লাফিয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। লম্বা ফার গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ পা দূরে গাছের গুঁড়িগুলোর পিছনে একটা বড় কালো কি যেন দেখতে পেলাম। নিশানা ঠিক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাবলাম:

"ওটা কি আরও কাছে আসবে না?"

সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সে কান দুটো নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে পিছনে হটছে। আর সেই সময়েই তার পুরো শরীরটা আমার চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড জানোয়ার। প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি গুলি ছুঁড়লাম, কিন্তু আমার বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা গাছে লাগল। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি মেলে দেখলাম, ভাল্লুকটা ছুটে বনের মধ্যে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"যা!" আমি ভাবলাম। "আমার সুযোগটা গেল। ওটা আর আমার দিকে ফিরে আসবে না। হয় আমার বন্ধু তাকে গুলি করবে, নয় তো সে বীটারদের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যাবে। যে কোন অবস্থাতেই সে আমাকে আর সুযোগ দেবে না।"

যা হোক, বন্দুকে গুলি ভরে আবার কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিকে চাষীরা চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ডান দিকে, আমার বন্ধু সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বেশী দূরেও নয়, একটি স্ত্রীলোকের উন্মত্ত চীৎকার আমার কানে এল:

"সে এখানে! সে এখানে! এখানে আসুন! এখানে আসুন! ওঃ! ওঃ! আই! আই!"

সে নিশ্চয় ভাল্লুকটাকে দেখতে পেয়েছে। সেটাকে দেখবার আশা ছেড়ে দিয়ে আমি ডান দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটা লাঠি হাতে নিয়ে বরফ-জুতো ফেলে দিয়ে দেমিয়ান একটা সরু পথ

ধরে বন্ধুর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। তার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে কোন কিছুকে নিশানা করার ভঙ্গীতে সে তার লাঠিটা তুলে ধরল। আর তখনই আমার বন্ধু বন্দুকটা তুলে সেই একই দিকে নিশানা ঠিক করল। ক্র্যাক! সে গুলি ছুঁড়ল।

ভাবলাম, "ওই! বন্ধু সেটাকে মেরেছে।"

কিন্তু আমি দেখলাম, বন্ধু ভালুকটার দিকে দৌড়ে গেল না। তাহলে তার গুলিটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, অথবা পুরোপুরি কার্যকরী হয় নি।

ভাবলাম, "ভালুকটা দূরে চলে যাবে। একবার চলে গেলে আর আমার দিকে আসবে না।—কিন্তু ওটা কি"

ঘূর্ণি-ঝড়ের মত কি যেন আমার দিকে ছুটে আসছে; তার নাকের গরগর শব্দ হচ্ছে; আমার একেবারে সামনে বরফ ছিটকে উঠল। সামনে তাকালাম; ভয়ে আত্মহারা ভালুকটা ঝোপের ভিতরকার পথ ধরে আমার দিকেই ছুটে আসছে। সেটা তখন দু'পা দূরেও নেই, আর আমি তার পুরো চেহারাটাই দেখতে পাচ্ছি—তার কালো বুক আর লালের ছোপ-লাগা প্রকাণ্ড মাথা। ওই তো বরফ ছিটকে ফেলতে ফেলতে সে সোজা আমার দিকে ছুটে আসছে। তার চোখ দেখে আমি বুঝতে পারলাম, সে আমাকে মোটেই দেখে নি, কিন্তু ভয়ে পাগলের মত হয়ে অন্ধের মত ছুটে আসছে; যে গাছটার নীচে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেটাই তার পথের লক্ষ্য। বন্দুক তুলে গুলি করলাম। সে আমার একেবারে উপরে এসে পড়েছে। বুঝতে পারলাম যে আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আমার বুলেটটা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, সে আমার গুলির শব্দটাও শুনতে পায় নি, কিন্তু তবু সে ছুটে আসছে। বন্দুক নীচু করে প্রায় তার মাথায় লাগিয়ে আবার গুলি ছুঁড়লাম। ক্র্যাক! গুলি লেগেছে, কিন্তু সে মরে নি।

ভালুকটা মাথা তুলল; কান দুটো পিছনে নিয়ে দাঁত বের করে আমার দিকে ধেয়ে এল।

আমি দ্বিতীয় বন্দুকটার দিকে হাত বাড়ালাম; কিন্তু সেটাতে হাত দেবার আগেই সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এক ধাক্কায় আমাকে বরফের উপর ফেলে দিয়ে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল।

"কপাল ভাল যে সে আমাকে ফেলে গেছে", আমি ভাবলাম।

আমি উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কে যেন আমাকে চেপে ধরে উঠতে দিল না। ধাক্কার বেগে ভালুকটা আমাকে পার হয়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু সে আবার ফিরে এসে শরীরের সমস্ত ভার নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলাম যে একটা ভারী বোঝা আমাকে চেপে ধরেছে, আমার মুখের উপরটা গরম লাগছে, ধীরে ধীরে আমার গোটা মাথাটাই সে তার

মুখের দিকে টেনে নিচ্ছে। আমার নাক ইতিমধ্যেই তার মুখের মধ্যে চলে গেছে ; মুখের গরমটা বুঝতে পারছি ; তার রক্তের গন্ধও পাচ্ছি। দুই থাবা দিয়ে সে আমার কাঁধকে চেপে ধরেছে ; আমি নড়তেও পারছি না : সে চেষ্টা করছে আমার নাক ও চোখের উপর দাঁত বসিয়ে দিতে. আর নাক ও চোখকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায় আমি আমার মাথাটাকে তার মুখ থেকে দূরে আমার বুকের দিকে নামিয়ে নিচ্ছি। তারপরই আমি বুঝতে পারলাম, তার নীচের চোয়ালের দাঁত দিয়ে আমার চুলের ঠিক নীচে কপালটাকে এবং উপরের চোয়াল দিয়ে আমার চোখের নীচেকার মাংসটাকে সে চেপে ধরেছে। আমার মুখটাকে যেন ছুরি দিয়ে কাটা হচ্ছে। নিজেকে ছাড়াবার জন্য আমি ছটফট করতে লাগলাম, আর সে চর্বণরত কুকুরের মত তাড়াতাড়ি চোয়াল দুটো একত্র করতে চেষ্টা করতে লাগল। অনেক কষ্টে আমার মুখটাকে সরিয়ে নিলাম. কিন্তু ভালুকটা আবার আমার মুখটাকে তার মুখের দিকে টানতে লাগল।

ভাবলাম, "এবার আমার শেষ ঘনিয়ে এসেছে!"

তারপরই মনে হল, বোঝাটা উঠে গেছে ; চোখ তুলে দেখলাম সে নেই। সে এক লাফে ছুটে চলে গেছ।

আমার বন্ধু ও দেমিয়ান যখন দেখল যে ভালুকটা আমাকে ফেলে দিয়ে বিপদে ফেলেছে তখন তারা আমাকে রক্ষা করতে ছুটে আসে। আমার বন্ধু তাড়াহুড়োয় ভুল করে চলতি পথ না ধরে গভীর বরফের ভিতর দিয়ে ছুটতে গিয়ে পড়ে যায়। সে যখন বরফ থেকে উঠে আসতে চেষ্টা করতে থাকে ততক্ষণে ভালুকটা আমাকে কামড়াতে চেষ্টা করছে। দেমিয়ান্-এর হাতে বন্দুক নেই, আছে শুধু একটা লাঠি ; তাই নিয়ে ছুটতে ছুটতে সে চেঁচাতে লাগল :

"মনিবকে খেয়ে ফেলল। মনিবকে খেয়ে ফেলল।"

দৌড়তে দৌড়তেই সে ভালুকটাকে বলল :

"এই বোকারাম! কি করছিস? চলে যা! চলে যা!"

ভালুকটা তার কথা শুনল ; আমাকে ছেড়ে দৌড়ে চলে গেল। আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন বরফের উপর এত রক্ত পড়েছিল যেন একটা ভেড়াকে কাটা হয়েছে এবং তার মাংস কেটে কেটে আমার চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যদিও তীব্র উত্তেজনার জন্য কোন ব্যথাই আমি বোধ করি নি।

ততক্ষণে আমার বন্ধু এসে পড়ল ; অন্য সকলেও সেখানে জড়ো হয়ে আমার ঘা পরীক্ষা করে তাতে বরফ লাগিয়ে দিল। আমি কিন্তু ক্ষতের কথা ভুলে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম : "ভালুকটা কোথায়? কোন্ দিকে গেল?"

হঠাৎ আমি শুনলাম :

"এই যে সে এখানে! সে এখানে!"

আমরা দেখলাম, ভালুকটা আবার আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। আমরা বন্দুক তুলে নিলাম, কিন্তু কেউ গুলি করবার আগেই সে এক দৌড়ে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সে এখন হিংস্র হয়ে উঠেছে; আবার আমাকে কামড়াতেই এসেছিল; কিন্তু এতগুলি মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে। তার পথের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার মাথা থেকে রক্ত পড়ছে। তাকে অনুসরণ করতে চাইলেও আমার ক্ষতের জন্য খুব যন্ত্রণা হওয়ায় অগত্যা একজন ডাক্তারের সন্ধানে আমরা শহরে গেলাম।

ডাক্তার রেশমী কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানগুলি বেঁধে দিল এবং শীঘ্রই ঘা শুকিয়ে গেল।

এক মাস পরে সেই ভালুকটিকে শিকার করতে আমরা আবার গেলাম, কিন্তু সেটাকে শেষ করবার সুযোগ আমি পেলাম না। সে জলাভূমির ভিতর থেকে কিছুতেই বেরিয়ে এল না; সেখানেই ঘুরে ঘুরে গর্জন করে বেড়াতে লাগল।

দেমিয়ান তাকে মারল। আমার গুলিতে ভালুকটার নীচের চোয়াল ভেঙে গিয়েছিল, একটা দাঁত উপড়ে গিয়েছিল।

জানোয়ারটা ছিল প্রকাণ্ড, আর তার কালো লোমশ চামড়াটাও ছিল চমৎকার।

তার ভিতরে খড় ভর্তি করে তাকে এখন আমার ঘরে রেখে দিয়েছি। আমার কপালের ঘা-টা এত সুন্দর ভাবে শুকিয়ে গেছে যে তার দাগটাও আর চোখে পড়ে না।

১৮৭২

মানুষ কী নিয়ে বাঁচে

What men live by

॥ ১ ॥

এক মুচি তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একজন চাষীর বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকত। তার নিজের ঘর-বাড়ি জমি-জমা কিছুই ছিল না। মুচির কাজ করেই সে তার সংসার চালাত।

তখন রুটির দাম ছিল চড়া, আর মজুরি ছিল কম; কাজেই রুজি-

রোজগার যা হত দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে যেত।

মুচি আর তার স্ত্রী একটিমাত্র চামড়ার কোট ভাগাভাগি করে গায়ে দিত। সে কোটটারও তখন জীর্ণ দশা। তাই সে একটা নতুন কোট করবার মত ভেড়ার চামড়া কিনবার জন্য তৈরি হতে লাগল।

শীত পড়বার মুখেই মুচির হাতে বেশ কিছু টাকা জমল: তার স্ত্রীর ট্রাংকে জমল তিন রুবল, আর গাঁয়ের চাষীদের কাছে তার পাওনা হল পাঁচ রুবল কুড়ি কোপেক।

একদিন সকালে মুচি তার বউয়ের সুতির জ্যাকট পরল শার্টের উপর, তার উপর চড়াল তার গরম কাফ্‌তান। তারপর তিন রুবল পকেটে ফেলে বেড়াবার একটা লাঠি কেটে নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

যেতে যেতে ভাবল: "চাষীদের কাছ থেকে আগে পাঁচ রুবল আদায় করব, তার সংগে যোগ করব পকেটের তিন রুবল; আর তাই দিয়ে কিনব নতুন কোটের জন্য একটা ভেড়ার চামড়া।"

গাঁয়ে পেঁৗছে প্রথমে গেল একজন চাষীর বাড়ি। চাষী তখন বাড়ি নেই। তার বউ বলল, "এখন তো কিছু দিতে পারব না, তবে এক হপ্তার মধ্যে টাকা-সমেত আমার স্বামীকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

গেল আর একজন চাষীর কাছে। সে দিব্যি করে বলল, তার হাত একেবারে খালি; তবু জুতো সারানো বাবদ দেয় কুড়ি কোপেকের ছোট ঋণটা কোন রকমে শোধ করে দেবে।

মুচি মনে মনে ভাবল, না-হয় ধারেই ভেড়ার চামড়াটা কেনা যাবে। কিন্তু চামড়ার দোকানির মুখে অন্য কথা। সে বলল, "পুরো টাকাটা দিয়ে পছন্দমত চামড়া নিয়ে যাও। দেনা শোধ করা যে কী জিনিস সে আমি ভালই জানি।"

সারা সকাল ঘুরে জুতো সেলাই বাবদ কুড়ি কোপেক আর মেরামতের জন্য একজোড়া জুতো হাতে পাওয়া ছাড়া আর কিছুই তার কপালে জুটল না।

মুচির মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কুড়ি কোপেক দিয়ে মদ খেয়ে বাড়ির পথ ধরল।

সকালবেলা থেকেই তার বেশ শীত-শীত করছিল। কিন্তু এখন মদ খাবার পরে গরম কোট ছাড়াই শরীর বেশ গরম লাগছিল। এক হাতে লাঠি দিয়ে পথের বরফের টুকরাগুলোকে ঠুকতে ঠুকতে এবং অন্য হাতে মেরামতির জুতোজোড়া ফিতে ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে পথ চলতে লাগল মুচি। আর নিজের মনেই বলতে লাগল:

"কোট ছাড়াই বেশ তো গরম লাগছে। খেয়েছি তো একটুখানি, তাতেই

তো দেখছি শিরার ভিতর যেন খই ফুটছে। তবে আর ভেড়ার চামড়ার দরকারটা কী। সব কিছু ভুলে বেশ তো মজাসে চলেছি! এই তো চাই। শুধু-শুধু আজে-বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? বিনা কোটে বেশ তো চলে যায়। সারা জীবনেও আমার কোটের কোন দরকার হবে না। অবশ্যি—বাড়িতে বউ আছে। সে আবার এই নিয়ে খিটিমিটি করবে। আচ্ছা, এও তো বড় লজ্জার কথা। তুমি একজনের কাজ করে দেবে আর সে তোমাকে কলা দেখাবে। ঠিক আছে, সবুর কর বাছাধন, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আমার টাকা না দিয়ে যাও, তাহলে তোমার মাথার টুপি আমি খুলে নেব। মজা মন্দ নয়! ওই আর একজন—কুড়ি কোপেক যেন আমাকে ভিক্ষা দিলেন! কুড়ি কোপেকে কী হবে? কিছুটা মদ গেলা যায়—এই পর্যন্ত। দিব্যি গেলে বলল, হাত একেবারে ফাঁকা। আমিও তো বলতে পারতাম, 'শুধু কি তোমার হাতই ফাঁকা? আমার হাত ফাঁকা নয়? তোমার তো ঘর-বাড়ি আছে, গরু-বাছুর আছে, সব আছে। আমার তো যা কিছু সব এই কাঁধে। তোমার খাবার তুমি ক্ষেতে ফলাও, আর আমাকে তা কিনতে হয়। ফি হপ্তায় তিন রুবলের তো রুটিই কিনতে হয়। তাও আবার কোনদিন হয়ত বাড়ি ফিরে দেখি রুটি ফুরিয়ে গেছে; তখন আবার দেড় রুবলের ধাক্কা। কাজেই আমার যা পাওনা আমাকে দিয়ে দাও।"

এমনিধারা ভাবতে ভাবতে মুচি চলেছে। রাস্তাটা মোড় ঘুরতেই একটা গির্জার কাছে এসে পৌঁছল সে। গির্জার গায়ে একটা সাদা-মত কি যেন তার নজরে পড়ল।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভাল করে নজর করেও জিনিসটা যে কি তা সে ঠিক ঠাওর করতে পারল না। একবার ভাবল, "এ রকম কোন পাথর তো ওখানে ছিল না! তবে কি ষাঁড়? সে রকমও তো মনে হয় না। দেখতে অনেকটা যেন মানুষের মত; তবে সারাটা দেহ কেমন যেন সাদা। তাছাড়া, মানুষ ওখানে করবেই বা কী?"

আরও কাছে এগিয়ে সবটা পরিষ্কার দেখতে পেল। কী আশ্চর্য, গির্জার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা মানুষ। মৃতই হোক আর জীবিতই হোক, বসে আছে একেবারে উলঙ্গ আর নিশ্চুপ হয়ে।

মুচি ভয়ে শিউরে উঠল। ভাবল, "নিশ্চয় কেউ লোকটাকে খুন করে জামাকাপড় খুলে নিয়ে এখানে ফেলে গেছে। পালাই বাবা, কী কাজ এসব ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে।"

মুচি লোকটাকে পেরিয়ে গেল। গির্জার অপর দিকে পৌঁছতেই লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আরও খানিক এগিয়ে পিছন ফিরে চাইতেই

দেখে, লোকটা যেন গির্জা থেকে সরে এসে নড়ছে, তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মুচি আরও ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, "ওর কাছে ফিরে যাব, না চলে যাব? যদি ফিরে যাই, কে জানে কোন্ ঝামেলায় পড়ব—লোকটা যে কে তাই বা কে জানে? ভাল হলে এভাবে আসবে কেন? কাছে গেলে যদি লাফিয়ে পড়ে গলা চেপে ধরে, ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া শক্ত হবে। যদি তা নাও করে, সে তো আমার ঘাড়ে চাপবে। ও রকম একটা ন্যাংটো লোককে নিয়ে করবই বা কী? নিজের গায়ের যৎসামান্য জামা-কাপড় তো ওকে খুলে দিতে পারব না! ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।"

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল মুচি। কিছুদূর যেতে না যেতেই বিবেক তাকে খোঁচাতে শুরু করল। আপন মনেই বলতে লাগল: "কী করছ তুমি সাইমন? একটা মানুষ মরতে বসেছে, আর তুমি তাকে ভয় পাচ্ছ? তুমি কি এতই ধনী যে টাকা-পয়সা চুরি যাবার ভয় করছ? ধিক তোমাকে সাইমন, ধিক!"

সাইমন মুখ ঘুরিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে চলল।

॥ ২ ॥

কাছে গিয়ে খুব ভাল করে তাকাল সাইমন। লোকটি যুবক, দেখতে স্বাস্থ্যবান, শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু শীতে যেন জমে যাচ্ছে, যেন খুব ভয় পেয়েছে: কোনরকমে হেলান দিয়ে বসে আছে, এমনকি সাইমনের দিকেও তাকাচ্ছে না, যেন দুটো চোখ তুলে তাকাবার ক্ষমতাও তার নেই।

সাইমন কাছে যেতেই, যেন এইমাত্র তাকে প্রথম দেখছে এমনিভাবে লোকটা সহসা মাথা ঘুরিয়ে দুই চোখ মেলে সাইমনের দিকে তাকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সাইমনেরও যেন লোকটিকে বড় ভাল লাগল। বুটজোড়া মাটিতে রেখে কোমরের বেল্ট খুলে তার উপর রাখল। খুলে ফেলল গায়ের কোট।

বলল, "কথা পরে বলবে। আগে জামাটা পরে নাও। এক্ষুনি। এই নাও।"

লোকটার কনুই ধরে সাইমন তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। উঠে দাঁড়াল লোকটা। সাইমন দেখল, একটি একহারা পরিচ্ছন্ন দেহ, সুডৌল হাত-পা, মিষ্টি একখানি মুখ। মুচি তার কোটটা লোকটির গলায় জড়িয়ে

দিল, কিন্তু সে ঠিক হাতার মধ্যে তার হাত দুখানি ঢোকাতে পারল না। সাইমন ঠিকমত হাত ঢুকিয়ে তাকে কোটটা পরিয়ে দিয়ে বেল্ট এঁটে দিল। তারপর মাথার টুপিটা খুলে লোকটার মাথায় পরিয়ে দেবার উপক্রম করতেই তার নিজের মাথাটাই বেশ ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। সে ভাবল, "আমার মাথাটা তো টাকে ভরা, আর ওর মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল।" তাই সাইমন টুপিটা আবার নিজের মাথায় বসিয়ে দিল।

"ওকে বরং বুটজোড়া দিই।" সাইমন বসে পড়ে বুটজোড়া তাকে পরিয়ে দিল। জামা-জুতো পরিয়ে মুচি বলল, "এই তো ঠিক হয়েছে ভাই, এইবার হাঁট, শরীরটাকে গরম করে নাও। হাঁটতে পারবে তো?"

উঠে দাঁড়িয়ে লোকটি সাইমনের দিকে তাকাল, কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না।

"আরে, কথা না বলছ কেন? সারা শীতকালটা তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। আমাকে তো বাড়ি পেঁছিতে হবে। নাও, এস, আর যদি দুর্বল বোধ কর আমার লাঠিটায় ভর দাও। পা-টা একটু ঝেড়ে নাও।"

লোকটি হাঁটতে শুরু করল। অনায়াসেই হাঁটতে লাগল। একটুও পিছিয়ে রইল না।

পথে যেতে যেতে সাইমন বলল, "তুমি কোথায় থাক বল?"

"এ অঞ্চলে নয়।"

"সে তো জানি। এ অঞ্চলের সব লোককে আমি চিনি। কিন্তু ওই গির্জের কাছে তুমি এলে কী করে?

"বলতে পারব না।"

"কেউ তোমাকে মেরেছিল বলে মনে হচ্ছে?"

"কেউ আমাকে মারে নি। ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন।"

"ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছেন, সে তো সকলেই জানে। সেই রকম তোমারও তো একটা আস্তানা কোথাও আছে। তুমি কোথায় যাবে?"

"আমার কাছে সব জায়গাই সমান।"

সাইমন বিস্মিত হল। লোকটি উদ্ধত নয়, তার কথাগুলি শান্ত, কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছুই সে বলতে চায় না। সাইমন ভাবল, "কত কিছুই তো আমরা বুঝি না।" তারপর লোকটিকে বলল :

"ঠিক আছে, নিজের আস্তানায় যাবার আগে তুমি আমার বাড়িতেই চল।"

সাইমন হাঁটতে লাগল। লোকটিও তার পাশে-পাশেই চলল।

বাতাস উঠল। সাইমনের শার্টের ভিতর ঢুকতে লাগল। মদের গরম কেটে গিয়ে বেশ শীত করছে। যেতে যেতেই সে হাঁচতে লাগল। স্ত্রীর

জ্যাকেটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে ভাবতে লাগল : "ভেড়ার চামড়া আমাকে কোথায় টেনে এনেছে! বেরিয়েছিলাম ভেড়ার চামড়ার খোঁজে, আর ফিরছি যখন তখন নিজের কোটটাও গায়ে নেই, উপরন্তু একটা ন্যাংটো লোককে নিয়ে চলেছি সংগে করে। মাত্রোনা আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না!"

শেষের কথাটা মনে হতেই সাইমন ভীত হয়ে পড়ল। তবু লোকটির দিকে তাকাতেই তার মনে পড়ে গেল গির্জের কাছে তার সেই চাউনির কথা। সংগে সংগে মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

॥ ৩ ॥

সাইমনের বউ সকাল-সকাল সব কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছে। জ্বালানির কাঠ কেটেছে, জল এনেছে, ছেলেকে খাইয়েছে, নিজেও একটু মুখে দিয়েছে, তারপর বসে ভাবছে, কখন রুটি বানাবে : আজ না কাল? পাঁউরুটির উপরের পুরু ছালটা তো এখনও আছে। সে ভাবল, "সাইমন যদি দুপুরের খাবারটা খেয়ে থাকে, রাতে আর বেশি কিছু খাবে না। তাহলে যে রুটি আছে কাল চলে যাবে।"

রুটির টুকরোটা ঘোরাতে ঘোরাতে মাত্রোনা ভাবল : "আজ আর রুটি বানাচ্ছি না। যা ময়দা আছে তাতে আর একখানি মাত্র পাঁউরুটি হবে। সেটা দিয়ে শুক্রবার চালিয়ে দেব।"

রুটিটা একপাশে সরিয়ে রেখে মাত্রোনা টেবিলে বসে স্বামীর শার্টের ফুটো সেলাই করতে লাগল। সেলাই করতে করতে সে স্বামীর কথাই ভাবতে লাগল; ভাবতে লাগল তার চামড়া কেনার কথা।

"চামড়ার দোকানি তাকে না ঠকালে বাঁচি! লোকটা আবার যা সোজা সরল! নিজে সে কাউকে ঠকাবে না, কিন্তু একটা ছোট ছেলেও তাকে বোকা বানাতে পারে। আট রুবল তো চাট্টিখানি কথা নয়! তা দিয়ে খুব ভাল ভেড়ার চামড়ার কোট কেনা যায়। ট্যান-করা চামড়া না হলেও মোটামুটি ভাল কোটই হবে। একটা কোটের অভাবে গত শীতে বড়ই কষ্ট গেছে। নদীতে যেতে পারি না, কোথাও বেরোতে পারি না। লোকটা যখন সব কিছু গায়ে চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, আমার তো গায়ে দেবার কিছুই থাকত না। আজ যদিও খুব সকালে বেরোয় নি, তবু এতক্ষণ তো তার ফিরে আসা উচিত। জানি না আবার কোথাও মজা লুটতে বসেছেন কি না!"

মাত্রোনা যখন এইসব ভাবছে তখন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল;

কেউ যেন বাড়িতে ঢুকল। সেলাইয়ের ভিতর সূঁচটা আটকে রেখে মাত্রোনা বাইরে মুখ বাড়াল। আরে—এ যে দু-জন বাড়িতে ঢুকছে—সাইমন, আর তার সঙ্গে একটি অপরিচিত মানুষ! মাথায় টুপি নেই, পায়ে ভারি বুট।

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মুখে ভদ্‌কার গন্ধ পেল সে। তাহলে তো মজা লুটেই এসেছেন! তার উপর এতক্ষণে নজরে পড়ল তার গায়ে কোটটাও নেই, আছে শুধু তারই জ্যাকেটটা। হাতেও কিছু নেই; তাই মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মাত্রোনার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। সে ভাবল, "এ তো মদ খেয়ে সব টাকা উড়িয়ে এসেছে। এই বাজে লোকটার সঙ্গে ফুর্তি-ফার্তা করে তাকে বাড়ি অবধি নিয়ে এসেছে।"

মাত্রোনার সামনে দিয়েই তারা ঘরে ঢুকল। ভাল করে সে দেখতে পেল আগন্তুক লোকটিকে। একটি হ্যাংলা চেহারার যুবক, গায়ে তাদেরই কোট, মাথায় টুপি নেই। কোটের নিচে শার্টও নেই। ভিতরে ঢুকে লোকটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, একটুও নড়ল না, চোখ তুলে তাকালও না। মাত্রোনা ভাবল লোকটা নিশ্চয় খারাপ, তাই ভয় পেয়েছে।

মাত্রোনা ভুরু কুঁচকে স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল। দেখতে লাগল ওরা কী করে।

সাইমন টুপি খুলে বেঞ্চিটার উপর বসল, যেন কিছুই হয় নি। বলল, "আরে মাত্রোনা, রাতের খাবারটা বানাও।"

মাত্রোনা অস্ফুটভাবে কি যেন বলে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দু-জনকে দেখতে লাগল আর মাথা নাড়তে লাগল। সাইমন বুঝল বউয়ের মেজাজ বিগড়েছে, কিন্তু কিছু তো করবার নেই। আগন্তুকের হাত ধরে সে বলল, "এস ভাই, এইখানে বস, কিছু খাওয়া যাক।"

আগন্তুক সাইমনের পাশে বেঞ্চিটাতে বসল। সাইমন উঠে গিয়ে বউকে বলল, "কি রান্না করেছ বল।"

মাত্রোনা রাগে ফেটে পড়ল: "রান্না করেছি, কিন্তু তোমার জন্যে না। মদ খেয়ে তো বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। গেলে কোট কিনতে, ফিরে এলে নিজের কোটটাও খুইয়ে। আবার একটা ন্যাংটো রাস্তার লোককে ধরে এনেছ সঙ্গে করে। তোমাদের মত মাতালদের জন্য আমি রান্না করি নি।"

"দেখ মাত্রোনা, অকারণে বক-বক করো না। আগে শোন লোকটা কেমন......"

"আগে বল, টাকা কী করেছ।"

সাইমন কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নোট বের করে দেখাল।

"এই দেখ টাকা। ত্রিফোনফ টাকা দেয় নি, কাল দেবে বলেছে।"

মাত্রোনার রাগ আরও চড়ে গেল। কোট তো আনেই নি, আবার তাদের একটিমাত্র কোট খয়রাত করেছে একটা ন্যাংটো লোককে। তাকে বাড়ি অবধি নিয়ে এসেছে।

টেবিলের উপর থেকে টাকাটা ছোঁ মেরে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে রাখতে সে বলল, "কিছু খাবার নেই ; যত রাজ্যের ন্যাংটো মাতালদের আমি খাওয়াতে পারব না।"

"আঃ মাত্রোনা, চুপ কর! আগে শোন লোকটা কে…"

"একটা বোকা মাতালের কথা আবার কী শুনব! সাধে কি আর তোমার মত একটা মাতালকে বিয়ে করতে আমি গররাজি হয়েছিলাম! মা যা কিছু জামা-কাপড় দিয়েছিল সব তুমি মদে উড়িয়েছ। গেলে চামড়া কিনতে, তাও মদ খেয়ে উড়িয়ে দিলে।"

সাইমন বউকে বোঝাতে চাইল যে সে মাত্র কুড়ি কোপেকের মদ খেয়েছে, আর সে লোকটাকে কী অবস্থায় পেয়েছে,—কিন্তু এক কথা বলবার আগে বউ তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিল। ক্রমে দশ বছর আগে যা ঘটেছিল সে-সব কথাও এসে পড়ল।

বক্-বক্ করতে করতে এক সময় মাত্রোনা সাইমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে উঠল, "শিগ্গির আমার জ্যাকেট দাও! ওটাই তো আমার একমাত্র সম্বল, তাও তুমি নিয়ে নিয়েছ নিজে গায় দেবে বলে। এক্ষুনি ফিরিয়ে দাও, মাতাল, কুকুর কোথাকার! তারপর জাহান্নামে যাও!"

সাইমন জ্যাকেটটা খুলতে চেষ্টা করতেই মাত্রোনা সেটা ধরে দিল টান। ফলে তার সেলাই গেল ছিঁড়ে। সেটাকে টেনে নিয়ে নিজের মাথায় জড়িয়ে মাত্রোনা দরজার দিকে পা বাড়াল।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। তার মনে হল, রাগ দমন করা দরকার ; এ লোকটা কে তাও জানা দরকার।

॥ ৪ ॥

মাত্রোনা থামল। বলল : "লোকটা যদি ভালই হবে তাহলে সে এমন ন্যাংটো হত না যে গায়ে দেবার একটা শার্টও জোটে নি। আর তুমি যদি ভালভাবেই ছিলে সারাদিন তাহলে এই স্যাঙাৎকে কোত্থেকে জুটিয়েছ সেকথা এতক্ষণ আমাকে খুলে বলতে।"

সাইমন বলল, "বেশ তো, এখুনি সব বলছি। আমি হেঁটে আসছিলাম ; দেখি গির্জার পাশে লোকটি বসে আছে ; গায়ে কিছু নেই, শীতে জমে গেছে।

ভেবে দেখ, লোকটি একেবারে উলঙ্গ, আর এটা গরমি কাল নয়। ঈশ্বরই আমাকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলেন, নইলে সে নির্ঘাত মারা যেত। বল, তখন আমি কী করি? কোন কিছুই তো অকারণে ঘটে না। আমি তাকে হাত ধরে তুললাম, জামা-জুতো পরালাম, এখানে নিয়ে এলাম। মনটাকে একটু নরম কর মাত্রোনা ; এ রকম করা পাপ। মনে রেখ, আমরাও একদিন মরব।"

মাত্রোনা আবার বকুনি দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আগন্তুকের দিকে তার চোখ পড়ল। সে চুপ করে গেল। আগন্তুক তখনও বেঞ্চির এক কোণে চুপ করে বসে আছে। দু-খানি হাত রেখেছে হাঁটুর উপর, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর। চোখ দুটি বুজে আছে, ভুরু দুটো কুঁচকে আছে, যেন ভিতর থেকে কোন কিছু তাকে আঘাত করছে।

মাত্রোনা চুপ করে গেল।

সাইমন বলল, "মাত্রোনা, তোমার মধ্যে কি ঈশ্বর নেই?"

এই কথা শুনে মাত্রোনা আবার আগন্তুকের দিকে চাইল। সহসা তার মনটা গলে গেল। দরজার কাছ থেকে সরে সে স্টোভের কাছে গেল। খাবার তৈরি করল। টেবিলের উপর একটি ছোট বাটি রেখে তাতে কবাস ঢালল, রুটির শেষ টুকরোটা এনে দিল, তারপর দু-জনের দিকে কাঁটা-চামচ এগিয়ে দিল।

"এবার খাও", সে বলল।

সাইমন আগন্তুককে টেবিলে ডেকে নিল।

"বস হে ভাল মানুষ", সে বলল।

সাইমন রুটি কেটে খেতে শুরু করল। মাত্রোনা টেবিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে দেখতে লাগল। বেচারির জন্য এবার দুঃখ হল তার। তাকে যেন ভালও লাগছে এখন।

সহসা আগন্তুকও যেন খুশি হয়ে উঠল। থেমে গেল তার ভুরুর কোঁচকানি। মাত্রোনার দিকে দু-চোখ তুলে তাকিয়ে সে হেসে ফেলল।

খাওয়া হয়ে গেল। টেবিল পরিষ্কার করে মাত্রোনা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করল : "তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"এ অঞ্চল থেকে নয়।"

"রাস্তার ধারে এলে কেমন করে?"

"বলতে পারি না।"

"তোমার সব কিছু চুরি করেছিল কে?"

"ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।"

"তাই কি তুমি ন্যাংটো হয়ে সেখানে পড়ে ছিলে?"

"তাই আমি সেখানে পড়ে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম। সাইমন আমাকে

দেখতে পেল ; তার দয়া হল, কোট খুলে আমাকে পরিয়ে দিল। এখানে আসতে বলল। এখানে এলে তুমি আমাকে খাদ্য দিলে, পানীয় দিলে, আমাকে দয়া করলে। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন।"

মাত্রোনা উঠে দাঁড়াল। সাইমনের যে শার্টটা সে সেলাই করছিল সেটা জানালার তাক থেকে তুলে নিয়ে আগন্তুককে দিল। খুঁজে-পেতে একটা ট্রাউজারও এনে দিল।

"তোমার তো শার্ট নেই। এইগুলো প'রে ঐ তাকের উপরে বা স্টোভের উপরে যেখানে খুশি শুয়ে পড়।"

আগতুক গায়ের কোটটা খুলে শার্ট ও ট্রাউজার পরে তাকের উপরে শুয়ে পড়ল। মাত্রোনা বাতি নিভিয়ে দিয়ে কোটটা নিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল। কোটের একটা কোণ দিয়ে শরীরটাকে ঢাকলেও তার চোখে ঘুম এল না। আগন্তুকের চিন্তা তার মন থেকে কিছুতেই গেল না।

তার মনে পড়ল, রুটির শেষ টুকরোটাও তারা খেয়ে ফেলেছে। কালকের জন্য কিছুই নেই ; মনে পড়ল, শার্ট আর ট্রাউজার দুটোই সে দান করেছে। অমনি তার মন খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল আগন্তুকের হাসিটি ; অমনি আবার মন খুশি হল।

মাত্রোনা অনেকক্ষণ জেগে রইল। একসময় তার খেয়াল হল সাইমনও ঘুমোয় নি; কোটটা সে নিজের গায়ে টেনে নিয়েছে।

"সাইমন!"

"উঁ!"

"রুটির শেষ টুকরোটাও আমরা খেয়ে ফেলেছি। কালকের জন্য কিছু বানিয়েও রাখি নি। কাল কী হবে আমি জানি না। প্রতিবেশী মালানাইয়ার কাছে কিছু ধার চাইতে হবে।"

"আমরা বেঁচেই থাকব ; খেতেও পাব।"

বউটি চুপ করে রইল।

"যাই হোক, লোকটি নিশ্চয়ই ভাল ; তবে, নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলে না এ. যা।"

"কথা বলার তার দরকার নেই।"

"সাইমন!"

"উঁ!"

"আমরা তো দিলাম, কিন্তু আমাদের কেউ কিছু দেয় না কেন?"

কী জবাব দেবে সাইমন জানে না। সে বলল, "পরে কথা হবে।"

সে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৫ ॥

পরদিন সকালে সাইমনের ঘুম ভাঙল। ছেলেমেয়েরা তখনও ঘুমুচ্ছে। বউ গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি রুটি কর্জ করতে। পুরোনো ট্রাউজার আর শার্ট পরে আগন্তুক উপরের দিকে তাকিয়ে বেঞ্চিতে বসে আছে। তার মুখখানি আজ কালকের চাইতেও উজ্জ্বল।

সাইমন বলল, "দেখ ভাই, পেট চায় খাবার, আর শরীর চায় জামা-কাপড়। প্রত্যেককেই উপার্জন করতে হবে। তুমি কী কাজ জান?"

"আমি কিছুই জানি না।"

সাইমন বিস্মিত হয়ে বলল, "ইচ্ছা থাকলে মানুষ সব কিছু শিখতে পারে।"

"মানুষ কাজ করে; আমিও কাজ করব।"

"তোমার নাম কী?"

"মিখাইল।"

"দেখ মিখাইল, নিজের সম্পর্কে তুমি কিছুই বলতে চাও না, সে তোমার খুশি। কিন্তু উপার্জন তো তোমাকে করতেই হবে। আমি যা কাজ দিই তা করবে। তাহলে আমি তোমাকে খেতে দেব।"

"ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই শিখব। বলে দাও কী করতে হবে।"

সাইমন একটা সুতো নিয়ে আঙুলে পাক দিয়ে একটা গিঁট তৈরি করল।

"তুমি দেখ, কাজটা খুব শক্ত নয়......"

মিখাইল দেখল, সুতোটা নিয়ে আঙুলে পাক দিল; দেখতে দেখতে একটা গিঁটও দিয়ে ফেলল।

সাইমন দেখিয়ে দিল কেমন করে সেলাই করতে হয়। মিখাইল বেশ তাড়াতাড়ি সেটা রপ্ত করে নিল। মোটা সুতো দিয়ে কী করে সেলাই করতে হয় মিখাইল তাও শিখে ফেলল।

সাইমন যা কিছু দেখায় তাই সে শিখে ফেলে। তিন দিনের দিন থেকে সে এমনভাবে সেলাইয়ের কাজ করতে লাগল যেন সারা জীবন সে সেলাই করে আসছে। তার কাজে কখনও ভুল হয় না। সে খায়ও কম। শুধু মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নেয়, আর সেই সময়টা আকাশের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। কখনও সে ঘর ছেড়ে বাইরে যায় না; একটি বাজে কথা বলে না; হাসিঠাট্টাও করে না।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় মাত্রোনা যখন তার জন্যে খাবার তৈরি করছিল কেবলমাত্র সেই দিন তারা তাকে একবার হাসতে দেখেছিল।

॥ ৬ ॥

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, বছরও কেটে গেল। মিখাইল সাইমনের বাড়িতেই আছে, তার কাজই করছে। মিখাইলের নাম ছড়িয়ে পড়ল যে তার মত সুন্দর আর মজবুত জুতো আর কেউ সেলাই করতে পারে না। সারা জেলার লোক জুতোর জন্য সাইমনের বাড়ি আসতে লাগল। তার বরাত ফিরে গেল।

একদিন শীতকালে সাইমন বসে মিখাইলের সংগে কাজ করছে এমন সময় তিন ঘোড়ার একখানি ঘণ্টা-বাঁধা স্লেজগাড়ি তার কুড়ের দরজায় এসে দাঁড়াল। মিখাইল ও সাইমন জানালা দিয়ে তাকাল; স্লেজখানি তার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়েছে। একটি ছোট ছেলে কোচয়ানের আসন থেকে লাফ দিয়ে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ফার কোট গায়ে দিয়ে একজন ভদ্রলোক স্লেজ থেকে নামলেন। নেমে সাইমনের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। মাত্রোনা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মাথা নিচু করে তিনি ঘরে ঢুকলেন। আবার যখন মাথা উঁচু করলেন তখন মাথা প্রায় ছাদ ছোঁয়-ছোঁয়। ঘরের একটা কোণই তিনি দখল করে ফেললেন প্রায়।

সাইমন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। হাঁ করে ভদ্রলোককে দেখতে লাগল। এ রকম মানুষ সে এর আগে আর কখনও দেখে নি। সাইমন নিজে রোগা, মিখাইলও তাই; মাত্রোনা তো একগাছি শুকনো লাঠির মত দেখতে। কিন্তু ইনি—যেন অন্য জগতের লোক; ফোলা-ফোলা লাল মুখ, ষাঁড়ের মত ঘাড়, ঢালাই লোহা দিয়ে গড়া দেহ।

ভদ্রলোক হাঁপাতে লাগলেন। গায়ের কোট খুলে বেঞ্চিতে বসে বললেন: "বড় মুচি কে?"

সাইমন সামনে এগিয়ে বলল: "আজ্ঞে আমি।"

ভদ্রলোক চাকরটাকে চেঁচিয়ে বললেন: "এই—ফেড্‌কা, চামড়াটা নিয়ে আয়।"

ছেলেটা দৌড়ে একটা বাণ্ডিল নিয়ে এল। ভদ্রলোক বাণ্ডিলটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

"এটা খোল্‌।" তিনি বললেন। ছেলেটা বাণ্ডিলটা খুলে ফেলল।

চামড়াটা দেখিয়ে ভদ্রলোক সাইমনকে বললেন, "দেখ মুচি, বেশ মন দিয়ে শোন। এটা দেখতে পাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জিনিসটা কেমন ঠিক বুঝতে পারছ?"

সাইমন হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলল: "ভাল চামড়া।"

"ভালই বটে! বোকারাম, এমন চামড়া তুমি জীবনে দেখ নি! এটা

জার্মানীর জিনিস ; দাম কুড়ি রুবল ।"

সাইমন ভয় পেয়ে বলল : "এমন জিনিস আমরা কোথায় দেখব !"

"সে যাহোক। এই চামড়া দিয়ে তুমি আমাকে নতুন জুতো তৈরি করে দিতে পারবে কি ?"

"আজ্ঞে পারব।"

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন : "শুধু পারব বললেই হল না। কী জিনিস সেলাই করতে হবে বুঝতে পারছ কি ? আমাকে এমন জুতো তৈরি করে দিতে হবে যা এক বছরের মধ্যে ছিঁড়বে না, কুঁচকাবে না, বা সেলাই খুলে যাবে না। যদি পার, চামড়াটা নিয়ে কাটাকুটি কর ; যদি না পার নিয়ো না, কেটোও না। আমি আগেই বলে রাখছি, এক বছরের আগে যদি জুতোর সেলাই ছেঁড়ে বা জুতো দুমড়ে যায়, আমি তোমাকে জেলে দেব ! আর এক বছরের মধ্যে যদি না ছেঁড়ে বা না কুঁচকে যায়, তাহলে তোমাকে মজুরি দেব দশ রুবল।"

সাইমন ভয় পেয়ে গেল। কী যে বলবে বুঝতে পারছে না। মিখাইলের দিকে তাকিয়ে তাকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে বলল : "ভাই, কী করি ?"

মিখাইল মাথা নেড়ে বলল : "কাজটা নিয়ে নিন।"

মিখাইলের কথামত সাইমন এমন জুতো তৈরি করতে রাজি হল যা এক বছরের মধ্যে কুঁচকাবে না বা ছিঁড়বে না।

ভদ্রলোক চাকরটাকে চেঁচিয়ে ডেকে বাঁ পায়ের বুট খুলতে বললেন। তারপর পা-টা বাড়িয়ে দিলেন।

"মাপ নাও।"

সাইমন আঠারো ইঞ্চি লম্বা একখানা কাগজ সেলাই করে সেটা বেশ ভাল করে মুছে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। ভদ্রলোকের মোজা যাতে নোংরা না হয় সে জন্যে অ্যাপ্রনে হাত দুটো ভাল করে মুছে নিল। তারপর মাপ নিতে আরম্ভ করল। পায়ের তলা মাপল, পাতার উপরটা মাপল, তারপর পায়ের গুলি মাপতে গেল। কিন্তু কাগজটা ততদূর পৌঁছল না। সেই বিরাট চরণের গুলিটা একটা গাছের গুঁড়ির মত।

"দেখো যেন পায়ে না লাগে।"

সাইমন আর-এক টুকরো কাগজ জোড়া দিতে লাগল। ভদ্রলোক বসে মোজার মধ্যেই আঙুল নাড়তে লাগলেন। বাইরে তখন অনেক লোক উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

ভদ্রলোকের নজর পড়ল মিখাইলের উপর।

"ও কে ? ও কি তোমার লোক ?"

"ও আমার কারিকর। ও-ই তো জুতো সেলাই করবে।"

ভদ্রলোক মিখাইলকে বললেন: "দেখ হে, মনে রেখো এমনভাবে সেলাই করতে হবে যেন এক বছরের মধ্যে কিছু না হয়।"

সাইমন মিখাইলের দিকে তাকাল। সে দেখল, মিখাইল ভদ্রলোকের দিকে না তাকিয়ে তাঁর পিছনে ঘরের কোণে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে মৃদু হেসে উঠল আর তার সারা শরীর ঝলমল করে উঠল।

"হাঁ করে দেখছ কী বোকারাম? বরং নজর রেখো জুতো যেন ঠিক সময় তৈরি হয়।"

আর মিখাইল বলল: "ঠিক যে সময়ে দরকার হবে তখনি তৈরি পাবেন।"

"তাহলেই হল।"

বুট পায়ে দিয়ে ফার কোট গায়ে দিয়ে ভদ্রলোক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু মাথা নীচু করতে ভুল হওয়ায় তার মাথাটা লিণ্টেলের সঙ্গে ঠোক্কর খেল।

একটা শাপ-মন্যি করে মাথা ঘসতে ঘসতে ভদ্রলোক স্লেজে চেপে চলে গেলেন।

যাবার পরে সাইমন বলল: "ব্যাটা যেন প্যাহাড়। হাতুড়ি পিটেও তুমি ওকে মারতে পারবে না। মাথায় লেগে দরজাটা জখম হল, কিন্তু ওর কিছুই হল না।"

মাত্রোনা বলল: "ওদের যেমন জীবন তাতে শক্ত-পোক্ত তো হবেই। এ রকম লোহার মানুষকে মৃত্যুও ছুঁতে পারে না।"

॥ ৭ ॥

সাইমন মিখাইলকে বলল:

"কাজটা যখন নিয়েছি, দেখো যেন কোন রকম গোলমালে না পড়ি। চামড়াটা দামী, ভদ্রলোকও বদমেজাজী। দেখতে হবে যাতে কোন ভুল না হয়। দেখ, তোমার নজর আমার চাইতে সূক্ষ্ম। আর তোমার হাতও এখন আমার হাতের চেয়ে পাকা। মাপজোপগুলো নিয়ে চামড়াটা তুমিই কাট, আমি বরং উপরের চামড়াটা সেলাই করব।"

সেই কথামত মিখাইল ভদ্রলোকের চামড়াটা নিয়ে টেবিলের উপরে পাতল। দুই ভাঁজ করে কাঁচি নিয়ে কাটতে শুরু করল।

ঘরে ঢুকল মাত্রোনা। মিখাইলের চামড়া কাটা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। মুচির কাজ মাত্রোনাও ভালই বোঝে। সে দেখল, মিখাইল চামড়াটা

বুটের মত করে না কেটে গোল গোল টুকরো করে কাটছে। কিছু বলতে গিয়েও মাত্রোনা ভাবল : "হয়ত ভদ্রলোকদের বুট কেমন করে বানায় আমি জানি না। মিখাইল নিশ্চয় আমার থেকে ভাল জানে। কাজেই আমার কিছু না বলাই ভাল।"

কাটা শেষ করে মিখাইল সুতো নিয়ে সেলাই করতে শুরু করল,—বুট-জুতোর জন্য দরকার জোড়া সুতোর বদলে চটিজুতোর মত একটা সুতো দিয়ে।

মাত্রোনা আবারও অবাক হয়ে গেল। কিন্তু এবারও সে কিছু বলল না। মিখাইল সেলাই করেই চলল।

বেলা দুপুর হলে সাইমন উঠে দাঁড়িয়ে চোখ ফেরাল। একি! ভদ্রলোকের চামড়াটা দিয়ে মিখাইল যে একজোড়া চটি তৈরি করে ফেলেছে!

সাইমন আর্তনাদ করে উঠল। ভাবল: "আজ এক বছর মিখাইল এখানে আছে, কোনদিন একটা ভুল করে নি, আজ সে এমন মারাত্মক ভুল কেমন করে করল? ভদ্রলোক অর্ডার দিয়ে গেলেন উঁচু বুটের, আর ও তৈরি করে বসেছে চটিজুতো! চামড়াটাকেই যে নষ্ট করেছে! ভদ্রলোককে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? ও রকম চামড়াও তো পাওয়া যাবে না।"

তখন সে মিখাইলকে বলল: "এ তুমি কী করেছ ভাই? তুমি যে আমার গলা কেটেছ! ভদ্রলোক অর্ডার দিয়ে গেলেন বুটের, আর তুমি এ কী করেছ?"

সাইমন সবে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। সাইমন ও মিখাইল জানালা দিয়ে তাকাল। ঘোড়ায় চড়ে একটি লোক এসেছে। ঘোড়াটাকে বাঁধছে।

তারা দরজা খুলে দিল। সেই ভদ্রলোকের একটি চাকর ভিতরে ঢুকল।

"শুভদিন!"

"শুভদিন। কী চাই?"

"কর্ত্রী আমাকে পাঠালেন সেই বুটের ব্যাপারে।"

"বুটের আবার কী হল?"

"কী হলই বটে! আমার মনিবের আর বুটের দরকার নেই। আমার মনিব মারা গেছেন।"

"বল কী!

"এখান থেকে তিনি বাড়িও ফেরেন নি, স্লেজের মধ্যেই মারা গেছেন। আমরা যখন বাড়ি পৌঁছলাম, সকলে তাঁকে ধরাধরি করে নামাতে এল; কিন্তু তিনি একটা বস্তার মত গড়িয়ে পড়লেন। সব শেষ, তিনি তখন মারা গেছেন। তাঁকে স্লেজ থেকে নামিয়ে আনতে না আনতেই কর্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন: 'মুচিকে বলবে, একজন ভদ্রলোক চামড়া জমা দিয়ে একজোড়া

বুটের অর্ডার দিয়েছিলেন, সে বুট আর দরকার নেই, বরং যত শীঘ্র সম্ভব সেই চামড়া দিয়ে শবাধারের জন্য একজোড়া চটি যেন তৈরি করে দেয়। যতক্ষণ তৈরি না হয় অপেক্ষা করে চটি নিয়ে তবে আসবে।' তাই আমি এসেছি।"

মিখাইল টেবিল থেকে টুকরো চামড়াগুলো নিয়ে গোল পাকাল; তৈরি চটিজোড়া একসঙ্গে বেঁধে অ্যাপ্রন দিয়ে ভাল করে মুছল, তারপর সেগুলি ছেলেটাকে দিয়ে দিল। ছেলেটা হাত পেতে চটিজোড়া নিল।

"বিদায়, মশায়রা! শুভদিন!"

॥ ৮ ॥

আরও এক বছর কেটে গেল। তারপর দু-বছর। ক্রমে সাইমনের বাড়িতে মিখাইলের দু-বছর হল। সে ঠিক আগের মতই আছে। কখনও কোথাও যায় না, একটা বাজে কথা বলে না। এতদিনের মধ্যে মাত্র দু-বার হেসেছে: একবার, যখন স্ত্রীলোকটি তার জন্য রাতের খাবার তৈরি করেছিল, আর দ্বিতীয়বার সেই ভদ্রলোককে দেখে। লোকটিকে নিয়ে সাইমনেরও খুশির সীমা নেই। কোথা থেকে সে এসেছে, এ কথা সে আর জিজ্ঞাসা করে না। তার একমাত্র ভয়, পাছে মিখাইল চলে যায়।

একদিন, দু-জনই বাড়িতে। মুচির বউ উনুনে পাত্র চাপাচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা বেঞ্চির পাশে দৌড়োদৌড়ি করছে আর মাঝেমাঝে জানালা দিয়ে দেখছে। একটা জানালার পাশে বসে সাইমন সেলাই করছে। আরেকটা জানালার পাশে বসে মিখাইল জুতোর গোড়ালিতে কাঁটা মারছে।

সাইমনের ছোট ছেলে দৌড়ে এসে মিখাইলের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে জানালা দিয়ে তাকাল।

"মিখাইলকাকা, দেখ, ছোট-ছোট মেয়েদের নিয়ে একজন বণিকের স্ত্রী এই দিকেই আসছে। একটি ছোট মেয়ে আবার খোঁড়া।"

সঙ্গে সঙ্গে মিখাইল হাতের কাজ রেখে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পথের দিকে তাকাল।

সাইমন অবাক হয়ে গেল। এর আগে মিখাইল তো কখনও রাস্তার দিকে তাকায় নি! অথচ এখন সে কি যেন দেখবার জন্য জানালার একেবারে ধার ঘেঁষে বসেছে। সাইমনও জানালা দিয়ে তাকাল। সেও দেখল, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা একটি স্ত্রীলোক তার বাড়ির দিকেই আসছে। দুটি মেয়েকে সে হাত ধরে নিয়ে আসছে। দুটি মেয়ে দেখতে একেবারে একরকম। দুজনেরই

ফার কোট আর গরম স্কার্ফ গায়ে। দু-জনকে আলাদা করাই মুস্কিল, শুধু একজনের পা একটু বাঁকা, সে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

স্ত্রীলোকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল এবং মেয়েদুটিকে সামনে রেখে ঘরের ভিতরে পা দিল।

"নমস্কার।"

"আসুন। কী চাই আপনার?"

স্ত্রীলোকটি টেবিলের পাশে বসল। মেয়েদুটি তার হাঁটু ঘেঁষে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটি বলল, "এই মেয়েদের বসন্তকালে পরবার মত চামড়ার জুতো চাই।"

"ভাল কথা, করে দেব। এত ছোট জুতো এর আগে আমরা করি নি, কিন্তু সব রকমই আমরা করতে পারি। আগাগোড়া চামড়ার জুতোও করাতে পারেন, আবার কাপড়ের লাইনিং দেওয়াও করাতে পারেন। এই আমার বড় কারিকর মিখাইল।"

সাইমন মিখাইলের দিকে তাকাল। সে তখন হাতের কাজ রেখে মেয়ে-দুটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে।

সাইমন খুবই বিস্মিত হল। এ কথা ঠিক যে মেয়ে দুটি দেখতে খুব সুন্দর। কালো চোখ, গোলগাল লাল টুকটুকে শরীর। গায়ের কোট আর স্কার্ফও সুন্দর। কিন্তু মিখাইল কেন যে একান্ত পরিচিতের মত তাদের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে কিছুতেই বুঝতে পারল না।

যাহোক সাইমন স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দর-দাম করতে লাগল। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলে মাপ নিতে বসল। খোঁড়া মেয়েটাকে কোলের উপর তুলে স্ত্রীলোকটি বলল: "এর দু-পায়ের মাপ নাও; একপাটি জুতো কর খোঁড়া পায়ের মাপে, আর তিন পাটি কর ভাল পায়ের মাপে। তাহলেই হবে। এদের দু-জনের পা ঠিক এক মাপের। এরা যমজ।"

মাপ নেবার পর সাইমন বলল, "আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি, এরকম কেমন করে হল? জন্মের থেকেই কি এই রকম?"

"না, ওর মা-ই পা-টা ভেঙে ফেলেছিল।"

এই সময় মাত্রোনা ঘরে ঢুকে বলল, "আপনি তাহলে ওদের মা নন?"

"না গো ভালমানুষের মেয়ে, আমি ওদের মা নই, কোনরকম আত্মীয়ও নই। এদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। আমি ওদের লালন-পালন করেছি মাত্র।"

"আপনার মেয়ে নয়, অথচ আপনি ওদের এত ভালবাসেন!"

"ভাল না বেসে কী করি? এদের দু-জনকেই যে আমার বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি। আমার নিজের একটি সন্তান ছিল, ঈশ্বর তাকে নিয়ে

নিলেন। এদের যত ভালবাসি তত ভাল বুঝি সেটাকেও বাসতাম না।"

"এরা তাহলে কার মেয়ে?"

স্ত্রীলোকটি বলতে আরম্ভ করল।

"ছ-বছর আগেকার কথা। এক সপ্তাহের মধ্যে এরা বাবা-মাকে হারাল; বাপকে কবর দেওয়া হল মঙ্গলবার, মা মারা গেল শুক্রবার। জন্মের তিনদিন আগে বাপকে হারাল, মা মারা গেল জন্মের দিন। তখন আমার স্বামী আর আমি চাষ-বাসের কাজ করি। আমরা ছিলাম তাদের প্রতিবেশী; পাশের বাড়িই ছিল আমাদের। ওদের বাবাও ছিল চাষী, জঙ্গলে কাজ করত। কেমন করে যেন একটা গাছ তার উপরে পড়ে; শরীরের একেবারে আড়াআড়ি। ফলে ভিতরটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যায়। তাকে যখন বাড়ি নিয়ে এল, তখন সব শেষ। সেই সপ্তাহেই তার স্ত্রীর দুটি যমজ মেয়ে হল, এই দুটি মেয়ে। দুঃখে দুর্দশায় সে ছিল একেবারে একা—যুবতী বা বৃদ্ধা কোন আত্মীয়াই ছিল না। একাই সে শিশুদের জন্ম দিল, একাই মারা গেল।

"পরদিন সকালে আমি তাকে দেখতে গেলাম। ওর বাড়ি পেঁছে দেখি বেচারি তখন মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠিক মরবার সময় সে পাশ ফিরে একটা মেয়ের উপর গড়িয়ে পড়ে। তাতেই ওর বাঁ পা গুঁড়িয়ে বেঁকে যায়। লোকজন জড় হয়ে তাকে ধোয়া-পোঁছা করে, পোষাক পরিয়ে কফিন তৈরি করে কবর দেবার ব্যবস্থা করল। তারা সবাই লোক ভাল। মেয়েদুটি একা পড়ে গেল। কোথায় তাদের রাখা হবে? তখন একমাত্র আমার কোলেই সন্তান ছিল; আমার সেই ছেলের বয়স তখন আট সপ্তাহ। কাজেই তখনকার মত আমিই তাদের ভার নিলাম। চাষীরা সব একত্র হয়ে অনেক ভেবেচিন্তে আমাকে বলল; "মারিয়া, আপাতত তুমিই ওদের নাও, তারপর আমরা ভেবে দেখি কী ব্যবস্থা করতে পারি।" সুস্থ মেয়েটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগলাম। প্রথমটা পা-ভাঙা মেয়েটাকে দুধ দিই নি, ও যে বাঁচবে তা ভাবি নি। পরে ভাবলাম: এমন পরীর মত মেয়েটা কেন মারা যাবে? আমার মনে দয়া হল। তাকেও দুধ দিতে লাগলাম। কাজেই আমার একটি আর এই দুটি—তিনজনকেই বুকের দুধ খাওয়াতে লাগলাম। আমার তখন বয়স অল্প, স্বাস্থ্য ভাল, ভাল খাওয়া-দাওয়া করতাম। ঈশ্বরও বুকে এত দুধ দিতেন যে অনেক সময় উপচে পড়ত। একসঙ্গে দু-জনকে খাওয়াতাম, তৃতীয় জন অপেক্ষা করত। একজন থামলে তখন তৃতীয়টিকে খাওয়াতাম। ঈশ্বরেরই বুঝি ইচ্ছা যে আমি এই দুটোকেই মানুষ করি, তাই দ্বিতীয় বছরেই আমার নিজেরটিকে কবরে শুইয়ে দিলাম। ঈশ্বর আমাকে আর সন্তান দিলেন না, কিন্তু আমাদের অবস্থা ফিরতে লাগল। এখন আমরা মিলের মালিক হয়েছি। আমাদের আয় যথেষ্ট, থাকিও ভালভাবে। নিজেদের

ছেলেপিলে নেই, এই দুটিকে না পেলে কী নিয়ে আমি বাঁচতাম! ওদের ভাল না বেসে কি আমি পারি! ওরাই তো আমার প্রদীপের সলতে।"

স্ত্রীলোকটি এক হাতে খোঁড়া মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল।

মাত্রোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: "এই জন্যই বুঝি লোকে বলে: বাপ-মা ছাড়া তুমি বাঁচতে পার, কিন্তু ঈশ্বরকে ছেড়ে বাঁচতে পার না।"

কথাবার্তা শেষ করে স্ত্রীলোকটি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মুচি আর তার বউ দরজা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গেল। তারপর মিখাইলের দিকে তাকাল। হাঁটুর উপরে দুই হাত ভাঁজ করে সে বসে আছে। চেয়ে আছে উপরের দিকে। হাসছে।

॥ ৯ ॥

সাইমন তার কাছে গিয়ে বলল: "এইবার সব কথা খুলে বল তো মিখাইল।"

হাতের কাজ সরিয়ে রেখে মিখাইল বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল। অ্যাপ্রনটা খুলে মুচি আর তার বউকে নমস্কার করে বলল: "তোমরা দু-জন আমাকে ক্ষমা কর। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন। তোমরাও ক্ষমা কর।"

উভয়ে দেখতে পেল, মিখাইলকে ঘিরে একটা আলো ঝলমল করছে। সাইমন দাঁড়িয়ে মিখাইলকে নমস্কার জানিয়ে বলল: "বুঝতে পাচ্ছি মিখাইল, তুমি সাধারণ মানুষ নও, তোমাকে আর আমি ধরে রাখতে পারব না; তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করাও চলে না। শুধু একটা কথা বল: প্রথম সাক্ষাতের পরে তোমাকে যখন বাড়ি নিয়ে আসি তখনই বা তুমি বিষণ্ণ ছিলে কেন, আবার আমার স্ত্রী যখন তোমাকে রাতের খাবার পরিবেশন করল তখনই বা তুমি হাসলে কেন, বা মনে মনে খুশি হয়ে উঠলে কেন? তারপর, সেই ভদ্রলোক যখন বুটের অর্ডার দিলেন, তখনই বা তুমি দ্বিতীয়বার হাসলে কেন, বা অধিকতর খুশি হয়ে উঠলে কেন? এবং এইমাত্র স্ত্রীলোকটি যখন মেয়েদুটিকে নিয়ে এল তখনই বা তুমি তৃতীয়বার হাসলে কেন, বা পুরোপুরি খুশি হয়ে উঠলে কেন? বল মিখাইল, তোমার চারদিকে এমন আলো কেন, আর কেনই বা তুমি তিনবার হেসেছ?"

মিখাইল বলল: "আমার শাস্তি হয়েছিল, কিন্তু এখন ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন, তাই এই আলো। আমি তিনবার হেসেছি, কারণ তিনটি ঐশ্বরিক সত্য আমার জানবার ছিল। ঈশ্বরের সেই সত্য আমি জেনেছি।

প্রথম সত্য জানলাম যখন তোমার স্ত্রী আমার প্রতি করুণা করল ; তাই আমি প্রথমবার হাসলাম। আরেকটি সত্য জানলাম যখন ধনী লোকটি বুটের অর্ডার দিল, তাই দ্বিতীয়বার হাসলাম। এখন এই মেয়েদুটিকে দেখে আমি তৃতীয় এবং শেষ সত্যটি জানলাম। তাই তৃতীয়বার হাসলাম।"

সাইমন বলল : "বল মিখাইল, কেন ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, আর ঈশ্বরের সত্য তিনটিই বা কী কী। সব আমি জানতে চাই।"

মিখাইল বলল : "ঈশ্বরের আদেশ আমি অমান্য করেছিলাম, তাই তিনি আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম স্বর্গের দেবদূত। ঈশ্বরকে আমি অমান্য করেছিলাম।

"আমি স্বর্গের দেবদূত ছিলাম। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছিলেন একটি স্ত্রীলোকের আত্মা নিয়ে যেতে। পৃথিবীতে উড়ে গিয়ে দেখলাম একটি স্ত্রীলোক অসুস্থ হয়ে একাকী শুয়ে আছে। সবেমাত্র তার দুটি যমজ সন্তান জন্মেছে—দুটি মেয়ে। মেয়ে দুটি মায়ের পাশে পড়ে আছে, ওদের যে দুধ খাওয়াবে সে শক্তিও প্রসূতির নেই। স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখতে পেল, বুঝতে পারল তার আত্মা নিতেই আমি এসেছি। চোখের জল ফেলে সে বলল : 'ঈশ্বরের দূত! আমার স্বামী গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে ; সবাই মিলে সবে তাকে কবর দিয়েছে। আমার বোন নেই, মাসি-পিসি নেই, ঠাকুরমা নেই ; বাপ-মা-মরা মেয়েদুটোকে দেখবার কেউ নেই। আমার আত্মা নিয়ো না। মেয়েদুটোকে খাইয়ে-পরিয়ে তাদের পায়ে দাঁড়াবার মত করে তুলতে দাও। বাপ-মা ছাড়া তো সন্তান বাঁচতে পারে না।' প্রসূতির কথা শুনে আমি একটি মেয়েকে তার বুকে তুলে দিলাম, আরেকটি তুলে দিলাম তার কোলে, তারপর স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে চললাম। ঈশ্বরের কাছে উড়ে গিয়ে বললাম : 'সদ্যপ্রসূতির আত্মা আনতে আমি পারি নি। গাছ চাপা পড়ে বাপ মরেছে ; মায়ের দুটি যমজ সন্তান জন্মেছে ; সে আমাকে অনুরোধ করল তার আত্মা না নিতে। সে বলল : 'আমার মেয়েদের লালন-পালন করতে দাও, তাদের পায়ে দাঁড়াবার মত করতে দাও। বাপ-মা ছাড়া শিশু-সন্তান বাঁচতে পারে না।'...সে মায়ের আত্মা আমি আনি নি।" তখন ঈশ্বর বললেন : 'যাও মায়ের আত্মা নিয়ে এস, আর তিনটি সত্য জেনে এস ; জেনে এস মানুষের কী আছে, মানুষের কী নেই, আর মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। এই তিন সত্য জেনে তবে স্বর্গে ফিরে আসবে।' আমি আবার পৃথিবীতে উড়ে গেলাম, মায়ের আত্মা নিয়ে এলাম।"

"শিশুদুটি মায়ের বুক থেকে গড়িয়ে পড়ল। তার মৃতদেহ শয্যার উপরে ঘুরে পড়তেই একটি মেয়েকে চাপা দিল ; তার পা বেঁকে গেল। আত্মা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে উড়ে চলেছি এমন সময় আমি ঝড়ে পড়লাম,

আমার পাখা দুটো খসে পড়ল। আত্মা একাই ঈশ্বরের দিকে চলে গেল। আমি পৃথিবীতে একটি পথের ধারে পড়ে গেলাম।”

সাইমন ও মাত্রোনা বুঝতে পারল কাকে তারা খাইয়েছে, পরিয়েছে; কে তাদের সঙ্গে এতদিন ছিল। তখন ভয়ে ও আনন্দে তারা কাঁদতে লাগল।

দেবদূত বলল: “মাঠের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় আমি একা পড়ে রইলাম। মানুষের কী দরকার আমি জানতাম না। শীত বা ক্ষুধা কাকে বলে তাও জানতাম না। কিন্তু তখন আমি মানুষ হয়ে গিয়েছি। আমি তখন ক্ষুধায় কাতর, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি; কিন্তু কী যে করব কিছুই জানি না। তখন মাঠের মধ্যে তৈরি একটি ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দির দেখতে পেয়ে আশ্রয়ের আশায় সেখানেই গেলাম। গির্জা তালাবন্ধ। ভিতরে ঢুকতে পারলাম না। ঠাণ্ডা বাতাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য গির্জার পিছনে বসে রইলাম। সন্ধ্যা নেমে এল। আমি অভুক্ত, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, সারা শরীর কাঁপছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম; একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে, হাতে একজোড়া বুট; নিজের মনেই কি যেন বলছে। মানুষের মরণশীল মুখ আমি দেখলাম। সে মুখ দেখে আমার ভয় হল। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি শুনতে পেলাম লোকটি বলছে, এই বরফের মত ঠাণ্ডায় কী করে সে নিজের শরীরকে বাঁচাবে, কেমন করে তার স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াবে। আমি ভাবলাম: ‘ঠাণ্ডায় ও ক্ষুধায় আমি মরে যাচ্ছি, আর এই লোকটা শুধু নিজের কথাই ভাবছে; কেমন করে নিজেকে আর বউকে ফার কোট দিয়ে ঢাকবে, কেমন করে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে খাওয়াবে। এ কখনও আমাকে সাহায্য করবে না।” লোকটি আমাকে দেখল, ভুরু কোঁচকালো, যেন আরও ভয় পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম। হঠাৎ শব্দ শুনে বুঝলাম লোকটা ফিরে আসছে। আমি চোখ তুললাম, কিন্তু দেখলাম এ যেন সে লোক নয়। তখন তার মুখে ছিল মৃত্যুর ছায়া, এখন সহসা সে যেন বেঁচে উঠেছে, তার মুখে আমি ঈশ্বরকে দেখতে পেলাম। সে আমার কাছে এল, আমাকে জামা-জুতো পরাল, সঙ্গে নিল, তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বাড়িতে ঢুকতেই তার বউ এগিয়ে এসে বক্-বক্ করতে লাগল। বউটি যেন লোকটির চাইতেও ভয়ংকরী—তার মুখ দিয়ে যেন একটি মৃত আত্মা কথা বলছে, মৃত্যুর দুর্গন্ধে আমার যেন দম আটকে আসছিল। সেই ঠাণ্ডায় সে আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দিতে চাইল। আমি জানতাম, আমাকে তাড়িয়ে দিলেই সে মারা যাবে। তখন তার স্বামী তাকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটির পরিবর্তন হল। তারপর সে যখন খাবার দিয়ে

আমার দিকে তাকাল, আমি দেখলাম—তার মুখে মৃত্যুর ছায়া আর নেই ; সে যেন বেঁচে উঠেছে ; তার মুখে আমি ঈশ্বরকেও দেখতে পেলাম।

"তখনই আমার মনে পড়ে গেল ঈশ্বরের প্রথম কথা : 'জেনে এস, মানুষের কী আছে।' আমি জানলাম, মানুষের প্রেম আছে। আমি খুশি হলাম, কারণ ঈশ্বর আমাকে যা বলেছিলেন সেই সত্য আমার কাছে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। সেই আমি প্রথম বার হাসলাম। কিন্তু সবকিছু তখনও শেখা হয় নি। তখনও জানি নি, মানুষের কী নেই, বা মানুষ কী নিয়ে বেঁচে থাকে।

"তোমাদের সঙ্গে একটি বছর কাটালাম। তারপর একদিন একজন লোক এসে এমন বুটের অর্ডার দিল যা এক বছরের মধ্যে ছিঁড়বে না বা ফাটবে না। তার দিকে তাকাতেই তার পিছনে আমার সঙ্গী মৃত্যুদূতকে দেখতে পেলাম। বুঝলাম, সূর্যাস্তের আগেই সে এই ধনী লোকটির আত্মা নিয়ে যাবে। তখন ভাবলাম : "মানুষ এক বছরের কথা ভাবে, অথচ সে জানে না যে সন্ধ্যা পর্যন্তও তার আয়ু নেই।" তখনই মনে পড়ল ঈশ্বরের দ্বিতীয় কথা . 'জেনে এস, মানুষের কী নেই।'

"মানুষের কী আছে আমি আগেই জেনেছি। এখন জানলাম, মানুষের কী নেই। নিজের শরীরের জন্য কী প্রয়োজন সে জ্ঞানও মানুষের নেই। তখনই আমি দ্বিতীয়বার হাসলাম। আমার সঙ্গী দেবদূতকে দেখে এবং ঈশ্বর আর একটি সত্য আমার কাছে প্রকাশ করেছেন জেনে আমার ভারি আনন্দ হল।

"কিন্তু তখনও আমার সব জানা হয় নি! আমি তখনও জানি নি, মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, কবে ঈশ্বর বাকি সত্যটা আমার কাছে প্রকাশ করবেন। ষষ্ঠ বছরে দুটি যমজ মেয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটি এল। আমি তাদের চিনতে পারলাম ; তারা কী করে বেঁচে আছে তাও শুনলাম। সব শুনে ভাবলাম : 'মেয়েদের জন্য মা আমার কাছে জীবন-ভিক্ষা চেয়েছিল, মায়ের কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম—ভেবেছিলাম বাবা-মা ছাড়া শিশু সন্তান বাঁচতে পারে না, অথচ একজন অপরিচিতা তাদের বড় করে তুলেছে!' অন্যের মেয়ের প্রতি স্নেহে স্ত্রীলোকটি যখন কাঁদল, তখন তার মধ্যে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখতে পেলাম, আমি জানলাম মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। তখন আমি বুঝলাম, ঈশ্বর আমার কাছে তৃতীয় সত্য প্রকাশ করেছেন, আমাকে ক্ষমা করেছেন। তাই আমি তৃতীয়বার হাসলাম।"

॥ ১০ ॥

দেখতে দেখতে দেবদূতের দেহ নেমে এল। এমন তীব্র আলো দিয়ে সে দেহ গড়া যে সেদিকে তাকানো যায় না। অতি উচ্চ কণ্ঠে সে কথা বলতে লাগল। মনে হল, কথাগুলো তার ভিতর থেকে আসছে না, স্বর্গ থেকে আসছে। দেবদূত বলল: "আমি জানলাম, মানুষ নিজের কৌশলে বাঁচে না, বাঁচে প্রেমে।"

"মা-টি জানত না বাঁচবার জন্য তার মেয়েদের কী দরকার ছিল। ধনী লোকটিও জানত না তার কী দরকার ছিল। কোন মানুষই জানে না, সন্ধ্যা নাগাদ তার দেহের জন্য বুটজুতো লাগবে, না মৃতদেহের জন্য চটিজুতো লাগবে।

"মানুষ হিসাবে আমি বেঁচে রইলাম—আমার চেষ্টায় নয়, বেঁচে রইলাম যেহেতু একজন পথের লোক ও তার স্ত্রীর হৃদয়ে প্রেম ছিল, তারা আমাকে দয়া করেছিল, ভালবেসেছিল। বাপ-মা-হারা মেয়ে দুটি বেঁচে রইল কোন স্বার্থ-চিন্তার দ্বারা নয়, বেঁচে রইল, যেহেতু অপরিচিতার হৃদয়ে প্রেম ছিল, সে তাদের দয়া করেছিল, ভালবেসেছিল। সব মানুষই বেঁচে থাকে—নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে নয়, মানুষের হৃদয়ের প্রেমের শক্তিতে।

"আগে জানতাম ঈশ্বর মানুষকে জীবন দান করেন, তিনি চান তারা বেঁচে থাকুক; এখন আমি আরও কিছু জানলাম।

"আমি জানলাম, ঈশ্বর চান না যে তারা আলাদা হয়ে বাঁচুক, তাই যার-যার নিজের জন্য কী দরকার তা তার কাছে প্রকাশ করেন না; তিনি চান, সকলে মিলে-মিশে বাঁচুক, তাই যার-যার নিজের জন্য যা দরকার এবং অপর সকলের জন্য যা দরকার সবই তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করেন।

"আমি বুঝতে পারলাম, যদিও মানুষ মনে করে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টাতেই সে বাঁচে, সে কিন্তু বাঁচে একমাত্র প্রেমে। যে মানুষ প্রেমময়, ঈশ্বর তার সংগী, তার মধ্যে ঈশ্বর আছেন; কারণ ঈশ্বরই প্রেম।"

দেবদূত ঈশ্বরের জয়গান করতে লাগল, তার কণ্ঠস্বরে ঘরখানি কেঁপে কেঁপে উঠল। ঘরের ছাদ দুই ভাগ হয়ে পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটা অগ্নি-স্তম্ভ উঠে গেল। সাইমন, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা মেঝের পড়ে গেল। দেবদূতের পিঠে পাখা গজাল, সে আকাশে উড়ে গেল।

সাইমনের যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন তার কুঁড়েঘর যেমন ছিল তেমনি আছে, আর তার নিজের পরিবার ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই।

১৮৮১

দুই বৃদ্ধ

Two old men

॥ ১ ॥

দুই বৃদ্ধের বাসনা হল, ঈশ্বরকে ভজনা করতে জেরুজালেম যাবে। একজন সম্পন্ন চাষী, নাম এফিম তারাসিক সেবেলেফ। অপর জনের নাম এলিজা বোদ্রোফ, অবস্থা মাঝামাঝি। এফিম ধীর স্থির মানুষ; ভদ্‌কা খায় না, চুরুট খায় না, নস্যিও নেয় না; সারা জীবনে কখনও একটা খারাপ কথা বলে নি; কঠোর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দু-দু-বার সে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে কাজ করেছে, কখনও আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করে নি। তার পরিবার বড়: দুটি ছেলে ও একটি বিবাহিত নাতি তার সঙ্গে থাকে। সে স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ; তার লম্বা দাড়ি ষাট বছর পেরিয়ে সবে পাকতে শুরু করেছে।

এলিজা খুব ভাল মানুষ; ধনীও নয়, গরীবও নয়। ছিল ছুতোর, বুড়ো বয়সে সে-কাজ ছেড়ে দিয়ে মৌমাছি পালন শুরু করেছে। এক ছেলে কাজের খোঁজে বাইরে গেছে, আর এক ছেলে বাড়িতেই থাকে। এলিজা হাসি-খুশি আমুদে লোক; সে ভদ্‌কা খায়, নস্যি নেয়, গান গাইতে ভালবাসে; নম্র স্বভাব, আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব ভাল ভাব। বেঁটে-খাটো মানুষটি, ঘোরবর্ণ কোঁকড়ানো দাড়ি, যদিও মাথা জোড়া একটা মস্ত টাক, ঠিক তার গুরুদেব মহাপুরুষ এলিজার মত।

অনেকদিন আগে দুই বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করেছিল, একত্রে জেরুজালেম যাবে; কিন্তু এফিমের আর সময় হয়ে ওঠে না, সব সময়েই তার কিছু না কিছু কাজ থাকে! একটা কাজ শেষ না হতে হতেই আর একটা এসে হাজির। প্রথমে নাতির বিয়ে, তারপর ছোট ছেলে সেনাদল থেকে ফিরে আসবে তার জন্য অপেক্ষা, তারপর শুরু হল একটা নতুন ঘর তৈরির কাজ।

এক রবিবারে একটা কাঠের স্তূপের উপর বসে দুই বৃদ্ধ গল্প করছিল।

এলিজা বলল, "আচ্ছা, আমাদের সে প্রতিজ্ঞা আর কবে পূরণ হবে?"

এফিম ভুরু কুঁচকে বলল, "আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবেই। এ বছরটা আমার পক্ষে বড়ই খারাপ যাচ্ছে। শ-খানেক রুবল খরচ হবে ভেবে নিয়ে ঘরখানায় হাত দিয়েছিলাম, কিন্তু এরই মধ্যে তিনশ' রুবল খরচ হয়ে গেছে, অথচ ঘর এখনও শেষ হল না। আমার তো মনে হচ্ছে, গরম কাল অবধি এ কাজ চলবে। কাজেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় গরমের সময় আমরা নিশ্চয়

বেরোতে পারব।"

এলিজা বলল, "আমার মতে কিন্তু আর দিন পেছোনো ঠিক নয়। এখনই আমাদের যাওয়া উচিত। বসন্তকালই তো সবচেয়ে ভাল সময়।"

"সময় ভালই হোক আর মন্দই হোক, কাজ যখন হাতে নিয়েছি তখন সেটা ছেড়ে-ছুড়ে যাই কী করে?"

"কেন, আর কেউ কি তোমার হয়ে কাজটা শেষ করতে পারে না? তোমার ছেলেই তো পারে।"

"তবেই হয়েছে। বড় ছেলেটার উপর মোটেই ভরসা করা চলে না। ওটা এত বেশি মদ খায় যে কী বলব।"

"আরে বাবা, একদিন তো আমরা মরব। তখন আমাদের ছাড়াই ওদের চলে যাবে। কাজেই এখন থেকেই ছেলেকে কাজকর্ম শিখতে দাও।"

"যাই বল, আমি নিজের চোখে কাজটার শেষ দেখে যেতে চাই।"

"হায় বন্ধু! সব কাজ কি কখনও একেবারে শেষ হয়? এই তো সেদিন বাড়ির মেয়েরা উৎসবের জন্য সব কিছু ধোয়া-পোঁছা, যোগাড়-যন্ত্র করছিল। এখানে কিছু কাজ, ওখানে কিছু কাজ, কাজ আর শেষ হয় না। আমার পুত্রবধূ খুব চালাক-চতুর, সে বলল, 'ভাগ্যিস আমরা তৈরি না হলেও উৎসবের দিনগুলো এসে পড়ে!' কাজ যতই কর না কেন, কখনও কেউ পুরোপুরি তৈরি হতে পারে না।"

এফিম ভাবতে লাগল। বলল, "ঘরটা তৈরি করতে অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছি। এখন খালি হাতে তো পথে বেরোতে পারি না। বেশ মোটা টাকাই তো চাই—অন্তত একশ' রুবল্।"

এলিজা হেসে উঠল। বলল, "বাজে কথা বলো না বন্ধু। আমার চাইতে দশগুণ বেশি তোমার আছে, তবু তুমি টাকার কথা তুলছ। দিন স্থির করে ফেল; আমার হাতে একটা 'কোপেকে'ও নেই, কিন্তু দেখবে দরকারী টাকা ঠিক জুটে যাবে।"

এফিমও হাসতে লাগল। বলল, "আরে, তুমি যে একেবারে বড়লোকের মত কথা বলছ হে! টাকাটা পাব কোথায় বল তো?"

"এখান থেকে ওখান থেকে যোগাড় করে ফেল। যা কম পড়বে, আমার প্রতিবেশীর কাছে ডজনখানেক মৌচাক বিক্রি করলেই পেয়ে যাব। সে বেচারি অনেক কাল ধরে ওগুলোর জন্য অপেক্ষা করে আছে।"

"মৌমাছিরা যদি দলে দলে ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে যায়, তখন তো মনে দুঃখ পাবে।"

"দুঃখ? না বন্ধু, দুঃখ পাব না। আজ পর্যন্ত দুঃখ যা পেয়েছি তা শুধু পাপের জন্যই পেয়েছি। আত্মার চাইতে দামী আর কিছু নেই।"

"তা তো ঠিকই ; তবে গৃহস্থালির ব্যাপারে অবহেলা করাও তো ঠিক নয়।"

"কিন্তু আত্মাকে যখন অবহেলা করা হয় সে যে আরও খারাপ। প্রতিজ্ঞা যখন করেছি তখন যাওয়াই উচিত। সত্যি, চল বেরিয়ে পড়ি।"

॥ ২ ॥

এলিজা বন্ধুকে অনেক বোঝাল। অনেক ভেবে-চিন্তে এফিম পরদিন সকালে এলিজার কাছে গিয়ে বলল, "আচ্ছা, চল বেরিয়েই পড়ি। তুমি ঠিকই বলেছ। বাঁচা-মরা ঈশ্বরের হাতে। শক্ত-সমর্থ হয়ে বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের যাওয়া উচিত।"

সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই দুই বৃদ্ধ তৈরি হল।

এফিমের ঘরেই যথেষ্ট টাকা ছিল ; সে তীর্থযাত্রার জন্য একশ' রুবল্ নিল, আর স্ত্রীর কাছে রেখে গেল দুশ'।

এলিজাও তৈরি হল। প্রতিবেশীর কাছে দশটা মৌচাক সে বিক্রি করল। ঠিক হল, চাক থেকে যত মৌমাছি জন্মাবে সব সে পাবে। এর জন্য সে দাম পেল সত্তর রুবল্। বাকিটা সে পরিজনবর্গের কাছ থেকে যোগাড় করল। ফলে বাড়িতে প্রায় কিছুই থাকল না। তার স্ত্রী নিজের শেষকৃত্যের জন্য যা কিছু সঞ্চয় করেছিল তার শেষ কড়িটি পর্যন্ত তাকে দিয়ে দিল। তার পুত্র-বধূর কাছে যা কিছু ছিল তাও দিয়ে দিল।

এফিম তারাসিক বড় ছেলেকে সব কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিল : কোথায় কতটা খড় কাটতে হবে, কোথায় সার ফেলতে হবে, কেমন করে ঘরখানা শেষ করে ছাদ দিতে হবে—সব। সে সব ব্যাপারে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে যথাযোগ্য নির্দেশাদি দিয়ে গেল।

এদিকে এলিজা শুধু তার স্ত্রীকে বলল, বিক্রি-করা চাকের মৌমাছিগুলো যেন অন্য মৌমাছি থেকে আলাদা করে রাখে এবং প্রতিবেশীকে কোনরকম না ঠকিয়ে সেগুলো তাকে দিয়ে দেয়। গৃহস্থালির অন্যান্য ব্যাপারে সে কিছুই উচ্চবাচ্য করল না। শুধু বলল, "কখন কী করতে হবে, দরকারের সময় তা নিজেই বুঝতে পারবে। তোমার উপরেই সব ভার। যা ভাল বুঝবে তাই করবে।"

যাত্রার জন্য দু-জনে প্রস্তুত হল। মেয়েরা রুটি বানিয়ে দিল, বোঁচ্কা সেলাই করে দিল, পায়ে জড়াবার জন্য নতুন পট্টি কেটে দিল। নতুন চামড়ার জুতো পরে; পুরোনো জুতো সঙ্গে নিয়ে তারা রওনা দিল। পরিবারের

লোকজনেরা গ্রামের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় জানাল। দুই বৃদ্ধের যাত্রা শুরু হল।

গ্রাম ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা সব ভুলে এলিজা বেশ খোশ-মেজাজে চলতে লাগল। তার একমাত্র চিন্তা—কেমন করে সহযাত্রীকে খুশি রাখবে, কাউকে একটা কড়া কথা না বলে পথ চলবে, কেমন করে শান্তিতে ও প্রীতিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে ও বাড়ি ফিরবে। পথ চলতে চলতে এলিজা নিজের মনে প্রার্থনা করে, কখনও বা মুখস্থ-করা সন্ত-জীবনী আওড়ায়। পথের মাঝে বা রাত্রের আস্তানায় যখনই কারও সঙ্গে দেখা হয় তার সঙ্গেই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করে, দুটো ভাল কথা বলে। খুশি মনেই সে পথ চলে। শুধু এক ব্যাপারে একটু অসুবিধায় পড়ে। নস্যি নেওয়া ছেড়ে দেবার জন্য সে ইচ্ছা করেই নস্যির কৌটো বাড়িতে রেখে এসেছে। কিন্তু এখন দেখছে, ভারি ফ্যাসাদ। একজন পথের লোকের কাছ থেকে কিছুটা চেয়ে এনেছে, মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ে (সহযাত্রীকে যাতে পাপের পথে নিয়ে যেতে না হয়) তার থেকেই একটু একটু নিচ্ছে।

এফিম তারাসিকও বেশ ভালভাবেই একটানা চলতে লাগল। সে আজে-বাজে কথাও বলে না, কারও কোন ক্ষতিও করে না। তবে তার মন-মেজাজ তেমন ভাল নেই। বাড়ির দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না।—এই রে, ছেলেকে বুঝি এটা না হয় ওটার কথা বলতেই ভুলে গেছি। হয়ত পথে কাউকে দেখল আলুর চারা লাগাচ্ছে বা সার দিচ্ছে, অমনি ভাবতে লাগল : ছেলে আমার কথা মত এ সব কাজ ঠিক-ঠিক করছে তো? মনে হত, তখুনি ফিরে গিয়ে তাকে সব দেখিয়ে দেয়, বা নিজেই করে দিয়ে আসে।

॥ ৩ ॥

পাঁচ সপ্তাহ একটানা চলতে চলতে ঘরে তৈরি জুতো ছিঁড়ে নতুন জুতো কিনে দুই বৃদ্ধ ইউক্রেনে পৌঁছল। বাড়ি ছাড়বার পর থেকে এতদিন তারা থাকা-খাওয়ার পয়সা নিজেরাই দিচ্ছিল। কিন্তু ইউক্রেনে আসবার পর সব বাড়ি থেকেই তাদের থাকা, খাওয়া, শোয়ার জন্য ডাক আসতে লাগল। দুই বৃদ্ধের কাছ থেকে তারা কিছুতেই টাকা নিল না। উল্টে পথে খাবার জন্য রুটি বা কেক তাদের বোঁচকায় ভরে দিল।

এইভাবে প্রায় সাতশ' 'ভার্স্ট' চলবার পর দুই বৃদ্ধ আর এক দেশে পৌঁছল। সেখানে সে-বছর ফসল ফলে নি। তবু সেখানকার লোকেরা

তাদের বিনা পয়সায় থাকতে-শুতে দিল, কিন্তু খাওয়াতে পারল না। রুটি দুষ্প্রাপ্য, এমনকি পয়সা দিয়েও সব জায়গায় মেলে না। সবাই বলল, আগের বছর সেখানে একেবারেই ফসল হয় নি। ধনীদের অবস্থা পড়ে গেছে, যারা স্বল্পবিত্ত তারা নিঃস্ব হয়েছে, আর যে সব গরিব মানুষ পালিয়ে যায় নি তারা হয় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে আর না হয় সারা শীতকাল ভুষি আর শাকপাতা খেয়ে কোন মতে বেঁচে আছে।

একদিন রাতে দুই বৃদ্ধ একটা ছোট গ্রামে থামল। কুড়ি পাউণ্ড রুটি কিনল, ঘুমোল, তারপর ভোর হবার আগেই আবার যাত্রা করল যাতে রোদ চড়বার আগেই অনেকটা পথ এগুনো যায়। দশ 'ভার্স্ট' হাঁটবার পর তারা একটা ছোট নদীর তীরে পেঁছিল। বসল, বাটিতে করে জল তুলে রুটি ভিজিয়ে খেল, পায়ের পট্টি পাল্টে নিল, তারপর বিশ্রাম করতে লাগল।

এলিজা তার নস্যির কৌটো বের করল।

এফিম তারাসিক ঘাড় নেড়ে বলল, "এই বাজে অভ্যেসটা ছাড়তে পার না?"

এলিজা হাত নেড়ে বলল, "এ বড় শক্ত পাপ, কী করি বল?"

তারা উঠে পড়ল। প্রায় 'ভার্স্ট'-বারো পথ পার হয়ে একটা বড় শহরে পেঁছে তার ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল। দিনের তাপ তখন বেশ বেড়ে গেছে। বড়ই শ্রান্ত বোধ করায় এলিজা একটু বিশ্রাম করে একটু জল খেয়ে নিতে চাইল। কিন্তু এফিম এগিয়েই চলল। এফিম হাঁটায় বেশ পটু; ফলে তার সঙ্গে তাল রাখা এলিজার পক্ষে বেশ কষ্টকর।

"আমি একটু জল খেতে চাই।"

"বেশ তো, খাও। আমার কোন দরকার নেই।"

এলিজা সেখানেই থামল। বলল, "আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করো না। এক দৌড়ে আমি এই কুঁড়ে থেকে একটু জল খেয়ে আসছি। শিগগিরই তোমাকে ধরে ফেলব।"

এফিম বলল, "ঠিক আছে।" সে একাই পথে পা বাড়াল। এলিজাও কুঁড়ের দিকে এগোল।

ছোট একখানা মাটির ঘর। নিচের অংশটা কালো, উপরটা সাদা। দেয়ালের পলস্তারা খসে পড়েছে। দেখলেই বোঝা যায় অনেক দিন চুনকাম করা হয় নি। ঘরের ছাদ একদিকে হেলে পড়েছে। উঠোনের ভিতর দিয়েই ঘরে ঢুকবার একমাত্র পথ। উঠোনে ঢুকেই এলিজা দেখল, একটা জীর্ণ শীর্ণ লোক মাটিতে শুয়ে আছে। তার মুখে দাড়ি নেই; ইউক্রেনীয় স্টাইলে পরনের শার্টটা ট্রাউজারের ভিতর গোঁজা। লোকটা নিশ্চয়ই ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে সেখানে শুয়েছিল, এখন সূর্য একেবারে সোজা তার উপরে এসে পড়েছে। লোকটা ঠিক ঘুমোয় নি, শুধু শুয়ে আছে। এলিজা জল চাইল, কিন্তু

লোকটা কোন জবাব দিল না। "লোকটা হয় রুগ্ন আর না হয় অসামাজিক—" এই কথা ভেবে এলিজা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কান পেতে শুনল, কুঁড়ের ভিতরে একটি শিশু কাঁদছে। দরজার কড়া নেড়ে ডাকল, 'মালিক'! কেউ সাড়া দিল না। আবার ডাকল, 'খৃস্টান!' সব চুপ। 'ঈশ্বরের সেবক!' কোন জবাব নেই।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই এলিজার কানে এল, দরজার ওপারে কে যেন গোঙাচ্ছে। ভাবল, "লোকগুলো নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে। একবার দেখা দরকার "

॥ ৪ ॥

দরজায় চাবি দেওয়া ছিল না, এলিজা হাতলটা ঘোরাল। দরজা খুলে গেল। সরু পথ দিয়ে সে এগিয়ে গেল। বড় ঘরের দরজা খোলাই ছিল। বাঁ দিকে একটা স্টোভ, সোজা সামনে কতকগুলো পবিত্র মূর্তি, তারপর টেবিল; টেবিলের পিছনে বেঞ্চি। সেমিজ-পরা একটা টাক-মাথা বুড়ি মাথাটা টেবিলের উপর রেখে বেঞ্চির উপর বসে ছিল। তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা শুকনো, বিবর্ণ, পেট-মোটা ছেলে খুন-খুন করে কাঁদছে আর বুড়ির আস্তিন ধরে টানতে টানতে কি যেন চাইছে।

এলিজা ঘরে ঢুকল। বাতাসে ভ্যাপসা গন্ধ। চারদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, স্টোভের পিছনে মেঝের উপর একটি স্ত্রীলোক শুয়ে আছে। তার দুই চোখ বোজা, সাঁই সাঁই করে নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে, মাঝে মাঝেই একটা পা টান-টান করছে আবার ভাঙছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, স্ত্রীলোকটি একেবারে অসহায়, তাকে দেখবার কেউ নেই। যন্ত্রণায় বার বার এ-পাশ ও-পাশ করছে।

বুড়িটা আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী চাও এখানে? কী চাও? আমাদের কিছু নেই।"

ইউক্রেনীয় ভাষায় কথাগুলো বললেও এলিজা বুঝতে পারল। এগিয়ে কাছে গিয়ে বলল, "ঈশ্বরের সেবিকা, আমি একটু জল খেতে এসেছি।"

"নেই, নেই। জল আনবার কেউ নেই। চলে যাও।"

এলিজা শুধাল, "এই স্ত্রীলোকটির জন্য কিছু করতে পারে এ রকম সুস্থ কি এখানে কেউ নেই?"

"না, কেউ নেই। উঠোনে আমার ছেলে মরছে। এখানে আমরা মরছি।"

আগন্তুককে দেখে ছেলেটা চুপ করেছিল। এখন বুড়িকে কথা বলতে দেখে সে তার আস্তিন টেনে ধরে বলল, "রুটি দাও ঠামমা, রুটি দাও!" বলেই সে

কেঁদে উঠল।

এলিজা বুড়িকে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে যাবে; এমন সময় স্খলিত পদে ঘরে ঢুকল একটি চাষী। বেঞ্চটার কাছে যাবার জন্যে দেয়াল ধরে কোনমতে ফালি পথটা ধরে এগিয়ে যেতেই চৌকাঠের পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কিছুতেই উঠতে পারল না। সেখান থেকেই থেমে থেমে বলতে লাগল: "রোগ···ধরল; আর···ক্ষুধা। ওই তো···না খেতে পেয়ে···মরছে···"

মাথা নেড়ে ছোট ছেলেটাকে দেখিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এলিজা এক ঝাঁকিতে কাঁধ থেকে বোঁচকাটা নামিয়ে মেঝেতে রাখল। তারপর সেটাকে বেঞ্চির উপর তুলে মুখটা খুলে ফেলল। বের করল খানিকটা রুটি আর একখানা ছুরি। একটুকরো রুটি কেটে চাষীটিকে দিল।

চাষীটা নিল না; ইংগিতে ছোট ছেলেটিকে আর স্টোভের পাশে শোয়া একটি ছোট মেয়েকে দেখিয়ে দিল।

এলিজা রুটিটা ছোট ছেলেটাকে দিল। ছেলেটা জোরে নিঃশ্বাস টেনে দুই হাতে রুটিটা আঁকড়ে ধরে তার মধ্যে নাক ডুবিয়ে দিল।

মেয়েটা উঠে এসে রুটিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

এলিজা তাকেও কিছুটা দিল। আরও একটা ছোট টুকরো কেটে বুড়িকে দিল। বুড়ি সেটা চিবুতে লাগল। বলল, 'জল আন। ওদের মুখ শুকিয়ে গেছে। আমি জল আনতে চেষ্টা করেছিলাম—কাল না আজ ঠিক মনে পড়ছে না। তারপর পড়ে গেলাম। জলের কাছে আর যেতে পারলাম না। কেউ যদি না নিয়ে থাকে তাহলে ওখানে এক বালতি জল হয়ত আছে।"

এলিজা কুয়োটা কোথায় জেনে নিয়ে বাইরে গেল। বালতি করে জল আনল, সবাইকে দিল। ছেলেমেয়েরা জলের সঙ্গে আরও খানিকটা রুটি খেল। বুড়িও খেল। কিন্তু চাষীটা খেল না। বলল, "আমি খেতে পারব না।"

তরুণীটি তখনও অচৈতন্য অবস্থায় এ-পাশ ও-পাশ করছে।

এলিজা সেখান থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের মুদি দোকানে গেল। জোয়ার, নুন, ময়দা আর তেল কিনল। বাড়ি ফিরে কুড়ুল খুঁজে নিয়ে কাঠ কেটে স্টোভ ধরাল। ছোট মেয়েটির সাহায্যে রুটি ও 'কাশা' তৈরি করল সবাইকে খাওয়াবার জন্য।

॥ ৫ ॥

চাষী অল্প কিছু খেল; বুড়ি খেল; ছেলেমেয়েরা একটা বাটিভর্তি খাবার চেটে-পুটে খেয়ে এ-ওর গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

চাষী আর বুড়ি এলিজাকে সব কথা বলতে লাগল:

"আমরা তো বড়লোক নই, কোনরকমে দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ অজন্মা দেখা দিল। সেই দুর্দিনে আমাদের যা কিছু ছিল তাই খেতে শুরু করলাম। খেতে খেতে তাও ফুরিয়ে গেল। প্রতিবেশী স্বজনদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হল। প্রথম-প্রথম তাঁরা দিতেন। তারপর হাত গুটোলেন। কেউ-কেউ হয়ত খুশি মনেই দিতেন, কিন্তু তাঁদেরও কিছু ছিল না। চাইতেও বড় লজ্জা করত। সবার কাছে ধার—টাকা, ময়দা, রুটি।"

লোকটি বলল: "কাজের জন্য চেষ্টা করলাম, পেলাম না। শুধু দুটি খাবার জোগানোর মত কাজের জন্যই লোকেরা নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করতে লাগল। কেউ হয়ত একদিন ছোটখাট একটা কাজ পেল; তারপর আর একটা কাজ যোগাড় করতেই দুটো দিন কেটে গেল। এই বুড়ি আর মেয়েটা ভিক্ষে করতে অনেক দূরে চলে যেত। যৎসামান্যই পেত—রুটি তো তখন প্রায় কারোরই নেই। তবু কোনরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে রইলাম। মনে আশা ছিল, পরের ফসলের সময় দিন ফিরবে। কিন্তু বসন্তকাল এসে গেল, তখনও কেউ কিছু দিল না। ফলে আমরা রোগে পড়লাম। বড় অসহায় অবস্থা। একদিন খাওয়া জোটে তো দু'দিন জোটে না! ক্রমে ঘাস খেতে লাগলাম; হয়ত ঘাস খেয়েই আমার স্ত্রী অসুখে পড়ল। সে ভেঙে পড়ল। আমিও গায়ে জোর পাই না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারি না।"

বুড়ি বলল: "না খেয়েই যুঝতে লাগলাম। গায়ের জোর ফুরিয়ে গেল। মেয়েটাও দুর্বল আর ভীতু হয়ে পড়ল। কোন প্রতিবেশীর কাছে পাঠালে যেতে চায় না। ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে, কিছুতেই বেরোতে চায় না। পরশুর আগের দিন একজন প্রতিবেশিনী আমাদের ঘরে এল। কিন্তু যখন দেখল আমরা সবাই ক্ষুধার্ত, রুগ্ন, তখন মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। কি জান, সম্প্রতি তার স্বামী মারা যাওয়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার সংস্থানও তার নেই। কাজেই আমরাও এখানে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে আছি।"

তাদের কাহিনী শুনে এলিজা স্থির করল, সেদিন সহযাত্রীকে ধরবার চেষ্টা না করে রাতটা সে সেখানেই থেকে যাবে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সব কাজের ভার সে নিজে নিল,

যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। বুড়ির সঙ্গে ময়দা মাখল, স্টোভ ধরাল। দরকারি জিনিসপত্রের জন্য ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে করে প্রতিবেশীদের কাছে গেল। কিন্তু কারও কাছে কিছু পেল না; খাদ্যের জন্য গেরস্থালির তৈজসপত্র, এমনকি জামাকাপড় পর্যন্ত সবাই বিক্রি করে বসে আছে। কাজেই দরকারি জিনিসপত্র এলিজাই সব দিল—কতক কিনে দিল, কতক বা তৈরি করে দিল।

সারাটা দিন এলিজা সেখানে কাটাল। তারপর আর একটা দিন। ক্রমে তৃতীয় দিনটাও কেটে গেল। ছোট ছেলেটা ভাল হয়ে উঠল। সে এখন বেঞ্চি ধরে এগিয়ে এলিজার গা ঘেঁসে বসে। মেয়েটাও বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠেছে। সব কাজেই এগিয়ে যায়। সর্বক্ষণ এলিজার কাছে কাছে থাকে, তাকে 'দিদু!' 'দিদুসিউ!' বলে ডাকে। বুড়ি উঠে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগল। চাষীও দেওয়াল ধরে ধরে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রীলোকটি অচৈতন্যই ছিল, তবে, তিন দিনের দিন তার চেতনা ফিরে এল। সে খেতে চাইল।

এলিজা ভাবল, "ভাল, পথের মাঝখানে এতদিন কাটাতে হবে তা তো ভাবিনি। কালই রওনা হতে হবে।"

॥ ৬ ॥

চতুর্থ দিনটা ছিল একটা ভোজের দিন। এলিজা ভাবল, "এদের সঙ্গেই বরং 'পার্বণটা শেষ করি, উৎসব উপলক্ষ্যে এদের কিছু উপহার কিনে দিই, তারপর সন্ধ্যাবেলা যাব।"

দুধ, ময়দা আর চর্বি কিনবার জন্য এলিজা আবার গাঁয়ের দিকে গেল। সকালে সে আর বুড়ি রান্না করল, রুটি বানাল। এলিজা প্রার্থনা-সভায় গেল। ফিরে এসে সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল। সেদিন স্ত্রীটিও কোন রকমে উঠে একটু বেড়াল। চাষী দাড়ি কামাল, একটা সাদা শার্ট পরল (শার্টটা বুড়িই ধুয়ে দিয়েছিল), তারপর গাঁয়েরই একজন ধনী কৃষকের কাছে গেল তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে। সেই কৃষকের কাছেই তার মাঠ আর চাষের জমি বন্ধক ছিল। নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত সেই মাঠ আর জমি ব্যবহার করবার অনুমতি ভিক্ষা করতেই গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হতাশ হয়ে ফিরে এসে কাঁদতে লাগল। ধনী কৃষক তাকে কোন করুণা করেনি, শুধু বলেছে, "টাকা নিয়ে এস।"

এলিজা আবার ভাবনায় পড়ল। "কেমন করে এরা এখন বাঁচবে?

অন্যরা ফসল কাটবে, কিন্তু এদের তো কিছুই নেই, মাঠটাও বন্ধক দেওয়া। রাই পাকলে অন্যরা কাটতে আরম্ভ করবে (মাটি-মা কী ফসলই ফলিয়েছে!)। কিন্তু এদের তো কোন আশা নেই, তিন একর জমিই তো ধনী কৃষকের কাছে বাঁধা দেওয়া। আমি যদি চলে যাই, এরা যে অবস্থায় ছিল আবার সেখানেই ফিরে যাবে।"

নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে সে সন্ধ্যায়ও এলিজার যাওয়া হল না। সকাল পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রেখে সে উঠোনে শুতে গেল। সে প্রার্থনা করল; শুয়ে পড়ল; কিন্তু কিছুতেই ঘুমুতে পারল না। এবার তার যাওয়া উচিত—এদের জন্য ইতিমধ্যে অনেক সময় আর টাকা সে ব্যয় করেছে। তবু এদের জন্য তার দুঃখও হল।

"সবাইকে তুমি খাওয়াতে পরাতে পার না। এদের তুমি জল দিয়েছিলে, এক টুকরো রুটি দিয়েছিলে। আর ভেবে দেখ, এখন তুমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ। তুমি এদের জমি-জমা উদ্ধার করতে চাইছ। উদ্ধার হলে ছেলেমেয়েদের জন্য তোমাকে একটা গরু কিনতে হবে, কিনতে হবে খড়ের আঁটি, গাড়িতে করে চালান দেওয়ার জন্য একটা ঘোড়া। ভাই এলিজা কুজমিক, তুমি বড়ই জড়িয়ে পড়েছ। তুমি একেবারে নোঙর গেড়ে বসেছ, তাই ঠিক-বেঠিক বিচার করতে পারছ না।"

এলিজা উঠে দাঁড়াল। মাথার তলা থেকে কোটটা বের করে ভাঁজ খুলে নস্যির কৌটো বের করল। মাথাটা পরিষ্কার করবার জন্য এক টিপ নস্যি নিল। অনেক ভাবল, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারল না। বুঝল যে তার যাওয়াই উচিত, কিন্তু লোকগুলোর জন্য তার দুঃখও হতে লাগল। কী যে করবে বুঝতে পরল না। কোটটা ভাঁজ করে মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়ল। যখন ঘুম এল তখন মোরগ ডাকতে শুরু করেছে।

স্বপ্ন দেখলে, কেউ যেন হঠাৎ খুব রূঢ়ভাবে ডেকে তাকে জাগিয়ে দিল। দেখল, সে যেন বোঁচকা কাঁধে লাঠি হাতে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গেটটা খোলা, কিন্তু কেবল একজন লোক তার ভিতর দিয়ে যেতে পারে। গেট পেরোবার সময় তার বোঁচকাটা একদিকে আটকে গেল। সেটা ছাড়াতে চেষ্টা করতেই তার পায়ের পট্টি আটকে গেল আর এক দিকে। খুলতে গিয়ে দেখে, বেড়ায় তো আটকায় নি, বোঁচকাটা টেনে ধরেছে ছোট মেয়েটি; বলছে, "দিদু, দিদুসিউ, রুটি!" পায়ের দিকে তাকাতে দেখে, পায়ের পট্টি ধরে আছে ছোট ছেলেটি, আর বুড়ি এবং কৃষক জানালা দিয়ে দেখছে।

এলিজার ঘুম ভেঙে গেল। নিজেকেই যেন জোর গলায় বলে উঠল, "কালই আমি জমি আর মাঠ খালাস করে আনব; ওদের কিনে দেব একটা ঘোড়া, ফসলের সময় পর্যন্ত চলবার মত ময়দা, আর ছোটদের জন্য একটা গরু।

সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে যীশুকে খুঁজে খুঁজেও তুমি হয়ত নিজের মধ্যেই তাঁকে হারিয়ে ফেলতে পার। এই লোকগুলোকে আমি ওদের পায়ে দাঁড় করাবই।"

ভোর পর্যন্ত এলিজা জুত করে ঘুমোল।

সকালে উঠেই গেল ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ি। জমি ও মাঠ খালাস করল। একটা কাস্তে কিনে (লোকে তখন কাস্তেও বিক্রি করছিল) বাড়িতে নিয়ে এল। কৃষককে পাঠাল ফসল কাটতে, আর নিজে খোঁজ-খবর করে জানতে পারল, সরাইখানায় একটা ঘোড়া আর একখানা গাড়ি বিক্রি হবে। সরাইওলার সঙ্গে দর-দাম ঠিক করে ঘোড়া ও গাড়ি কিনল, একবস্তা ময়দা কিনে গাড়িতে তুলে রেখে গেল গরু কিনতে। যেতে যেতে দেখল, দুটি ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোক কথা বলতে বলতে চলেছে। তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বললেও এলিজা বুঝতে পারল তারা তার কথাই বলাবলি করছে:

"আরে, প্রথমটা ওরা জানতই না লোকটি কী; ওরা ভেবেছিল একজন মামুলি মানুষ। ওরা তো বলে জল খেতে এসে সেখানে থেকে গেছে। এখন কত জিনিস ওদের কিনে দিয়েছে! এই তো আজই সরাইওলার কাছ থেকে ঘোড়া কিনল, গাড়ি কিনল। জগতে এমন লোক তুমি কটা পাবে? আমার তো একবার গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে।"

এলিজা বুঝল, তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রশংসা করা হচ্ছে। গরু কিনতে না গিয়ে সে সরাইওলার কাছে ফিরে গেল ঘোড়ার দাম দিতে। গাড়িতে ঘোড়া জুড়ে ময়দা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। গেটের কাছে পেঁছেই গাড়ি থেকে নামল।

বাড়ির লোকেরা তো ঘোড়া দেখে অবাক। তারা বুঝল তাদের জন্যই ঘোড়া কেনা হয়েছে, কিন্তু সে কথা বলতে সাহস পেল না। বাড়ির কর্তা এগিয়ে এসে গেট খুলে দিয়ে বলল: "ঘোড়া কোথায় পেলে দিদু?"

"কিনলাম।" এলিজা বলল: "খুব শস্তায় যাচ্ছিল। যাও, কিছু ঘাস কেটে এনে রাতের মত গোয়ালে রেখে এস।"

সবাই শুতে গেল। বোঁচকাটা পাশে নিয়ে এলিজা পথের পাশেই শুয়ে পড়ল।

সেদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে উঠল। বোঁচকা বাঁধল, পায়ে পট্টি জড়াল, কোট গায়ে দিল, তারপর এফিমের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

॥ ৭ ॥

পাঁচ ভার্স্ট পথ হাঁটল এলিজা !

ভোর হয়ে আসছে ; একটা গাছের নিচে বসে সে বোঁচকা খুলল । গুণে দেখল, সাত রুবল কুড়ি কোপেক মাত্র আছে ।

মনে মনে ভাবল, "তাহলে ? এই টাকায় তো সাগর-পাড়ি দেওয়া যাবে না ! আর ভিক্ষে করে যাওয়ার থেকে না যাওয়াই ভাল । এফিম একাই সেখানে যাক ; আমার জন্য একটা দীপ সে জেবলে দেবেই । হয়ত মৃত্যু পর্যন্ত এই অপূর্ণ প্রতিজ্ঞা আমার বিবেকের উপর চেপে থাকবে । তবে একমাত্র ভরসা—ঈশ্বর করুণাময়, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন ।"

এলিজা উঠে দাঁড়াল । কাঁধের উপর বোঁচকা ঝুলিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল । পাছে লোকজনদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই গ্রামকে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি পেঁছিল । যাবার সময় বেশ কষ্ট হয়েছে । এফিমের সঙ্গে তাল রাখতে প্রাণান্ত । কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় ফিরতে তার সে রকম পরিশ্রম হল না । লাঠি দোলাতে দোলাতে খুশি মনে সে হেঁটে চলল । দিনে সত্তর ভার্স্ট হাঁটতে লাগল ।

যখন সে বাড়ি পেঁছিল তখন ফসল কাটা শেষ হয়েছে । বাড়ির লোকেরা বুড়োকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করল । কেমন করে কী ঘটল সব জানতে চাইল । সহযাত্রীর সঙ্গে রইল না কেন ? কেন তীর্থ পর্যন্ত গেল না ? কেনই বা বাড়ি ফিরে এল ?

এলিজা সব কথা খুলে বলল না ।

"ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় তাই । পথে আমার টাকা হারিয়ে গেল, সঙ্গীও অনেক এগিয়ে গেল, তাই আর গেলাম না । যীশুর দোহাই, আমাকে তোমরা ক্ষমা কর ।"

টাকা যা হাতে ছিল এলিজা তার স্ত্রীকে দিল । বাড়ি-ঘরের সব খবর জিজ্ঞাসা করল । সব ঠিক আছে । সব কাজ ঠিকমত করা হয়েছে । জমির কাজে কেউ গাফিলতি করে নি ! সবাই সুখে শান্তিতেই ছিল ।

এলিজা ফিরেছে জেনে এফিমের পরিবারের লোকেরা সেই দিনই এফিমের খবর জানতে গেল । এলিজা ওই একই কথা তাদেরও বলল ।

"সেণ্ট পিটার দিবসের ঠিক তিন দিন আগে যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তখন পর্যন্ত তোমাদের বুড়ো বেশ ভালভাবেই হাঁটছিল । আমি ভেবেছিলাম তাকে ধরে ফেলব, কিন্তু এমন সব ঝামেলা হল ! আমার টাকা হারিয়ে গেল । কী নিয়ে যাব ? কাজেই ফিরে এলাম ।"

সবাই অবাক হল । তার মত একজন চালাক-চতুর লোক এমন বোকার মত কাজ কেমন করে করল,—পথে বের হল কিন্তু পেঁছুতে পারল না ?

আবার সব টাকা উড়িয়ে দিল ?

অবাক হতে হতে একদিন সবাই ভুলে গেল।

এলিজাও ভুলে গেল। সে বাড়ির কাজকর্মে মন দিল। ছেলেকে নিয়ে সে শীতের জন্য কাঠ যোগাড় করল; মেয়েদের নিয়ে ফসল ঝাড়ল; চাল ছাইল; মৌমাছিগুলোর উপরে ঢাকনা দিল; এবং দশটি মৌচাক ও তার মৌমাছি প্রতিবেশীকে দিয়ে দিল। এলিজা যে দশটি মৌচাক বিক্রি করেছিল তার থেকে অনেকগুলো নতুন মৌমাছি তার স্ত্রী লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল; কিন্তু সব জিনিস এলিজার নখ-দর্পণে, সে দশটার বদলে প্রতিবেশীকে সতেরো ঝাঁক মৌমাছি দিয়ে দিল। সব ঠিকঠাক করে এলিজা ছেলেকে মজুরের কাজ করতে বাইরে পাঠিয়ে দিল। নিজে বাড়িতে থেকে জুতোর "লাছ" তৈরি এবং মৌমাছির জন্য কাঠের টুকরো কেটে ফাঁপা করতে লাগল।

॥ ৮ ॥

যে প্রথম দিনটা এলিজা সেই কুটিরে রুগ্ন লোকগুলোকে নিয়ে কাটিয়েছিল সেই পুরো দিনটাই এফিম তার সংগীর জন্য অপেক্ষা করল। কিছুটা পথ চলেই এফিম বসে পড়ল; অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল; একটু ঘুমিয়ে নিল, ঘুম ভেঙে আবার অপেক্ষা করল—এলিজার দেখা নেই। যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে রইল। গাছ-গাছালির পিছনে সূর্য অস্ত গেল—কোথায় এলিজা।

"তবে কি আমাকে ছাড়িয়ে গেল না কি একটা ঘোড়া পেয়ে, আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমাকে না দেখতে পেয়ে চলে গেল? কিন্তু আমাকে না দেখবে কেন? এই প্রান্তরের মধ্যে অনেক দূর থেকে সব কিছু দেখা যায়। আমি যদি ফিরে যাই, আর এদিকে সে যদি এগিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে? ক্রমেই তো আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাব। তার চেয়ে আমি এগিয়েই যাই। রাতের চটিতে নিশ্চয় দেখা হবে।"

একটা গ্রামে পৌঁছে চৌকিদারকে বলে রাখল, এই রকম এই রকম একটি বুড়ো এলে যেন তার কুঁড়েয় পৌঁছে দেয়। সে রাতে এলিজা এল না। এফিম এগিয়ে চলল। পথে যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে, একটি ছোট-খাট টাকমাথা বুড়োকে দেখেছে কি না। কেউ দেখে নি। এফিমের অবাক লাগে, তবু সে একাই পথ চলে। ভাবে: "ওডেসায় বা জাহাজে নিশ্চয় আমাদের দেখা হবে।"

তারপর আর ভাবে না।

পথে একজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হল। তার পরণে পুরোহিতের কোট,

আঁট টুপি, মাথায় লম্বা চুল। সে মাউণ্ট এথোসে গিয়েছে; জেরুজালেমে এই তার দ্বিতীয় যাত্রা। একই জায়গায় তারা রাত কাটাল, আলাপ-পরিচয় হল, তারপর একসঙ্গে যাত্রা করল।

বিনা কষ্টেই তারা ওডেসা পেঁছিল। সেখানে জাহাজের অপেক্ষায় তিন দিন তিন রাত্রি বসে রইল। অনেক জায়গা থেকে এসে আরও বহু যাত্রী বসে আছে। এফিম তাদের এলিজার কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেউ তাকে দেখে নি।

তীর্থযাত্রীটি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল, কেমন করে বিনা টিকিটে জাহাজে চাপা যায়। কিন্তু এফিম তারাসিক সে কথা শুনল না। বলল, "আমি বরং টাকাই দেব। এই জন্যই আমি টাকা জমিয়েছিলাম।"

পাঁচ রুবল দিয়ে সে একখানা বৈদেশিক পাসপোর্ট করল, জাহাজে যাতায়াতের দরুন চল্লিশ রুবল দিল, আর জাহাজে খাবার জন্য রুটি আর মাছ কিনল।

জাহাজ বোঝাই হল। এফিম ও তার সঙ্গী সহ-তীর্থযাত্রীরা সবাই উঠল। নোঙর তোলা হল। সবাই জাহাজে ভাসল।

এক দিন বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে বাতাস উঠল, বৃষ্টি শুরু হল, জাহাজও খুব দুলতে লাগল।

যাত্রীরা এ-ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগল, স্ত্রীলোকরা কান্না জুড়ে দিল; দুর্বল লোকগুলো একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল। এফিমও ভয় পেল, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করল না। সমস্ত রাত এবং তার পরদিনও সে জাহাজে উঠেই যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে রইল। পাশেই ছিল তামবফ্ থেকে আসা আর একটি বুড়ো। দুজনেই যার যার বোঁচকা ধরে বসে রইল। কোন কথা বলল না। তৃতীয় দিন অবস্থা শান্ত হল। পঞ্চম দিনে জাহাজ কন্সট্যান্টিনোপলে নোঙর করল। কতক যাত্রী তীরে নেমে গেল বিজ্ঞ সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা দেখতে। গির্জাটা তখন তুর্কীদের অধিকারে। এফিম জাহাজেই থাকল। কিছু সাদা পাঁউরুটি কিনল। পর দিন জাহাজ ছাড়ল। স্মার্না ও আলেকজাণ্ড্রিয়ায় থেমে জাফায় পেঁছিল। জাফায় সব তীর্থযাত্রী নেমে গেল। সেখান থেকে জেরুজালেম পায়ে হেঁটে সত্তর ভার্স্ট পথ।

জাহাজ থেকে নামবার সময় সবাই খুব ভীত হয়ে পড়ল। জাহাজ খুব উঁচু। সেখান থেকে যাত্রীদের নিচে ছোট ছোট নৌকোয় নামিয়ে দেওয়া হল। যে-কেউ ছিটকে বাইরে পড়ে যেতে পারে। জনা-দুই লোক তো চুবোনি খেলও। যাহোক, সবাই নিরাপদে তীরে পেঁছিল।

পায়ে হেঁটে হেঁটে তারা জেরুজালেম পেঁছিল তৃতীয় দিনে। শহরের

বাইরে রুশ যাত্রীনিবাসে আশ্রয় নিল। সেখানে তাদের পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মারা হল। দুপুরের খাবার খেয়ে এফিম আর তার সংগী পুণ্যস্থানগুলি দেখে বেড়াল। পবিত্র পীঠস্থানে প্রবেশের শুভলগ্ন আসতে তখনও দেরি ছিল। কাজেই তারা সাধু-সন্তদের মঠে গিয়ে হাজির হল। অনেক লোক সেখানে জমায়েত হয়েছে। সেখানে স্ত্রীলোক আর পুরুষকে আলাদা করে দেওয়া হল। সবাইকে জুতো-মোজা খুলে গোল হয়ে বসতে বলা হল। একজন সন্ন্যাসী একখানা তোয়ালে নিয়ে এসে একে-একে সকলের পা ধুইয়ে দিল। ধুয়ে-পুঁছে পায়ে চুমো খেল একে একে সকলেরই। এফিমের পা ধুইয়ে চুমো খেল। সেও প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিল, প্রার্থনা করল, মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল, সমবেত প্রার্থনার সময় পড়বার জন্য তার বাপ-মার নাম লিখিয়ে দিল। যাত্রীদের খাবার ও মদ দেওয়া হল।

মিশরের মেরী যে গুহায় মুক্তিলাভ করেছিলেন, পরদিন তারা সেখানে গেল। সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে, প্রার্থনা করে অ্যাব্রাহামের মঠে গেল। যে সাবেকফ উদ্যানে অ্যাব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে তার ছেলেকে বলি দিতে চেয়েছিল, সেটাও তারা দেখল। তারপর তারা গেল সেই জায়গায় যেখানে যীশু মেরী ম্যাগডালেনকে দেখা দিয়েছিলেন। প্রভুর ভাই সেণ্ট জেম্‌সের গির্জায়ও গেল। সংগী তীর্থযাত্রীটিই তাকে সব কিছু দেখাল, কোথায় কত দক্ষিণা দিতে হবে বলে দিল। দুপুরে তারা খাবার জন্য হোটেলে ফিরল। যেই তারা বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েছে অমনি সেই তীর্থযাত্রী চিৎকার করে জামা-কাপড় হাতড়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

সে বলতে লাগল, "কারা আমার থলে সরিয়েছে। তাতে পঁচিশ রুবল ছিল। দুখানা দশ রুবলের নোট আর তিনটে মুদ্রা।" নানাভাবে সে বিলাপ করতে লাগল। কিন্তু কিছুই তো করবার নেই। সকলে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৯ ॥

শুয়ে শুয়ে নানা দুষ্ট চিন্তা এফিমের মাথায় ঘুরতে লাগল। তার মনে হল, "তীর্থযাত্রীটির টাকা হয়ত চুরি যায় নি। সে তো কোন স্থানেই কিছু দান করে নি। আমাকেই শুধু কোথায় কী দিতে হবে তাই বলেছে, নিজে কিছুই দেয় নি। বরং আমার কাছ থেকে এক রুবল ধার নিয়েছে।"

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সে আবার নিজেকে তিরস্কারও করতে লাগল :

"অন্যকে বিচার করা আমার পক্ষে পাপ। এ চিন্তা আমাকে দূর করতে হবে।" কিন্তু ভুলে যাওয়ামাত্রই আবার তার মনে পড়তে থাকে—টাকার উপর তীর্থযাত্রীটির যে রকম কড়া নজর, তার টাকা চুরি যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। সে ভাবে, "নিশ্চয় লোকটার কোন টাকা ছিল না। আমাকে ধোঁকা দিতেই ও কথা বলেছে।"

সকালে উঠে তারা 'পবিত্র সমাধিস্তম্ভের পুনরুজ্জীবনের বড় গির্জা"র প্রার্থনা-সভায় গেল। তীর্থযাত্রীটিও এফিমের সঙ্গে গেল, তার পাশেই রইল সর্বক্ষণ।

গির্জায় পৌঁছে দেখে লোকে লোকারণ্য—রুশ, গ্রীক, আর্মেনীয়, তুর্ক, সিরীয় ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির তীর্থযাত্রী ও পূজারী সেখানে সমবেত হয়েছে। জনতার সঙ্গে এফিম "পবিত্র ফটক"-এ পৌঁছল। একজন সন্ন্যাসী এসে তাদের তুর্কী রক্ষীদলকে পার করে সেইখানে নিয়ে গেল যেখানে যীশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে তৈলাভিষেক করা হয়েছিল। বড় বড় ন-টি মোমবাতি সেখানে জ্বলছে। সন্ন্যাসী সব কিছু দেখাল, বুঝিয়ে দিল। এফিমও একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হল গলগোথায়। সেখানেই ক্রুশটি পোতা হয়েছিল। এফিম সেখানে প্রার্থনা করল। মাটির সেই ফাটলটাও তাকে দেখান হল যেখানে পৃথিবী পাতাল পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যীশুর হাতে ও পায়ে যেখানে পেরেক ঠোকা হয়েছিল সে জায়গাটাও দেখা হল। তারপর আদমের সমাধি—সেখানে তার কংকালের উপর যীশুর রক্ত ঝরে পড়েছিল। তাকে নিয়ে গেল সেই পাহাড়ে যেখানে বসিয়ে যীশুর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই দণ্ডটির কাছে, যাতে বেঁধে যীশুকে চাবুক মারা হয়েছিল। এফিম যীশুর পায়ের ছাপের গর্ত-করা পাথরটিও দেখল। সন্ন্যাসীরা তাকে আরও অনেক কিছু দেখাত, এমন সময় জন-সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। সবাই 'পবিত্র সমাধিস্তম্ভের" গুহার দিকে ছুটতে লাগল। বিদেশীদের প্রার্থনা-সভা শেষ হয়ে তখন গোঁড়া রুশদের প্রার্থনা-সভা সবে শুরু হয়েছে। এফিমও জনতার সঙ্গে সেই গুহার দিকে অগ্রসর হল।

তীর্থযাত্রীটির সঙ্গ সে এড়িয়ে যেতে চাইল (মনে মনে তখনও সে তার সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করে চলেছে), কিন্তু লোকটা কিছুতেই তাকে ছাড়বে না; সেও সঙ্গে সঙ্গে চলল।

এফিম আরও সামনে এগোতে চাইল, কিন্তু পারল না। এত লোক তখন জমায়েত হয়েছে যে এগোনো-পেছনোও অসম্ভব। প্রার্থনা করতে করতে সে মাঝে মাঝেই টাকার থলিটা হাত দিয়ে দেখছিল। তার মন তখন সেই দিকে। প্রথমে ভাবল, তীর্থযাত্রীটি তাকে ধোঁকা দিয়েছে; আবার ভাবল, যদি সে

সত্য কথাই বলে থাকে, যদি তার টাকা খোয়া গিয়েই থাকে, তাহলে সেরকমটা তো আমার বেলায়ও ঘটতে পারে।

॥ ১০ ॥

এফিম দাঁড়াল। প্রার্থনা করতে করতে সে সম্মুখের পবিত্র স্তম্ভের আসনের দিকে তাকাল। মাথার উপরে ছত্রিশটা বাতি জ্বলছে। জনতার মাথার উপর দিয়ে ভাল করে তাকাতেই হঠাৎ—ও কী! একেবারে সামনে প্রজ্জ্বলিত পবিত্র অগ্নির উপরকার আলোগুলির ঠিক নিচে একটা মোটা ধূসর কোট গায়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাটো একটি বুড়ো মানুষ, তার মাথার টাক চকচক্ করছে ঠিক এলিজা বোদ্রোফের মত। সে ভাবল, "এলিজার মত দেখতে বটে, কিন্তু সে তো হতে পারে না। আমার আগে সে তো এখানে আসতে পারে না! আমাদের আগেকার জাহাজ ছেড়েছিল সাতদিন আগে। এত আগে তো তার পক্ষে পৌঁছনো সম্ভব নয়। আবার আমাদের জাহাজেও সে আসে নি। প্রতিটি যাত্রীকে আমি ভাল করে দেখেছি।"

এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতেই সে দেখল, সেই ছোটখাট বুড়োটি তিনবার মাথা নোয়াল: একবার ঈশ্বরের সামনে, তারপর দুই পাশের প্রার্থনারত জনতার দিকে। বুড়োটি যখন ডান দিকে মাথাটা ঘোরাল, তখন এফিম তাকে চিনতে পারল। এ তো স্বয়ং বোদ্রোফ—তার গালের কাছে পাক-ধরা কালো কোঁকড়ানো দাড়ি, তার ভুরু, চোখ, নাক, মুখ। সে-ই তো। সঙ্গী পেয়ে এফিম ভারি খুশি। সে যে তার আগেই এসে পৌঁছেছে, এটা খুবই বিস্ময়কর।

"আরে বোদ্রোফ, তুমি অতটা সামনে গেলে কেমন করে!" সে ভাবল। নিশ্চয়ই এমন কারও সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। বেরোবার পথেই তাকে ধরব; তীর্থযাত্রীটিকে ঝেড়ে ফেলে এলিজার সঙ্গ নেব; সে হয়ত আমাকে কি ভাবে সকলের আগে যাওয়া যায় সে পথ দেখিয়ে দেবে।"

এলিজা যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য তাকে সে চোখে চোখে রাখল। প্রার্থনা শেষ হলে জনতা সমাধিস্তম্ভকে চুম্বন করবার জন্য সবেগে অগ্রসর হতে লাগল; তাদের চাপে এফিম একপাশে ছিটকে গেল। ওদিকে আবার ভয়, বুঝি টাকার থলি চুরি যায়। হাতের মুঠোয় থলিটা চেপে ধরে এফিম খোলা জায়গায় যাবার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল। বাইরে বেরিয়ে গির্জার ভিতরে ও বাইরে এখানে-ওখানে অনেক ঘুরল, এলিজাকে অনেক খুঁজল।

গির্জার ছোট ঘরে সে অনেক লোককে দেখতে পেল;—কেউ খাচ্ছে, কেউ বা পান করছে, ঘুমুচ্ছে। কিন্তু এলিজা কোথাও নেই।

এফিম যাত্রীনিবাসে ফিরে এল। সেখানেও এলিজাকে দেখতে পেল না।

সেইদিন সন্ধ্যায় তীর্থযাত্রীটিও ফিরে এল না। তার রুবল ফিরিয়ে না দিয়েই সে উধাও হয়ে গেল। এফিম একেবারে একা পড়ে গেল।

পরদিন এফিম আবার পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভে গেল। সঙ্গী জাহাজের পরিচিত তানবোকের সেই বৃদ্ধ। সে একেবারে সামনের সারিতে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু পিছনেই পড়ে রইল। সেখানেই একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। সামনে তাকিয়ে আবার সে দেখতে পেল—সমাধিস্তম্ভের আলোর ঠিক নিচে একটা খুব ভাল জায়গায় এলিজা দাঁড়িয়ে আছে; পবিত্র আসনে দণ্ডায়মান পুরোহিতের মত তার দুই হাত সামনে প্রসারিত, তার গোল টাক মাথাটা চক্-চক্ করছে।

এফিম ভাবল, "আচ্ছা, এবার আর ওকে হারাচ্ছি না।" সে জোর করে সামনে এগোতে লাগল। দুই হাতে ভিড় সরিয়ে সামনে গিয়ে দেখল, এলিজা সেখানে নেই।

তৃতীয় দিন সে আবার পবিত্র সমাধিস্তম্ভে গেল। আবারও দেখল, একেবারে সর্বোচ্চ আসনে পরিষ্কার দাঁড়িয়ে আছে এলিজা। তার হাত সম্মুখে প্রসারিত, যেন কাউকে দেখছে এমনিভাবে উর্ধ্ব দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এফিম ভাবল, "আচ্ছা, এবার তাকে হারাচ্ছি না। বের হবার পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তাহলে আর কেউ কাউকে হারাব না।"

বাইরে গিয়ে এফিম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। দুপুর গড়িয়ে গেল; সকলেই তার পাশ দিয়ে চলে গেল; শুধু গেল না এলিজা।

ছ-সপ্তাহ এফিম জেরুজালেমে কাটাল। সর্বত্র গেল—বেথলেহেম, বেথানি, জর্ডন, সব জায়গায়। নিজের কবরের জন্য সে একটি নতুন শার্ট পবিত্র সমাধিস্তম্ভ থেকে মন্ত্রপূত করিয়ে নিল, জর্ডন নদীর জল সংগ্রহ করল, খানিকটা পবিত্র মাটি ও পবিত্র অগ্নিতে জ্বালানো একটা মোমবাতি সঙ্গে নিল, আট জায়গায় প্রার্থনার জন্য নাম লেখাল, এবং শুধুমাত্র বাড়ি ফিরবার টাকা রেখে আর সব খরচ করে ফেলল। তারপর শুরু হল ফিরতি যাত্রা। পায়ে হেঁটে জাফায় এসে জাহাজে চড়ল। সেখান থেকে ওডেসায় এসে আবার পায়ে হেঁটে বাড়ি পেঁছিল।

॥ ১১ ॥

এফিম বাড়ি ফিরবার সেই একই পথ ধরল। যত এগোয় ততই তার দুশ্চিন্তা বাড়ে, তার অনুপস্থিতিতে ঘর-গেরস্তালি সব ঠিকমত চলেছে তো? এক বছরে তো অনেক জল বয়ে গেল। ঘর গড়তেই সময় লাগে, ভাঙতে আর কী। তাকে ছাড়া ছেলে সব ঠিকমত করতে পেরেছে তো? বসন্তকাল কেমন কেটেছে কে জানে। শীতে গরু-ভেড়াগুলোই বা কেমন ছিল? নতুন ঘরখানি কি শেষ হয়েছে?

এক বছর আগে এলিজার সঙ্গে যেখানে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সেইখানে পৌঁছল এফিম। লোকগুলোকে এখন যেন আর চেনা যায় না। এক বছর আগে তারা সব না খেয়ে মরছিল, এবার সবারই বরাত ফিরেছে, ফসল ভাল হয়েছে। গত বছরের দুঃখ-কষ্টকে ঝেড়ে ফেলেছে সবাই।

এক বছর আগে এলিজা যে গাঁয়ে থেকে গিয়েছিল সেই গাঁয়ে পৌঁছল এফিম। গাঁয়ে ঢুকতেই সাদা ফ্রক-পরা একটি ছোট্ট মেয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

"দিদু! দিদুসিউ! আমাদের বাড়ি এস।"

এফিম নিজের পথেই এগোতে চাইল। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা: তার কোটের নিচু দিকটা আঁকড়ে ধরে হাসতে হাসতে তাকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল।

ছোট ছেলেকে নিয়ে একটি স্ত্রীলোকও বেরিয়ে এসে তাকে ডাকল: ' আসুন দিদু, খেয়ে-দেয়ে এখানেই রাতটা কাটান।"

এফিম ভিতরে ঢুকল। ভাবল, এলিজার কথা জিজ্ঞেস করি। হয়ত এই বাড়িতেই সে জল খেতে ঢুকেছিল।

ঘরে ঢুকলে স্ত্রীলোকটি তার ঘাড় থেকে বোঁচকাটা নামাল, হাত-মুখ ধোবার জল দিল, তারপর খাবার টেবিলে নিয়ে বসাল। দুধ আর কাশা খেতে দিল।

এফিম তাকে ধন্যবাদ জানাল, তীর্থযাত্রীদের আপ্যায়ন করার জন্য তাকে প্রশংসা করল।

স্ত্রীলোকটি মাথা নেড়ে বলল, "তীর্থযাত্রীকে আমরা কখনও ফেরাই না। একজন তীর্থযাত্রীর কাছেই আমরা বাঁচতে শিখেছি। আমরা ঈশ্বরকে ভুলে ছিলাম, তাই ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। মরতেই তো বসেছিলাম। গত গ্রীষ্মে সবাই তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এক কণা খাবার ছিল না। মরেই যেতাম, এমন সময় আপনার মত একজন বৃদ্ধকেই ঈশ্বর পাঠালেন। জল খেতে এসে আমাদের দেখে তাঁর দয়া হল, এখানেই থেকে গেলেন। তিনি আমাদের খাদ্য দিলেন, পানীয় দিলেন, আমাদের বাঁচালেন; জমি খালাস করে

দিলেন, ঘোড়া ও গাড়ি কিনে তাও আমাদের দিয়ে গেলেন।”

ঠিক সেই সময় বুড়ি ঘরে ঢুকে বাধা দিয়ে বলতে লাগল, “জানি না তিনি মানুষ না স্বর্গের দেবদূত! তিনি আমাদের ভালবাসা দিলেন, দয়া করলেন, তারপর চলে গেলেন। পরিচয়ও জানালেন না যে তাঁর জন্য একটু প্রার্থনা জানাব। এখনও মনে হয় যেন আজকের ঘটনা: ওইখানে আমি শুয়ে আছি, মরণ এলেই হয় এমন অবস্থা। চোখ মেলে দেখি সাদাসিদা ছোটখাটো টাকমাথা একটি বুড়ো মানুষ জল চাইছে। পাপীর মন তো, আমি ভাবলাম: ও আবার কি জন্য উঁকিঝুঁকি মারছে? তারপর লোকটি কী করাই না করল! আমাদের দেখেই ধপাস্ করে বোঁচকাটা ফেলে দিল। ঠিক ওইখানে। তারপর সেটা খুলে ফেলল।”

ছোট মেয়েটিও বলতে ছাড়ল না।

“হল না ঠাকুমা। তিনি প্রথমে বোঁচকাটা রাখলেন ওখানে ঘরের ঠিক মাঝে, তারপর তুলে রাখলেন বেঞ্চিটার উপর।”

তারপর শুরু হল তাদের কথা-কাটাকাটি, তার সব কথা, তার সব কাজের ফিরিস্তি বর্ণনা: কোথায় সে বসেছিল, কোথায় ঘুমিয়েছিল, কী করেছিল, কী বলেছিল, সব।

সন্ধ্যায় কৃষক ফিরে এল ঘোড়া নিয়ে। বুড়ো মানুষটার গল্প বলতে সেও কমতি গেল না।

“তিনি যদি না আসতেন, আমরা সবাই মরে যেতাম। গভীর হতাশায় মরতে বসে আমরা অভিযোগ করছিলাম ঈশ্বর আর মানুষের বিরুদ্ধে। তিনিই আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখালেন। মানুষের মধ্যে সৎকে দেখতে শেখালেন। যীশু তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। গরু-ভেড়া-র মত বেঁচে ছিলাম আমরা। তিনি আমাদের মানুষ করে গেছেন।”

এফিমকে খাদ্য ও পানীয় জুগিয়ে শোবার জায়গা করে দিয়ে তারাও সকলে শুতে গেল।

এফিম জেগেই রইল। জেরুজালেমে সে যে বারবার তিনবার এলিজাকে দেখেছিল, এ চিন্তা কিছুতেই তার মাথা থেকে গেল না।

তার মনে হল, “বুঝেছি কেমন করে সে আমার আগে পেঁৗছে গেছে। আমার তীর্থযাত্রার পুণ্য যথাস্থানে পেঁৗচেছে কি না জানি না, কিন্তু তার যাত্রা ঈশ্বরের কাছেই পেঁৗছে গিয়েছিল।”

সকালে সকলে মিলে এফিমকে বিদায় জানাল, পথের জন্য তার বোঁচকায় কিছু খাবার ভরে দিল, তারপর যে যার কাজে চলে গেল।

এফিমও পথে পা বাড়াল।

॥ ১২ ॥

ঠিক এক বছর এফিম তীর্থভ্রমণ করেছে। সে যখন বাড়ি ফিরল তখন বসন্তকাল। সন্ধ্যার দিকে বাড়ি পৌঁছে দেখে, ছেলে বাড়ি নেই, মদের দোকানে গেছে। বেশি রাত করে মদ গিলে ছেলে বাড়ি ফিরল। এফিম তখন নানারকম কৈফিয়ত তলব করল। দেখা গেল, তার অনুপস্থিতিকালে ছেলেটা কিছুই করে নি। বোকার মত কাজ করে সব দিক ডুবিয়েছে। বাপ ছেলেকে বকতে লাগল। ছেলেও পাল্টা জবাব দিল :

"তোমারই তো দোষ! তুমিই তো টাকা পয়সা সব নিয়ে চলে গেলে। এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?"

বৃদ্ধ রেগে তাকে প্রহার করল।

পরদিন সকালে এফিম তারাসিক গ্রাম-প্রধানের বাড়ি গেল ছেলের বিষয়ে আলোচনা করতে। পথে এলিজার বাড়ি। এলিজার স্ত্রী বাড়ির দরজা থেকেই তাকে ডেকে বলল : "এই যে, ভাল তো? তীর্থধর্ম বেশ ভালই হল তো?"

এফিম দাঁড়াল। বলল, "ঈশ্বরের কৃপায় ভালই হয়েছে। তোমাদের বুড়ো তো মাঝপথেই হারিয়ে গেল। শুনলাম সেও বাড়ি ফিরেছে।"

বুড়ি মহা গপ্পে, সে অমনি মুখ খুলল : "তা ফিরেছে, অনেক দিন হল ফিরেছে। ধরুন, উৎসবের ঠিক আগে, বা কাছাকাছি সময়ে। ঈশ্বর ইচ্ছায় সে ফিরে আসায় ভালই হয়েছে। ওকে ছাড়া বড়ই একা-একা লাগত। কাজ-কর্ম অবশ্য এখন আর বেশি কিছু করতে পারে না—দিন তো হয়ে এল। তবু সে যে এখনও বাড়ির কর্তা তাতেই আমাদের আনন্দ। আর ছেলেও খুব খুশি —ওকে ছাড়া যেন অকূল আঁধারে পড়েছিল। যাই বলুন, ওকে ছাড়া যেন আমাদের চলে না। ওকে আমরা ভালবাসি। সোহাগ করি।"

"সে কি এখন বাড়ি আছে?"

"বাড়িতেই তো আছে। মৌ-ঘরে মৌমাছিদের চাকে বসাচ্ছে। ও তো বলছে খুব ভাল মৌমাছি হয়েছে; ঈশ্বরের ইচ্ছায় এমন বড়-সড় হয়েছে যে-রকম বড় একটা দেখা যায় না। ও তো বলে, ঈশ্বর আমাদের করুণা করে পাপের শাস্তি দেন নি। আরে; আপনি ভিতরে আসুন। আপনাকে দেখলে ও খুব খুশি হবে।"

বাড়ির ভিতর গিয়ে এফিম এলিজার মৌ-ঘরে চলে গেল।

আরে! বার্চ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এলিজা। হাতে জাল নেই, দস্তানা নেই, একটা ধূসর রঙের কোট গায়ে। হাত-দুখানি সামনে বাড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে আছে, সারা টাক-মাথাটা চক্-চক্ করছে,—ঠিক যেমন

সে দাঁড়িয়েছিল জেরুজালেমের 'পবিত্র সমাধি'র পাশে। মাথার উপরে বার্চ গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঠিক তেমনিভাবে পড়েছে যেমন পড়েছিল জেরুজালেমের পবিত্র অগ্নিশিখা। সোনালি মৌমাছিগুলো গুন-গুন করে মাথার চারদিকে ঘুরছে অথচ কামড়াচ্ছে না, ঠিক যেন একটা জ্যোতির্মণ্ডল।

এলিজার স্ত্রী ডেকে বলল, "তোমার বন্ধু এসেছেন।"

এলিজা খুশিমনে ফিরে তাকাল। ধীরে ধীরে দাড়ির ভিতর থেকে মৌমাছিগুলোকে সরিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এল।

"নমস্কার, নমস্কার বন্ধু। তারপর ধর্মকর্ম সব ভাল হল তো?"

"পা দুটো ঠিকই চলেছে। জর্ডন নদীর জলও তোমার জন্য এনেছি। গিয়ে নিয়ে এসো। তবে প্রভু আমার তীর্থযাত্রা গ্রহণ করেছেন কি না......"

"আরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। যীশু তোমার মঙ্গল করুন।"

একটু চুপ করে থেকে এফিম বলল, "আমার পা দুটো সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু অন্তরটা আমার, না অন্য কারও..."

এলিজা বাধা দিল, "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বন্ধু, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"ফেরবার পথে সেই বাড়িতে উঠেছিলাম যেখানে তুমি—"

আঁতকে উঠে এলিজা তাড়াতাড়ি বলল: "ঈশ্বরের ইচ্ছা বন্ধু, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। চল, ঘরে চল, তোমাকে মধু খাওয়াব।"

প্রসঙ্গ পাল্টে এলিজা গৃহস্থালির কথা শুরু করল।

এফিম একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সে বাড়ির লোকজনদের কথা, জেরুজালেমে তাকে দর্শনের কথা কিছুই এলিজাকে বলল না।

শুধু তার মনে হল, মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকে যেন ভালবাসা আর কাজের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্তব্য পালন করি—এই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

১৮৮৫

জীবে প্রেম করে যেই জন

Where love is God is

কোন এক শহরে এক সময়ে এক মুচি বাস করত। তার নাম মার্টিন এবুডিশ। একতলার যে ছোট্ট ঘরটিতে সে থাকত তার একটিমাত্র জানালা। আর সে জানালাটি ছিল রাস্তার দিকে। কাজেই তার ভিতর দিয়ে রাস্তার লোকজন দেখা যেত। অবশ্য দেখা যেত শুধু তাদের পা, আর মার্টিন

এবডিশও জুতো দেখেই লোক চিনতে পারত। অনেক কাল ধরে সে এখানে আছে, কাজেই অনেকের সঙ্গেই তার জানাশোনা। দু-একবার তার হাতে এসে পড়ে নি এমন একজোড়া জুতো এ তল্লাটে খুঁজে পাওয়া ভার। কোন জুতো 'রি-সোল' করেছে, কোনটায় বা নতুন করে গোড়ালি লাগিয়েছে। অনেক সময়ই সে জানালা দিয়ে চেয়ে তার কাজগুলো দেখত। কাজও পেত সে প্রচুর, কারণ সে কাজ করত সৎ পথে, ভাল জিনিস দিত, দাম নিত অল্প, আর সব সময় কথা ঠিক রাখত। ঠিক সময়-মত যে কাজ করে দিতে পারবে শুধু সেই কাজই সে নিত ; না পারলে আগেই সেকথা বলে দিত, অকারণে কাউকে ভোগাত না। এবডিশকে সকলেই চিনত, তাই সে কাজও পেত প্রচুর।

স্বভাবতই সে মানুষ ভাল। তার উপর যতই বয়স বাড়তে লাগল ততই সে বেশি করে ভাবতে লাগল তার অন্তরাত্মার কথা, ততই সে বেশি করে ঝুঁকল ঈশ্বরের দিকে। শিক্ষানবিশ থাকাকালেই তার স্ত্রী মারা যায় একটিমাত্র তিন বছরের ছেলে রেখে। তাদের অন্য সব সন্তান আগেই মারা গিয়েছিল। প্রথমে মার্টিন ভেবেছিল, ছোট ছেলেটিকে তার বোনের কাছে গ্রামে পাঠিয়ে দেবে ; কিন্তু পরে সে মত বদলাল, ভাবল : 'কোন অপরিচিত পরিবারে মানুষ হতে হলে আমার ছোট্ট ক্যাপিটোশ্‌কের কষ্ট হবে। তার চেয়ে সে আমার কাছেই থাকুক।' কাজেই শিক্ষানবিশী শেষ করে এবডিশ ছোট ছেলেকে নিয়ে একটা বাসাবাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু ঈশ্বর তার কপালে পুত্র-সুখ লেখেন নি। ছেলেটি বড় হয়ে সবে বাপকে কিছু-কিছু সাহায্য করে তাকে সুখী করতে শুরু করেছে, এমন সময় সে অসুখে পড়ল, বিছানা নিল; আর এক সপ্তাহ জ্বরে ভুগে মারা গেল।

মার্টিন ছেলেটিকে কবর দিল। গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ল একেবারে। এমন কি ঈশ্বরে পর্যন্ত বিশ্বাস হারাতে বসল। গভীর নৈরাশ্যে বার বার ঈশ্বরের কাছে মৃত্যুভিক্ষা করল ; এমনকি তার মত একটা বুড়ো-হাবড়ার পরিবর্তে তার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কাছে টেনে নেবার জন্য ঈশ্বরকে তিরস্কার করল পর্যন্ত। শেষটায় সে গির্জায় যাওয়াই ছেড়ে দিল।

তারপর একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এল তাদেরই গাঁয়ের একজন বুড়ো তীর্থযাত্রী,—সাত বছর ধরে সে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথায় কথায় এবডিশ অকে জানাল তার নিজের দুঃখের কথা।

সে বলল, "আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না বাবাজী, আমি শুধু মরতে চাই। ঈশ্বরের কাছে এ ছাড়া আর কিছুই আমার চাওয়ার নেই। আজ আমার কেউ নেই, কোন আশাও নেই।"

বুড়ো তীর্থযাত্রী জবাব দিল, "না না, এমন কথা বলো না মার্টিন।

ঈশ্বরের কাজের বিচারক আমরা নই। ঈশ্বরের বিচারের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে, আমাদের বুদ্ধির উপরে নয়। তিনি যখন ভেবেছেন যে তোমার ছেলেকে মরতে হবে আর তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, তখন সেটাকেই ঠিক বলে মনে করতে হবে। তুমি যে এত দুঃখ পাচ্ছ তার কারণ, শুধুমাত্র নিজের সুখের জন্যই তুমি বাঁচতে চেয়েছ।"

"তাহলে আর কিসের জন্য লোক বেঁচে থাকে?" মার্টিন প্রশ্ন করল।

"শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য।" বুড়ো লোকটি জবাব দিল। "এ জীবন তারই দান, কাজেই তাঁর জন্যই তোমার বেঁচে থাকা উচিত। যখন তাঁর জন্য বেঁচে থাকতে শুরু করবে, দেখবে তখন আর তোমার ক্ষোভ থাকবে না, সব কিছুই তোমার কাছে বেশ সহজ হয়ে আসবে।"

মার্টিন চুপ করে রইল। তারপর বলল, "কিন্তু ঈশ্বরের জন্য আমি কেমন করে বাঁচব?"

বুড়ো লোকটি বলল, "সে পথ তো যীশুই আমাদের দেখিয়েছেন। তুমি পড়তে পার তো? একখানা 'টেস্টামেণ্ট' কিনে পড়, তাহলেই বুঝতে পারবে কেমন করে ঈশ্বরের জন্য বাঁচতে হয়। হ্যাঁ, সে বইতে সব লেখা আছে।"

কথাগুলো এব্‌ডিশের অন্তরে গভীর রেখাপাত করল। সেইদিনই বেরিয়ে সে বড় হরফে ছাপা একখানি 'নিউ টেস্টামেণ্ট' কিনে পড়তে আরম্ভ করল।

এব্‌ডিশ প্রথমে ভেবেছিল শুধু ছুটির দিনগুলোতে বইখানা পড়বে। কিন্তু একবার পড়তে আরম্ভ করে মনে এমন শান্তি পেল যে রোজই পড়তে লাগল। একদিন তো পড়ায় এমন ডুবে গেল যে বাতির সবটা কেরোসিন পুড়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বই ছেড়ে উঠতেই পারল না। যতই পড়ে ততই যেন সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে ঈশ্বর তার কাছে কি চায়, কেমন করে ঈশ্বরের জন্য বাঁচা যায়; ততই তার অন্তর হাল্কা হতে থাকে। আগে আগে যখনই সে ঘুমের জন্য শুত তখনই তার ছোট্ট ক্যাপিটোশ্‌কার কথা মনে করে যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠত। কিন্তু এখন সে শুধু বার বার বলে, "হে প্রভু! তোমার জয় হোক। তোমার জয় হোক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

সেই দিন থেকে এব্‌ডিশের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। আগে সে ছুটির দিনগুলোতে সরাইখানায় গিয়ে একটু চা খেত, কখনও বা এক গ্লাস ভদ্‌কাও খেত। বন্ধুর সঙ্গে অল্প কিছু পান করে যখন সে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে আসত তখন, ঠিক মাতাল না হলেও, তার পা টলত এবং আজে-বাজে বকত; কখনও বা বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচিও করত। কিন্তু এখন এসব সে ছেড়ে দিয়েছে; তার জীবনে ফিরে এসেছে সুখ ও শান্তি। খুব ভোরে উঠে সে কাজে বসত; যতক্ষণ কাজ করবার একটানা খাটত; তারপর তাকের উপর থেকে বাতিটা নামিয়ে সেটা জেলে পড়তে বসত। যত পড়ে তত সব

বোঝে ; যত বোঝে তত তার মন পরিষ্কার হয়, আনন্দে ভরে ওঠে।

একদিন পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেল। সেণ্ট লুক লিখিত সুসমাচারের ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলো সে পড়ছিল :

"যদি কেউ তোমার এক গালে চড় মারে, তাহলে অপর গাল তার দিকে এগিয়ে দাও ; কেউ যদি তোমার ক্লোকটা নেয়, তাকে তোমার কোটটাও দিয়ে দাও। তোমার কাছে কেউ কিছু চাইলে তা তাকে দাও, আর যা তোমার তাও যদি কেউ চায়, তাও কখনও তুমি ফিরে চেয়ো না। মানুষের কাছে যেমন ব্যবহার তুমি আশা কর, ঠিক তেমনি ব্যবহার তাদের সঙ্গে কর।"

আরও এগিয়ে সেই শ্লোকগুলো সে পড়তে লাগল যেখানে প্রভু বলছেন :

"তোমরা আমাকে মুখে বলবে প্রভু, প্রভু, অথচ আমি যা বলি তা করবে না, এ কেমন কথা? যে লোক আমার কাছে আসে, আমার আদেশ শোনে, সেগুলো পালন করে, সে কেমন লোক বলছি : সে হচ্ছে সেই মানুষ যে বাড়ি তৈরি করতে অনেক গভীর করে খুঁড়ে পাথরের উপর ভিত্তি স্থাপন করল। তারপর বন্যা এল, নদী আছড়ে পড়ল সেই বাড়ির উপর, কিন্তু একটুও নড়াতে পারল না, কারণ সে বাড়ি যে পাথরের উপর গড়া। কিন্তু যে লোক আমার কথা শোনে, অথচ তা পালন করে না সে হচ্ছে সেই মানুষ যে বিনা ভিত্তিতে মাটির উপর বাড়ি তৈরি করে ; তারপর নদী যখন আছড়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়, আর বাড়িটার ক্ষতিও হয় প্রচুর।"

এই কথাগুলো পড়ে এবাডিশের মন খুশিতে ভরে উঠল। সে চশমাটা খুলে বইয়ের উপর রাখল, এবং টেবিলের উপর কনুই রেখে ভাবতে লাগল। ওই কথাগুলো দিয়ে নিজের জীবনের পরিমাপ করতে বসে সে নিজের মনেই ভাবতে লাগল :

"আমার বাড়ি কিসের উপর স্থাপিত—পাথরের উপর, না বালির উপর? যদি পাথরের উপর হয়, তাহলেই ভাল। এখানে একা বসে তো বেশ ভালই লাগছে। কিন্তু আমি তো অনায়াসেই ভাবতে পারি যে ঈশ্বরের সব নির্দেশ মেনে চলেও হয়ত অসতর্কতার দরুন আবার পাপ করে বসলাম। যাই হোক, আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। আর তার ফল তো ভালই হয়েছে। হে প্রভু! তুমি আমার সহায় হও।"

এইরকম ভাবতে ভাবতে তার ঘুমোবার সময় হল, তবু বই ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করল না। সেণ্ট লুকের সপ্তম অধ্যায় পড়তে শুরু করল। একে একে শত সৈন্যের সেনাপতি, বিধবার পুত্র, জনের শিষ্যদের প্রতি উপদেশ, একজন ধনী ফ্যারিসি কর্তৃক প্রভুকে অতিথি হিসাবে স্বগৃহে আমন্ত্রণ, ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক কর্তৃক তাঁর পায়ে তেল মাখানো ও চোখের জলে ধুইয়ে দেওয়া এবং প্রভু কর্তৃক তার উদ্ধার সাধন প্রভৃতি সব সে পড়ে ফেলল। তারপর চুয়াল্লিশ

নম্বর শ্লোকে পৌঁছে সে পড়তে লাগল :

"তখন স্ত্রীলোকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি সাইমনকে বললেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখছ? আমি তোমার বাড়িতে এলাম, কিন্তু তুমি আমার পা ধোবার জল দিলে না; আর এই স্ত্রীলোকটি চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে দিয়েছে, মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে। তুমি আমাকে স্বাগত জানিয়ে চুম্বন কর নি, কিন্তু আমি আসার পর থেকে সে অবিরাম আমার পা দু-খানি চুম্বন করছে। তুমি আমার মাথার তেল দাও নি, কিন্তু সে আমার পায়ে প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে।"

শ্লোকগুলি পড়ে সে ভাবতে লাগল : "তুমি বলে দাও নি, তুমি চুম্বন কর নি, তুমি আমার মাথায় তেল ঢাল নি......"—আবার সে চশমা খুলে বইয়ের উপরে রেখে চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। নিজেকে বলতে লাগল : "এই ফ্যারিসিটি ঠিক আমার মত। আমার মতই সে শুধু নিজের কথাই ভেবেছে। অতিথির কথা চিন্তা না করে সে গরমে বসে আরাম করে চা খেয়েছে। সে নিজের যত্ন নিজে নিয়েছে, অতিথিকে যত্ন করে নি। আর, সে অতিথি কে? স্বয়ং প্রভু! তিনি যদি আমার কাছে আসেন, আমিও কি অমনি করব?"

দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে কখন যে এব্‌ডিশ ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই টের পায় নি।

"মার্টিন!"—অকস্মাৎ একটি কণ্ঠস্বর যেন নিশ্বাসের মত তার কানে এসে বাজল।

তন্দ্রার মধ্যেই জেগে উঠল মার্টিন।

কে ওখানে? মার্টিন চারদিকে চোখ ঘোরাল। তাকাল দরজার দিকে। কেউ নেই। আবার সে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসল। সহসা সে আবার স্পষ্ট শুনতে পেল :

"মার্টিন! মার্টিন! কাল রাস্তার দিকে চেয়ে থেকো। আমি তোমাকে দেখতে আসব।"

মার্টিনের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। চোখ মুছল। বুঝতে পারল না, কথাগুলো সে শুনেছে, না স্বপ্ন দেখেছে।

বাতি নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ভোর হবার আগেই এব্‌ডিশ উঠে পড়ল, প্রার্থনা করল, স্টোভ ধরাল, কপির ঝোল আর 'কাশা' চড়াল, 'সামোভার' জ্বালাল, অ্যাপ্রন পরল, তারপর জানালার পাশে কাজে বসল। কাজ করতে করতেই গত রাত্রের ঘটনার কথা ভাবতে লাগল। তার মনে দুটো ভাব দেখা দিল। একবার মনে হল, সে স্বপ্ন দেখেছে; আবার পরমুহূর্তেই মনে হল, সত্যি সে-কণ্ঠস্বর সে শুনেছে। মনে মনে ভাবলে, হ্যাঁ, এমন ঘটনা তো ঘটেই।

জানালার পাশে বসে মার্টিন যত না কাজ করল তার চাইতে বেশি সময় তাকিয়ে রইল বাইরে। যখনই কেউ অচেনা জুতো পরে আসে, অমনি সে মুখ নিচু করে জানালা দিয়ে তাকিয়ে তার মুখ এবং জুতো দুই-ই দেখতে চেষ্টা করে। নতুন ফেল্ট বুট পরে এল একজন দারোয়ান। একজন জলের ভারী চলে গেল। তারপর প্রথম নিকোলাসের সময়কার একজন বুড়ো সৈনিক পুরোনো তালিমারা জুতো পায়ে হাতে একটা শাবল নিয়ে একেবারে জানালার নিচে এসে দাঁড়াল। জুতো-জোড়া দেখেই এব্‌ডিশ তাকে চিনল। লোকটার নাম স্টেপানিচ, জনৈক প্রতিবেশী ব্যবসায়ীর বাড়িতে সে থাকে। তাঁর কাজ দারোয়ানকে সাহায্য করা। স্টেপানিচ এব্‌ডিশের জানালার বাইরের জমা বরফ সরাতে লাগল। এব্‌ডিশও তার দিকে একবার তাকিয়ে কাজে মন দিল।

"আরে! বুড়ো বয়সে কি তোমার ভিমরতি হল?"—কথাটা ভাবতেই এব্‌ডিশ হেসে ফেলল। "স্টেপানিচ এসেছে বরফ পরিষ্কার করতে, আর আমি ভাবছি যীশু এসেছেন আমার কাছে। কী বুড়ো গাধাই যে আমি হয়েছি!"

যাহোক, ডজন-খানেক ফোঁড় দেবার পরেই আবার সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সে দেখতে পেল, স্টেপানিচ শাবলটাকে দেয়ালের গায়ে রেখে বিশ্রাম করছে আর নিজেকে একটু গরম করতে চেষ্টা করছে।

এব্‌ডিশ মনে মনে বলল, "লোকটা বুড়ো হয়েছে, শরীরও ভেঙে পড়েছে; বরফ পরিষ্কার করবার মত জোরও নেই। ওকে একটু চা দিলে কেমন হয়? সামোভারে জল এতক্ষণে নিশ্চয় ফুটেছে।"

চামড়ার গায়ে সেলাইয়ের কাঁটাটাকে আটকে রেখে সে উঠে পড়ল। সামোভারটাকে টেবিলের উপর রাখল, চা তৈরি করল, এবং জানালার পাল্লায় আঙুলের টোকা মারল। স্টেপানিচ মুখ ঘুরিয়ে আবার জানালার দিকে এগিয়ে এল।

"ভিতরে এসে একটু গরম হয়ে নাও," মার্টিন বলল, "তুমি যে একেবারে জমে গেছ!"

স্টেপানিচ বলল, "যীশু তোমার মংগল করুন! আমার হাড়গুলো অবধি কাঁপছে।"

ভিতর ঢুকে সে গায়ের বরফ ঝেড়ে ফেলতে লাগল। যদিও দুটো পা তখনও ঠক-ঠক করে কাঁপছে, তথাপি ঘরের মেঝে পাছে নোংরা হয়ে যায় তাই খুব যত্ন করে পা মুছতে শুরু করল।

"তোমাকে আর পা মুছতে হবে না। তোমার জুতো আমিই পরিষ্কার করে দেব। ও তো আমারই কাজের অংগ। এখানে এসে বস, একটু চা খাও।"

এব্‌ডিশ দু-গ্লাস চা তৈরি করল। একটা অতিথির দিকে এগিয়ে দিল,

আর নিজেরটা থালায় ঢেলে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগল।

স্টেপানিচ গ্লাসের সবটা চা খেয়ে গ্লাসটা উপুড় করে অবশিষ্ট চিনির টুকরোটা তার উপর রেখে দিল। তাকে ধন্যবাদ দিল। বেশ বোঝা গেল, আরও কিছুটা চা চাই।

দু-জনের জন্য আর এক গ্লাস করে চা ঢেলে এব্‌ডিশ বলল, "আর এক গ্লাস খাও।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে এব্‌ডিশ চা খেতে লাগল।

তার অতিথি জিজ্ঞেস করল, "কারও আসবার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ নাকি?"

"অপেক্ষা? কার জন্য যে অপেক্ষা করছি সেকথা বলতেও লজ্জা হচ্ছে। অপেক্ষা,—মানে ঠিক অপেক্ষা করা নয়, অথচ কথাগুলোকে মন থেকে তাড়াতেও পারছি না। আমি নিজেই জানি না, সেটা স্বপ্ন না কি। দেখ ভাই, কাল রাতে আমি প্রভু যীশুর সুসমাচার পড়ছিলাম। এই পৃথিবীতে এসে কত যে দুঃখ তিনি পেয়েছেন! সে সব তো তুমিও শুনেছ, কি বল?"

স্টেপানিচ জবাব দিল, "হ্যাঁ, শুনেছি। তবে আমরা তো মুখ্যু লোক, পড়তেও জানি না।"

"তারপর, শোন, আমি পড়ছিলাম এই পৃথিবীতে তিনি কেমন ছিলেন, কেমন করে তিনি একদিন এক ফ্যারিসির বাড়ি গেলেন, অথচ সে লোকটা তাঁর অভ্যর্থনার কোন আয়োজন করল না। জান ভাই, কাল রাতে এই সব পড়ে সেই কথাই ভাবছিলাম—ভাবছিলাম, একদিন হয়ত আমিও আমাদের প্রিয় পিতা যীশুকে উপযুক্ত সম্মান দেখাতে ভুলে যাব। নিজের মনেই আমি ভাবছিলাম, ধর, তিনি আমার কাছে বা আমারই মতন আর কারও কাছে এলেন। লর্ড সাইমনের মত আমরাও কি তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ভুলে যাব? তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে যাব না? এই সব ভাবতে ভাবতে যেখানে বসে ছিলাম সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই অবস্থায়ই শুনতে পেলাম, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। আমি উঠে পড়লাম। সেই কণ্ঠস্বর যেন আমার কানে কানে চুপি চুপি বলল, 'কাল আমার জন্য অপেক্ষা করো, কারণ আমি তোমার কাছে আসব।' দু-বার এ কথাগুলি সে বলল। সেই থেকে কথাগুলো যেন আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। আর, যতই বোকামি হোক তবু তাঁরই জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি—অপেক্ষা করে আছি আমাদের প্রিয় পিতার জন্য।"

স্টেপানিচ শুধু ঘাড় নাড়তে লাগল, মুখে কিছুই বলল না। গ্লাসের চা সবটা খেয়ে এক পাশে নামিয়ে রাখল। এব্‌ডিশ গ্লাসটা নিয়ে আবার ভরে দিল।

বলল, "এটাও খেয়ে ফেল। এতে তোমার উপকার হবে। হ্যাঁ, তারপর শোন। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাদের ছোট্ট পিতা যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করতেন না, তা সে যত ছোটই হোক। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গেই মিশতেন, তাদের সঙ্গেই থাকতেন, আর প্রধানত আমাদের মত পাপী-তাপী শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই তাঁর শিষ্যদের বেছে নিতেন। তিনি বলতেন, 'যে বড় আছে সে-ই ছোট হবে, আর যে ছোট আছে সে-ই বড় হবে।' তিনি আরও বলতেন, 'তোমরা আমাকে প্রভু বল, তবু আমি তোমাদের পা ধুইয়ে দেব। যে পথ দেখাতে চায় তাকে সকলের দাস হতে হবে। কারণ যারা দরিদ্র, যারা দীন, যারা নরম, যারা দয়ালু, তারাই ধন্য।'

স্টেপানিচ চা খেতে একদম ভুলে গিয়েছিল। বুড়ো মানুষ সে, সহজেই তার চোখে জল আসে। চুপ করে বসে শুনতে শুনতে তার দুই গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

এবৃডিশ বলল, "নাও, আরও একটু খাও।"

কিন্তু স্টেপানিচ ক্রুশ চিহ্ন করল, তারপর তাকে ধন্যবাদ দিয়ে গ্লাস সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

বলল "আমাকে নেমন্তন্ন করার জন্য ধন্যবাদ মার্টিন এবৃডিশ, তুমি আমার দেহ ও মন দুয়েরই খোরাক জুগিয়েছ।"

এবৃডিশ বলল, "তুমি আবার এস। অতিথি-অভ্যাগত এলে আমার খুব ভাল লাগে।"

স্টেপানিচ চলে গেলে মার্টিন বাকি চা-টা ঢেলে নিয়ে খেল, চায়ের সাজ-সরঞ্জাম সরিয়ে রাখল, তারপর জানালার পাশে গিয়ে কাজে বসল। জুতো সেলাই করতে করতে কেবলই সে বাইরে তাকাচ্ছিল, আশা করছিল যীশুকে দেখতে পাবে; তার এবং তার কার্যাবলীর কথাই ভাবছিল। যীশুর বাণী-গুলোই তার মাথার মধ্যে চলাফেরা করতে লাগল।

দু জন সৈন্য চলে গেল,—একজনের পায়ে সামরিক বুট, অন্যের পায়ে সাধারণ জুতো। রবারের পরিষ্কার ঢোলা জুতো পরে চলে গেল একজন প্রতিবেশী। একজন রুটিওয়ালা গেল ঝুড়ি নিয়ে। তারপর এল একটি স্ত্রীলোক। পায়ে পশমী মোজা ও খুব পুরনো জুতো। জানালা পার হয়ে পাশের দেয়ালের পাশে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবৃডিশ জানালা দিয়ে দেখতে পেল, স্ত্রীলোকটি আগন্তুক; তার পোষাক-পরিচ্ছদও খারাপ। একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশুটিকে ভালভাবে ঢাকবার চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু ঢাকবার মত কিছুই তার ছিল না। তার পরনে ছিল গ্রীষ্মের কাপড়-জামা; তাও

ছেঁড়া। জানালার ওপাশ থেকেই এব্ডিশ শুনতে পেল শিশুটি কাঁদছে, আর স্ত্রীলোকটি তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। এব্ডিশ উঠে দাঁড়াল, দরজা পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ডাকল, "ওগো ভালমানুষের মেয়ে!"

স্ত্রীলোকটি শুনতে পেয়ে ফিরে দাঁড়াল।

"শিশুটিকে নিয়ে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভিতরে এস। এখানে ওকে আরও ভালভাবে গরমে ঢেকে রাখতে পারবে। চলে এস।"

অ্যাপ্রন-পরা নাকে-চশমা-আঁটা একটি বুড়োমানুষ তাকে ডাকছে দেখে বিস্মিত হলেও স্ত্রীলোকটি তার পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরে ঢুকল।

বুড়ো স্ত্রীলোকটিকে বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "ভালমানুষের মেয়ে, এখানে বসে পড়। কাছেই স্টোভটা রয়েছে, নিজে গরম হও, আর বাচ্চাকে কিছু খাওয়াও।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "আমার তো বুকে দুধ নেই। আর আমি নিজেও সকাল থেকে কিছু খাইনি।"

তথাপি শিশুটিকে সে বুকে চেপে ধরল।

এব্ডিশ মাথা নাড়তে নাড়তে টেবিলের কাছে গেল, রুটি ও একটা পাত্র আনল। তারপর উনুনের ঢাকনা খুলে কপির ঝোল ঢালল পাত্রে। 'কাশা'র পাত্রটাও বের করল, কিন্তু সেটা তখনও তৈরি হয় নি। কাজেই শুধু ঝোলটাই টেবিলের উপর রাখল। টেবিলের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে রুটি নিয়ে এল।

"ভালমানুষের মেয়ে, এখানে বসে খাও। তোমার বাচ্চাকে আমি নিচ্ছি। আমার নিজেরও ছেলেপিলে আছে, তাদের কেমন করে রাখতে হয় আমি জানি।"

স্ত্রীলোকটি ক্রুশ চিহ্ন করে টেবিলে বসে খেতে শুরু করে দিল। এব্ডিশ বাচ্চাকে নিয়ে বিছানায় বসল। ঠোঁট দিয়ে সে দু-একবার চুক্-চুক্ শব্দ করল, কিন্তু তার মুখে একটিও দাঁত না থাকায় শব্দটা ঠিকমত হল না। ফলে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। তখন তাকে চমকে দেবার জন্য সে আঙুলটাকে বাচ্চাটার মুখের সামনে বারবার নাড়াচাড়া করতে লাগল, কিন্তু একবারও আঙুলটা বাচ্চার মুখের ভিতরে পুরে দিল না, কারণ সেলাইয়ের মোম লেগে লেগে আঙুলটা কালো হয়ে ছিল। আঙুলের দিকে তাকিয়ে বাচ্চা শান্ত হল, হাসতে লাগল। এব্ডিশও খুশি হল। এদিকে স্ত্রীলোকটি খেতে খেতেই তার নিজের কথা বলতে লাগল,—সে কে বা কোথায় যাচ্ছে।

"আমি একজন সৈনিকের স্ত্রী। আট মাস আগে আমার স্বামীকে কোথায় কোন্ দূরদেশে পাঠিয়েছে, সেই থেকে তার কোন খবর নেই। বাচ্চা

হবার আগে আমি রাঁধুনির কাজ করেছি—কিন্তু একটি বাচ্চা শুধু তারা আমাকে রাখল না। এ তিন মাস আগেকার কথা। তখন থেকে আমার কোন কাজ নেই। যা কিছু সঞ্চয় ছিল ফুরিয়ে গেছে। নার্সের কাজ করতে চেয়েছি, কিন্তু কেউ কাজে নেয়নি, সকলেই বলে আমি খুব রোগা। একজন ব্যবসায়ীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সেখানে আমার ঠাকুরমা কাজ করে। তিনি কথা দিয়েছিলেন আমাকে নেবেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ সেখানে যেতে তিনি পরের সপ্তাহে আসতে বললেন। এখান থেকে অনেক দূরে তিনি থাকেন। শুধু-শুধু আমি নিজেও হেঁটে মরলাম, বাচ্চাটাকেও ভোগালাম। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার বাড়িওয়ালী আমার প্রতি সদয়, যীশুর নামে তিনি আমাদের থাকতে দিয়েছেন। নইলে কোথায় যে মাথা গুঁজতাম জানি না।"

এব্‌ডিশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার কি গরম জামা-কাপড় কিছুই নেই?"

স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে নিল। এব্‌ডিশ উঠে আলমারির কাছে গেল। সেখানে অনেক খুঁজে-পেতে একটা পুরনো জামা নিয়ে ফিরে এল। বলল, "এই নাও। এটা খুব পুরনো, তাহলেও তোমার শরীরটা ঢাকতে পারবে।"

স্ত্রীলোকটি একবার জামাটার দিকে তাকাল, বুড়ো মানুষটির দিকে তাকাল, জামাটা নিল, এবং তারপরেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এব্‌ডিশ মুখ ঘুরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিচে গেল। সেখান থেকে একটা পুরনো তোরঙ্গ টেনে বের করে তার ভিতরে কি যেন হাতড়াতে লাগল। তারপর স্ত্রীলোকটির সামনে গিয়ে বসল।

তখন স্ত্রীলোকটি তাকে বলল, "দাদু, যীশুর নামে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। নিশ্চয় তিনিই আমাকে আপনার জানালার নিচে পাঠিয়েছিলেন। না হলে তো ঠাণ্ডায় এই বাচ্চার মৃত্যু আমাকে দেখতে হত। আমি যখন বেরিয়ে আসি তখন আবহাওয়া গরম ছিল। এখন তো ঠাণ্ডায় সব জমে যাচ্ছে। কিন্তু তিনিই আমাকে আপনার জানালার কাছে এনে দিয়েছেন যাতে আমার দুরবস্থা দেখে আমার উপর আপনার দয়া হয়।"

এব্‌ডিশ হেসে বলল, "একথা ঠিক যে তিনিই আমাকে ওখানে বসিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ভালমানুষের মেয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম।"

মার্টিন তখন সৈনিকের স্ত্রীর কাছে সব খুলে বলল—তার স্বপ্নের কথা, সেদিন তার কাছে আসবার যে প্রতিশ্রুতি প্রভু তাকে দিয়েছিলেন তার কথা।

"সে তো হতেই পারে," এই কথা বলে স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা

নিল, তা দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়াল। তারপর আবার তাকে অভিবাদন জানিয়ে ধন্যবাদ দিল।

"যীশুর নামে এটাও নাও, এটা দিয়ে তোমার শালটা ফিরিয়ে এনো", বলে এব্‌ডিশ তার হাতে একটা দুই 'গ্রিভেংকা' দিল।

স্ত্রীলোকটি ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। সেও তাই করল। তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় দিল।

স্ত্রীলোকটি চলে গেলে এব্‌ডিশ সামান্য ঝোল খেল, বাসন-পত্তর পরিষ্কার করল, তারপর কাজে বসল। সারাক্ষণ কিন্তু চোখ তার জানালার দিকেই রইল। যখনই সেখানে কোন ছায়া পড়ে অমনি সে চোখ বাড়িয়ে দেখে কে যাচ্ছে। তার পরিচিত অনেকে গেল, অপরিচিত অনেকেও গেল; কিন্তু বিশিষ্ট কাউকে চোখে পড়ল না।

এমন সময় হঠাৎ কি যেন তার নজরে পড়ল। তার জানালার উল্টো দিকে একটি বুড়ি ফেরিওয়ালী এসে দাঁড়িয়েছে একঝুড়ি আপেল নিয়ে। আপেল প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে, ঝুড়িতে সামান্যই বাকি আছে। কিন্তু তার কাঁধে ছিল এক ছালাভর্তি কাঠের টুকরো; একটা অসম্পূর্ণ বাড়ির কাছ থেকেই সেগুলো সে নিশ্চয় কুড়িয়ে পেয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে বোঝাটা তার ঘাড়ে খুব ভারি হয়েই চেপেছে। সেটাকে ঘাড় বদলাবার জন্যই সে দাঁড়িয়েছে। আপেলের ঝুড়িটা একটা থামের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে ছালাটাকে রাস্তায় নামিয়ে কাঠের টুকরোগুলোকে ঝাঁকাতে লাগল। বুড়ি যখন তার ছালা ঝাঁকাতে ব্যস্ত তখন কোথা থেকে ছেঁড়া টুপি মাথায় একটা ছেলে ছুটে এসে ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে নিল। যেই পালাতে যাবে অমনি বুড়ি মুখ ফিরিয়ে তার জামার আস্তিন টেনে ধরল।

ছেলেটা হাতের মুঠো ছাড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বুড়ি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মাথার টুপিটা ফেলে দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরল। ছেলেটা চিৎকার করতে লাগল। বুড়িও গালাগাল দিতে লাগল।

হাতের সেলাইয়ের কাজ মেঝের উপর ফেলে এব্‌ডিশ একলাফে দরজার কাছে গেল। চশমাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোন রকমে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে দেখল, স্ত্রীলোকটি ছেলেটির চুলের মুঠি ধরে টানছে আর গালাগালি দিচ্ছে, তাকে পুলিশে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে; আর ছেলেটা নিজেকে ছাড়াবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। সে বার-বার বলছে, "আমি কক্ষনও নিই নি, কেন আমাকে মারছ? আমাকে ছেড়ে দাও।"

এব্‌ডিশ দু-জনকে সরিয়ে দিয়ে ছেলেটার হাত ধরে বলল, "দিদিমা, ওকে ছেড়ে দাও। যীশুর দোহাই, ওকে ক্ষমা কর, সব ভুলে যাও।"

"আমি ওকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেব যা ও জীবনে ভুলবে না। ও মড়াকে

আমি পুলিশে দেব।”

এবুডিশ তবু অনুনয় করে বলল, “ওকে ছেড়ে দাও দিদিমা, এমন কাজ ও আর কখনও করবে না। যীশুর দোহাই; ওকে ছেড়ে দাও।”

বুড়ি ওকে ছেড়ে দিল। অমনি ছেলেটা দৌড়ে পালাচ্ছিল, এবুডিশ তাকে ধরে ফেলল। বলল, “বুড়ির কাছে ক্ষমা চা! বল্, আর কখনও এ কাজ করবি না। আমি নিজে তোকে আপেলটা নিতে দেখেছি।”

ছেলেটা কেঁদে ফেলল। এবুডিশের কথামত বুড়ির কাছে ক্ষমা চাইল।

এবুডিশ বলল; “ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইবার আমি তোকে একটা দিচ্ছি। এই নে।”

ঝুড়ি থেকে একটা আপেল নিয়ে সে ছেলেটাকে দিল। বুড়িকে বলল, “এটার পয়সা আমি তোমাকে দেব গো ভালমানুষের মেয়ে।”

বুড়ি বাধা দিল: “ঠিক আছে। কিন্তু এই করে তুমি ক্ষুদে শয়তানটার মাথা খাচ্ছ। ওকে এমন পুরস্কার দেওরা উচিত ছিল যা ও সাত দিনেও ভুলত না।”

এবুডিশ বলে উঠল, “আহা ভালমানুষের মেয়ে, আমাদের পুরস্কারের ব্যবস্থাটা হয়ত ও রকম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থা তা নয়। আপেলটা নেবার জন্য ছেলেটাকে যদি চাবুক মারা হয়, তাহলে আমাদের পাপের জন্য কি আমাদেরও শাস্তি পাওয়া উচিত নয়?”

বুড়ি চুপ করে গেল। তখন এবুডিশ বুড়িকে সেই উপাখ্যানটা বলল যাতে এক মনিব তার চাকরকে অনেক টাকা ঋণ মকুব করে দিল, আর সেই অকৃতজ্ঞ চাকর সেখান থেকে গিয়ে তার নিজের খাতকের গলা টিপে ধরল।

বুড়ি শুনল, ছেলেটাও শুনল। এবুডিশ বলতে লাগল, “ঈশ্বর আমাদের বলেছেন পরস্পরকে ক্ষমা করতে, নইলে তো তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না! সকলকেই আমাদের ক্ষমা করা উচিত, বিশেষ করে এই অবুঝ ছেলেটাকে তো বটেই।”

বুড়ি ঘাড় নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তা হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষুদে শয়তানগুলো যে একেবারে গোল্লায় গেছে!”

সে বলল, “তাহলেও তো আমাদের মত বড়দেরই কাজ হল ওদের শিখিয়ে-পড়িয়ে ভাল করে তোলা।”

বুড়ি এবার যোগ দিল, “একথা তো আমিও অনেক সময় বলি। এক সময়ে বাড়িতে আমার সাতটা ছেলেমেয়ে ছিল। এখন শুধু একটা মেয়ে বেঁচে আছে।”

তারপর সে বলতে লাগল—সে ও তার মেয়ে কোথায় থাকে, কী করে, তার কতগুলো নাতি-নাতনি আছে—সব।

"আমার তো শরীরের এই হাল দেখছ, তবু আমি খুব খাটি, খাটি আমার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের জন্য। বড় ভাল ওরা। ওদের মত কেউ আমাকে ভালবাসে না। আকসিনটকা তো আমার কাছে ছাড়া কারু কাছে থাকবেই না। ঠাকমা ঠাকমা করে একেবারে পাগল।"

বুড়ির মনটা তখন বেশ নরম হয়ে এসেছে। ছেলেটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, "এও তো ছেলেমানুষ, ঈশ্বর এর সহায় হোন!"

বুড়ি এবার তার ছালাটা ঘাড়ে তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ছেলেটা ছুটে এসে বলল, "ওটা আমাকে দাও ঠাকমা, আমিও ওই পথেই যাব।"

বুড়ি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, ছালাটা তার ঘাড়ে তুলে দিল; তারপর দুজনে রাস্তা ধরে চলে গেল। এবুডিশের কাছ থেকে আপেলের দাম চেয়ে নিতেও ভুলে গেল বুড়ি।

অনবরত বক্-বক্ করতে করতে দু-জনে চলে গেল। এবুডিশ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগল. তাদের কথা শুনতে লাগল।

ওরা চলে গেলে এবুডিশ ঘরে ফিরে গেল। চশমা-জোড়া সিঁড়ির উপরেই পড়ে ছিল। সূঁচটা হাতে নিয়ে আবার সে কাজে বসে গেল। কিছুক্ষণ কাজ করবার পর ভাল করে চোখেই দেখতে পাচ্ছিল না। বাইরে চেয়ে দেখল, রাস্তার আলো জ্বালাতে বাতিওয়ালা এসে গেছে। সে ভাবল, আমাকেও তো আলো জ্বালাতে হবে। তখন সে বাতিটা উস্কে দিল, তারপর সেটা ঝুলিয়ে দিয়ে আবার কাজে মন দিল। একটা জুতো শেষ করে দেখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। না; বেশ ভালই হয়েছে। তারপর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে; টুকরো-টাকরা যা পড়ে ছিল ঝাঁট দিয়ে, সূঁচ-সুতো তুলে বাতিটা এনে টেবিলের উপর রাখল এবং তাকের উপর থেকে 'সুসমাচার'-খানা পেড়ে নিল। ইচ্ছা ছিল, আগের দিন যে জায়গাটায় এক ফালি চামড়া দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল বইয়ের সেই জায়গাটাই খুলবে, কিন্তু খুলল অন্য জায়গা। 'সুসমাচার' খুলতেই এবুডিশের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কার পায়ের শব্দ তার কানে এল। কে যেন তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

পিছনে তাকাতে তার মনে হল, অন্ধকার কোণটায় কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তাদের চেহারা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

কে যেন তার কানে চুপি-চুপি বলল, "মার্টিন, মার্টিন, আমাকে চিনতে পারছ না?"

মার্টিন বলল, "কে?"

কণ্ঠস্বর বলল, "আমি। আমি গো।"

অন্ধকার কোণ থেকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল বুড়ো স্টেপানিচ। আবার হাসল সে। তারপর মেঘের মত মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখা

গেল না।

আর একটি কণ্ঠস্বর বলল, "আমি গো।" সেই স্ত্রীলোকটি বাচ্চা কোলে করে অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল। বাচ্চাটাও হেসে উঠল। তারপর তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আর এই তো আমি", আর একটি কণ্ঠস্বর বলল। সেই বুড়ি, আর আপেল হাতে ছেলেটা এগিয়ে এল। তারাও হেসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবুডিশের মন খুশিতে ভরে গেল। সে ক্রুশ চিহ্ন করে চোখে চশমা পরে বইয়ের যেখানটা খুলেছিল সেইটেই পড়তে লাগল। একটা পাতার একেবারে উপর থেকে জোর গলায় পড়তে লাগল :

"আর আমার ক্ষুধা পেলে তুমি খেতে দিলে, তৃষ্ণা পেলে পানীয় দিলে ; আমি অপরিচিত, তবু তুমি আমাকে ভিতরে ডাকলে।"

সেই পাতার নিচের দিকে সে পড়ল :

"যেহেতু আমার একটি ভাইয়ের জন্য তুমি এসব করেছ, এসব তুমি আমার জন্যই করেছ।" (ম্যাথু, ১৪শ অধ্যায়)

তখন এবুডিশ বুঝতে পারল, তার স্বপ্ন তাকে প্রতারণা করেনি, ত্রাণকর্তা সেদিন সত্যি তার কাছে এসেছিলেন, আর সেও সত্যি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

১৮৮৫

সময় থাকতে আগুন নেভাও

A spark neglected burns the house

একদা কোন এক গাঁয়ে আইভান শেরবাকফ নামে এক চাষী বাস করত। বেশ ভালভাবেই সে থাকত। নিজে বেশ শক্ত-সমর্থ, গাঁয়ের সবার সেরা কাজের লোক ; তার উপর তিন তিনটে জোয়ান ছেলে। একটি বিয়ে-থা করেছে, আর একটির বিয়ের কথা চলছে, আর ছোটটি ঘোড়াগুলি দেখাশোনা করতে পারে, চাষ করতেও শিখেছে। আইভানের স্ত্রীও বেশ চতুর ও হিসেবি। পুত্রবধূটি যেমন শান্ত, তেমনি কাজের মানুষ। ফলে আইভান পরিবারের খাবারের অভাব নেই। একমাত্র অকেজো মানুষ বুড়ো রুগ্ন বাবা (ছ-বছর হল হাঁপানীতে শয্যাশায়ী হয়ে স্টোভের উপরের বাঙ্কে পড়ে আছে)।

আইভানের সব কিছুই যথেষ্ট আছে—তিনটে ঘোড়া ও একটি বাচ্চা, একটি গরু ও একটি বাছুর, আর পনেরোটি ভেড়া। মেয়েরা পরিবারের

সকলের জন্যে জুতো ও কাপড় বানায়, মাঠে কাজ করে, আর পুরুষেরা খামারে কাজ করে। প্রতি বছর তারা যে ফসল পায় তাতে পরের ফসল পর্যন্ত তাদের অনায়াসে চলে যায়, 'ওট' যা পায় তাতে ট্যাক্স ও অন্যান্য দরকার মিটে যায়। আইভান ছেলেপিলে নিয়ে বেশ সুখেই ছিল, শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া : পাশের খামারে বাস করত গরুদেই ইভানফের ছেলে খোঁড়া গ্যাব্রিয়েল, তার সঙ্গে ছিল আইভানের শত্রুতা।

যতদিন বুড়ো গরুদেই বেঁচে ছিল আর আইভানের বাবা ছিল সংসারের কর্তা ততদিন দুই চাষী পরিবার ভালভাবেই পাশাপাশি বাস করত। যখনই মেয়েদের একটা চালনি বা বালতির দরকার পড়ত; বা পুরুষদের দরকার হত একটা বস্তা বা গাড়ির চাকা—যার যা দরকার এক খামার থেকে আরেক খামারে চেয়ে পাঠাত, প্রতিবেশীর মতই একে অপরকে সাহায্য করত। একজনের বাছুর যদি প্রতিবেশীর উঠোনে ঢুকে পড়ত, প্রতিবেশী সেটাকে তাড়িয়ে দিত, আর শুধু বলত "ওটাকে ছেড়ে দিও না, আমাদের ফসল এখনও তোলা হয় নি।" কোথাও লুকিয়ে রাখা, বা খোঁয়াড়ে দেওয়া বা অপরের ক্ষতি করা—না, সেরকম কখনও করা হত না।

বাপের আমলে এই রকমই চলছিল। তারপর ছেলেরা সংসারের ভার নিল। অবস্থাও মোড় ঘুরল।

শুরু হল তুচ্ছ জিনিস নিয়ে।

আইভানের পুত্রবধূর মুরগিটা ডিম দিতে শুরু করেছে। ঈস্টার উৎসবের জন্য সে ডিমগুলি জমিয়ে রাখছে। চালাঘরের গাড়ির নিচ থেকে রোজই সে ডিম কুড়িয়ে আনে। একদিন মুরগিটা বাচ্চাদের তাড়া খেয়ে বেড়ার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে প্রতিবেশীর উঠোনে ডিম পাড়ল। মুরগির ডাক শুনে বউটি ভাবল :

"আমি এখন বড় ব্যস্ত, উৎসবের আগেই ঘরটা মেরামত করতে হবে।"

সন্ধ্যাবেলা যখন সে চালাঘরে গাড়ির নিচ থেকে ডিম আনতে গেল, দেখে সেখানে ডিম নেই। শাশুড়িকে শুধাল, দেওরকে শুধাল—কেউ ডিম আনেনি। তারা বলল, "না, আমরা আনিনি।" ছোট দেওর তারাস্কা বলল :

"তোমার মুরগি তো প্রতিবেশীর উঠোনে ডিম পেড়েছে। সেখান থেকেই ডেকে উড়ে গেছে।"

বউটি মুরগির খোঁজে গিয়ে দেখে, সেটা দাঁড়ের উপর একটা মোরগের পাশে বসে ঘুমে চোখ বুজে আছে। মুরগিটাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইল কোথায় ডিম পেড়েছে, কিন্তু তাতে তো আর জবাব মিলবে না। সে প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়ে এক বুড়ির দেখা পেল।

সে বলল, "হ্যাগো মেয়ে, কাকে চাই ?"

"আচ্ছা ঠাকুমা, আমার মুরগিটা আজ তোমাদের উঠোনে উড়ে এসেছিল, সে কি একটা ডিম পেড়ে রেখে গেছে ?"

"তা তো জানি নে বাছা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের মুরগিটা সেই কবে থেকে ডিম দিচ্ছে। তাই আমরা জমিয়ে রাখছি, অন্যের ডিমে আমাদের দরকার কী! অন্যের উঠোনের ডিম আমরা কুড়িয়ে বেড়াই না!"

কথার ধরন শুনে বউটি দুঃখিত হল। সেও বলল বেশ দু-কথা, প্রতিবেশিনী জবাব দিল তার দ্বিগুণ। শুরু হল ঝগড়া। আইভানের বউ জল নিয়ে আসছিল, সেও যোগ দিল। তেড়ে এল গ্যাব্রিয়েলের বউ, সত্যি-মিথ্যে জড়িয়ে সমানে বকতে লাগল। যে যত পারে গলা চড়ায়। একটা হৈ-চৈ লেগে গেল। তুই হ্যানো, তুই ত্যানো, তুই ডাকাত, তুই ভ্রষ্টা, তুই শ্বশুরকে না খাইয়ে মেরে ফেলেছিস ; তুই একটা কিম্ভুত—এমনি সব কথা।

"হতচ্ছাড়ি, তুই তো আমার চালুনিতে একটা ফুটো করে দিয়েছিলি। এই যে বাঁকে করে জল এনেছিস, এটা তো আমাদের! দিয়ে দে এটা!"

বাঁক ধরে দিল এক টান। সব জল পড়ে গেল। শাড়ি ছিঁড়ে গেল। শুরু হল কিলোকিলি। মাঠ থেকে ফিরে গ্যাব্রিয়েল স্ত্রীর পক্ষ নিল। আইভান আর তার ছেলেরাও ছুটে এল। আইভানের গায়ে খুব জোর। সে সবাইকে হটিয়ে দিল। গ্যাব্রিয়েলের একগোছা দাড়িও উপড়ে নিল। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে কোনরকমে ঝগড়া মেটাল।

এই হল সূচনা।

গ্যাব্রিয়েল দাড়ির গোছা কাপড়ে জড়িয়ে স্থানীয় আদালতে গেল। বলল, "ব্যাটা হাটু-ভাঙা আইভাঙ্কা উপড়ে নেবে বলে তো আমি দাড়ি গজাই নি!"

এদিকে তার বউ প্রতিবেশীদের কাছে গেয়ে বেড়াতে লাগল, আইভানকে সাইবেরিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ঝগড়া বেড়েই চলল।

স্টোভের উপর শুয়ে বুড়ো প্রথম দিন থেকেই ওদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তার কথা কে শোনে।

সে বলল, "কেন বোকার মত একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এরকম হৈ-চৈ করছ ? ভেবে দেখ, পুরো ব্যাপারটার সূচনা একটা ডিম নিয়ে। ছেলে-মেয়েরা যদি ডিমটা নিয়েই থাকে—নিক না ; একটা ডিমে কী যায় আসে ? ঈশ্বর তো আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন। বুড়ি যদি দুটো খারাপ কথা বলেই থাকে,—বেশ তো তাকে শিখিয়ে দাও ভাল কথা কেমন করে বলতে হয়। ঝগড়া করে হবে কী—আমরা সবাই তো পাপী। যা হয়েছে হয়েছে, যাও

এবার সব মিটিয়ে ফেল। যদি রাগ করে বসে থাক, ফল আরও খারাপ হবে।”

ছেলেরা শুনল না। তারা ভাবল, বুড়ো বাপ বাজে কথা বলছে; বুড়ো হলে যেমন হয়, সব ব্যাপারেই জ্ঞান দিচ্ছে।

আইভান কিছুতেই প্রতিবেশীর কাছে ছোট হবে না।

“আমি দাড়ি ওপড়াই নি; ও নিজে উপড়েছে। ওর ছেলে আমার শার্ট ছিঁড়েছে, বোতাম ছিঁড়েছে। এই দেখ।”

আইভানও আদালতে গেল,—গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে জেলা আদালত পর্যন্ত। মামলা চলছে। একদিন গ্যাব্রিয়েলের গাড়ির একটা জোড়-হুড়কো হারিয়ে গেল। গ্যাব্রিয়েলের বাড়ির মেয়েরা বলে বেড়াল, আইভানের ছেলে সেটা চুরি করেছে।

“একদিন রাতে তাকে জানালার নিচ দিয়ে গাড়ির কাছে যেতে দেখেছি আমরা।” আবার একজন পড়শিও বলেছে, সে নাকি সরাইখানায় গিয়ে তার মালিককে সেটা গছাতে চেষ্টা করেছিল।

তারা আবার মামলা করল। এমন দিন নেই যেদিন গালাগালি বা মারামারি না চলে। বড়দের দেখাদেখি ছোটরাও গালাগালি শিখল। আর মেয়েরা যখন নদীতে কাপড় কাচতে যায়, তখন তো ধোবার পাটে যত না শব্দ হয় তার চেয়ে বেশি শব্দ হয় তাদের মুখে মুখে।

প্রথম-প্রথম এক পক্ষ অপর পক্ষের নিন্দে করে বেড়াত। তারপর আরম্ভ হল ছ্যাঁচড়ামি, যে যার জিনিস পায় হাত-সাফাই করে। মেয়েরা, এমনকি ছোটরাও তাদের দেখাদেখি তাই করতে লাগল। তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আইভান শেরবাকফ ও খোঁড়া গ্যাব্রিয়েল পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকতে লাগল,—গ্রাম-সভায়, জেলা-আদালতে, গ্রাম-পঞ্চায়েতে। ক্রমে জজরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। গ্যাব্রিয়েল চেষ্টা করে আইভানের অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড করাতে; আবার আইভানেরও সেই একই চেষ্টা। পরস্পরের প্রতি যত খারাপ কাজ করে, তত রাগ বাড়ে। দুটো কুকুর যখন ঝগড়া করে, লড়াই যত বাড়ে, রাগ তত বাড়ে। এই চাষীদের ব্যাপারেও সেই রকমই দাঁড়াল। একটা কুকুরকে যদি তখন অপর কেউ পিছন থেকে আঘাত করে, কুকুরটা ভাবে অপর কুকুরই তাকে কামড়েছে, আর তত সে রেগে যায়। ঠিক সেই রকম, এরাও আদালতে যায়, যে কেউ একজনের শাস্তি হয়—অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড, আর তাদের মেজাজ আরও চড়ে যায়। “দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।” এই-রকম চলল ছ-বছর। স্টোভের উপর থেকে বুড়ো মানুষটা বার বার তাদের কাছে আবেদন জানাল, বলল:

“বাপু, তোমরা করছ কী? রাগ ঝেড়ে ফেল; যার যার কাজকর্মেয়

এই ক্ষতি বন্ধ কর, মানুষের প্রতি ঘৃণা থামাও ; দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। যত ঘৃণা করবে, অবস্থা তত খারাপ হবে।"

বুড়োর কথায় কেউ কান দেয় না।

সপ্তম বছরে এক বিয়ে-বাড়িতে আইভানের পুত্রবধূ সকলের সামনে গ্যাব্রিয়েলকে অপমান করতে লাগল,—সে নাকি ঘোড়া চুরি করেছে। গ্যাব্রিয়েল তখন মদে চুর। রাগ সামলাতে না পেরে সে বউটিকে এমন মারল যে সাতদিন সে বিছানায় পড়ে রইল! সে আবার তখন গর্ভবতী। আইভান তো খুব খুশি, সে চলল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে। ভাবল, "এইবার বাছাধনকে এখান থেকে সরাব ; হয় কারগারে না হয় সাইবেরিয়ায়, এক জায়গায় তাকে যেতেই হবে।"

কিন্তু আইভানের মামলা টিকল না। ম্যাজিস্ট্রেট তার দরখাস্তই নিলেন না। বউটিকে পরীক্ষা করা হল। সে তখন সেরে উঠেছে ; তার গায়ে আঘাতের কোন চিহ্নই নেই।

আইভান গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাছে গেল। তিনি মামলা পাঠালেন জেলা-আদালতে। আইভান জেলা-আদালতে চরকিপাক ঘুরতে লাগল ; কেরাণী আর প্রধানকে দশ পাঁইট মদও খাওয়াল। গ্যাব্রিয়েলের শাস্তি হল চাবুক।

আদালতে গ্যাব্রিয়েলের সে দণ্ডাদেশ শোনানো হল। কেরাণী পড়ল : "আদালত স্থির করেছেন যে জেলা আদালতের সামনে গ্যাব্রিয়েল গরদিফকে বার্চ লাঠির দশ চাবুক খেতে হবে।"

দণ্ডাদেশ শুনে আইভান গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকাল—এবার কী করবে? গ্যাব্রিয়েলও শুনল। তার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে সে আদালত-কক্ষ ছেড়ে চলে গেল।

আইভানও তার পিছু-পিছু নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনল গ্যাব্রিয়েল বলছে :

"ঠিক আছে। ওরা আমাকে মারবে, আমার পিঠ জ্বালা করবে ; কিন্তু ওর এমন কিছু পুড়বে যাতে জ্বালা আরও বেশি করবে।"

কথাগুলো শুনে আইভান তৎক্ষণাৎ জজের কাছে ফিরে গেল।

"মহামান্য বিচারক, ও আমাকে শাসাচ্ছে, আমার ঘর পোড়াবে। সাক্ষীদের সামনেই ও একথা বলেছে।"

গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে পাঠানো হল।

"এ কথা তুমি বলেছ?"

"আমি কিছুই বলি নি। আপনার ক্ষমতা আছে, আমাকে চাবুক মারুন। দেখতেই তো পাচ্ছি, ঠিক পথে থেকেও আমাকেই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। আরও যা খুশি তাই করতে পারেন।"

গ্যাব্রিয়েল আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তাঁর ঠোঁট আর গলা তখন থর্-থর্ করে কাঁপছে। সে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

তার চোখ-মুখ দেখে জজরাও ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, "এ নিশ্চয় বাইরে গিয়ে এর প্রতিবেশীর বা নিজের একটা ক্ষতি করবে।"

তখন বুড়ো জজ বললেন: "দেখ বন্ধুরা, তোমরা আপোসে মিটিয়ে ফেল। দেখ ভাই গ্যাব্রিয়েল, একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোককে আঘাত করা কি তোমার ঠিক হয়েছে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বিপদ কিছু ঘটে নি, কিন্তু খুবই ক্ষতি তো হতে পারত। কাজটা কি ঠিক করেছ? দোষ স্বীকার করে তুমি ওর কাছে ক্ষমা চাও। ও তোমাকে ক্ষমা করবে। আমরা তোমার শাস্তি বদলে দেব।"

এ কথা শুনে কেরাণী বলল: "১১৭ ধারা মতে এ অসম্ভব; আপোস-মীমাংসা যখন হয় নি, তখন আদালতে দণ্ড হবেই; আর সে দণ্ড পেতেই হবে।"

জজ কিন্তু কেরাণীর কথা শুনলেন না, বললেন, "থাম। দেখ বন্ধু, আইনের প্রথম ধারা হচ্ছে, ঈশ্বরকে স্মরণে রাখা। আর ঈশ্বর বলেছেন শান্তিতে থাকতে।"

জজ চাষীদের বোঝাতে পারলেন না। গ্যাব্রিয়েল তাঁর কথা শুনল না। বলল, "এক বছরের মধ্যেই আমার বয়স হবে পঞ্চাশ বছর। আমার ছেলেরও বিয়ে হয়ে গেছে। জন্মের পর থেকে কখনও চাবুক খাইনি, আর আজ হাঁটু-ভাঙা ভাংকা আমাকে চাবুক খাওয়াচ্ছে। তার কাছে ক্ষমা চাইব আমি! তবে আর বাকি রইল কী?...ভাংকাও যাতে আমাকে মনে রাখে তাই আমি করব।"

গ্যাব্রিয়েলের গলা কাঁপতে লাগল। গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না। মুখ ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

আদালত থেকে খামার প্রায় দশ ভার্স্ট পথ। আইভানের বাড়ি ফিরতে দেরি হল। মেয়েরাই গরু-বাছুর আনতে মাঠে চলে গেছে।

আইভান ঘোড়াটাকে খুলে দিয়ে আস্তাবলে রেখে ঘরে ঢুকল। বাড়িতে কেউ নেই। ছোটরা মাঠ থেকে ফেরে নি, মেয়েরা গরু চরাচ্ছে। ভিতরে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে আইভান ভাবতে লাগল! তার মনে পড়ল, দণ্ডাদেশ পড়বার সময় গ্যাব্রিয়েল কেমন সাদা হয়ে গিয়েছিল, দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। আইভানের বুকটা ব্যথা করে উঠল। যদি তাকে চাবুক মারার আদেশ হত, তাহলে কী হত! গ্যাব্রিয়েলের জন্য তার দুঃখ হতে লাগল।

স্টোভের উপর বুড়ো বাবা কাশতে শুরু করেছে। পাশ ফিরে পা ঝুলিয়ে সে নামতে চেষ্টা করল। কোন রকমে নিচে নেমে সে বেঞ্চিতে বসল। এই-

টুকুতেই তার খুব পরিশ্রম হয়েছে। বার-বার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে সে বলল, "আচ্ছা, ওর কী শাস্তি হয়েছে?"

আইভান বলল : "কুড়ি ঘা চাবুক।"

বুড়ো শুনে মাথা নাড়তে লাগল। "আইভান, তুমি অন্যায় করেছ, খুব অন্যায় করেছ। তার প্রতি নয়—তোমার নিজের প্রতি। তারা ওর পিঠে চাবুক মারবে, আর তুমি কি তাতে খুশি হবে?"

আইভান বলল, "এমন কাজ সে আর করবে না।"

"আর করবে না মানে? তোমার চেয়েও খারাপ কাজ সে কী করেছে?"

আইভান প্রতিবাদ করল, "কী করেছে মানে? আপনি কী বলছেন? সে তো আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলতে পারত! এখন আবার শাসাচ্ছে, আমাদের পুড়িয়ে মারবে। আর আমি তাকে পুজো করব?"

বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দেখ আইভান, বছরের পর বছর আমি স্টোভের উপর পড়ে আছি, আর তুমি পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে পৃথিবী চক্কর দিচ্ছ; তাই তুমি ভাবছ সবই দেখতে পাচ্ছ, আর আমি কিছুই দেখতে পাই না। না বাবা, তুমিই কিছু দেখতে পাচ্ছ না—রাগ তোমাকে অন্ধ করে রেখেছে। অন্যের পাপটাই তোমার চোখে পড়েছে, নিজেরটা নয়। তুমি বলছ, দোষ তার। আরে, তাই কি কখনও হয়! দোষ যদি তার একার হত, তাহলে তো রাগই থাকত না। এক কাঠি কি কখনও বাজে? দু-জন না হলে ঝগড়া হয় না। তার নষ্টামি তুমি দেখছ, কিন্তু নিজেরটা দেখতে পাচ্ছ না। শুধু সে যদি মন্দ হত, আর তুমি ভাল হতে, তাহলে ঝগড়া লাগত না। কে তার দাড়ি ছিঁড়েছিল? কে তার খড়ের গাদা নষ্ট করেছে? কে তাকে আদালতে টেনে নিয়ে গেছে? তবু তুমি বলবে, সবই তার দোষ? তুমি নিজেই ঠিক নেই; সেখানেই যত গোলমাল। আমি এরকম ছিলাম না, তোমাকেও তো এরকম শিক্ষা আমি দিই নি। ওর বাবা বা আমি কি কখনও এরকম করেছি? আমরা কেমন ভাবে দিন কাটিয়েছি? ভাল প্রতিবেশীর মত। তার যদি ময়দা কম পড়ত, তার স্ত্রী এসে বলত, 'ফ্রল খুড়ো, আমার ময়দা চাই।' আমি বলতাম, 'গোলায় গিয়ে যা দরকার নিয়ে যাও।' তার যদি ঘোড়াগুলোকে দেখবার লোক না থাকত, আমি বলতাম, 'ভাবিয়া, যাও, ঘোড়াগুলোকে মাঠে নিয়ে যাও।' আবার আমরাও কোন কিছুর অভাব পড়লে তার কাছেই যেতাম : 'গরদেই খুড়ো, আমার যে এটা-ওটা চাই।' 'ফ্রল খুড়ো, যা দরকার নিয়ে যাও।' এই ছিল আমাদের কালে। আমরা সুখে ছিলাম। আর এখন? এই তো সেদিন একজন সৈনিক প্লেভ্‌নার যুদ্ধের কথা বলছিল। তোমাদের যুদ্ধ তো আরও খারাপ। এই কি জীবন? এ তো পাপ! তুমি মানুষ, তুমি এ সংসারের

কর্তা। তোমাকেই এর জবাবদিহি করতে হবে। বাড়ির মেয়েদের আর ছোটদের তোমরা কী শিক্ষা দিচ্ছ? কুকুরের মত খেয়ো-খেয়ি করতে? এই তো সেদিন এইটুকু ছেলে তারাস্কা আরিনা খুড়িকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করল, আর ওর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। এটা কি ভাল? তোমাকেই এর জবাবদিহি করতে হবে। নিজের কথা ভাব। সব ঠিকমত চলছে কি? তুমি আমাকে একটা খারাপ কথা শোনালে, আমি দ্বিগুণ শোনালাম; তুমি আমাকে আঘাত করলে, আমি দ্বিগুণ আঘাত করলাম। না বাবা, আমাদের মত বোকাদের এ কথা শেখাতে খৃস্ট পৃথিবীতে আসেন নি। তোমাকে যদি কেউ কিছু বলে, চুপ করে থাক—তার নিজের বিবেকই তাকে খোঁচাবে। এই কথাই তিনি শিখিয়েছেন। আমি যদি তোমাকে আঘাত করি, তুমি অপর গাল পেতে দিয়ে বলবে, 'আমি যদি দোষ করে থাকি আমাকে মার।' তার বিবেকই তাকে কামড়াবে, তার মন নরম হবে। সে তোমার কথা শুনবে। এই কথাই তিনি শিখিয়েছেন, মাথা গরম করতে নয়। চুপ করে আছ কেন? আমি যা বলছি তা কি ঠিক নয়?"

আইভান চুপ করে শুনল।

বুড়ো কাশতে লাগল। অনেক কষ্টে থুথু ফেলে আবার বলতে লাগল:

"তুমি কি মনে কর খৃস্ট ভুল শিখিয়েছেন? সবই আমাদের ভালোর জন্য। তোমাদের কথাই ধর: তোমাদের এই গ্লেভ্নার যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে তোমরা ভাল আছ, না আগের চাইতে খারাপ আছ? হিসেব করে দেখ, মামলা-মোকর্দমায়, যাতায়াতে আর খাওয়ায়-দাওয়ায় তোমরা কত খরচ করেছ। তোমার ছেলেরা ঈগলের মত বড় হচ্ছে; তোমরা ভালভাবে থাকতে পারতে, কিছু জমাতেও পারতে; তার বদলে তোমাদের সম্পত্তি কমে যাচ্ছে। কারণ কী? কারণ ওই এক। কারণ তোমাদের অহংকার। ছোটদের সঙ্গে নিয়ে চাষবাস করবে, বীজ বুনবে, তা না, তোমার শত্রু তোমাকে কোর্ট-ঘর করাচ্ছে, নয় তো কোন ছিঁচকে উকিলের বাড়ি ঘুরিয়ে মারছে। সময়ে চাষ কর নি, সময়ে বীজ বোন নি, ধরিত্রী মা তোমাদের জন্য ফসলও ফলাবে না। 'ওট' হল না কেন? কখন বুনেছিলে? শহর থেকে ফিরে এসে। অথচ আদালতে কী পেয়েছ? খালি ঝঞ্ঝাট আর ঝামেলা। দেখ বাপু, নিজের কাজে অবহেলা করো না; ছোটদের সঙ্গে নিয়ে মাঠের কাজ কর, বাড়ি-ঘর দেখ। কেউ যদি তোমাকে অপমান করে, মহত্ত্বের সঙ্গে তাকে ক্ষমা কর; তবেই জীবন সুখের হবে, বুকের বোঝা হাল্কা হবে।"

আইভান চুপ করে রইল।

"আইভান, আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা শোন। যাও, ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে সোজা আদলতে চলে যাও, সেখানে সব ব্যাপার মিটিয়ে ফেল।

সকালে গ্যাব্রিয়েলের কাছে গিয়েও সব কিছু ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে ফেল। কালকের উৎসবে তাকে তোমার বাড়ি নেমন্তন্ন করে এস ; এক বোতল ভদ্‌কা নিয়ে বস, সব গোলযোগ মিটে যাক ; যেন ভবিষ্যতে আর কিছু না ঘটে। মেয়েদের আর ছোটদেরও তাই করতে বলে দাও।"

আইভান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনে হল, বুড়ো ঠিকই বলেছে। তার মন যেন অনেকটা হাল্কা হয়েছে। কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারছে না, কেমন করে কী করবে—গোলযোগ মেটাবে কী করে।

আইভানের মনের ভাব বুঝতে পেরে বুড়ো আবার বলল : "যাও ভানিয়া, এ কাজ ফেলে রেখ না। ছড়াবার আগে গোড়াতেই আগুন নিভিয়ে ফেল, নইলে এ আগুন আর নেভাতে পারবে না।"

বুড়ো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মেয়েরা ঘরে ঢুকে ছাতারে পাখির মত কিচির-মিচির শুরু করে দিল। সব খবরই তারা পেয়ে গেছে : গ্যাব্রিয়েলকে চাবুক মারা হবে ; সেও শাসিয়েছে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেবে। কতক তারা শুনেছে, কতকটা আবার নিজেরা জুড়েছে। ইতিমধ্যেই গ্যাব্রিয়েলের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তারা ঝগড়া করে এসেছে। এখন তারা বলে বেড়াচ্ছে : গ্যাব্রিয়েলের পুত্রবধূ সরকারী উকিলকে দিয়ে তাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। সরকারী উকিলের সঙ্গে গ্যাব্রিয়েলের খুব ভাব ; সব ব্যাপারটাই সে নাকি উল্টে দেবে। স্কুলের মাস্টারমশাই নাকি এরই মধ্যে আইভানের বিরুদ্ধে নতুন করে দরখাস্ত পর্যন্ত লিখে ফেলেছে। দরখাস্ত লেখা হয়েছে স্বয়ং জারকে। তাতে সব কথা লেখা হয়েছে : গাড়ির হুড়কো, সব্‌জি বাগান—সব কিছু। তাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে, আইভানের অর্ধেক সম্পত্তি গ্যাব্রিয়েলকে দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা হোক।

তাদের কথা শুনে আইভানের মন আবার শক্ত হয়ে উঠল। গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারটা সে নতুন করে ভাবতে লাগল।

বাড়ির কর্তার খামারে অনেক কাজ থাকে। মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করবার সময় নেই আইভানের। সে ঘর ছেড়ে খামারে চলে গেল। সব কিছু ঠিক করে যখন সে বাড়ি ফিরল তখন সূর্য পাটে বসেছে ; সকলে মাঠ থেকে ফিরছে। দুই ঘোড়ার লাঙল নিয়ে তারা মাঠে চাষ করছিল। তাদের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলে সে তাদের জিনিসপত্র ঘরে তুলতে সাহায্য করল। আরও কিছু টুকটাক কাজকর্ম সেরে আইভান ভাবল, "এইবার খেয়ে দেয়ে ঘুম।" সে বাড়ির দিকে চলল।

গ্যাব্রিয়েলের কথা, তার বাবার কথা—সবই সে ভুলে গেছে তখন। দরজার হাতলে হাত দিতেই তার কানে এল, বেড়ার পিছন থেকে প্রতিবেশী তীব্র স্বরে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

গ্যাব্রিয়েল চিৎকার করে কাকে যেন বলছে, "ও শয়তানের উপযুক্ত শাস্তি কী? একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।"

কথাগুলো শুনে আইভানের সব রাগ আবার জ্বলে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সে শুনল। তারপর গ্যাব্রিয়েল থামলে ঘরের ভিতর চলে গেল।

ভিতরে আলো জ্বলছিল। ছেলের বউ এক কোণে বসে সেলাই করছে। স্ত্রী রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত। বড় ছেলে জুতোর জন্য চামড়ার ফালি কাটছে। মেজ ছেলে একখানা বই নিয়ে টেবিলে বসে আছে। আর ছোট ছেলে মাঠে রাত কাটাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সব কিছুই শান্ত, সুন্দর; অন্তত তাই হত, যদি এই বিরূপ প্রতিবেশীর অভিশাপ না থাকত।

রেগে-মেগেই আইভান ঘরের ভিতর ঢুকল। কোটটা বেঞ্চির উপর ছুঁড়ে ফেলে জলের বালতিটা বে-জায়গায় রাখার জন্য মেয়েদের বকল। মন খারাপ করে বসে বসে ঘোড়ার কলারটা মেরামত করতে লাগল। বার বার তার মনে পড়তে লাগল আদালতে গ্যাব্রিয়েলের সেই শাসানির কথা, আর রুক্ষ গলায় এইমাত্র যে কথা সে বলছিল,—কার যেন মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি।

বয়স্ক স্ত্রীলোকটি তারাস্কাকে খেতে দিল। খাবার পর ছেলেটা মোটা একটা ভেড়ার চামড়ার কোট পরে তার উপরে একটা সুতির কোট চাপিয়ে বেল্ট লাগিয়ে সঙ্গে কিছু রুটি নিল, তারপর ঘোড়ার খোঁজে বেরিয়ে গেল। বড় ভাই তাকে এগিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াতে আইভান নিজেই উঠে দাঁড়াল এবং বারান্দায় গেল।

বাইরে খুব অন্ধকার। কালো অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে গেছে। বাতাস উঠেছে।

আইভান সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছেলেকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল, বাচ্চাটাকে তার সঙ্গে জুড়ে দিল, তারপর তারাস্কাকে যতক্ষণ দেখা গেল সেইদিকে তাকিয়ে রইল। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্যাব্রিয়েলের কথাগুলোই তার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল: "ওর এমন কিছু পুড়বে যাতে জ্বালা আরও বেশি করে।"

সে ভাবতে লাগল: "ওর সঙ্কোচের বালাই নেই। সব কিছুই এখন শুকনো, বাতাসও আছে। পিছন দিক থেকে এসে ব্যাটা শয়তান কোন রকমে একটু আগুন ধরিয়ে দিয়েই সরে পড়বে। তারপর সব পুড়ে যাবে। হাতে-নাতে যদি ব্যাটাকে ধরতে পারি তো বেশ হয়।"

কুচিন্তাটা এমনভাবেই মাথায় চেপে বসল যে আইভান সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে না গিয়ে গেট পার হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। ভাবল, "বাড়ির চারদিক ঘুরে

দেখতে হবে। কিছুই বলা যায় না।"

বেড়ার ধার ঘেঁসে নিঃশব্দে সে হাঁটতে লাগল। একটা মোড় ঘুরতেই তার মনে হল, উল্টো মোড়ের দিকে কি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হল, কেউ যেন বেরিয়েই আবার লুকিয়ে পড়ল। আইভান থেমে গিয়ে কান পাতল। চারদিক নিস্তব্ধ। বাতাসে উইলো গাছের পাতাগুলি নড়ছে; আর খড়ো চালের খড়গুলি সর্-সর্ শব্দ করছে।

বাইরে বেশ অন্ধকার হলেও ধীরে ধীরে সেই অস্পষ্ট আলোয়ও বহুদূরে পর্যন্ত সে দেখতে পেল। কেউ কোথাও নেই।

আইভান ভাবল, "হয়ত সবই আমার কল্পনা। তবু চারিদিক একটু ঘুরে দেখাই ভাল।"

সে এত আস্তে হাঁটতে লাগল যে নিজের পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না। দূরের মোড়টায় পেঁছে সামনে তাকাতেই নজরে পড়ল, লাঙলটার পাশে একটা সাদা কি যেন নড়ে-চড়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

আইভানের বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই সময় সেই একই জায়গায় কি যেন দেখা গেল। এবার সে স্পষ্টই দেখতে পেল, টুপি মাথায় একটা লোক তার দিকে পিছন ফিরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক বাণ্ডিল খড়ে আগুন ধরাল।

আইভানের বুকের ভিতরটা পাখির মত নেচে উঠল। বড় বড় পা ফেলে সে এগিয়ে গেল। ভাবল, "এবার আর পালাতে হচ্ছে না! একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলব।"

বেশ কিছুটা পথ তখনও বাকি, এমন সময় হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলো তার চোখে লাগল—ঠিক আগেকার জায়গায় নয়, আর ছোটখাট আগুনের ঝিলিকও নয়,—ঘরের চালের ছাঁচতলায় খড়ের গাদাটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আগুনের শিখা ঘরের চাল ছোঁয়-ছোঁয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গ্যাব্রিয়েল সেখানে দাঁড়িয়ে।

বাজপাখি যেমন করে চাতক পাখির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে আইভান গ্যাব্রিয়েলের দিকে ছুটে গেল। ভাবল, "ওকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব! এবার আর পালাতে হয় না!"

খোঁড়া গ্যাব্রিয়েলের কানে ততক্ষণ পায়ের শব্দ পেঁছে গেছে। চারদিক তাকিয়ে সে খরগোসের মত প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে দিল।

তার পিছন পিছন ধাওয়া করে আইভান চেঁচিয়ে বলল, "এবার আর রেহাই নেই!"

আইভান গ্যাব্রিয়েলের গলা জড়িয়ে ধরতেই সে তার হাত থেকে গলে গেল। আইভান তার কোটের কোণটা চেপে ধরল। কোট ছিঁড়ে গিয়ে আইভান

মাটিতে পড়ে গেল। লাফ দিয়ে উঠে সে চিৎকার করে উঠল, "কে আছ, ধর, ওকে ধর!" বলতে বলতে সে দৌড়তে লাগল।

আইভান উঠে দাঁড়াবার আগেই গ্যাব্রিয়েল তার বাড়িতে পেঁছে গেছে। সেখানেই আইভান তাকে চেপে ধরতে গেল। ঠিক সেই সময় পাথরের মত কি যেন একটা তার মাথায় পড়ল। গ্যাব্রিয়েল একটা ওক কাঠের লাঠি নিয়ে সজোরে তার মাথায় মেরেছে।

আইভানের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল; চোখের সামনে সরষে ফুল ফুটতে লাগল; তারপর সব অন্ধকার। তার পা কাঁপতে লাগল। আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল, গ্যাব্রিয়েল ততক্ষণে হাওয়া।

তার বাড়ির দিক থেকে একটা আগুনের আভা আসছে; একটা মেশিন যেন চলছে, এমনি গর্জন ও ফট্-ফট্ আওয়াজ আসছে। আইভান মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল, পিছনের চালাটা জ্বলছে, পাশেরটায়ও আগুন ধরেছে। আগুন আর ধোঁয়া। জ্বলন্ত খড় আর ধোঁয়া এগিয়ে চলেছে শোবার ঘরের দিকে।

হাত নাড়তে নাড়তে আইভান চিৎকার করে উঠল, "এ কী হল ভাইসব, এ কী হল! চালার তলা থেকে জ্বলন্ত খড়গুলো সরিয়ে নিভিয়ে দিতে হবে যে! এ কী হল ভাইসব, এ কী হল!"

সে আবার চিৎকার করতে চাইল, গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। দৌড় দিতে চাইল, পা সরে না; একটার সংগে আরেকটার ঠোকাঠুকি লাগল। এক পা এগিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। আবার দম আটকে এল তার। একটু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে চলতে লাগল। চালার চারদিক ঘুরে যখন আগুনের কাছে পেঁছিল তখন শোবার ঘরের একটা কোণ ও গেটটা জ্বলছে, ঘরের ভিতর থেকে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। উঠোনে ঢোকে কার সাধ্য! দৌড়োদৌড়ি করে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। প্রতি-বেশীরা যার যার ঘর থেকে জিনিসপত্র টেনে বের করছে, গোয়াল থেকে গরু-বাছুর তাড়িয়ে দিচ্ছে।

আইভানের বাড়ির পরে গ্যাব্রিয়েলের বাড়িও আগুনে পুড়ল। অর্ধেকটা গ্রামই ধ্বংস হয়ে গেল।

আইভানের বাড়ির থেকে একমাত্র তার বুড়ো বাবাকে উদ্ধার করা গেল। অন্য সবাই এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিল। আর সব কিছু পুড়ে গেছে। যে ঘোড়াগুলো রাতের জন্য বাইরে গিয়েছিল ঘাস খেতে, সেগুলো ছাড়া গরু-বাছুর সব পুড়ে মরেছে; মুরগিগুলো মরেছে; গাড়ি, লাঙল, জোয়াল, জামা-কাপড়ের প্যাটরা, ফসলের বেড়ি—সব পুড়ে গেছে।

গ্যাব্রিয়েলের বাড়ি থেকে গরু-বাছুরগুলো আর যৎসামান্য জিনিস বের

করা হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে আগুন জ্বলতে লাগল: সারা রাত। আইভান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আর বার বার বলতে লাগল: "এ কী হল ভাইসব! কোন কিছুই যে বের করা হল না!"

ঘরের ছাদ যখন ভেঙে পড়ছে তখন আইভান সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা জ্বলন্ত কাঠের কড়ি টেনে বের করতে চেষ্টা করল। মেয়েরা অনেক ডাকাডাকি করল। আইভান ততক্ষণে সে কড়িটা টেনে বের করে আর একটা আনতে গিয়েই হোঁচট খেয়ে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে টেনে বের করে আনল।

আইভানের চুল-দাড়ি পুড়ে গেছে, কাপড় পুড়েছে, হাতে লেগেছে; কিন্তু কোন কিছুতেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সকলে বলতে লাগল, "শোকে আর ক্ষোভে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

ক্রমে আগুন নিভে এল। আইভান তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে কেবল বলছে, "ভাইসব, এ কী হল! তোমরা যদি একটু চেষ্টা করতে!"

সকালের দিকে গ্রাম-প্রধানের ছেলে এল আইভানকে ডাকতে।

"আইভান খুড়ো, তোমার বাবার শেষ সময় উপস্থিত। শেষ দেখা দেখবার জন্য তিনি তোমাকে ডেকেছেন।"

বাবার কথা আইভান সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। কে যে কী বলছে ঠিক বুঝতেও পারছে না। সে বলল, "কে? তার নাম কী?"

গ্রাম-প্রধানের ছেলে আইভানের হাত ধরে বলল, "শেষ দেখা দেখবার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে। আমাদের বাড়িতে তিনি মৃত্যুশয্যায়। এস আইভান খুড়ো।"

আইভান ছেলেটির পিছন পিছন চলল।

বুড়োকে ঘর থেকে বের করবার সময়েই সে পুড়ে গিয়েছিল। সকলে মিলে অগ্নিকাণ্ড থেকে অনেক দূরে গ্রামের প্রান্তে প্রধানের বাড়িতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

আইভান যখন বাবার কাছে পেঁছিল, তখন সেখানে ছিল শুধু প্রধানের স্ত্রী। ছেলেমেয়েরা স্টোভের উপরে বাঙ্কে শুয়ে ছিল। আর সবাই আগুনের কাছে গিয়েছে। তার বাবা দুই হাতে মোমবাতি নিয়ে বেঞ্চির উপর শুয়ে আছে। মাথাটা দরজার দিকে। ছেলে ঘরে ঢুকতে তার শরীরটা নড়ে উঠল। প্রধানের স্ত্রী বলল, "ছেলে এসেছে তোমাকে দেখতে।" ছেলেকে আরও কাছে আসতে বলল সে। আইভান কাছে গেলে বুড়ো বলল: "দেখ ভানিয়া, আমি কী বলেছিলাম তোমাকে? কে সারা গ্রামটাকে জ্বালিয়ে দিল?"

আইভান বলল, "সব সে করেছে বাবা। সেই আগুন দিয়েছে। আমি তাকে ধরেছিলাম। খড়ের চালে আগুন দিতে তাকে আমি দেখেছি। জ্বলন্ত খড় মুঠি করে ধরে তখন যদি সেটা নিভিয়ে ফেলতাম, তাহলে কিছুই হত না।"

বুড়ো বলল, "আইভান, আমার শেষ সময় উপস্থিত, একদিন তুমিও যাবে। এ কার পাপ?"

আইভান কোন কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল।

"ঈশ্বরকে সামনে রেখে বল: এ কার পাপ? আমি তোমাকে কী বলেছিলাম?"

এতক্ষণে যেন সহসা আইভানের বুদ্ধি ফিরে এল। ভাঙা-ভাঙা গলায় সে বলল, "আমার পাপ, বাবা!"

বাবার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে কেঁদে ফেলল। বলল, "আমাকে ক্ষমা কর বাবা! তোমার কাছে, ঈশ্বরের কাছে আমি অপরাধী!"

বুড়ো মোমবাতিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল, ক্রুশ-চিহ্ন করবার জন্য ডান হাতটা কপালের দিকে টানতে চেষ্টা করল; কিন্তু ততদূর নিতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমারই জয় হোক প্রভু, তোমারই জয় হোক!" তারপর বলল:

"ভানিয়া! ভানিয়া!"

"বল বাবা।"

"এখন কী করবে?"

আইভান সমানে কাঁদছে।

"আমি জানি না বাবা। কেমন করে আমরা বেঁচে থাকব বাবা?"

বুড়ো চোখ বুজল। তার ঠোঁট নড়তে লাগল, যেন মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করছে; তারপর আবার চোখ মেলে বলল: "তোমরা বাঁচবে। ঈশ্বর-পরায়ণ হও, তাহলেই তোমরা বাঁচবে।"

বুড়ো আবার চুপ করল। একটু হেসে বলল: "দেখ ভানিয়া, কে আগুন লাগিয়েছিল কাউকে বলো না। অন্যের একটা পাপ যদি তুমি ঢেকে রাখ; তাহলে ঈশ্বর তোমার দুটো পাপ ক্ষমা করবেন।"

বুড়ো দুই হাতে মোমবাতি নিল, বুকের উপর দুটো হাত এক করল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, শরীরটা টান-টান করল, তারপর মারা গেল।

গ্যাব্রিয়েলের কথা আইভান প্রকাশ করল না। কেউ জানল না আগুন কেমন করে লেগেছিল।

গ্যাব্রিয়েলের প্রতি আইভানের যে রাগ ছিল তা চলে গেল। গ্যাব্রিয়েলও অবাক হয়ে গেল যে, আইভান কাউকে তার কথা বলল না। প্রথমে সে আইভানকে ভয় করে চলত; ক্রমে ভয় কেটে গেল। নতুন করে বাড়ি-ঘর তৈরি করবার সময় দুই পরিবার একই ঘরে একটি পরিবারের মতই বাস করতে লাগল।

তারপর গ্যাব্রিয়েল ও আইভান তাদের বাবাদের মতই ভাল প্রতিবেশীর মত বাস করতে লাগল। আইভান সারবাকফ তার বাবার সেই আদেশ, ঈশ্বরের সে নির্দেশ কখনও ভোলে নি যে, সূচনাতেই আগুন নিভিয়ে ফেলা উচিত। কেউ যদি তার প্রতি অন্যায় করত, প্রতিহিংসার বদলে সে তার প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করত; কেউ তাকে খারাপ কথা বললে, অধিকতর খারাপ কথায় তার জবাব না দিয়ে সে তাকে খারাপ কথা ব্যবহার না করাটা শেখাতে চেষ্টা করত; মেয়েদের এবং ছোটদেরও সে সেই শিক্ষাই দিত।

এমনি করে আইভান সবকিছু ঠিক করে ফেলল। এখন সে আগেকার চাইতে অনেক ভাল আছে।

১৮৮৬

শিব ও শয়তান

Evil allures, but good endures

অনেক কাল আগে একজন ভাল মনিব বাস করতেন; অনেক সম্পত্তির মালিক তিনি, তাঁর ক্রীতদাসও ছিল অনেক। ক্রীতদাসরাও তাদের মনিবের সম্পর্কে গর্ব করে বলত: সূর্যের নিচে আমাদের মনিবের চাইতে ভাল মনিব আর কেউ নেই। তিনি আমাদের খেতে দেন, পরতে দেন; আমরা করে উঠতে পারি এমন কাজ দেন; কাউকে তিনি বকেন না, কাউকে দ্বেষ করেন না। অন্য মনিবরা তাঁদের ক্রীতদাসের প্রতি গরু-ছাগলের চাইতে খারাপ ব্যবহার করেন, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে শাস্তি দেন, কখনও একটা ভাল কথা বলেন না। কিন্তু আমাদের মনিব সেরকম নন। তিনি আমাদের ভাল চান, ভাল করেন, এবং আমাদের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলেন। এর চাইতে ভাল জীবন আমরা চাই না।

এমনিভাবেই ক্রীতদাসরা তাদের মনিবকে প্রশংসা করত। কিন্তু ক্রীতদাসরা তাদের মনিবের সঙ্গে এরূপভাবে ভালবাসায় মিলেমিশে আছে দেখে শয়তান ভারি বিরক্ত হয়ে পড়ল। সে তখন মনিবের আলেব নামে একজন

ক্রীতদাসকে দলে টেনে তাকে আদেশ দিল অন্য সবাইকে লোভ দেখাতে।

একদিন, ক্রীতদাসরা সবাই যখন বিশ্রামকালে মনিবের প্রশংসা করছিল, তখন আলেব বলে উঠল: "বন্ধুগণ, অকারণেই তোমরা আমাদের মনিবের গুণগান করছ। তোমরা যদি শয়তানকে খুশি করতে পার, তাহলে তো শয়তানও তোমাদের ভাল করবেন। আমরা ভালভাবে আমাদর মনিবের সেবা করি, তাঁকে খুশি রাখতে সব কিছু করি। কোন কথা তাঁর মনে উদয় হওয়া-মাত্রই তাঁর মনের কথা ধরে নিয়ে আমরা সে কাজটা করে ফেলি। এরপরেও কি তিনি ভাল না হয়ে পারেন? তাঁকে খুশি করা বন্ধ করে দাও, একদিন তার ক্ষতি কর, দেখবে তিনিও অন্য সব খারাপ মনিবদের মত খারাপের বদলায় আরও খারাপ ব্যবহার করবেন।"

অন্য ক্রীতদাসরা আলেবের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। তর্ক করতে করতে এক সময় বাজি ধরল। কথা দিল, আলেব তাদের ভাল মনিবকে রাগিয়ে দেবে; তা যদি না পারে তাহলে সে ছুটির দিনের জামা-কাপড় থেকে বঞ্চিত হবে; আর যদি মনিবকে রাগাতে পারে, তাহলে অপর সকলে তাদের ছুটির দিনের জামা-কাপড় তাকে দিয়ে দেবে, এবং যদি তাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয় বা জেলে দেওয়া হয় তবে তাকে মনিবের হাত থেকে রক্ষা করবে, তাকে উদ্ধার করবে। আলেব কথা দিল, পরদিন সকালেই সে মনিবকে রাগাতে চেষ্টা করবে।

আলেবের উপর ছিল ভেড়ার খোঁয়াড়ের ভার। দামী ভাল জাতের ভেড়াগুলোর দেখাশোনা সে করত।

পরদিন সকালে মনিব যখন তাঁর দামী আদরের ভেড়াগুলো অতিথিদের দেখাবার জন্য তাঁদের নিয়ে খোঁয়াড়ে গেল, তখন শয়তানের দোসর আলেব সঙ্গীদের দিকে চোখ ঠারল। যেন বলতে চাইল, "চেয়ে দেখ, তোমরা মনিবকে কেমন পাগলা বানিয়ে দি।"

দরজার ফাঁক দিয়ে আর বেড়ার উপর দিয়ে ব্যাপারটা দেখবার জন্য ক্রীতদাসরা সব জড় হল। এদিকে তার দোসর কেমন করে তার কাজ করে দেখবার জন্য শয়তান গোলাবাড়ির উপরকার একটা গাছে চড়ে বসল।

গোলাবাড়ির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনিব আঙুল তুলে তার মেষ আর ছাগলছানাগুলো অতিথিদের দেখাতে লাগলেন। শেষটায় তাঁর ইচ্ছা হল, সবচেয়ে ভাল ভেড়াটা তাঁদের দেখাবেন।

বললেন, "বাকি যা আছে সবই ভাল। তবে, বাঁকানো-শিংওয়ালা ভেড়াটা একেবারে অমূল্য। সেটা আমার দুটো চোখের চাইতেও বেশি প্রিয়।"

লোকজন দেখে ভেড়াগুলো তখন খোঁয়াড়ের মধ্যে ইতস্তত দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে। ফলে সেই দামী ভেড়াটাকে অতিথিরা ঠিকমত দেখতে

পাচ্ছিল না। ভেড়াটা যেই একটু শান্ত হয়ে দাঁড়ায় অমনি শয়তানের দোসর, যেন হঠাৎই ঘটে গেল এমনি ভাব দেখিয়ে আবার সব ভেড়াগুলোকে ভয় পাইয়ে দিতে লাগল। ফলে সব ভেড়া আবার মিলে মিশে একাকার ; ফলে অমূল্য ভেড়াটাকে চেনাই মুস্কিল হল অতিথিদের।

ব্যাপার দেখেশুনে খুব বিরত হয়ে মনিব বললেন, "ভাই আলেব, বাঁকানো-শিংওয়ালা সেরা ভেড়াটাকে ধরতে চেষ্টা কর তো। ওটাকে একটু শান্ত করে রাখ।"

মনিব এই কথা বলামাত্র আলেব সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেড়াগুলোর উপর এবং দামী ভেড়াটার লোম আঁকড়ে ধরল। জোর করে চেপে ধরে আলেব তার পিছনের বাঁ পা-টা এক হাতে ধরে সেটাকে উঁচু করে তুলে ধরল এবং মনিবের চোখের সামনেই তার পা-টা উপরের দিকে মুচড়ে দিল। গাছের শুকনো ডালের মত পা-টা মটাৎ করে ভেঙে গেল। ভেড়াটা চিৎকার করতে করতে সামনের দুই হাঁটুর উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আলেব তখন পিছনের ডান পা ধরে সেটাকে তুলে ধরল ; দোমড়ানো বাঁ পা-টা চাবুকের মত ল্যাংচাতে লাগল।

অতিথি এবং ক্রীতদাস সকলে তখন হাঁ হয়ে গেছে। আলেব কেমন নিপুণভাবে কাজটা সমাধা করেছে দেখে শয়তান ভারি খুশি। মনিবের মুখ রাতের মত কালো। চোখে ভ্রূকুটি। একটা কথাও না বলে তিনি মাথা নিচু করলেন।

অতিথি এবং ক্রীতদাসরা চুপ করে আছে। না জানি কী ঘটবে।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে মনিব নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিলেন, যেন একটা কিছু ঝেড়ে ফেললেন। তারপর মাথা তুলে আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালেন।

বেশিক্ষণ নয়, মুহূর্তকাল পরেই তাঁর মুখের কুঁচকে যাওয়া দাগগুলো সরে গেল ; হাসি মুখে তিনি আলেবের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে আবার হাসলেন; তারপর বললেন : "আলেব! আলেব! তোমার প্রভু তোমাকে আদেশ দিয়েছিলেন আমাকে রাগাতে। কিন্তু আমার প্রভু তোমার প্রভুর চাইতেও শক্তিমান। তুমি আমাকে রাগাতে পার নি, কিন্তু আমি তোমার প্রভুকে রাগাব। তুমি ভয় পেয়েছিলে যে আমি তোমাকে শাস্তি দেব, তাই তুমি মুক্ত হতে চেয়েছিল। জেনে রাখ, আমি তোমাকে শাস্তি দেব না, আর আমার অতিথিদের সাক্ষী রেখে এখানে এই মুহূর্তে তোমার আকাঙ্খিত মুক্তি তোমাকে দেব। এই নাও তোমার ছুটির দিনের জামা-কাপড়, তারপর চলে যাও তোমার যেখানে খুশি।"

তারপর সেই ভাল মনিব অতিথিদের নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। আর

সেই শয়তান দাঁত কড়-মড় করতে করতে গাছ থেকে নেমে মাটির মধ্যে ঢুকে গেল।

১৮৮৬

বোকা আইভানের কাহিনী

The story of Ivan the fool

[এবং তার দুই ভাই সৈনিক সাইমন ও শক্তিমান তরাস, এবং বোবা বোন মার্থা, এবং বুড়ো শয়তান ও তিন ক্ষুদে শয়তানের কাহিনী]

॥ ১ ॥

এক সময়ে কোন এক দেশের কোন এক প্রদেশে এক ধনী কৃষক বাস করত। তার ছিল তিন ছেলে: সৈনিক সাইমন, শক্তিমান তরাস ও বোকা আইভান; তাছাড়া তার ছিল একটি অবিবাহিতা মেয়ে মার্থা; মেয়েটি বোবা ও কালা। সৈনিক সাইমন রাজার চাকরি নিয়ে যুদ্ধে চলে গেল; শক্তিমান তরাস শহরে এক বণিকের কাছে গেল বাণিজ্য করতে; আর বোকা আইভান মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতেই থেকে গেল; জমি চষতে চষতে তার পিঠ বাঁকা হয়ে গেল।

সৈনিক সাইমন উচ্চপদ ও সম্পত্তি লাভ করে জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের মেয়েকে বিয়ে করল। তার অনেক মাইনে, আর সম্পত্তিও বেশ বড়, তবু খরচে কুলোয় না। স্বামী যা কিছু রোজগার করে সবই তার স্ত্রী উড়িয়ে দেয়; ফলে কোন সময়েই তাদের হাতে টাকা থাকে না।

কাজেই সৈনিক সাইমন তার জমিদারিতে গেল টাকা আদায় করতে। সেখানে সরকার বলল, "টাকা আসবে কোথেকে? আমাদের গরু-মোষ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, ঘোড়া নেই, লাঙল নেই, বিদে-মই নেই। আগে এসব যোগাড় করতে হবে, তবে তো টাকা আসবে।"

তখন সৈনিক সাইমন বাবার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, তুমি ধনী মানুষ, কিন্তু আমাকে কিছুই দাও নি। তোমার যা আছে ভাগ করে আমাকে তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে দাও; তাহলেই আমার জমিদারির উন্নতি করতে পারব।"

বৃদ্ধ বলল: "আমার বাড়িতে তুমি কিছুই দাও নি, আমি তোমাকে

এক-তৃতীয়াংশ দেব কেন? তাতে আইভান ও মেয়েটির প্রতি অবিচার করা হবে।"

কিন্তু সাইমন জবাব দিল, "সে তো বোকা, আর ওই বুড়ি কুমারীটা তো বোবা ও কালা; তারা সম্পত্তি দিয়ে কি করবে?"

বৃদ্ধ বলল, "এ বিষয়ে আইভান কি বলে আমাদের দেখতে হবে।"

আর আইভান বলল, "ও যা চায় তা নিয়ে যাক।"

ফলে সৈনিক সাইমন বাবার সম্পত্তির অংশ নিজের জমিদারিতে স্থানান্তরিত করে পুনরায় রাজার চাকরিতে চলে গেল।

শক্তিমান তরাসও অনেক টাকা-পয়সা করে এক বণিকের পরিবারে বিয়ে করল। কিন্তু তার আরও টাকার দরকার। তাই সেও বাবার কাছে গিয়ে বলল, "আমার অংশ আমাকে দাও।"

কিন্তু তরাসকে তার অংশ দেবার ইচ্ছা বৃদ্ধের ছিল না। সে বলল, "এখানে তুমি কিছুই দাও নি। এ বাড়িতে যা কিছু আছে সবই আইভান উপার্জন করেছে। তার ও মেয়েটার প্রতি অন্যায় করব কেন?"

কিন্তু তরাস বলল, "তার আবার কি দরকার? সে তো বোকা! সে বিয়ে করতে পারবে না, কারণ কেউ তাকে গ্রহণ করবে না; বোকা মেয়েটারও কোন কিছুরই দরকার নেই। শোন আইভান", সে বলল, "আমাকে ফসলের অর্ধেক দাও; আমি যন্ত্রপাতি কিছু চাই না, আর গৃহপালিত পশুদের মধ্যে আমি শুধু ধূসর ঘোড়াটা নেব, সেটা তো চাষের ব্যাপারে তোমার কোন কাজেই লাগে না।"

আইভান হেসে বলল, "তোমার যা ইচ্ছে নিয়ে যাও। আমি কাজ করে আবার সব করব।"

এইভাবে তারা তরাসকেও তার অংশ দিয়ে দিল। সে গাড়ি বোঝাই করে ফসল নিয়ে শহরে চলে গেল; ধূসর ঘোড়াটাকেও সংগে নিল। আর আইভানের রইল শুধু একটা বুড়ো ঘোটকি; তাই নিয়েই সে পূর্বের মতই তার চাষী জীবন কাটাতে লাগল; বাবা-মাকেও প্রতিপালন করতে লাগল।

॥ ২ ॥

সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে ভাইরা ঝগড়া-ঝাঁটি না করে শান্তিপূর্ণভাবে চলে গেল দেখে বুড়ো শয়তান খুবই বিরক্ত হল; তিন ক্ষুদে শয়তানকে সে কাছে ডাকল।

বলল, "দেখ, তিন ভাই আছে: সৈনিক সাইমন, শক্তিমান তরাস ও

বোকা আইভান। তাদের ঝগড়া করাই উচিত ছিল, কিন্তু তারা বেশ শান্তিতে আছে আর বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই মেলামেশা করছে। বোকা আইভানই সব কিছু ভেস্তে দিয়েছে। এবার তোরা তিনজন চলে যা; তিন ভাইয়ের সংগে বোঝা-পড়া কর্‌গে; তাদের এমন ক্ষেপিয়ে তুলবি যেন আচড়ে-কামড়ে একে অন্যের চোখ খুবলে নেয়! কি বলিস্‌, পারবি তো?"

"হ্যা, তাই করব," তারা বলল।

"কি ভাবে কাজ শুরু করবি?"

তারা বলল, "কেন, প্রথমে তাদের সর্বনাশ করে দেব। আর যখন তাদের খাবার দানাটিও থাকবে না তখন তাদের এক সংগে জুড়ে দেব, তাহলেই তারা নির্ঘাৎ লড়াই শুরু করে দেবে!"

"খাসা হবে; দেখছি তোদের কাজ তোরা ভালই বুঝিস্‌। চলে যা; যতক্ষণ তাদের কান ধরে শায়েস্তা করতে না পারবি ততদিন ফিরবি না; নইলে তোদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেব!"

একটা জলাভূমিতে গিয়ে ক্ষুদে শয়তানরা কিভাবে কাজ শুরু করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে বসল। তাদের ঝগড়ার আর শেষ হয় না; সকলেই চায় সব চাইতে হাল্কা কাজটি করতে। শেষ পর্যন্ত তারা স্থির করল, কে কোন্‌ ভাইকে নিয়ে পড়বে সেটা লটারি করে ঠিক হবে। যার কাজ আগে শেষ হবে সে গিয়ে অন্যদের সাহায্য করবে। কাজেই ক্ষুদে শয়তানরা ভাগ্য-পরীক্ষা করল; এবং কে সফল হল ও কার সাহায্য দরকার সে সব জানবার জন্য পরে আবার কখন তারা দেখা করবে সে দিন-ক্ষণও স্থির করল।

নির্ধারিত দিনটি এসে গেলে পূর্বব্যবস্থা মত তিন ক্ষুদে শয়তান আবার সেই জলাভূমিতে মিলিত হল। প্রত্যেকেই যার যার কাজের ফিরিস্তি দিল। পয়লা নম্বরের ভাগে পড়েছিল সৈনিক সাইমন; সে বলল: "আমার কাজ ভালই চলেছে। আগামীকাল সাইমন তার বাবার বাড়িতে ফিরে যাবে।"

সহকর্মীরা শুধাল, "তুমি কেমন করে কাজ হাসিল করলে?"

সে বলল, "প্রথমে আমি সাইমনের বুকে এত সাহস এনে দিলাম যে সে রাজার কাছে বিশ্ব জয় করে দেবার প্রস্তাব করল, আর রাজাও তাকে সেনাপতি করে দিয়ে ভারতবর্ষের রাজার সংগে যুদ্ধ করতে পাঠাল। তারা যুদ্ধের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি হল। কিন্তু আগের দিন রাতে আমি সাইমনের শিবিরের সব বারুদ ভিজিয়ে রাখলাম এবং ভারতের রাজার স্বপক্ষে এত বেশী সংখ্যক খড়ের সৈন্য তৈরি করে দিলাম যে তোমরা গুণেও শেষ করতে পারবে না। সেই সব খড়ের সৈন্যরা তাদের ঘিরে ধরেছে দেখে সাইমনের সৈন্যরা

ভয় পেয়ে গেল। সাইমন তাদের গোলা-গুলি চালাবার আদেশ দিল, কিন্তু তাদের কামান ও বন্দুক থেকে একটা গোলা-গুলিও ছুটল না। তখন সাইমনের সৈন্যরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে ভেড়ার মত দৌড়তে শুরু করল আর ভারতের রাজা তাদের সাবাড় করে দিল। রাজা সাইমনের উপর চটে গেল। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এবং আগামী কাল তার মৃত্যুদণ্ড হবে। আমার হাতে আর একদিনের কাজ বাকি আছে—সে যাতে পালিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারে সে জন্য তাকে কারাগার থেকে বের করে আনতে হবে। আগামী কাল থেকে তোমাদের মধ্যে যার দরকার হবে তাকেই আমি সাহায্য করতে পারব।"

দু'নম্বর ক্ষুদে শয়তানের হাতে ছিল তরাস; সে তার কথা বলতে শুরু করল। বলল, "আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই, আমার কাজ ভালই চলেছে। তরাস আর এক সপ্তাহের বেশি চালাতে পারবে না। প্রথমে আমি তাকে লোভী ও পেট-মোটা করে তুললাম। তার লোভ এত বেড়ে গেল যে সে যা পেল তাই কিনতে চাইল। প্রচুর মালপত্র কিনে সে সব টাকা খরচ করে ফেলেছে, এবং এখনও কিনেই চলেছে। এর মধ্যেই সে ধার-কর্জ করতে শুরু করেছে। ঋণের বোঝা তার গলায় ভারী হয়ে ঝুলছে, আর সে এতই জড়িয়ে পড়েছে যে কোন মতেই তার হাত থেকে রেহাই পাবে না। এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে সব ধার শোধ করতে হবে; তার আগেই তার সব সঞ্চিত ফসল আমি নষ্ট করে দেব। ধার শোধ করতে না পেরে সে তখন বাড়িতে তার বাবার কাছে যেতে বাধ্য হবে।"

তখন তারা তিন নম্বর ক্ষুদে শয়তানকে (আইভানের) জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কেমন চলছে?"

সে বলল, "দেখ, আমার কাজকর্ম বড়ই খারাপ চলেছে। প্রথমে তার পানীয়ে থুথু ছিটিয়ে দিলাম যাতে তার পেটে ব্যথা হয়; তারপর মাঠে গিয়ে মাটি পিটিয়ে পাথরের মত শক্ত করে দিলাম যাতে সে চাষ করতে না পারে। আমি ভেবেছিলাম সে জমিতে লাঙল দেবে না, কিন্তু লোকটা এতই বোকা যে সে লাঙল নিয়ে মাঠ চষতে শুরু করে দিল। পেটের ব্যথায় আর্তনাদ করলেও সে লাঙল চালাতেই লাগল। তার লাঙলটা ভেঙে দিলাম, কিন্তু সে বাড়িতে গিয়ে আর একটা লাঙল এনে ক্ষেত চষতে লাগল। আমি মাটির নীচে ঢুকে তার লাঙলের ফলাটা চেপে ধরলাম, কিন্তু তাকে রুখতে পারলাম না; সে লাঙলের উপর ঝুঁকে পড়ল, আর লাঙলের ধারালো ফলায় আমার হাতই কেটে গেল। মাঠে লাঙল দেওয়া সে প্রায় শেষ করে এনেছে; আর একটা ছোট ফালিমাত্র বাকি আছে। ভাই, তোমরা এসে আমাকে সাহায্য কর; কারণ তাকে পরাজিত করতে না পারলে আমাদের সব চেষ্টাই বিফল হবে। বোকাটা

যদি নিজের পথে থেকে জমিতে কাজ করতে থাকে তাহলে তার ভাইদেরও কোন অভাব থাকবে না, কারণ সে তাদের দুজনকেই খাওয়াবে।”

সৈনিক সাইমনের ক্ষুদে শয়তান কথা দিল, পরদিন সে সাহায্য করতে যাবে। তারপর তারা বিদায় নিল।

॥ ৩ ॥

এক চিলতে ছাড়া আর সবটা জমিই আইভান চাষ করে ফেলেছিল। বাকিটাও শেষ করতে এল। পেট যতই ব্যথা করুক, চাষ করতেই হবে। জোয়ালের দড়ি খুলে লাঙল ঘুরিয়ে সে কাজ শুরু করে দিল। এক শিরালা চালাবার পরে লাঙলের মুখ ঘোরাতেই লাঙলের ফলাটা বেধে গেল, যেন কোন শিকড়ে আটকে গেছে। আসলে ক্ষুদে শয়তানটা দুই পা দিয়ে লাঙলের ফলাটা জড়িয়ে ধরে সেটাকে আটকে দিয়েছে।

আইভান ভাবল, “এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! এখানে তো কোন শিকড় ছিল না, অথচ একটা শিকড় দেখতে পাচ্ছি।”

শিরালার মধ্যে অনেকখানি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা শক্ত মত জিনিস হাতে লাগায় আইভান সেটাকে টেনে তুলল। জিনিসটা শিকড়ের মত কালো হলেও কেমন যেন মোচড়াতে লাগল। আরে, এ যে একটা জ্যান্ত ক্ষুদে শয়তান!

“কী নোংরা জিনিস,” এই কথা বলে সেটাকে লাঙলের উপর আছাড় মারতে উদ্যত হতেই ক্ষুদে শয়তান আর্তনাদ করে উঠল :

“আমাকে আঘাত করো না ; তুমি যা বলবে আমি তাই করব।”

“তুমি কি করতে পার ?”

“যা করতে বলবে তাই পারব।”

আইভান মাথা চুলকোতে লাগল।

বলল, “আমার পেট ব্যথা করছে ; সারিয়ে দিতে পারবে ?”

“নিশ্চয় পারব।”

“ঠিক আছে ; সারিয়ে দাও।”

ক্ষুদে শয়তান শিরালার মধ্যে ঢুকে গিয়ে থাবা দিয়ে আঁচড়ে-আঁচড়ে তিনটে ছোট শিকড়ের একটা গোছা এনে আইভানের হাতে দিল।

বলল, “এই নাও ; এর একটা যে খাবে তার যে কোন অসুখ সেরে যাবে।”

আইভান শিকড়গুলো নিয়ে একটাকে আলাদা করে গিলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের ব্যথা সেরে গেল। ক্ষুদে শয়তান তখন তাকে ছেড়ে দিতে

বলল। "এখনই আমি এক লাফে মাটির ভিতর ঢুকে যাব; আর কখনও আসব না।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে; চলে যাও; ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!"

যেই না আইভান ঈশ্বরের কথা বলল অমনি ক্ষুদে শয়তান জলের ভিতর ছুঁড়ে দেওয়া পাথরের মত মাটির মধ্যে ঢুকে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা গর্ত।

বাকি শিকড় দুটো টুপির মধ্যে গুঁজে রেখে আইভান আবার লাঙল চালাতে লাগল। শেষ ফালিটুকুও চষা শেষ করে সে লাঙল তুলে বাড়ি ফিরে গেল। ঘোড়াটাকে খুলে দিয়ে কুঁড়েতে ঢুকে সে দেখল, তার বড় ভাই সৈনিক সাইমন ও তার স্ত্রী খেতে বসেছে। সাইমনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, সে কোন রকমে কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছে, আর এখন থেকে তার বাবার বাড়িতেই থাকবে।

আইভানকে দেখে সাইমন বলল: "তোমার সঙ্গে থাকতেই এলাম। আর একটা চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে ও আমার স্ত্রীকে তুমিই খাওয়াবে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে, তোমরা আমাদের সঙ্গেই থাকতে পার।"

কিন্তু আইভান যখন বেঞ্চিতে বসতে গেল তখন তার গায়ের গন্ধ মহিলাটির পছন্দ হল না; সে তার স্বামীকে বলল: "একটা নোংরা চাষার সঙ্গে বসে আমি খেতে পারব না।"

তখন সৈনিক সাইমন বলল, "আমার স্ত্রী বলছে, তোমার গায়ের গন্ধ ভাল নয়। তুমি বরং বাইরে গিয়ে খাও।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে; ঘোটকিটাকে ঘাস খাওয়াবার জন্য আমাকে তো রাতটা বাইরেই কাটাতে হবে।"

কাজেই কিছু রুটি ও কোটটা নিয়ে ঘোটকিটাকে সঙ্গে করে সে মাঠে চলে গেল।

॥ ৪ ॥

সেদিন রাতে নিজের কাজ শেষ করে সাইমনের ক্ষুদে শয়তান তার কথামত আইভানের ক্ষুদে শয়তানটাকে সাহায্য করতে ও বোকাটাকে পর্যুদস্ত করতে এসে হাজির হল। মাঠে পৌঁছে সে অনেক খুঁজল—কিন্তু তার বন্ধুর বদলে দেখতে পেল শুধু একটা গর্ত।

সে ভাবল, "পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বন্ধুর কোন বিপদ ঘটেছে। তার জায়গা আমাকেই নিতে হবে। জমি তো চাষ করাই হয়ে গেছে, কাজেই

মাঠেই বোকাটার ব্যবস্থা করতে হবে।”

ক্ষুদে শয়তান তখন মাঠে গিয়ে আইভানের খড়ের মাঠ এমনভাবে জলে ভরে দিল যে সব খড় কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

ভোর বেলা গোচারণ ভূমি থেকে ফিরে আইভান কাস্তেটাতে শান দিয়ে খড় কাটতে মাঠে গেল। কিন্তু কাস্তেটা দু'একবার চালাতেই তাতে আর খড় কাটা গেল না; আবার নতুন করে ধার দেওয়া দরকার। আইভান বার কয়েক চেষ্টা করে বলল: “এ ভাবে হবে না। বাড়ি গিয়ে একটা যন্তর এনে কাস্তেটাকে সোজা করতে হবে; সেই সঙ্গে এক চাঙড় রুটিও নিয়ে আসতে হবে। এখানে যদি এক সপ্তাহও কাটাতে হয় তথাপি খড়কাটা শেষ না করে এখান থেকে যাব না।”

এই কথা শুনে ক্ষুদে শয়তান মনে মনে ভাবল, “এ বোকাটা তো ভারী ত্যাঁদোড়; এভাবে ওর সঙ্গে পারা যাবে না। অন্য চালাকি খেলতে হবে।”

ফিরে এসে কাস্তেতে শান দিয়ে আইভান আবার খড় কাটতে শুরু করল। ক্ষুদে শয়তান হামাগুড়ি দিয়ে ঘাসের মধ্যে ঢুকে গোড়ালি দিয়ে কাস্তেটাকে চেপে ধরে তার মুখটাকে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। ফলে কাজটা করতে খুব কষ্ট হলেও সমস্ত মাঠের খড়ই সে কেটে ফেলল, শুধু জলাভূমির অংশটুকু বাকি রইল। ক্ষুদে শয়তান সেই জলাভূমিতে ঢুকে ভাবল, “আমার থাবাগুলো যদি কেটেও যায় তবু তাকে খড় কাটতে দেব না।”

আইভান জলাভূমিতে নামল। ঘাসগুলো খুব ঘন নয়, অথচ কাস্তে বসছে না। আইভান রেগে গিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কাস্তে চালাতে শুরু করল। ক্ষুদে শয়তান হার মানল; সে আর কাস্তেটা ধরে রাখতে পারল না; গতিক ভাল নয় বুঝে সে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আইভান ঝোপটা চেপে ধরে কাস্তে চালাতেই ক্ষুদে শয়তানের লেজের অর্ধেকটা কাটা পড়ল। তারপর ঘাস কাটা শেষ করে বোনকে সেগুলো দিয়ে গাদা সাজাতে বলে সে গম কাটতে চলে গেল। সে কাস্তেটা হাতে নিয়েই গেল, কিন্তু লেজ-কাটা ক্ষুদে শয়তান তার আগেই সেখানে পৌঁছে গমকে এমনভাবে পেঁচিয়ে রাখল যে সে কাস্তে কোন কাজেই এল না। কিন্তু আইভান বাড়ি ফিরে গিয়ে তার ছোট কাস্তেটা নিয়ে এল এবং তাই দিয়ে কাজ শুরু করে সবটা গমই কেটে ফেলল।

সে বলল, “এবার যই কাটার সময় হয়েছে।”

একথা শুনে লেজ-কাটা ক্ষুদে শয়তান ভাবল, “গমের বেলায় ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি নি, কিন্তু যইয়ের বেলায় নিশ্চয় পারব। শুধু সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সকালে ক্ষুদে শয়তান তাড়াতাড়ি যইয়ের মাঠে গেল, কিন্তু ততক্ষণে সব

যই কাটা হয়ে গেছে। যাতে বেশী ফসল ঝরে না যায় সেজন্য আইভান রাতের মধ্যেই সব যই কেটে ফেলেছে। ক্ষুদে শয়তান ভয়ানক রেগে গেল।

"এই বোকাটা আমার সারা শরীর কেটে দিয়েছে, আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। এ তো যুদ্ধের চাইতেও খারাপ। এই বোকাটা ঘুমোয় না পর্যন্ত; ওর সঙ্গে এঁটে ওঠা ভার। এবার ওর খড়ের গাদায় ঢুকে সেগুলোকে নষ্ট করে দেব।"

তখন ক্ষুদে শয়তান গমের মধ্যে ঢুকে তার আঁটিগুলোর মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে সেগুলোকে পচিয়ে ফেলতে লাগল। সেগুলো গরম হতেই তার নিজেরও বেশ আরাম লাগায় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আইভান ঘোটকির পিঠে জোয়াল কসিয়ে বোনকে সঙ্গে নিয়ে গমের আঁটি গাড়িতে বোঝাই করতে গেল। দুটো আঁটিকে টানাটানি করে সে সাঁড়াশিটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল—ক্ষুদে শয়তানের একেবারে পিঠের মধ্যে। সাঁড়াশিটা তুলে ধরে দেখে তার দাঁড়ার উপর সেই লেজ-কাটা ক্ষুদে শয়তানটা মুচড়ে-দুমড়ে লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করছে।

"আরে পাজি, তুমি এখানেও হাজির হয়েছ?"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "আমি অন্য লোক। এক নম্বরটা আমার ভাই। আমি তোমার ভাই সাইমনের কাছে ছিলাম।"

আইভান বলল, "সে তুমি যেই হও, তোমার কপালেও সেই একই শাস্তি।"

ক্ষুদে শয়তানটাকে গাড়ির উপর আছাড় দিতে গেলে সেটা চেঁচিয়ে বলে উঠল: "আমাকে ছেড়ে দাও; আমিও তোমাকে ছেড়ে তো যাবই; উপরন্তু তুমি যা করতে বলবে তাই করব।

"তুমি কি করতে পার?"

"যে কোন জিনিস দিয়ে সৈন্য বানাতে পারি।"

"কিন্তু তারা কি কাজে লাগবে?"

"তাদের দিয়ে যে কোন কাজ করাতে পার; তোমার যা ইচ্ছা তারা তাই করতে পারবে।"

"তারা গাইতে পারবে?"

"হ্যাঁ, তুমি চাইলেই পারবে।"

"ঠিক আছে; আমাকে কিছু সৈন্য বানিয়ে দাও।"

তখন ক্ষুদে শয়তান বলল, "দেখ, এক আঁটি গম নাও; তারপর সেটাকে মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে শুধু বল:

'খড়ের আঁটি! খড়ের আঁটি! আমার চাকর হুকুম দিল:
একটি করে সৈন্য দাঁড়াক যেথায় যত খড়রা ছিল!'

আইভান খড়ের আঁটিটা নিয়ে মাটিতে আছড়ে ক্ষুদে শয়তানের শেখানো কথাগুলি বলল। আঁটিটা খুলে ছড়িয়ে পড়ল আর প্রতিটি খড় একটি করে সৈন্যে পরিণত হল। তাদের সামনে একজন ভেরীবাদক ও একজন ঢাকবাদকও বাজাতে শুরু করে দিল। ফলে একটা পুরো রেজিমেণ্ট তৈরি হয়ে গেল।

আইভান হেসে উঠল।

বলল, "তাজ্জব ব্যাপার! ভারী চমৎকার! মেয়েরা খুব খুসি হবে!"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "এবার আমাকে ছেড়ে দাও।"

আইভান বলল, "না। ঝাড়াই করা খড় থেকে আমি সৈন্য বানাতে চাই, নইলে অনেক ফসল নষ্ট হবে। এগুলোকে কেমন করে আবার খড়ে পরিণত করা যাবে সেটা আমাকে শিখিয়ে দাও। আমি খড়গুলো ঝাড়াই করব।"

তখন ক্ষুদে শয়তান বলল, "তাহলে আবার বল :

'সৈন্যরা সব খড় হয়ে যাও আবার।

আমার চাকর দিচ্ছে হুকুম আবার!'

আইভান এই কথা বলতেই আবার সব খড় হয়ে গেল।

ক্ষুদে শয়তান পুনরায় মিনতি করে বলল, "এবার আমাকে যেতে দাও।"

"ঠিক আছে।" তাকে গাড়ির পাশে চেপে ধরে আইভান সাঁড়াশিটা টেনে নিল।

"ঈশ্বর তোমার সহায় হোন," সে বলল।

সে ঈশ্বরের নাম করামাত্রই জলের মধ্যে পাথরের মত ক্ষুদে শয়তান মাটির ভিতর ঢুকে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা গর্ত।

আইভান বাড়ি ফিরে গেল। সেখানে তখন তার অপর ভাই তরাস ও তার স্ত্রী খেতে বসেছে।

শক্তিমান তরাস ঋণ শোধ করতে না পেরে পাওনাদারদের কাছ থেকে পালিয়ে তার বাবার বাড়িতে ফিরে এসেছে। আইভানকে দেখে সে বলল, "দেখ, যতদিন আমি আবার একটা ব্যবসা শুরু করতে না পারছি ততদিন আমাকে ও আমার স্ত্রীকে খাওয়াবার ভার তোমাকেই নিতে হবে।

আইভান বলল, "ঠিক আছে, তোমাদের ইচ্ছা হলে এখানে থাকতে পার।"

আইভান কোটটা খুলে টেবিলে বসল। তখন বণিকের স্ত্রী বলল : "এই ভাঁড়ের সংগে এক টেবিলে আমি বসতে পারব না ; ওর গায়ে ঘামের গন্ধ।"

তখন শক্তিমান তরাস বলল, "আইভান, তোমার গায়ে বড় বেশী গন্ধ। তুমি বাইরে গিয়ে খাও।"

কিছু রুটি নিয়ে উঠোনে যেতে যেতে আইভান বলল, "ঠিক আছে। ঘোটকীটাকে চরাবার সময় তো হয়েই গেছে।"

॥ ৫ ॥

তরাসের ক্ষুদে শয়তানও নিজের কাজ শেষ করে সেই রাতেই পূর্ব ব্যবস্থামত বোকা আইভানকে পযুর্দস্ত করার ব্যাপারে তার বন্ধুদের সাহায্য করতে এল। ফসলের ক্ষেতে পেঁছে সে সঙ্গীদের অনেক খুঁজল—কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। শুধু একটা গর্ত সে দেখতে পেল। সে তখন প্রান্তরের দিকে গেল এবং সেখানে জলাভূমিতে ক্ষুদে শয়তানের একটা লেজ এবং গমের নাড়ার মধ্যে একটা গর্ত দেখতে পেল।

সে ভাবল, "নিশ্চয় আমার সঙ্গীদের কোন বিপদ ঘটেছে। আমাকেই তাদের জায়গা নিয়ে বোকাটার মোকাবিলা করতে হবে।"

ক্ষুদে শয়তান তখন আইভানকে খুঁজতে লাগল। সে তখন ফসল বোঝাই শেষ করে জঙ্গলে কাঠ কাটতে শুরু করেছে। এক বাড়িতে বাস করার ফলে দুই ভাই ইতিমধ্যেই ঠাসাঠাসি বোধ করায় আইভানকে কাঠ কেটে এনে তাদের জন্য নতুন ঘর তৈরি করে দিতে বলেছে।

ক্ষুদে শয়তান দৌড়ে জঙ্গলে গেল; গাছের ডালে চড়ে সে আইভানের গাছ কাটায় বাধা দিতে লাগল। আইভান একটা গাছের গোড়া কেটে দিলে সেটার সরাসরি মাটিতে পড়ে যাবার কথা, কিন্তু পড়বার মুখে গাছটা বেঁকে গিয়ে কয়েকটা ডালে আটকে গেল। আইভান একটা লম্বা লাঠি কেটে নিয়ে সেটা দিয়ে ঠেলা দিয়ে অনেক কষ্টে গাছটাকে মাটিতে ফেলে দিল। আর একটা গাছ কেটে ফেলতে চেষ্টা করল—আবারও সেই একই ঘটনা; অনেক চেষ্টা করে তবে সে গাছটাকে মাটিতে ফেলে দিল। তৃতীয় গাছ কাটার বেলায়ও সেই একই ঘটনা ঘটল।

আইভান আশা করেছিল পঞ্চাশটা ছোট গাছ কাটতে পারবে; কিন্তু মাত্র দশটা কাটবার আগেই রাত নেমে এল, আর সেও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার গা থেকে গরম ধোঁয়া কুয়াসার মত জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তবু সে কাজ করেই চলল। আরও একটা গাছের গোড়া কাটতেই তার পিঠ এত ব্যথা করতে লাগল যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কুড়ুলটা গাছের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে সে বিশ্রাম নিতে বসে পড়ল।

আইভান কাজ বন্ধ করেছে দেখে ক্ষুদে শয়তানটা খুসি হয়ে উঠল।

সে ভাবল, "শেষ পর্যন্ত সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবার সে কাজে ক্ষান্ত হবে। এবার আমি নিজেও একটু বিশ্রাম নিতে পারি।"

একটা ডালের দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে সে মুখ টিপে হাসল। কিন্তু একটু পরেই আইভান উঠে দাঁড়াল এবং কুড়ুলটা তুলে উল্টো দিক থেকে এত জোরে আঘাত করল যে গাছটা সঙ্গে সঙ্গে সবেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ক্ষুদে শয়তান এটা আশা করে নি; তাই সে পা দুটো সরিয়ে নেবার

সময় পেল না; গাছটা ভেঙে পড়বার সময় তার থাবাটাকে চেপে ধরল। ডালপালাগুলো কাটতে কাটতে সে দেখতে পেল; একটা ক্ষুদে শয়তান গাছ থেকে ঝুলে রয়েছে! আইভান বিস্মিত হল।

বলল, "আরে বেয়াড়া চিজ! তুমি আবার এখানে এসেছ!"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "আমি অন্য লোক। আমি তোমার ভাই তরাসের সঙ্গে ছিলাম।"

"তুমি যেই হও; নিয়তি তোমাকে টেনেছে," এই কথা বলে আইভান কুড়ুল ঘুরিয়ে পিছন দিকটা দিয়ে তাকে আঘাত করতে যাবে এমন সময় ক্ষুদে শয়তান তার কাছে করুণা ভিক্ষা করল: "আমাকে মেরো না, তুমি আমাকে যা করতে বলবে তাই করব।"

"তুমি কি করতে পার?"

"তুমি যত চাও তত টাকা তোমাকে বানিয়ে দিতে পারি।"

"ঠিক আছে, কিছু বানিয়ে দেখাও।" তখন ক্ষুদে শয়তান তার কেরামতি দেখাতে লাগল।

সে বলল, "এই ওক গাছ থেকে কিছু পাতা নিয়ে তোমার হাতের মধ্যে ঘসতে থাক, তাহলেই মাটিতে সোনা ঝরে পড়বে।"

আইভান কিছু পাতা নিয়ে ঘসতে লাগল, আর তার হাত থেকে সোনা পড়তে লাগল।

সে বলল, "খুব ভাল হল; ছুটির দিনে ছোটরা এ নিয়ে বেশ খেলা করতে পারবে।"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "এবার আমাকে যেতে দাও।"

"ঠিক আছে", বলে আইভান তাকে ছেড়ে দিল। "এবার চলে যাও! ঈশ্বর তোমার সহায় হোন," সে বলল।

যেই না ঈশ্বরের কথা বলা অমনি জলের মধ্যে পাথরের মত ক্ষুদে শয়তান মাটির মধ্যে ঢুকে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা গর্ত।

॥ ৬ ॥

এই ভাবে দাদারা ঘর-বাড়ি বানিয়ে আলাদা বাস করতে লাগল। আইভান ফসল কাটা শেষ করল, বীয়ার চোলাই করল, এবং পরবর্তী উৎসবের সময়টা তার সঙ্গে কাটাবার জন্য দাদাদের আমন্ত্রণ করল। কিন্তু দাদারা এল না।

তারা বলল, "চাষীদের উৎসব নিয়ে আমাদের উৎসাহ নেই।"

কাজেই আইভান কৃষকদের ও তাদের বৌদের আপ্যায়ন করল। বীয়ার

খেয়ে তার চোখে রং ধরল। একদল নাচিয়ের সঙ্গে সে রাস্তায় গেল এবং সেখানে তার সম্মানে একটি গান গাইতে মেয়েদের অনুরোধ করল; সে বলল, "আমি তোমাদের এমন একটা জিনিস দেব যা তোমরা জীবনে কখনও দেখ নি।"

মেয়েরা হাসতে হাসতে তার প্রশংসিত গাইতে শুরু করল। গান শেষ করে তারা বলল, "এবার তোমার উপহার দাও।"

"এখনই নিয়ে আসছি", সে বলল।

একটা বীজ-ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে সে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল। মেয়েরা হেসে উঠল। "ও একটা বোকা!" এই কথা বলে তারা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

কিন্তু আইভান শীঘ্রই দৌড়ে ফিরে এল; কোন ভারি জিনিস দিয়ে তার ঝুড়িটা ভর্তি।

"এটা তোমাদের দেব কি?"

"হ্যাঁ, দাও।"

একমুঠো সোনা তুলে নিয়ে আইভান মেয়েদের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেগুলি কুড়িয়ে নেবার জন্য তারা যে ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে একটা দেখবার মত দৃশ্য। আশেপাশের পুরুষরাও তার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল এবং একে অন্যেরটা কেড়ে নিতে লাগল। একটা বুড়িকে তো চেপে মেরেই ফেলেছিল আর কি। আইভান হাসতে লাগল।

বলল, "আরে বোকারা! তোমরা ঠাকুরমাকে চেপে ধরেছ কেন? শান্ত হও, আমি তোমাদের আরও দিচ্ছি।" এই বলে সে আরও কিছু ছড়িয়ে দিল। লোকজন সব চারদিক থেকে ভিড় জমিয়ে তুলল, আর আইভান ক্রমে ক্রমে সব সোনাই ছড়িয়ে দিল। তারা আরও চাইলে আইভান বলল, "এখন তো আমার কাছে আর নেই। অন্য সময়ে আরও কিছু তোমাদের দেব। আপাতত এস, আমরা সকলে নাচ শুরু করি, আর তোমরাও আমাকে গান শুনিয়ে দাও।"

মেয়েরা গাইতে শুরু করল।

সে বলল, "তোমাদের গান মোটেই ভাল নয়।"

"এর চাইতে ভাল গান কোথায় পাবে?" তারা বলল।

"এখনই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি", সে বলল।

তারপর সে গোলাবাড়িতে গিয়ে একটা আঁটি নিয়ে ফসল ঝেড়ে ফেলে সেটাকে খাড়া করে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলল।

"এবার, সে" বলল:

"খড়ের আঁটি! খড়ের আঁটি! আমার চাকর হুকুম দিল :
একটি করে সৈন্য আসুক যেথায় যত খড়রা ছিল।"

অমনি আঁটিটা খুলে গিয়ে দেখা দিল একদল সৈনিক। ভেরী ও ঢাক বেজে উঠল। আইভান সৈনিকদের গান-বাজনা করতে হুকুম করল ও তাদের রাস্তায় নিয়ে হাজির করল। সকলে তো অবাক। সৈনিকরা বাদ্য বাজাল, গান করল। তখন আইভান (সকলকে তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করে) সকলকে গোলাবাড়িতে নিয়ে গিয়ে আবার খড়ের আঁটিতে পরিণত করে যথাস্থানে রেখে দিল।

তারপর সে বাড়ি ফিরে আস্তাবলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে এ সব কথা শুনে সৈনিক সাইমন ভাইয়ের কাছে গেল।

বলল; "আমাকে বল তো এত সব সৈন্য তুমি পেলেই বা কোথায়, আর তাদের রেখেছই বা কোথায়?"

"তা শুনে তুমি কি করবে?" আইভান বলল।

"কি করব? দেখ, সৈন্য হাতে পেলে যা ইচ্ছা করা যায়। একটা রাজ্য জয় করা যায়।" আইভান অবাক হল।

বলল, "সত্যি নাকি! এ কথা আগে বল নি কেন? তুমি যত চাও তত সৈন্য আমি তোমাকে দিতে পারি। বোন ও আমাতে মিলে ফসল ঝেড়ে অনেক খড় জমা করেছি।"

আইভান দাদাকে সঙ্গে করে গোলাবাড়িতে গিয়ে বলল :

"একটা কথা; তোমাকে সৈন্য বানিয়ে দেওয়ামাত্রই তুমি তাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে; কারণ তাদের যদি এখানে খাওয়াতে হয় তাহলে একদিনেই তারা সারা গ্রামটাকেই খেয়ে ফেলবে।"

সৈনিক সাইমন কথা দিল, সৈন্যদের নিয়ে চলে যাবে, আর আইভানও সৈন্য বানাতে শুরু করল। এক আঁটি খড় সে উঠোনে আছড়ে ফেলল—আর একদল সৈন্য উদয় হল। আর এক আঁটি ফেলল— আর একদল সৈন্য হল। এইভাবে সে এত সৈন্য বানিয়ে ফেলল যে গোটা মাঠই ছেয়ে গেল।

"এতে হবে তো?" সে প্রশ্ন করল।

সাইমন আনন্দে আত্মহারা; বলল : "এতেই হবে! ধন্যবাদ আইভান।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে। যদি আরও দরকার হয়, আমাকে এসে বলো, বানিয়ে দেব। এ বছর যথেষ্ট খড় পাওয়া গেছে।"

সৈনিক সাইমন সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলকে নিজের অধীনে এনে তাদের সাজিয়ে-গুছিয়ে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে গেল।

সৈনিক সাইমন চলে যাবার পরক্ষণেই শক্তিমান তরাস এসে হাজির হল। সেও গত কালকার সব ব্যাপার শুনেছিল ; তাই ভাইকে বলল :

"এত সোনা তুমি কোথায় পেলে আমাকে দেখাও। আমি যদি কিছু সোনা হাতে পেতাম, তাহলে সারা পৃথিবীর টাকা আমার কাছে এনে হাজির করতে পারতাম।"

আইভান তো অবাক।

বলল, "সত্যি! এ কথা আগে বললেই পারতে। যত চাও তত সোনা তোমাকে দেব।"

তার দাদা তো ভারি খুসি।

"শুরুতে আমাকে তিন ঝুড়ি দাও।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে। আমার সঙ্গে বনে চল ; বরং ঘোটকিটাকে নিয়ে যাই, কারণ অত সোনা তুমি বয়ে আনতে পারবে না।"

ঘোড়ায় চড়ে তারা বনে ঢুকল। আইভান ওক গাছের পাতা নিয়ে হাতে ঘসতে লাগল। সোনার স্তূপ জমে গেল।

"এতে হবে তো ?"

তরাসের খুসি ধরে না।

বলল, "আপাতত এতেই হবে। ধন্যবাদ আইভান!"

আইভান বলল, "ঠিক আছে। যদি আরও লাগে তো চলে এসো। গাছে অনেক পাতা আছে।"

গাড়ি-বোঝাই সোনা নিয়ে শক্তিমান তরাস বাণিজ্য করতে চলে গেল।

এই ভাবে দুই দাদাই চলে গেল : সাইমন গেল যুদ্ধ করতে, আর তরাস গেল কেনা-বেচা করতে। সৈনিক সাইমন একটা রাজ্য জয় করল ; তরাসও ব্যবসা করে অনেক টাকা করল।

দুই ভাইয়ের দেখা হলে একে অপরকে সব কথা বলল : সাইমন কি ভাবে সৈন্যদের পেল, আর তরাস কি ভাবে টাকাটা পেল। তখন সৈনিক সাইমন ভাইকে বলল, "একটা রাজ্য জয় করে আমি বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই আছি, কিন্তু সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমার নেই।

আর শক্তিমান তরাস বলল, "আর আমি অনেক টাকা করেছি, কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে সে টাকা পাহারা দেবার কেউ নেই।"

সৈনিক সাইমন বলল, "চল, আমরা ভাইয়ের কাছে যাই। আমি তাকে আরও সৈন্য বানাতে বলব, আর তোমার টাকা পাহারা দেবার জন্য তাদের তোমাকে দিয়ে দেব ; আবার তুমি তাকে আমার জন্য যে টাকা তৈরি করতে

বলবে তাই দিয়ে আমি আমার সৈন্যদের খাওয়াব।"

তখন তারা আইভানের কাছে গেল।

সাইমন বলল, "আদরের ভাই, আমার যথেষ্ট সৈন্য নেই ; আরও দুই গাদা বা ঐ রকম সৈন্য আমাকে বানিয়ে দাও।"

আইভান মাথা নাড়ল।

বলল, "না! আমি তোমাকে আর সৈন্য বানিয়ে দেব না।"

"কিন্তু তুমি দেবে বলে কথা দিয়েছিলে।"

"জানি কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি আর সৈন্য বানাব না।"

"কিন্তু কেন বানাবে না বোকা ?"

"কারণ তোমার সৈন্যরা একটি লোককে মেরেছে। এই তো সেদিন রাস্তার ধারে লাঙল চালাচ্ছিলাম এমন সময় দেখলাম একটি স্ত্রীলোক কাঁদতে কাঁদতে গাড়িতে করে একটা শবাধার নিয়ে চলেছে। কে মারা গেছে জানতে চাইলাম। সে বলল, 'সাইমনের সৈন্যরা যুদ্ধে আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে।' আমি ভেবেছিলাম সৈন্যরা শুধু সুর বাজাবে, কিন্তু তারা মানুষ মেরেছে। কাজেই আর সৈন্য আমি দেব না।"

যে কথা সেই কাজ ; সে কিছুতেই সৈন্য বানাবে না।

শক্তিমান তরাসও তার জন্য আরও সোনা বানাতে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু আইভান মাথা নাড়ল।

"না, আর সোনা বানাব না," সে বলল।

"তুমি আমাকে কথা দাও নি ?"

"দিয়েছিলাম, কিন্তু আর বানাব না," সে বলল।

"কেন বানাবে না বোকা ?"

"কারণ তোমার স্বর্ণ মুদ্রা মাইকেলের মেয়ের গরুটা নিয়ে গেছে।"

"কেমন করে ?"

"স্রেফ নিয়ে গেছে! মাইকেলের মেয়ের একটা গরু ছিল। তার ছেলে-মেয়েরা সেই গরুর দুধ খেত। কিন্তু সেদিন তার ছেলেমেয়েরা আমার কাছে দুধ চাইতে এসেছিল। আমি বললাম, 'তোদের গরু কোথায় গেল ?' তারা জবাব দিল, 'শক্তিমান তরাসের গোমস্তা এসে মাকে তিন টুকরো সোনা দিল আর মা তাকে গরুটা দিয়ে দিল ; কাজেই আমাদের খাবার দুধ নেই।' আমি ভেবেছিলাম সোনার টুকরোগুলো দিয়ে তুমি শুধু খেলা করবে, কিন্তু তুমি ছেলেমেয়েদের গরুটা নিয়ে এসেছ। তাই তোমাকে আর সোনা দেব না।"

যে কথা সেই কাজ ; আইভান তাকে আর সোনা দিল না। কাজেই দুই ভাই চলে গেল। তাদের অভাবগুলো কি ভাবে দূর করা যায়, যেতে যেতে সেই কথাই তারা আলোচনা করতে লাগল। সাইমন বলল :

"দেখ, কি করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি। সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য তুমি আমাকে টাকা দাও, আর তোমার টাকা-পয়সা পাহারা দেবার জন্য আমি তোমাকে দেব অর্ধেক রাজ্য আর যথেষ্ট সৈন্য।" তরাস সম্মত হল। এই ভাবে দুই ভাই যার যা ছিল ভাগ করে নিল; ফলে দুজনই রাজা হল, আর দুজনই ধনী হল।

॥ ৮ ॥

আইভান বাড়িতে থেকে বাবা-মার ভরণ-পোষণ করতে লাগল এবং বোবা বোনটিকে নিয়ে ক্ষেতে কাজ করে চলল। এখন হল কি, আইভানের কুকুরটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। গা-ময় পাচড়া হয়ে সে প্রায় মরতে বসল। তার প্রতি করুণাবশত আইভান বোনের কাছ থেকে কিছুটা রুটি নিয়ে তার টুপির মধ্যে ভরে বাইরে নিয়ে কুকুরটার সামনে ছুঁড়ে দিল। টুপিটা ছিল ছেঁড়া, তাই রুটির সঙ্গে একটা ছোট শিকড় মাটিতে পড়ে গেল। বুড়ো কুকুরটা রুটি সমেত সেটা খেয়ে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সেটা লাফাতে লাগল, খেলা করতে লাগল, ডাকতে লাগল, আর লেজ নাড়তে লাগল—এক কথায় সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল।

বাবা আর মা তা দেখে তো অবাক।

তারা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি করে কুকুরটাকে সারালে?"

আইভান জবাব দিল: "যে কোন ব্যথা সারাবার মত দুটো ছোট শিকড় আমার কাছে ছিল। কুকুরটা তার একটা গিলে খেয়েছে।"

এদিকে ঠিক সেই সময়ই রাজার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাজা সমস্ত শহরে ও গ্রামে ঘোষণা করে দিল, যে কেউ তার মেয়েকে সারিয়ে তুলতে পারবে রাজা তাকেই পুরস্কৃত করবে, আর যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ রাজার মেয়েকে সারাতে পারে তাহলে সেই তাকে পত্নীরূপে পাবে। আইভানদের গ্রামে এবং অন্য সর্বত্রই এই ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল।

বাবা ও মা আইভানকে কাছে ডেকে বলল: "রাজা কি ঘোষণা করেছেন শুনেছ? তুমি বললে, তোমার কাছে এমন শিকড় আছে যাতে যে কোন রোগ সারবে। তুমি গিয়ে রাজার মেয়েকে সারিয়ে তোল; তাহলেই সারা জীবনের মত সুখী হতে পারবে।"

"ঠিক আছে," সে বলল।

তখন আইভান যাবার জন্য প্রস্তুত হল। তারা তাকে যথাসাধ্য ভাল ভাবে সাজিয়ে দিল। কিন্তু দরজা থেকে বেরিয়েই নুলো হাতওয়ালা একটি

ভিখারিনীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

ভিখারিনী বলল, "আমি শুনেছি তুমি মানুষকে ভাল করে দিতে পার। আমি প্রার্থনা জানাই, আমার হাতটা ভাল করে দাও, কারণ জুতোজোড়া পর্যন্ত আমি নিজে পরতে পারি না।"

"ঠিক আছে," বলে আইভান ছোট শিকড়টা তাকে দিয়ে গিলে ফেলতে বলল। ভিখারিনী সেটা খেয়েই ভাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে বেশ ভাল ভাবে তার হাতটা নাড়তে লাগল।

আইভানের সঙ্গে রাজার কাছে যাবার জন্য তার বাবা ও মাও বেরিয়ে এল। কিন্তু তারা যখন শুনল যে শিকড়টা সে দিয়ে দিয়েছে এবং রাজার মেয়েকে সারাবার মত আর কিছুই তার কাছে নেই, তখন তারা আইভানকে বকতে শুরু করল।

তারা বলল, "তুমি ভিখারিনীকে দয়া করলে, কিন্তু রাজার মেয়ের জন্য তোমার দুঃখ হল না!" তবে আইভান রাজার মেয়ের জন্যও দুঃখিত হল। তাই সে ঘোড়াটা জুতে গাড়িতে বসবার জন্য খড় বিছিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

"তুমি কোথায় চললে বোকা?"

"রাজার মেয়েকে সারাতে?"

"কিন্তু তাকে সারাবার মত কিছুই তো তোমার নেই।"

"সে জন্য ভেব না," এই কথা বলে সে গাড়ি ছেড়ে দিল।

রাজার প্রাসাদে পেঁছে যেই সে চৌকাঠে পা দিল অমনি রাজার মেয়ে ভাল হয়ে গেল।

রাজা খুব খুসি। আইভানকে কাছে ডেকে এনে তাকে রাজ-পোষাকে সাজাবার ব্যবস্থা করল।

"তুমি আমার জামাই হও", রাজা বলল।

"ঠিক আছে," আইভান বলল।

তখন আইভান রাজকুমারীকে বিয়ে করল। তার কিছু পরেই তার বাবা মারা গেল এবং আইভান রাজা হল। এই ভাবে তিনটি ভাইই রাজা হল।

॥ ৯ ॥

তিন ভাই বেঁচে-বর্তে থেকে রাজত্ব করতে লাগল। বড় ভাই সৈনিক সাইমনের অনেক উন্নতি হল। খড়ের সৈন্য ছাড়াও সে আরও আসল সৈন্য সংগ্রহ করল। সে রাজ্যময় ঘোষণা করে দিল, প্রতি দশটি বাড়ি থেকে একজন

করে সৈন্য পাঠাতে হবে, আর সে সৈন্য হবে দীর্ঘকায় এবং দেহে ও মুখে পরিচ্ছন্ন। এই রকম অনেক সৈন্য সংগ্রহ করে সে তাদের শিক্ষিত করে তুলল। কেউ তাকে বাধা দিলেই তৎক্ষণাৎ ওই সব সৈন্য পাঠিয়ে সে তাকে বশে আনতে লাগল। ফলে সকলেই তাকে ভয় করতে লাগল এবং বেশ আরামে তার জীবন কাটতে লাগল। যেদিকে সে চোখ ফেলবে, যা সে চাইবে, সবই তার হয়ে যাবে। যখন যা চাই তাই সে সৈন্য পাঠিয়ে নিয়ে আসতে লাগল।

শক্তিমান তরাসও আরামেই দিন কাটাতে লাগল। আইভানের কাছ থেকে পাওয়া টাকার অপচয় না করে সে বরং তাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলল। রাজ্যে আইন ও শৃংখলা প্রবর্তন করল। সব টাকা সে সিন্দুকে রেখে দিল। প্রজাদের উপর কর বসাল। মাথা-পিছু কর, হাঁটা ও গাড়ি চালানোর উপর কর, জুতো, মোজা ও পোষাকের লেসের উপর কর বসল। যা কিছু চাইছে সবই পাচ্ছে। টাকার জন্য সকলেই তাকে সব কিছু এনে দিচ্ছে। সকলেই তার কাজ করতে ইচ্ছুক, কারণ সকলেই চায় টাকা।

বোকা আইভানের অবস্থাও কিছু খারাপ নয়। শশুরকে কবর দেবার সংগে সংগেই সে সব রাজার পোষাক খুলে ফেলে সেগুলো স্ত্রীকে দিল বাক্সবন্দী করে রাখতে, আর পুনরায় শনের শার্ট, আঁটো পায়জামা ও চাষী-জুতো পরে সে কাজে লেগে গেল।

বলল, "বড়ই একঘেয়ে লাগছে। মোটা হয়ে যাচ্ছি, ঘুম কমে যাচ্ছে!" অতএব বাবা, মা ও বোবা বোনটাকে নিজের কাছে এনে সে আগের মতই কাজ করতে শুরু করল।

লোকে বলল, "কিন্তু তুমি যে রাজা।"

সে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু রাজাকেও তো খেতে হবে।"

একজন মন্ত্রী এসে বলল, "মাইনে দেবার মত টাকা নেই।"

সে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে কাউকে মাইনে দিও না।"

"তাহলে তো কেউ সেবা করবে না।"

"ঠিক আছে; কাউকে সেবা করতে হবে না। তাতে তারা কাজের জন্য আরও বেশী সময় পাবে; তারা গাড়িতে সার বোঝাই করুক। ঝাড়ুদারের কাজ তো অনেক করবার আছে।"

আইভানের কাছে লোকে বিচারের জন্য আসে। একজন বলল, "সে আমার টাকা চুরি করেছে।' আর আইভান বলল, 'ঠিক আছে; এতেই বোঝা যাচ্ছে তার টাকার দরকার ছিল।"

এই ভাবে সকলেই বুঝতে পারল যে, আইভান একটি বোকা লোক। তার স্ত্রী তাকে বলল, "লোকে বলে তুমি বোকা।"

"ঠিক আছে," আইভান বলল।

তার স্ত্রী ভাবল আর ভাবল ; কিন্তু সেও ছিল বোকা।

বলল, "আমি কি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যাব ? যেদিকে সূচ যায়, সুতোও সেই দিকেই যায়।"

কাজে কাজেই সেও রানীর পোষাক খুলে বাক্সবন্দী করে রাখল, আর বোবা মেয়েটির কাছ থেকে কাজ শিখতে লাগল। কাজ শিখে স্বামীকে সাহায্য করতে শুরু করে দিল।

ক্রমে সব জ্ঞানী লোকরা আইভানের রাজ্য ছেড়ে চলে গেল, রইল শুধু বোকারা।

তাদের কারোরই টাকা নেই। তারা বেঁচে-বর্তে থেকে কাজ করতে লাগল। নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করল; অন্যদেরও খাওয়াল।

॥ ১০ ॥

ক্ষুদে শয়তানদের কাছ থেকে তিন ভাইয়ের সর্বনাশের খবরের জন্য বুড়ো শয়তান অপেক্ষা করছে তো করছেই। কিন্তু কোন খবর এল না। সুতরাং সে নিজেই খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে তিন ক্ষুদে শয়তানের বদলে দেখতে পেল তিনটে গর্ত।

সে ভাবল, "নিশ্চয় ওরা কিছু করতে পারে নি। আমাকেই একটা কিছু করতে হবে।"

সুতরাং সে ভাইদের খোঁজে গেল। কিন্তু তারা তো আর আগের জায়গায় নেই। তিনটে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে সে তাদের দেখতে পেল। সকলেই বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছে। এতে বুড়ো শয়তান খুবই বিরক্ত হল।

বলল, "আচ্ছা, আমি নিজেই একাজে হাত লাগাব।"

প্রথমে সে গেল রাজা সাইমনের কাছে। নিজের চেহারায় না গিয়ে একজন সেনাপতির ছদ্মবেশ ধরে সে ঘোড়ায় চড়ে সাইমনের রাজপ্রাসাদে গেল।

বলল, "রাজা সাইমন, আমি শুনেছি আপনি একজন বড় যোদ্ধা ; তাই যেহেতু ও কাজটা আমি ভালই জানি তাই আমি আপনার সেবা করতে চাই।"

রাজা সাইমন তাকে নানা রকম প্রশ্ন করে যখন বুঝল যে লোকটি জ্ঞানী, তখন তাকে চাকরিতে নিল।

কি ভাবে একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হয় নতুন সেনাপতি

সে কথা রাজা সাইমনকে বোঝাতে লাগল।

বলল, "প্রথমে আমাদের আরও সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে কারণ আপনার রাজ্যে অনেক বেকার লোক আছে। সব যুবকদেরই আমরা সেনাদলে ভর্তি করব, কাউকে বাদ দেব না। তাহলে আগের চাইতে পাঁচগুণ বেশী সৈন্য আপনি পাবেন। দ্বিতীয়ত, নতুন বন্দুক ও কামান আমাদের অবশ্য যোগাড় করতে হবে। আমি এমন বন্দুক বানাব যা থেকে এক সংগে একশ' গুলি ছোঁড়া যাবে; গুলি মটরদানার মত ছুটবে। আর এমন কামান বানাব যাতে মানুষ, ঘোড়া, দেয়াল সব কিছু জ্বলবে। সে কামান সব কিছু পুড়িয়ে ফেলবে।"

রাজা সাইমন নতুন সেনাপতির কথা মন দিয়ে শুনল, বিনা ব্যতিক্রমে সব যুবককে সেনাদলে ভর্তি হবার হুকুম জারি করল, আর নতুন নতুন কারখানা খুলে প্রচুর পরিমাণে উন্নত ধরনের বন্দুক ও কামান তৈরি করে ফেলল। কাল বিলম্ব না করে সে একজন প্রতিবেশী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রতিপক্ষ বাহিনীর সম্মুখীন হয়েই রাজা সাইমন সৈন্যদের গুলিবর্ষণ করতে ও কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে আদেশ দিল। এক আঘাতেই শত্রুপক্ষের অর্ধেক সৈন্যকে সে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পঙ্গু করে দিল। প্রতিবেশী রাজা অত্যন্ত ভয় পেয়ে পরাজয় মেনে নিয়ে নিজের রাজ্য ছেড়ে দিল। রাজা সাইমনও খুসি হল।

বলল, "এবার আমি ভারতের রাজাকে জয় করব।"

কিন্তু ভারতের রাজা আগে থেকেই রাজা সাইমনের কথা শুনে তার সব নতুন আবিষ্কারই গ্রহণ করেছিল এবং নিজেও কিছু কিছু যোগ করেছিল। ভারতের রাজা শুধু সব যুবকই নয়, সব অবিবাহিতা যুবতীকেও সৈন্যদলে ভর্তি করে নিয়েছিল এবং রাজা সাইমনের সেনাদল থেকেও বড় সেনাদল গড়ে তুলেছিল। রাজা সাইমনের বন্দুক ও কামান নকল করা ছাড়াও সে আকাশ থেকে বিস্ফোরক বোমা ছুঁড়বার জন্য বাতাসে উড়বার একটা নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিল।

রাজা সাইমন ভারতীয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হল। সে আশা করেছিল অপর রাজার মতই তাকেও পরাজিত করতে পারবে; কিন্তু যে কাস্তে তখন এত ভাল কেটেছিল এখন তার ধার পড়ে গেছে। ভারতের রাজা সাইমনের বাহিনীকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই আসতে দিল না; সাইমনের বাহিনীর উপর আকাশ থেকে বিস্ফোরক বোমা ছুঁড়বার জন্য নারী-বাহিনীকে আকাশ পথে পাঠিয়ে দিল। তারাও আরসলার উপর বোরাক্সের মত সৈন্যদের উপর বোমাবর্ষণ করতে লাগল। সৈন্যরা পালিয়ে গেল, রাজা সাইমন একা পড়ে রইল। এই ভাবে ভারতের রাজা সাইমনের রাজ্য অধিকার করল আর

সাইমন যথাশক্তি দ্রুত পালিয়ে গেল।

ভাইকে শেষ করে বুড়ো শয়তান এবার রাজা তরাসের কাছে গেল। বণিকের ছদ্মবেশে সে তরাসের রাজ্যে বসবাস শুরু করল, একটা ব্যবসার পত্তন করল এবং যথেষ্ট টাকা খরচ করতে লাগল। সে সব জিনিসেরই চড়া দাম দিতে লাগল, আর টাকার জন্য সকলেই নতুন বণিকের কাছে ছুটতে লাগল। লোকের হাতে এত টাকা জমল যে তারা সব কর মিটিয়ে দিল এবং বকেয়া করও দিয়ে দিল। ফলে রাজা তরাসও খুসি হল।

সে ভাবল, "নতুন বণিককে ধন্যবাদ, আমি আগের থেকে অনেক বেশী টাকা পাব, এবং আরও আরামে থাকতে পারব।"

তখন রাজা তরাস নতুন পরিকল্পনা নিয়ে একটা নতুন প্রাসাদ গড়তে শুরু করল। সে সকলকে জানিয়ে দিল, তারা যেন তাকে কাঠ ও পাথর এনে দেয় এবং তার কাজ করতে আসে। সব কিছুর জন্যই সে বেশ চড়া দরও ঠিক করে দিল। রাজা তরাস ভেবেছিল, লোকরা আগের মতই দলে দলে কাজ করতে আসবে, কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল সব কাঠ আর পাথরই বণিকের বাড়িতে চলে যাচ্ছে, আর মজুররাও সব সেখানেই যাচ্ছে। রাজা তরাস দর বাড়িয়ে দিল, কিন্তু বণিক আরও বাড়িয়ে দিল। রাজা তরাসের অনেক টাকা ছিল বটে, কিন্তু বণিকের ছিল আরও বেশী; প্রতি পদেই সে রাজার চাইতে বেশী দর দিতে লাগল।

রাজার প্রাসাদ তৈরির কাজ থেমে গেল; বাড়ি উঠল না।

রাজা তরাস একটা বাগানের নক্সা করে হেমন্তকাল পড়তেই লোকদের ডেকে পাঠাল বাগানে গাছ পুঁতে দিতে, কিন্তু কেউ এল না। সব লোক বণিকের একটা পুকুর কাটতে ব্যস্ত। শীতকাল এল। রাজা তরাস একটা নতুন ওভারকোট বানাবার জন্য বেজির লোম কিনতে চাইল। সে লোক পাঠালে তারা ফিরে এসে জানাল, "কোন লোম পাওয়া গেল না। বণিক সব কিনে নিয়েছে। চড়া দাম দিয়ে কিনে সেই চামড়া দিয়ে সে কার্পেট তৈরি করছে।"

রাজা তরাস কয়েকটা ঘোড়া কিনতে চাইল। সেজন্য লোক পাঠালে তারা এসে জানাল, "বণিক সব ভাল ঘোড়া কিনে নিয়েছে; সেগুলো তার পুকুর ভর্তি করার জন্য জল বয়ে আনছে!"

রাজার সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। তার কাজ কেউ করতে চায় না, সকলেই বণিকের কাজে ব্যস্ত; বণিকের টাকায় কর শোধ করবার জন্যই শুধু তারা রাজার কাছে আসে।

এদিকে রাজার হাতে এত টাকা জমে গেল যে রাখবার জায়গা নেই; ফলে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। সব নতুন পরিকল্পনা বন্ধ করে দিয়ে সে এখন সাদাসিদে ভাবে বাস করতে পারলেই খুসি, কিন্তু তাও পারছে না।

সব কিছুতেই টান পড়তে লাগল। একে একে রাঁধুনি, কোচয়ান, চাকর সকলেই তাকে ছেড়ে বণিকের কাছে চলে যেতে লাগল। শীঘ্রই তার খাবারের অভাব দেখা দিল। বাজারে কোন জিনিস কিনতে পাঠালে কিছুই পাওয়া যায় না—বণিকই সব কিছু কিনে নিয়েছে। লোকরা রাজার কাছে আসে শুধু টাকা নিয়ে—কর দিতে।

রাজা রেগে গিয়ে বণিককে দেশ থেকে নির্বাসিত করল। কিন্তু বণিক সীমান্তের ওপারেই আস্তানা বানিয়ে আগের মতই চলতে লাগল। বণিকের টাকার জন্য লোকরা সব কিছুই রাজার বদলে তার কাছেই নিয়ে যেতে লাগল।

রাজার দুর্দশার সীমা নেই। দিনের পর দিন তার খাওয়া জুটছে না। এমন কি গুজব রটে গেল যে, বণিক গর্ব করে বলছে সে স্বয়ং রাজাকেই কিনে নেবে! রাজা তরাস ভয় পেয়ে গেল; কী যে করবে বুঝতে পারল না।

এই সময় সৈনিক সাইমন তার কাছে এসে বলল, "আমাকে সাহায্য কর, ভারতের রাজা আমাকে পরাজিত করেছে।"

কিন্তু রাজা তরাস নিজেই তখন বিপদে ডুবে আছে। সে বলল, "আজ দু'দিন আমার নিজেরই খাবার জোটে নি।"

॥ ১১ ॥

দুই ভাইকে শেষ করে বুড়ো শয়তান আইভানের কাছে গেল। একজন সেনাপতির ছদ্মবেশে আইভানের কাছে গিয়ে সে তাকে বোঝাতে লাগল যে তারও একটা সেনাদল থাকা উচিত।

সে বলল, "সৈন্যদল না থাকলে একজন রাজাকে মানায় না। আপনি শুধু হুকুম করুন, তাহলেই আপনার প্রজাদের ভিতর থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আমি একটি বাহিনী গড়ে তুলব।"

আইভান তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বলল, "ঠিক আছে, একটা সেনাদল গঠন করে তাদের ভাল গান গাইতে শেখাও। তাদের গান শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বুড়ো শয়তান তখন আইভানের রাজ্যময় সৈন্য সংগ্রহ করে বেড়াতে লাগল। সে তাদের বলল, সেখানে গিয়ে সৈন্যদলের তালিকায় নাম লেখালেই প্রত্যেকে তিন-পোয়া বোতল মদ ও একটা ভাল লাল টুপি পাবে।

শুনে সকলে হেসে উঠল।

বলল, "মদ আমাদের যথেষ্ট আছে। আমরা নিজেরাই তো বানাই।

আর টুপি, সেও মেয়েরাই সব রকম বানাতে পারে, এমন কি ডোরা-কাটা ঝোপ্পা দেওয়া টুপি পর্যন্ত।"

কাজেই কেউ নাম লেখাতে রাজী হল না।

বুড়ো শয়তান আইভানের কাছে এসে বলল: "তোমার ঐ বোকারা কেউ স্বেচ্ছায় নাম লেখাবে না। তাদের দিয়ে জোর করে নাম লেখাতে হবে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে; তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।"

তখন বুড়ো শয়তান প্রচার করে দিল—সকলকেই নাম লেখাতে হবে, আর যে অস্বীকার করবে আইভান তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

সকলে সেনাপতির কাছে এসে বলল, "তুমি বলছ আমরা যদি সৈন্য না হই তাহলে রাজা আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেবে, কিন্তু নাম লেখালে কি হবে তা তো তুমি বলছ না। আমরা শুনেছি যে সৈন্যরা মারা পড়ে।"

"হ্যাঁ, কখনও কখনও সে রকমটা ঘটে।"

এই কথা শুনে সকলে এক কাট্টা হয়ে গেল।

বলল, "আমরা যাব না। তার চাইতে বাড়িতে থেকে মরাই ভাল। যে ভাবেই হোক, মরতে তো আমাদের হবেই।"

বুড়ো শয়তান বলে উঠল, "বোকা! তোমরা সব বোকা! একজন সৈন্য মরতেও পারে, নাও মরতে পারে, কিন্তু তোমরা যদি না যাও তাহলে রাজা আইভান তোমাদের নির্ঘাৎ মেরে ফেলবেন।"

লোকগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোকা আইভানের কাছে গেল পরামর্শ করতে।

তারা বলল, "একজন সেনাপতি এসে বলছে, আমাদের সবাইকে সৈন্য হতে হবে। সে বলছে, 'তোমরা সৈন্য হয়ে গেলে মরতেও পার আবার না মরতেও পার, কিন্তু যদি না যাও তাহলে রাজা আইভান তোমাদের নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে।' এ কথা কি সত্যি?"

আইভান হেসে বলল, "আমি একা তোমাদের সকলকে মারব কেমন করে? আমি যদি বোকা না হতাম তাহলে ব্যাপারটা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারতাম; কিন্তু আমি তো নিজেই এটা বুঝতে পারি না।"

তারা বলল, "তাহলে আমরা সৈন্যদলে যাব না।"

সে বলল, "ঠিক আছে, যেয়ো না।"

সুতরাং সকলে সেনাপতির কাছে গিয়ে নাম লেখাতে আপত্তি জানাল। বুড়ো শয়তানও বুঝল যে এ খেলা চলবে না। সে তখন সেখান থেকে চলে গেল এবং আরসলা-দেশের রাজার সঙ্গে ভাব জমাল।

তাকে বলল, "আমরা যুদ্ধ করে রাজা আইভানের দেশকে জয় করে নেব।

সে দেশে টাকা নেই সত্য, কিন্তু আছে প্রচুর ফসল ও গবাদি পশু, আছে আর সব কিছু।"

কাজেই আরসলা-দেশের রাজা যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। বিরাট বাহিনী সাজিয়ে, কামান-বন্দুক নিয়ে সে সীমান্ত অভিমুখে অভিযান করল এবং আইভানের রাজ্যে প্রবেশ করল।

সব লোক আইভানের কাছে এসে বলল, "আরসলা-দেশের রাজা আসছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে, আসতে দাও।"

সীমান্ত পার হয়ে আরসলা-দেশের রাজা স্কাউটদের পাঠাল আইভানের সেনাদলকে দেখে আসতে। তারা অনেক খুঁজে খুঁজেও কোথাও কোন সেনাদল দেখতে পেল না! যদি কোথাও কোন সেনাদল এসে পড়ে সেই আশায় তারা অনেক অপেক্ষা করল, কিন্তু কোন সেনাদলেরই দেখা মিলল না, যুদ্ধ করবার মত কাউকে পাওয়া গেল না। আরসলা-দেশের রাজা তখন গ্রামগুলোকে অবরোধ করতে সৈন্যদের পাঠিয়ে দিল। সৈন্যরা একটা গ্রামে ঢুকতেই মেয়ে-পুরুষ সব লোক ছুটে বেরিয়ে এসে সৈন্যদের দেখে বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সৈন্যরা তাদের ফসল ও গবাদি পশু নিয়ে নিতে শুরু করল; আর লোকরাও তাতেই সায় দিল, কোন রকম বাধা দিল না। সৈন্যরা আরেকটা গ্রামে গেল। সেখানেও ঐ একই জিনিস ঘটল। সারাটা দিন সৈন্যরা এগিয়ে চলল, দ্বিতীয় দিনও কেটে গেল; সর্বত্র সেই একই জিনিস ঘটল। লোকরা তাদের সব কিছু দিয়ে দিল, কেউ বাধা দিল না। শুধু সৈন্যদের তাদের সঙ্গে থাকতে আমন্ত্রণ জানাল।

তারা বলল, "আহা বেচারিরা, নিজেদের দেশে তোমাদের জীবন যদি এতই কষ্টের তাহলে সকলে এসে চিরদিনের মত আমাদের সঙ্গে থাক না কেন?"

সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে এগিয়ে চলল: কোথাও কোন সৈন্য নেই; লোকজন আছে, নিজেরা খাচ্ছে ও অপরকে খাওয়াচ্ছে; কেউ বাধা দিচ্ছে না, বরং সকলেই সৈনিকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাদের সঙ্গে থেকে যেতে, বসবাস করতে। এ কাজ সৈন্যদের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠল। তারা আরসলা-দেশের রাজার কাছে এসে বলল, "এখানে আমরা যুদ্ধ করতে পারছি না, আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে চলুন। যুদ্ধ তো ভাল, কিন্তু এ কী হচ্ছে? এ যেন মটরের ঝোল কেটে খাওয়া। এখানে আমরা আর যুদ্ধ করব না।"

আরসলা-দেশের রাজা খুব রেগে গেল; সৈন্যদের হুকুম দিল: সারাটা রাজ্য চষে ফেল, গ্রামগুলো ধ্বংস কর, ফসল ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দাও, গবাদি

পশুকে হত্যা কর। আর আমার হুকুম যদি না মান, তাহলে তোমাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হবে।

সৈন্যরা ভয় পেয়ে রাজার হুকুমমাফিক কাজ করতে লাগল। তারা বাড়ি-ঘর ও ফসল জ্বালিয়ে দিল, গবাদি পশু হত্যা করল। কিন্তু বোকা লোকগুলো তথাপি বাধা দিল না, শুধু কাঁদতে লাগল। বুড়োরা কাঁদল, বুড়িরা কাঁদল, যুবক-যুবতীরাও কাঁদল।

তারা বলল, "তোমরা আমাদের ক্ষতি করছ কেন? ভাল জিনিসগুলো তোমরা নষ্ট করছ কেন? ওগুলো যদি তোমাদের কাজে লাগে তাহলে নিজেরা নিয়ে নিচ্ছ না কেন?"

শেষ পর্যন্ত সৈন্যরাও এ অবস্থাটা সহ্য করতে পারল না। তারা আরও অগ্রসর হতে অস্বীকার করল; সৈন্যরা দল ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গেল।

॥ ১২ ॥

বুড়ো শয়তান আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল। সৈন্যদের সাহায্য নিয়েও সে আইভানের সঙ্গে পেরে উঠল না। কাজেই একজন চমৎকার ভদ্রলোক সেজে সে আইভানের রাজ্যে বাস করতে শুরু করল। তরাসের মত আইভানকেও সে টাকা দিয়ে জয় করতে চাইল।

বলল, "আমি আপনার কিছু উপকার করতে চাই, আপনাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি জোগাতে চাই। আপনার রাজ্যে একটি বাড়ি তৈরি করে আমি ব্যবসা গড়ে তুলব।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে; আপনার ইচ্ছা হলে আমাদের মধ্যে এসে বাস করুন।"

পরদিন সকালে সুন্দর ভদ্রলোকটি একটা বড় বস্তা-বোঝাই সোনা ও এক তা কাগজ নিয়ে পাবলিক স্কোয়ারে গিয়ে বলল, "তোমরা সকলেই শুয়োরের মত বেঁচে আছ। কি করে ভালভাবে বাঁচতে হয় সেটা আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব। এই নক্সা অনুযায়ী আমাকে একটা বাড়ি তৈরি করে দাও। আমার নির্দেশ মত তোমরা কাজ করবে, আমি তোমাদের স্বর্ণ মুদ্রায় মজুরি দেব।" থলির সব সোনা সে তাদের দেখাল।

বোকারা সব অবাক হয়ে গেল; তাদের মধ্যে সোনার কোন প্রচলন ছিল না; তারা জিনিস-বিনিময় করত, এবং কাউকে মূল্য দিতে হলে শ্রমের দ্বারা দিত। অবাক হয়ে তারা স্বর্ণ মুদ্রাগুলি দেখতে লাগল।

বলল, "কী সুন্দর ছোট ছোট জিনিস!"

তারপর থেকে তাদের জিনিসপত্র ও শ্রমের বদলে তারা ভদ্রলোকের কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা নিতে লাগল। তরাসের রাজ্যের মত এখানেও বুড়ো শয়তান দরাজ হাতে সোনা বিলোতে লাগল, আর সব লোক সোনার বদলে তাকে সব জিনিস দিতে লাগল, তার সব কাজ করে দিতে লাগল।

বুড়ো শয়তান তো মহাখুসি; নিজের মনে সে ভাবল, "এইবার ঠিক পথ ধরেছি। তরাসের মত এবার এই বোকাটারও সর্বনাশ করব; তার দেহ-মন সব কিনে নেব।"

কিন্তু বোকারা সব করল কি—সেই সব স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে মেয়েদের গলার হারে পরতে দিল। মেয়েরা সেগুলি বেণীতে ঝুলিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা সেগুলি নিয়ে পথে খেলা করতে লাগল। সকলেরই প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা জমে গেল; তারা সেগুলি নেওয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু সুন্দর ভদ্রলোকের বাড়ি তখনও অর্ধেকও হয় নি; সারা বছরের মত ফসল ও গবাদি পশুরও ব্যবস্থা করা হয় নি। কাজেই সে প্রচার করে দিল যে সে চায় সব লোক এসে তার কাজ করে দিক, গবাদি পশু ও ফসল জমা করে দিক; প্রতিটি জিনিস ও প্রতিটি কাজের জন্য সে আরও অনেক স্বর্ণ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু কেউ কাজ করতে এল না; কোন জিনিসও এল না। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটি ছেলে বা মেয়ে হয় তো স্বর্ণমুদ্রার বদলে একটি ডিম দিয়ে যায়; তার কেউ আসে না, ফলে তার খাওয়াও জোটে না। ক্ষুধায় কাতর হয়ে সুন্দর ভদ্রলোকটি গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ল; দেখা যাক কিছু খাবার কিনতে পারা যায় কি না। এক বাড়িতে ঢুকে একটা মোরগের বদলে সে একটা স্বর্ণ মুদ্রা দিতে চাইল, কিন্তু বাড়ির গৃহিণী তা নিতে চাইল না।

বলল, "ও আমার অনেক আছে।"

একটি বিধবার বাড়ি গিয়ে একটা হেরিং-মাছ কেনার জন্য সে একটি স্বর্ণ-মুদ্রা দিতে চাইল।

সে বলল, "দেখুন মশাই, ওটা আমি চাই না। আমার তো কোন ছেলে-মেয়ে নেই যে ওটা নিয়ে খেলা করবে। সৌখীন জিনিস হিসাবে ও রকম তিনটে মুদ্রা আমার বাড়িতেই রেখে দিয়েছি।"

একজন চাষীর কাছ থেকে রুটি কিনতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেও টাকা নিতে চাইল না। বলল, "ওটার কোন দরকার নেই; তবে আপনি যদি 'খৃস্টের নামে' ভিক্ষা চান তো একটু সবুর করুন, আমি গিন্নিকে বলছি আপনাকে এক টুকরো রুটি কেটে দেবে।"

সে কথা শুনে শয়তানটা থুথু ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। খৃস্টের নামে কোন কিছু পাওয়া তো দূরের কথা, খৃস্টের নাম উচ্চারণ শুনলেই তার

বুকের মধ্যে যেন ছুরি বসে যায়।

এইভাবে কোন রুটিই সে পেল না। প্রত্যেকেরই সোনা আছে, তাই বুড়ো শয়তান যেখানেই যায় টাকার বদলে কেউ তাকে কিছু দিতে চায় না; সকলেই বলে, "হয় অন্য কিছু নিয়ে এস, নয় তো এসে কাজ কর, আর না হয় তো খৃস্টের নামে কিছু ভিক্ষা চাও।"

কিন্তু শয়তানের তো টাকা ছাড়া আর কিছু নেই; কাজ করবার ইচ্ছাও তার নেই; আর "খৃস্টের নামে" কোন কিছু তো সে নিতেই পারে না। বুড়ো শয়তান ভয়ানক রেগে গেল।

বলল, "আমি তো তোমাদের টাকা দিচ্ছি, এর বেশী তোমরা কি চাও? সোনা দিয়ে তোমরা সব কিছু কিনতে পার, যে কোন মজুরকে খাটাতে পার।" কিন্তু বোকারা কেউ তার কথায় কান দিল না।

তারা বলল, "না, আমরা টাকা চাই না। আমাদের কাউকে টাকা দিতে হয় না, আমাদের কোন কর নেই, কাজেই টাকা দিয়ে আমরা কি করব?"

বুড়ো শয়তান না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

বোকা আইভানকে সব কথা বলা হল। সকলে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কি করব? একজন ভাল ভদ্রলোক এসেছে; সে ভাল খেতে-পড়তে চায়, কিন্তু কাজ করতে চায় না, 'খৃস্টের নামে' ভিক্ষাও করে না, শুধু সকলকে স্বর্ণমুদ্রা দিতে চায়। প্রথম প্রথম সে যা চেয়েছে লোকে তাই দিয়েছে; কিন্তু এখন সকলের হাতের প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা জমে গেছে, এখন আর কেউ তাকে কিছু দেয় না। তাকে নিয়ে কি করা যায়? অচিরেই সে যে না খেয়ে মারা যাবে।"

আইভান মন দিয়ে শুনল।

বলল, "ঠিক আছে, আমরাই তাকে খাওয়াব। মেষপালকদের মত সেও পালা করে এক-এক জনের বাড়িতে থাকুক।"

কোন উপায় নেই: বুড়ো শয়তানকে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতেই হল।

যথাসময়ে আইভানের বাড়িতে যাবার পালা এল। বুড়ো শয়তান খেতে এল; বোবা মেয়েটিও খাবার তৈরি করে চলেছে।

এর আগে আলসে লোকগুলো তাকে অনেক ঠকিয়েছে; নিজেদের ভাগের কাজ শেষ না করেই আগেভাগে এসে সবটা 'পরিজ' খেয়ে গেছে; তাই সে এখন হাত দেখে ফাঁকিবাজদের ধরে ফেলতে শিখেছে। যাদের হাতে কড়া পড়ে তাদের সে টেবিলে বসতে দেয়, আর বাকিদের খেতে দেয় উচ্ছিষ্ট এঁটো-কাঁটা।

বুড়ো শয়তান টেবিলে বসতেই বোবা মেয়েটি তার হাত দুটো তুলে ধরে ভাল করে দেখল—হাতের কোন জায়গাই শক্ত নয়: দুটি হাতই পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন, তাতে লম্বা নখ। বোবা মেয়েটি ধমক দিয়ে শয়তানটাকে টেবিল থেকে তুলে দিল। তখন আইভানের স্ত্রী তাকে বলল, "সুন্দর ভদ্রলোক, আপনি রাগ করবেন না। হাতে কড়া না থাকলে আমার ননদিনী তাকে টেবিলে বসতে দেয় না। একটু অপেক্ষা করুন, সকলের খাওয়া হয়ে গেলে যা পড়ে থাকবে সেটা আপনি পাবেন।"

রাজার বাড়িতে তাকে শুয়োরের মত খেতে দেওয়া হবে দেখে বুড়ো শয়তান খুব অসন্তুষ্ট হল। সে আইভানকে বলল, "প্রত্যেককেই নিজের হাতে কাজ করতে হবে, আপনার রাজ্যের এই আইন খুবই অর্থহীন। আপনার বোকামিই এর আবিষ্কর্তা। মানুষ কি শুধু তার হাত দিয়েই কাজ করে? জ্ঞানী মানুষরা কি দিয়ে কাজ করে বলুন তো?"

আইভান বলল, "আমরা বোকা মানুষ তা কেমন করে জানব? আমরা তো অধিকাংশ কাজই হাত ও পিঠ দিয়েই করে থাকি।"

"তার কারণ আপনারা বোকা। আমি আপনাদের শিখিয়ে দেব কেমন করে মাথা দিয়ে কাজ করতে হয়। তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে হাত দিয়ে কাজ করার চাইতে মাথা দিয়ে কাজ করা অনেক বেশী লাভজনক।"

আইভান অবাক হল।

বলল, "তাই যদি হয় তাহলে তো আমাদের বোকা বলার কিছুটা অর্থ আছেই।"

তখন বুড়ো শয়তান বলতে লাগল, "তবে মাথা দিয়ে কাজ করাটা সহজ নয়। আমার হাতে কোন শক্ত জায়গা নেই বলে আপনারা আমাকে কিছুই খেতে দেন নি, কিন্তু আপনারা জানেন না যে মাথা দিয়ে কাজ করা আরও শতগুণ বেশী শক্ত। অনেক সময় মাথাটা যেন ভেঙে পড়তে চায়।"

আইভান বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

"বন্ধু, তাহলে নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? মাথাটা ভেঙে পড়া কি আরামের ব্যাপার? হাত আর পিঠ দিয়ে সহজভাবে কাজ করাই কি তার চাইতে ভাল নয়?"

কিন্তু শয়তান বলল, "আপনাদের মত বোকাদের জন্যই এ কাজ আমি করি। আমি যদি নিজেকে কষ্ট না দেই তাহলে যে আপনারা চিরকালই বোকা থেকে যাবেন। কিন্তু আমি মাথা দিয়ে কাজ করেছি বলেই আজ আপনাদের শেখাতে পারছি।"

আইভান বিস্মিত হল।

বলল, "আমাদের শিখিয়ে দিন! যাতে আমাদের হাতে খিল ধরলে আমরা কিছু সময়ের জন্য মাথাটা ব্যবহার করতে পারি।"

তখন শয়তান কথা দিল, সে সকলকেই শিখিয়ে দেবে। কাজেই আইভান

রাজ্যময় ঘোষণা করে দিল: একজন ভাল ভদ্রলোক এসেছেন; মাথা দিয়ে কেমন করে কাজ করতে হয় তা তিনি সকলকে শিখিয়ে দেবেন; হাতের চাইতে মাথা দিয়ে অনেক বেশী কাজ করা যায়; এবং সকলেরই এগিয়ে এসে সে সব শিখে নেওয়া উচিত।

এখন আইভানের রাজ্যে একটা খুব উঁচু দুর্গ ছিল; অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে তার মাথায় উঠতে হয়; দুর্গের চূড়ায় ছিল একটা লণ্ঠন। সকলেই যাতে দেখতে পায় সে জন্য আইভান ভদ্রলোকটিকে সেখানে নিয়ে গেল।

কাজেই দুর্গের চূড়ায় উঠে ভদ্রলোক কথা বলতে শুরু করল, আর তাকে দেখবার জন্য লোক এসে ভিড় করল। তারা ভেবেছিল, হাতের বদলে কেমন করে মাথা দিয়ে কাজ করা যায় সত্যি সত্যি সেটাই সে তাদের দেখাবে। কিন্তু বুড়ো শয়তান কথার জাল বুনে তাদের শুধু বোঝাতে লাগল কাজ না করে কি করে বেঁচে থাকা যায়। লোকদের মাথায় কিছুই ঢুকল না। হাঁ করে তাকিয়ে তারা অনেকক্ষণ ভাবল; তারপর যার যার কাজে চলে গেল।

বুড়ো শয়তান সারাটা দিন দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে রইল; দ্বিতীয় দিনও সেই ভাবে কেটে গেল; সারাক্ষণ সে শুধু কথাই বলল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তার ক্ষিধে পেয়ে গেল, কিন্তু দুর্গের মাথায় তাকে খাবার পেঁছে দেবার কথা বোকা লোকদের মনেই এল না। তারা ভাবল, সে যখন হাতের চাইতে মাথা দিয়েই ভালভাবে কাজ করতে পারে, তখন সে সহজেই রুটির ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

বুড়ো শয়তান শুধু কথা বলে বলেই আরও একটা দিন সেই দুর্গের চূড়ায় কাটিয়ে দিল। লোকজনরা কাছে এসে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল, তারপর চলে গেল।

আইভান জিজ্ঞাসা করল, "ভদ্রলোক কি মাথা দিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে?"

তারা বলল, "এখনও করে নি; এখনও কথার ঝর্ণাই বইয়ে চলেছে।"

বুড়ো শয়তান আরও একটা দিন দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমেই সে এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে টলতে টলতে পড়ে গিয়ে লণ্ঠনের একটা থামে তার মাথায় আঘাত লাগল। একজন সেটা দেখতে পেয়ে আইভানের স্ত্রীকে বলল, আর সে দৌড়ে তার স্বামীর কাছে মাঠে চলে গেল।

বলল, "দেখবে এস। ওরা বলছে, ভদ্রলোকটি মাথা দিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে।"

আইভান অবাক হয়ে গেল।

"সত্যি নাকি?" বলেই সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দুর্গের দিকে ছুটল।

যতক্ষণে সে দুর্গে পেঁছিল ততক্ষণে বুড়ো শয়তান ক্ষিধেয় আরও ক্লান্ত হয়ে অনবরত টলে পড়ছে আর থামের গায়ে তার মাথাটা ঠুকে যাচ্ছে। আর ঠিক যে মুহূর্তে আইভান দুর্গের কাছে পেঁছে গেল তখন শয়তানটা টলতে টলতে পড়ে গেল এবং সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে ধপ্-ধপ্ করে ঠোক্কর খেতে খেতে ও মাথা ঠুকে ঠুকে প্রতিটি ধাপ গুণতে গুণতে সিঁড়ির একেবারে নীচে গিয়ে পড়ল।

আইভান বলল, "আরে! ভাল ভদ্রলোক তো ঠিকই বলেছিল যে 'অনেক সময় মাথাটা একেবারে ভেঙে যায়।' এতো দেখছি ছুঁড়ে যাওয়ার চাইতেও খারাপ; এ ধরনের কাজের পরে তো মাথাটা ফুলে উঠবেই।"

বুড়ো শয়তান সিঁড়ির নীচে গড়িয়ে পড়তেই মাটিতে তার মাথাটা ঠুকে গেল। সে কতটা কাজ করেছে দেখবার জন্য আইভান তার কাছে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই—হঠাৎ মাটি ফাঁক হয়ে গেল আর বুড়ো শয়তান তার ভিতর সেঁধিয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা গর্ত।

আইভান মাথা চুলকোতে লাগল।

বলল, "কী সব বাজে ব্যাপার। এও নির্ঘাৎ আর একটা শয়তান! কী লাফ দিল! এটা নিশ্চয় সেগুলোর বাপ!"

আইভান এখনও বেঁচে আছে। সকলেই তার রাজ্যে গিয়ে ভিড় করেছে। তার নিজের ভাইরাও এসে তার সঙ্গেই বাস করছে, আর সে তাদেরও খাওয়াচ্ছে। যে কেউ এসে বলে, "আমাকে খেতে দাও!" তাকেই আইভান বলে, "ঠিক আছে। আমাদের সঙ্গে থাক; সব কিছুই প্রচুর পরিমাণে আমাদের আছে।"

শুধু তার রাজ্যে একটি বিশেষ প্রথা আছে: যাদের হাতে কড়া আছে তারা টেবিলে বসবে, আর যাদের নেই তারা অন্যরা যা ফেলে যায় তাই খাবে।

১৮৮৫

বড়র চাইতে ছোটর বুদ্ধি বেশী

Little girls wiser than men

ইস্টারের গোড়ার দিক। স্লেজ চালানোর মরশুম সবে শেষ হয়েছে। উঠোনে তখনও বরফ জমে আছে; কিন্তু গ্রামের রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

দুটো আলাদা বাড়ির দুটি ছোট মেয়ের সঙ্গে গলিতে দেখা হয়ে গেল।

গোলাবাড়িগুলো থেকে বয়ে আসা নোংরা জল পড়ে গলিটায় একটা বড় ডোবার মত হয়েছে। একটি মেয়ে খুবই ছোট, অপরটি একটু বড়। মেয়েরা দুজনকেই নতুন ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে। ছোটটি পরেছে নীল ফ্রক, বড়টি পরেছে হলুদ ছাপা ফ্রক; দুজনেরই মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। গির্জা থেকে ফিরবার পথে এইমাত্র তাদের দেখা হয়েছে। প্রথমেই দু'জন দুজনকে নতুন জামা দেখাল; তারপর খেলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই তাদের জলে নামবার সখ হল। ছোটটি জুতো-জামা সমেতই ডোবার মধ্যে নামতে যাচ্ছিল, বড়টি তাকে বাঁধা দিল।

বলল, "ওখানে যেয়ো না মলাশা, তোমার মা বকবে। আমার জুতো-মোজা খুলে ফেলছি, তুমিও জুতো-মোজা খুলে ফেল।"

দুজনে তাই করল; তারপর স্কার্টের কোণা তুলে ধরে ডোবার ভিতর দিয়ে পরস্পরের দিকে এগোতে লাগল। জলে মলাশা-র গোড়ালি ভিজে গেল। সে বলে উঠল :

"অনেক জল অকুল্যা, আমার ভয় করছে।"

অপরটি জবাব দিল, "চলে এস। কোন ভয় নেই। জল ওর বেশী উঠবে না।"

দুজনে কাছাকাছি হলে অকুল্যা বলল, "দেখ মলাশা, জল ছিটিও না। সাবধানে হাঁটো।"

বলতে না বলতেই মলাশা ধপ করে পড়ে গেল, আর জল ছিটকে উঠে অকুল্যার ফ্রক ভিজিয়ে দিল। শুধু ফ্রক না, জল ছিটকে অকুল্যার নাকে-চোখেও লাগল। ফ্রকে দাগ লেগেছে দেখে অকুল্যা রেগে মলাশাকে মারতে ছুটল। ওদিকে মলাশাও ভয় পেয়ে বাড়িতে পালিয়ে যাবার জন্য ডোবার ভিতর দিয়েই ছুটতে লাগল। ঠিক সেই সময় অকুল্যা-র মা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। মেয়ের স্কার্টে কাদা লেগেছে, আস্তিন নোংরা হয়েছে দেখে মা বলে উঠল, "এই যে দুষ্টু মেয়ে, কি করছিলে?"

"মলাশা ইচ্ছে করে করেছে," মেয়েটি জবাব দিল।

এ-কথা শুনে অকুল্যার মা মলাশাকে ধরে তার গর্দানের উপর আঘাত করল। মলাশা এমনভাবে চেঁচাতে লাগল যে সারা পথের লোক তা শুনতে পেল। তার মাও বেরিয়ে এল।

"আমার মেয়েকে ঠেঙাচ্ছ কেন?" বলেই সে প্রতিবেশিনীকে বকতে শুরু করল। এক কথা দুই কথায় দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। পুরুষরা সব বেরিয়ে এল; পথে লোক জমে গেল; সকলেই চীৎকার শুরু করে দিল; কেউ আরও কথায় কান দিল না। সকলেই ঝগড়ায় মেতে উঠল; একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিল; তাই নিয়ে হাতাহাতি

মারামারি হবার যোগাড়, এমন সময় অকুল্যার বুড়ি ঠাকুরমা মাঝখানে পড়ে তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করল।

"তোমরা সব ভেবেছ কি? এ রকম ব্যবহার করা কি উচিত? আর আজকের মত দিনে! এখন তো আনন্দ করবার সময়, এ রকম বোকামি করার সময় নয়।"

বুড়ির কথায় কেউ কান দিল না। তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় আর কি। আর অকুল্যা ও মলাশা না থাকলে সে বুড়ি কিছুতেই লোকগুলোকে শান্ত করতে পারত না। মেয়েরা যখন খিস্তি-খেউড় করছিল তখন অকুল্যা ফ্রকের কাদা মুছে ফেলে আবার ডোবায় নেমে গেল। একটা পাথর তুলে নিয়ে সে এমনভাবে একটা নালি কেটে দিল যাতে ডোবার জমা জলটা বেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারে। তা দেখে মলাশাও একটুকরো কাঠ হাতে নিয়ে নালি কাটতে অকুল্যাকে সাহায্য করতে লাগল। লোকগুলোর মধ্যে ঝগড়া বাধবার উপক্রম হতেই মেয়েদের কাটা নালি দিয়ে জলের স্রোত গিয়ে বড় রাস্তায় ঠিক সেইখানে পড়তে লাগল যেখানে বুড়িটি লোকগুলোকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল। জলের স্রোতের দুদিক ধরে দৌড়তে দৌড়তে মেয়ে দুটিও সেখানে গিয়ে হাজির হল।

"ওটাকে ধর মলাশা! ওটাকে ধর!" অকুল্যা চেঁচিয়ে বলল; হাসির দমকে মলাশা কথাই বলতে পারল না।

কাঠের টুকরোটাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে জলের স্রোতে ভেসে চলেছে দেখে মেয়ে দুটি মহা আনন্দে দৌড়তে দৌড়তে একেবারে লোকগুলির জটলার মধ্যে গিয়ে হাজির হল। তাদের দেখতে পেয়ে বুড়ি লোকগুলোকে ডেকে বলল:

"তোমাদের লজ্জা করে না? মেয়ে দুটো সব ভুলে গিয়ে আবার মনের সুখে খেলা করছে, আর তোমরা তাদের হয়ে লড়াই শুরু করেছ? ছোট্ট সোনারা আমার। ওরা তো তোমাদের চাইতে বেশী বুদ্ধি রাখে!"

ছোট মেয়ে দুটিকে দেখে সকলেই লজ্জা পেল; সকলেই হাসতে হাসতে যার যার বাড়ি চলে গেল।

"তোমাদের যদি পরিবর্তন না হয়, তোমরা যদি ছোট শিশুদের মত না হতে পার, তাহলে কোন ক্রমেই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।"

১৮৮৫

ইলিয়াস

Elias

উফা প্রদেশে ইলিয়াস নামে একজন বাস্‌কির বাস করত।

ইলিয়াসের বিয়ের এক বছর পরে যখন তার বাবা মারা গেল তখন সে না ধনী, না দরিদ্র। সাতটা ঘোটকী, দুটো গরু আর কুড়িটা ভেড়া—এই তার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি। কিন্তু ইলিয়াসের সুব্যবস্থায় তার সম্পত্তি কিছু কিছু করে বাড়তে লাগল। সে আর তার স্ত্রী সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠে আর সকলের পরে ঘুমুতে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে। ফলে প্রতি বছরই তার অবস্থার উন্নতি হতে লাগল।

এইভাবে পঁয়ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে সে প্রচুর সম্পত্তি করে ফেলল। তখন তার দুশ' ঘোড়া, দেড়শ' গরু-মোষ, আর বারোশ' ভেড়া। ভাড়াটে মজুরেরা তার গরু-ঘোড়ার দেখাশোনা করে, ভাড়াটে মজুরনীরা দুধ দোয়, কুমিস, মাখন আর পনীর তৈরি করে। মোট কথা, ইলিয়াসের তখন খুব বোল-বোলাও, আশেপাশের সকলেই তাকে ঈর্ষা করে। বলে: "ইলিয়াস তো ভাগ্যবান পুরুষ; কোন কিছুরই অভাব নেই; ওর তো মরবারই দরকার নেই।"

ক্রমে ভাল ভাল লোকের সংগে তার পরিচয় হতে লাগল। দূর দূরান্তর থেকে অতিথিরা তার সংগে দেখা করতে আসে। সকলকেই স্বাগত জানিয়ে সে তাদের ভোজ্য পানীয় দিয়ে সেবা করে। যে যখনই আসুক, কুমিস, চা, সরবত আর মাংস সব সময়েই হাজির। অতিথি এলেই একটা বা দুটো ভেড়া মারা হয়; সংখ্যায় বেশি হলে ঘোটকীও মারা হয়।

ইলিয়াসের দুই ছেলে, এক মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ইলিয়াস যখন গরিব ছিল, ছেলেরা তার সংগে কাজ করত; গরু-ভেড়া চরাত। কিন্তু বড়লোক হবার পরে তারা আয়েসী হয়ে উঠল। একজন তো মদই খেতে শুরু করল। বড়টি এক মারামারিতে পড়ে মারা গেল। ছোটটি এমন এক ঝগড়াটে বউ বিয়ে করল যে তারা বাপের আদেশই অমান্য করতে শুরু করল। ফলে ইলিয়াসের বাড়ি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল।

ইলিয়াস তাকে একটা বাড়ি দিল, কিছু গরু-ঘোড়াও দিল। ফলে ইলিয়াসের সম্পত্তিতে টান পড়ল। তারপরেই ইলিয়াসের ভেড়ার পালে মড়ক লেগে অনেকগুলো মরে গেল। তার পরের বছর দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। খড় পাওয়া গেল না একেবারে। ফলে সে-বছর শীতকালে অনেক গরু মোষ না খেয়ে মরল। তারপর 'কিরঘিজ'রা তার সবচাইতে ভাল ঘোড়াগুলো চুরি করে নিয়ে গেল। ইলিয়াসের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। যত তার অবস্থা পড়তে লাগল, ততই তার শরীরের জোরও কমতে লাগল। এমনি করে সত্তর

বছর বয়সে ইলিয়াস বাধ্য হয়ে তার পশমের কোট, কম্বল, ঘোড়ার জিন, তাঁবু এবং সবশেষে গৃহপালিত পশুগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে দুর্দশার একেবারে চরমে নেমে গেল! আসল অবস্থা বুঝে উঠবার আগেই সে একেবারে সর্বহারা হয়ে পড়ল। ফলে বৃদ্ধ বয়সে স্বামী-স্ত্রীকে অজানা লোকের বাড়িতে বাস করে. তাদের কাজ করে খেতে হত। সম্বলের মধ্যে রইল শুধু কাঁধে একটা বোঁচকা—তাতে ছিল একটা লোমের তৈরি কোট, টুপি, জুতো আর বুট, আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী শাম-শেমাগি। বিতাড়িত পুত্র অনেক দূর দেশে চলে গেছে, মেয়েটিও মারা গেছে। বৃদ্ধ দম্পতিকে সাহায্য করবার এখন কেউ নেই।

মহম্মদ শা নামে এক প্রতিবেশীর করুণা হল বুড়ো-বুড়ির জন্য। সে নিজে ধনীও নয়, গরীবও নয়, তবে থাকত সুখে, আর লোকও ভাল। ইলিয়াসের অতিথি-বৎসলতার কথা স্মরণ করে তার খুব দুঃখ হল। বলল:

"ইলিয়াস, তুমি আমার বাড়ি এসে আমার সঙ্গে থাক। বুড়িকেও নিয়ে এস! যতটা ক্ষমতায় কুলোয় গ্রীষ্মে আমার তরমুজের ক্ষেতে কাজ করবে আর শীতকালে গরু-ঘোড়াগুলোকে খাওয়াবে। শাম-শেমাগিও ঘোটকী-গুলোকে দুইতে পারবে, কুমিস তৈরী করতে পারবে। আমি তোমাদের দুজনেরই খাওয়া-পরা দেব। এছাড়া যদি কখনও কিছু লাগে, বলবে, তাও দেব।"

ইলিয়াস প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ দিল। সে আর তার স্ত্রী মহম্মদ শার বাড়িতে ভাড়াটে মজুরের মত কাজ করে খেতে লাগল। প্রথমে বেশ কষ্ট হত, কিন্তু ক্রমে সব সয়ে গেল। যতটা পারত কাজ করত আর থাকত।

বুড়ো-বুড়িকে রেখে মহম্মদ শারও লাভই হল, কারণ নিজেরা একদিন মনিব ছিল বলে সব কাজই তারা ভালভাবে করতে পারত। তাছাড়া তারা অলস নয়, সাধ্যমত কাজকর্ম করত। তবু এই সম্পন্ন মানুষ দুটির দুরবস্থা দেখে মহম্মদ শার দুঃখ হত।

একদিন মহম্মদ শার একদল আত্মীয় অনেক দূর থেকে এসে তার বাড়িতে অতিথি হল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মোল্লা। মহম্মদ শা ইলিয়াসকে একটা ভেড়া এনে মারতে বলল। ইলিয়াস তার চামড়া ছাড়িয়ে. সেদ্ধ করে অতিথিদের কাছে পাঠিয়ে দিল। অতিথিরা খাওয়া-দাওয়া করল, চা খেল, তারপর কুমিস-এ হাত দিল। মেঝেয় কম্বলের উপরে পাতা কুশনে গৃহস্বামীর সঙ্গে বসে অতিথিরা বাটি থেকে কুমিস পান করতে করতে গল্প করছিল। এমন সময় কাজ শেষ করে ইলিয়াস দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে মহম্মদ শা অতিথিদের বলল:

"দরজার পাশ দিয়ে যে বুড়ো মানুষটি চলে গেল তাকে আপনারা লক্ষ্য

করেছেন কি ?"

একজন বলল, "আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু ওর মধ্যে বিশেষ করে দেখবার কিছু আছে নাকি ?"

"বিশেষত্ব এই যে, এক সময় সে এ তল্লাটের সবচেয়ে ধনী ছিল। নাম ইলিয়াস। নামটা আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন।"

অতিথি বলল, "নিশ্চয়! না শোনবার জো কী? লোকটিকে কখনও চোখে দেখি নি, কিন্তু তার সুনাম ছড়িয়েছিল বহুদূর।"

"অথচ আজ তার কিছু নেই। আমার কাছে মজুরের মত থাকে, আর তার স্ত্রী আমার ঘোটকীদের দুধ দোয়।"

অতিথি সবিস্ময়ে জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করল। ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, "সত্যি, ভাগ্য যেন চাকার মত ঘোরে; একজন উপরে ওঠে তো আর একজন তলায় পড়ে যায়। আহা, বলুন তো, বুড়ো লোকটা এখন নিশ্চয়ই খুব বিষণ্ন ?"

"কী জানি, খুব চুপচাপ আর শান্ত হয়ে থাকে। কাজও করে ভাল।"

অতিথি বলল, "লোকটির সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি? জীবন সম্পর্কে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি।"

গৃহস্বামী বলল, "নিশ্চয়ই পারেন।" তারপর তাঁবুর বাইরে গিয়ে ডাকল: "বাবাই, একবার এদিকে এস তো। তোমার বুড়িকেও সঙ্গে নিয়ে এস। আমাদের সঙ্গে একটু কুমিস পান করবে।"

ইলিয়াস আর তার স্ত্রী এল। ইলিয়াস অতিথি ও গৃহস্বামীকে নমস্কার করল, প্রার্থনা করল, তারপর দরজার পাশে এক কোণে বসল। তার স্ত্রী পর্দার আড়ালে গিয়ে কর্ত্রীর পাশে বসল।

ইলিয়াসকে এক বাটি কুমিস দেওয়া হল। সে আবার অতিথি ও গৃহস্বামীকে মাথা নিচু করে নমস্কার করল এবং একটু খেয়ে বাকিটা নামিয়ে রাখল।

অতিথি তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বাবাই, আমাদের দেখে তোমার অতীত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে এবং এখনকার দুরবস্থার কথা ভেবে কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?"

ইলিয়াস হেসে বলল, "সুখ-দুঃখের কথা যদি বলি, আপনারা হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। বরং আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি মেয়েমানুষ, তাঁর মনেও যা মুখেও তাই। এ বিষয়ে তিনিই পুরো সত্য বলতে পারবেন।"

অতিথি তখন পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা ঠাকমা; আগেকার সুখ আর এখনকার দুঃখ সম্পর্কে তোমার মনের কথাটা বল তো।"

পর্দার আড়াল থেকে শাম-শেমাগি বলতে লাগল : "এই হল আমার মনের কথা : পঞ্চাশ বছর এই বুড়ো আর আমি একত্র বাস করেছি, সুখ খুঁজেছি ; কিন্তু কখনও পাই নি। আর আজ এখানে এই আমাদের দ্বিতীয় বছর, যখন আমাদের কিছুই নেই, যখন আমরা ভাড়াটে মানুষের মত বেঁচে আছি, তখন আমরা পেয়েছি সত্যিকারের সুখ ; আজ আর কিছুই চাই না।"

অতিথিরা বিস্মিত। গৃহস্বামীও বিস্মিত। সে উঠে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে বুড়ির দিকে তাকাল। দুই হাত ভেঙে বসে সে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসছে। স্বামীও হাসছে।

বুড়ি আবার কথা বলল : "আমি সত্য কথাই বলছি, তামাসা করছি না। অর্ধ-শতাব্দী ধরে আমরা সুখ খুঁজেছি ; যতদিন ধনী ছিলাম, কখনও সুখ পাই নি। কিন্তু আজ এমন সুখের সন্ধান আমরা পেয়েছি যে আর কিছুই আমরা চাই না।"

"কিন্তু এখন কিসে তোমাদের সুখ হচ্ছে ?"

"বলছি। যখন ধনী ছিলাম, বুড়োর বা আমার এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি ছিল না,—কথা বলবার সময় নেই। অন্তরের কথা ভাববার সময় নেই, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার সময় নেই। দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না। হয়ত অতিথিরা এলেন—এক দুশ্চিন্তা : কাকে কী খেতে দিই, কী উপহার দিই যাতে লোকে নিন্দা না করে। আবার অতিথিরা চলে গেলে মজুরদের দিকে নজর দিতে হয় ; তারা যেমন কম খেটে বেশি খেতেই ব্যস্ত, তেমনি আমরাও নিজেদের স্বার্থে তাদের উপর কড়া নজর রাখি,—সেও তো পাপ। অন্যদিকে দুশ্চিন্তা—এই বুঝি নেকড়েতে ঘোড়ার বাচ্চা বা গরুর বাছুরটাকে নিয়ে গেল। কিংবা চোর এসে ঘোড়াগুলোই নিয়ে সরে পড়ল। রাতে ঘুমুতে গেলাম, কিন্তু ঘুমুবার উপাই নেই; মনে দুশ্চিন্তা—ভেড়ী বুঝি ছানাগুলোকে চেপে মেরে ফেলল। ফলে সারারাত ঘুমই ছিল না। একটা দুশ্চিন্তা পেরোতেই আর একটা এসে মাথা চাড়া দিত,—শীতের জন্য যথেষ্ট খড় মজুত আছে তো। এ ছাড়া বুড়োর সঙ্গে মতবিরোধ ছিল ; সে হয়তো বলল এটা এভাবে করা হোক, আমি বললাম অন্যরকম। ফলে ঝগড়া। সেও তো পাপ। কাজেই এক দুশ্চিন্তা থেকে আর এক দুশ্চিন্তায়, এক পাপ থেকে আর এক পাপেই দিন কাটত; সুখী জীবন কাকে বলে কোনদিন বুঝি নি।"

"আর এখন ?"

"এখন বুড়ো আর আমি একসঙ্গে সকালে উঠি, দুটো সুখ-শান্তির কথা বলি। ঝগড়াও কিছু নেই, দুশ্চিন্তাও কিছু নেই,—আমাদের একমাত্র কাজ প্রভুর সেবা করা। যতটা খাটতে পারি স্বেচ্ছায়ই খাটি, কাজেই প্রভুর

কাজে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই। বাড়িতে এলেই খাবার ও কুমিস পাই। শীতকালে গরম হবার জন্য লোমের কোট আছে, জ্বালানি আছে। আত্মার কথা আলোচনা করবার বা ভাববার মত সময় আছে, সময় আছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার। পঞ্চাশ বছর ধরে সুখ খুঁজে খুঁজে এতদিনে পেয়েছি।"

অতিথিরা হেসে উঠল। কিন্তু ইলিয়াস বলল: "বন্ধুগণ, হাসবেন না। এটা তামাসা নয়। এটাই মানুষের জীবন। আমার স্ত্রী আর আমি অবুঝ ছিলাম, তাই সম্পত্তি হারিয়ে কেঁদেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কাছে সত্যকে উন্মুক্ত করেছেন। আর সে কথা যে আমরা আপনাদের বললাম তা ফূর্তির জন্য নয়, আপনাদের কল্যাণের জন্য।"

তখন মোল্লা বললেন:

"এটা খুবই জ্ঞানের কথা। ইলিয়াস যা বলল সবই সত্য, এবং পবিত্র গ্রন্থে লেখা আছে।"

শুনে অতিথিরা ভাবতে বসল।

১৮৮৬

আইভান ইলুয়িচ-এর মৃত্যু

The Death of Ivan Ilyich

॥ ১ ॥

মেলভিনস্কি মামলার শুনানীর বিরতির সময় বিচারক পরিষদের সদস্যগণ ও সরকারী উকিল নিজে আদালতের বড় বাড়িটার ভিতরে আইভান ইয়েগরভিচ শেবেক-এর খাস কামরায় একত্রিত হয়ে ক্রাসভস্কি মামলা নিয়ে আলোচনা করছিল। ফিয়দর ভাসিলীভিচ সরবে জানাল যে ঐ মামলা এই আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। ইয়েগর আইভানভিচ নিজের মত প্রকাশের জন্য উঠে দাঁড়াল; কিন্তু পিয়তর আইভানভিচ প্রথম থেকেই চুপ করে ছিল, এবারও এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না, বরং সদ্য আনা সংবাদপত্রের পাতায় মনোনিবেশ করল।

"ভদ্রমহোদয়গণ!" সে বলল, "আইভান ইলুয়িচ মারা গেছেন!"

"অমন কথা বলবেন না!"

"এই তো রয়েছে, পড়ে দেখুন", ভিজে-ভিজে গন্ধমাখা তাজা খবরের কাগজখানা ফিয়দর-এর হাতে দিয়ে সে বলল।

কালো রেখার মধ্যে ছাপা হয়েছে : "প্রাস্কোভিয়া ফিয়োদরভ্না গলোভিন আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে তার প্রিয় স্বামী 'কোর্ট অব্ জাস্টিস'-এর সদস্য আইভান ইল্যিচ গলোভিন-এর বন্ধু ও আত্মীয়জনকে তার মৃত্যু-সংবাদ জানাচ্ছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেছেন। বৃহস্পতিবার বেলা একটায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।"

আইভান ইল্যিচ সমবেত ভদ্রজনদের সহকর্মী ছিল। সকলেই তাকে পছন্দ করত। কয়েক সপ্তাহ আগে সে অসুস্থ হয়; বলা হয়, তার রোগ দুরারোগ্য। তার পদটা শূন্যই রাখা হয়েছিল; সকলে ভেবেছিল তার মৃত্যু হলে আলেক্সয়ীভ তার কাজটা পাবে, এবং ভিনিকভ বা শ্তাবেল আলেক্সয়ীভ-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং আইভান ইল্যিচ-এর মৃত্যু সংবাদ শুনবার পরে সমবেত প্রত্যেকটি ভদ্রলোকের প্রথম চিন্তাই হল, এই মৃত্যুর ফলে নিজেদের বা বন্ধুবান্ধবদের চাকরির ক্ষেত্রে বদলি বা উন্নতির অবস্থাটা কি দাঁড়াবে।

ফিয়দর ভাসিলীভিচ ভাবল, "শ্তাবেল বা ভিনিকভ-এর স্থানটা এবার আমি নিশ্চয় পাব। অনেক আগেই এটা আমাকে দেওয়া হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল; আর এই পদোন্নতির মানেই অফিস পরিচালনার দরুণ অনুদান ছাড়াও আটশ' রুবল অতিরিক্ত উপার্জন।"

পিয়তর আইভানভিচ ভাবল, "আমার শ্যালক যাতে কালুগা থেকে বদলি হতে পারে তার জন্য আমাকে এখনই দরখাস্ত করতে হবে। আমার স্ত্রী খুব খুসি হবে। তার পরিবারের জন্য আমি কখনও কিছু করি নি, এ কথা সে আর বলতে পারবে না।"

পিয়তর আইভানভিচ মুখে বলল, "তিনি যে আর শয্যা ছেড়ে উঠতে পারবেন না সেটা আমার মনেই হয়েছিল। আমি দুঃখিত!"

"কিন্তু তার আসলে হয়েছিলটা কি?"

"ডাক্তাররা ঠিক ধরতে পারে নি। তার মানে, রোগ তারা ধরেছিল, তবে আলাদা আলাদা। আমি যখন তাকে শেষ দেখতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু মনে হয়েছিল তিনি সেরে উঠবেন।"

"দেখুন, ছুটির পরে আমার আর তার সঙ্গে দেখা করাই হয় নি। অবশ্য যাবার ইচ্ছা খুবই ছিল।"

"তার কোন সম্পত্তি ছিল কি?"

"মনে হয় তার স্ত্রীর সামান্য কিছু আছে। তবে সে খুবই যৎকিঞ্চিৎ।"

"হ্যাঁ, অনেকটা পথ গিয়ে তবে দেখা করতে হবে। বড্ড বেশী দূরে তারা থাকেন।"

"বলুন যে আপনার বাড়ি থেকে অনেকটা পথ। আপনার আস্তানা থেকে

তো সব জায়গাই অনেক দূরের পথ।"

শেবেক-এর দিকে তাকিয়ে পিয়তর আইভানভিচ বলল, "এই দেখুন, আমি যে নদীর ওপারে থাকি সেটা তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না।" তারপর শহরের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কোথায় কত বেশী দূরত্ব সে বিষয়ে আলোচনা করতে করতে তারা আদালত-কক্ষে ফিরে গেল।

এই মৃত্যুর ফলে চাকরিক্ষেত্রে রদ-বদল ও উন্নতির আলোচনা ছাড়াও একজন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত জনের মৃত্যুর সংবাদে সাধারণত যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই হল: সকলের মনেই একই অনুভূতি জাগল যে "তিনি মারা গেছেন, আমি নই।"

প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল বা অনুভব করল, "ভাবুন তো! তিনি মারা গেছেন, কিন্তু আমি এখানে বহাল তবিয়তেই আছি।" আইভান ইল্যিচ-এর সঙ্গে যারা বেশী ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, যারা তার তথাকথিত বন্ধু, তাদের মনে আরও একটা ভাবনা দেখা দিল যে এখনই তাদের কতকগুলি অতীব ক্লান্তিকর সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হবে—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে হবে এবং বিধবাটির সঙ্গে দেখা করে শোক জানাতে হবে।

প্রয়াত সহকর্মীর সঙ্গে সব চাইতে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল ফিয়দর ভাসিলীভিচ ও পিয়তর আইভানভিচ।

পিয়তর আইভানভিচ ছিল তার আইন-বিদ্যালয়ের সতীর্থ এবং আইভান ইলয়িচ-এর প্রতি সে কৃতজ্ঞ বোধ করত।

খাবার সময় স্ত্রীকে আইভান ইল্যিচ-এর মৃত্যু-সংবাদ ও তার ভাইয়ের বদলির সম্ভাবনার কথা জানিয়ে পিয়তর আইভানভিচ একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য শুয়ে না পড়ে ফ্রক-কোটটা গায়ে চড়িয়ে আইভান ইলয়িচ-এর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল।

আইভান ইল্যিচ-এর ফ্ল্যাটের সামনের ফটকেই সে একটা গাড়ি ও দুটো ভাড়াটে ঘোড়া দেখতে পেল। ঢোকার মুখেই সিঁড়ির নীচে হ্যাট-স্ট্যাণ্ডের পাশেই সদ্য পালিশ করা একটা শবাধারের ঢাকনা দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো ছিল। দুটি মহিলা তাদের জোব্বা খুলে রাখছিল। তাদের একজনকে সে চেনে, আইভান ইল্যিচ-এর বোন; অপর মহিলাটি তার অপরিচিত। পিয়তর আইভানভিচ-এর সহকর্মী শ্ভার্ত্স্ নীচে নেমে আসছিল; সিঁড়ির উপর থেকেই আগন্তুককে দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে তার দিকে চোখ টিপল, যেন বলতে চাইল: "আইভান ইল্যিচ সব গোলমাল পাকিয়ে রেখেছে; আপনার-আমার কথা অবশ্য আলাদা।"

শ্ভার্ত্স্-এর মুখের ইংরেজসুলভ গোঁফ আর ফ্রককোট পরা কৃশ শরীরের জন্য তাকে সব সময়ই পরিচ্ছন্ন ও গম্ভীর দেখায়। শ্ভার্ত্স্-এর

আমুদে স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত এই গাম্ভীর্য এখানে বিশেষভাবে বেমানান লাগছিল বলে পিয়তর আইভানভিচ-এর মনে হল।

মহিলাদ্বয়কে তার আগে উঠে যেতে দিয়ে পিয়তর আইভানভিচ ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। শ্‌ভার্ত্‌স্‌ নীচে না নেমে সিঁড়ির মাথায়ই অপেক্ষা করে রইল। কেন যে অপেক্ষা করে আছে পিয়তর আইভানভিচ তা জানে; সেদিন সন্ধ্যায় তাসের "স্ক্রু" খেলার আসরটা কোথায় বসবে সেটাই সে তার সঙ্গে ঠিক করে নিতে চায়। মহিলা দুটি বিধবার ঘরের দিকে চলে গেল; আর শ্‌ভার্ত্‌স্‌ ঠোঁট দুটি গম্ভীরভাবে চেপে ধরে, দুই চোখ নাচিয়ে, ভুরু দুটিকে বেঁকিয়ে যে ঘরে মৃতদেহটি রয়েছে সেই দিকে পিয়তর আইভানভিচ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এ সব ক্ষেত্রে সকলেরই যে রকম হয়ে থাকে পিয়তর আইভানভিচও সেই রকম সেখানে গিয়ে কি করতে হবে না জেনেই ঘরের ভিতর ঢুকল। শুধু একটা জিনিস সে ঠিকই জানে—এ সব ক্ষেত্রে ক্রুশ-চিহ্ন করতে কখনও ভুল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ক্রুশ-চিহ্ন করবার সময় মাথা নীচু করা দরকার কি না ঠিক জানা না থাকায় সে একটা মাঝামাঝি পথ বেছে নিল। ঘরে ঢুকে সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল এবং মাথাটা খানিকটা নোয়ালো। সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব হাত ও মুখ ঘুরিয়ে সে ঘরের চারদিকটা দেখে নিল। দুটি যুবক ক্রুশ-চিহ্ন শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে; তাদের মধ্যে একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। হয় তো কোন ভাই-পো। একটি বৃদ্ধা নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল, আর একটি মহিলা অদ্ভুতভাবে ভুরু দুটি তুলে তার কানে কানে কি যেন বলছিল। ফ্রককোট গায়ে একজন ডিয়েকন এমন ভঙ্গী করে উচ্চৈঃস্বরে একটা কিছু পড়ছিল যাতে মনে হয় যে তার কথার কোন রকম প্রতিবাদ করাই চলতে পারে না। গেরাসিম নামক একটি তরুণ চাষী এখানে পরিচারকের কাজ করত; আস্তে আস্তে পা ফেলে পিয়তর আইভানভিচ-এর সামনে এসে সে মেঝের উপর কি যেন ছিটিয়ে দিতে লাগল। সেটা চোখে পড়তেই বাসি মরার একটা হাল্কা গন্ধ পিয়তর আইভানভিচ-এর নাকে লাগল। আইভান ইল্যিচকে যখন শেষ দেখতে এসেছিল তখন পিয়তর আইভানভিচ এই চাষীটিকে তার ঘরে দেখেছিল; সে তখন রোগীর সেবা করত, আর আইভান ইল্যিচ তাকে বিশেষ ভালও বাসত। শবাধার, ডিয়েকন এবং ঘরের কোণের টেবিলের উপরকার পবিত্র মূর্তিগুলির একটা মাঝামাঝি জায়গার উদ্দেশে পিয়তর আইভানভিচ ক্রুশ-চিহ্ন ও অভিবাদন করতে লাগল। তারপর যখন মনে হল যে ও কাজটা অযথা অনেক বেশী সময় ধরে করা হয়েছে তখন সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃত লোকটিকে ভাল করে দেখতে লাগল।

মৃত লোকদের বেলায় যেমন হয়ে থাকে এই মৃত লোকটিও সেই

একই বিশেষ ভঙ্গীতে একান্ত মৃতবৎ শুয়ে ছিল; শক্ত হাত-পাগুলো শবাধারের কুশনের মধ্যে বসে গেছে; মাথাটা চিরকালের মত বালিশের উপর ঢলে পড়েছে; চুপসে-যাওয়া টাক-মাথাটার সামনে মোমের মত কপালটায় হলুদে ছোপ ধরেছে; উপরের ঠোঁটের উপর নাকটা যেন হঠাৎ খাড়া হয়ে ঠেলে উঠেছে। পিয়তর আইভানভিচ তাকে যখন শেষ দেখেছিল তার থেকে এখন সে অনেকটা বদলে গেছে, বেশ কিছুটা শুকিয়ে গেছে; আর—মৃতদের বেলায় সব সময়ই যেমনটি হয়ে থাকে—তার মুখখানি এখন যেন জীবিত অবস্থার চাইতেও বেশী সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। যা করার ছিল সবই করা হয়েছে এবং ভাল ভাবেই করা হয়েছে—এই ভাবটাই যেন মুখের উপর ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া সেই মুখে যেন জীবিতদের প্রতি কিছুটা তিরস্কার বা অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ভাবও ফুটে উঠেছে। এই মনে করিয়ে দেবার ভাবটা পিয়তর আইভানভিচ-এর কাছে অবাঞ্ছিত এবং অন্তত তার পক্ষে অবান্তর বলে মনে হল। তার মনের মধ্যে একটা অপ্রীতির ভাব জেগে উঠল; ফলে সে অত্যন্ত দ্রুত আর একবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শ্ভার্ত্স্ পাশের ঘরেই তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল; পা দুটি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাত দুটি পিছনে নিয়ে টুপিটা নাড়াচাড়া করছিল। শ্ভার্ত্স্-এর ফুর্তিবাজ, চতুর, ও পরিচ্ছন্ন মূর্তির দিকে এক নজরে তাকিয়েই পিয়তর আইভানভিচ মনের বল ফিরে পেল। সে বুঝল, শ্ভার্ত্স্ এ সবের ঊর্ধ্বে, সে কখনও মন খারাপ করবে না। তার মুখের উপরেই যেন এই কথাগুলি লেখা আছে: আইভান ইল্যিচ-এর মৃতদেহের সৎকারের ঘটনা কখনও এ মরশুমের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হতে পারে না,—অন্য কথায়, পরিচারক যখন সন্ধ্যাবেলা আমাদের টেবিলে চারটি সাধারণ মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবে তখন এই ঘটনাটির জন্য আমাদের তাসের আড্ডাটি বন্ধ থাকতে পারে না; বস্তুত, সন্ধ্যাবেলাটা ফুর্তি করে কাটাবার পথে এই ঘটনাটি কোন রকম বাধার সৃষ্টি করতে পারে এ কথা ভাববার কোন কারণই থাকতে পারে না। বেরিয়ে আসতে আসতে এই কথাগুলিই পিয়তর আইভানভিচকে জানিয়ে সে প্রস্তাব করল যে, ফিয়দর ভাসিলীভিচ-এর বাড়িতেই আজ সকলে জমায়েত হবে। কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা গেল সেদিন সন্ধ্যায় "স্ক্রু" খেলা পিয়তর আইভানভিচ-এর কপালে ছিল না। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না কয়েকটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে তার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেঁটে, মোটা এই মহিলাটি যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কাঁধ থেকে নীচের দিকে ক্রমাগতই স্থূলতর হয়ে চলেছে; তার পরনে কালো পোষাক, মাথায় লেস, এবং ভুরু দুটি শবাধারের পাশে দাঁড়ানো মহিলাটির মতই অদ্ভুতভাবে বাঁকানো।

সকলকে নিয়ে মৃতের ঘরে ঢুকে সে বলল : "অনুষ্ঠান এখনই শুরু হবে ; আপনারা আসুন।"

শ্‌ভার্ৎস্‌ কোন রকমে মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল ; আমন্ত্রণটি গ্রহণও করল না, প্রত্যাখ্যানও করল না। পিয়তর আইভানভিচকে চিনতে পেরে প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা তার কাছে এগিয়ে গেল ; তার হাতটা ধরে বলল, "আমি জানি আপনি ছিলেন আইভান ইল্‌য়িচ-এর প্রকৃত বন্ধু।" কতকগুলির যথাযথ প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় সে তার দিকে তাকিয়ে রইল। পিয়তর আইভানভিচ জানে, আগের মতই তাকে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে হবে এবং মহিলাটির হাতখানি ধরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে হবে, "আহা, সত্যি তাই ছিলাম!" সে করলও তাই। সেই সঙ্গে সে বুঝতেও পারল যে প্রত্যাশিত ফলটি ফলেছে ; সে নিজে অভিভূত হয়েছে, আর মহিলাটিও অভিভূত হয়েছে।

বিধবা বলল, "আসুন ; এখনও কাজ শুরু হয় নি, এই ফাঁকে আপনাকে কিছু বলতে চাই। আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন।"

পিয়তর আইভানভিচ হাত বাড়িয়ে দিল। শ্‌ভার্ৎস্‌-এর পাশ দিয়ে তারা ভিতরের ঘরে চলে গেল। শ্‌ভার্ৎস্‌ বিষন্ন মনে তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল।

তার দুষ্টুমি-ভরা দৃষ্টি যেন বলল, "'স্ক্রু' খেলা হয়ে গেল! আমরা আর একজন খেলুড়ে যোগাড় করে নিলে কিছু মনে করবেন না। ছাড়া পেয়ে ফিরে গেলে আপনি পঞ্চম খেলুড়ে হতে পারবেন।"

পিয়তর আইভানভিচ আরও হতাশভাবে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়োদরভ্‌না কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার হাতটা চেপে ধরল। তারা বসবার ঘরে ঢুকল। ঘরে লাল মোটা পর্দা ঝুলছে, একটা বিষন্ন-দর্শন বাতি জ্বলছে। দুজন টেবিলে গিয়ে বসল ; মহিলাটি বসল সোফায়, আর সে বসল একটা নীচু "অটোমান"-এ ; "অটোমান"-এর স্প্রিংগুলো খারাপ হয়ে যাওয়ায় তার ভারে কিছুটা বসে গেল। প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না তাকে অন্য একটা আসনে বসতে বলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল এ ধরনের অনুরোধ করা তার মর্যাদার পরিপন্থী, তাই সে চুপ করে গেল। "অটোমান"-এর উপর বসে পিয়তর আইভানভিচ-এর মনে পড়ে গেল; আইভান ইল্‌য়িচ কি ভাবে এই ঘরটাকে সাজিয়েছিল, এই সবুজ পাতা ও লাল ফুলে ছাপা পর্দার ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করেছিল। বসবার ঘরটা নানা রকম আসবাব ও জিনিসপত্রে ভর্তি। মহিলাটি যখন টেবিলটা সরিয়ে সোফায় বসতে গেল তখন তার ত্রিকোণ গলাবন্ধের ফিতেটি টেবিলের কোণায় আটকে গেল। সেটা ছাড়িয়ে দেবার জন্য পিয়তর আইভানভিচ

উঠে দাঁড়াতেই তার ভার-মুক্ত "অটোমান"টি হুঁস করে ফুলে উঠল। মহিলাটি নিজেই সেটা খুলে নেওয়ায় পিয়তর আইভানভিচ আবার অটোমান"-এর বিদ্রোহী স্প্রিংগুলোকে চেপে তার আসনে বসে পড়ল। কিন্তু বিধবাটি নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়াতে পারল না দেখে পিয়তর আইভানভিচ আবার উঠে দাঁড়াল, আর সংগে সংগে "অটোমান"টাও আবার এক ঝাঁকিতে উদ্ধত মাথাটা তুলে ধরল। এ সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেলে মহিলাটি একখানি ক্যাম্ব্রিকের রুমাল বের করে কাঁদতে বসল। একদিকে ফিতে আর অন্য দিকে "অটোমান"-এর স্প্রিং—এই দুয়ের ধাক্কায় নাজেহাল হয়ে পিয়তর আইভানভিচ বিষণ্ণ বদনে বসে রইল। আইভান ইলায়িচ-এর খানসামা সকলভ ঘরে ঢোকায় এই অস্বস্তিকর অবস্থাটার অবসান ঘটল। সে জানাল, সমাধি-ক্ষেত্রের যে স্থানটি প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না বেছে নিয়েছে তার জন্য দু শ' রুবল খরচ পড়বে। কান্না থামিয়ে আহত শিকারের মত দৃষ্টিতে পিয়তর আইভানভিচ-এর দিকে তাকিয়ে বিধবাটি বলল যে, তার কাছে এটা বড়ই দুঃসংবাদ। পিয়তর আইভানভিচও নীরবে এমন ভংগী করল যেন সে বিষয়ে সে নিজেও নিঃসংশয়।

উদার অথচ ভগ্ন কণ্ঠে মহিলাটি বলল, "দয়া করে ধূমপান করুন"; তারপর সে কবরের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটির দাম দিয়ে সকলভ-এর সংগে আলোচনা করতে লাগল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পিয়তর আইভানভিচ সমাধিক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানের দাম সম্পর্কে বিধবার নানা মন্তব্য ও সে সম্পর্কে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। স্থান-নির্বাচন শেষ করে বিধবাটি গায়কদলের ব্যবস্থাও করে ফেলল। সকলভ চলে গেল।

টেবিলের উপর যে অ্যালবামগুলো পড়ে ছিল সেগুলো একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে সে বলল; "সব কিছুই আমি নিজে দেখাশুনা করি।" হঠাৎ তার নজরে পড়ল, সিগারেটের ছাইতে টেবিলটা নষ্ট হতে পারে; তাই তাড়াতাড়ি পিয়তর আইভানভিচ-এর দিকে একটা ছাই-দানি এগিয়ে দিয়ে সে বলল, "আমার দুঃখের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মের দিকে নজর দিতে পারব না—এ রকম ভান করতে আমি পারি না। বরং যদি কোন কিছুতে আমি—না, ঠিক সান্ত্বনা নয়,...একটু ভুলে থাকতে পারি, সেটা হল তার জন্য সব কিছুর সুব্যবস্থা করা।" আবার সে রুমালখানা হাতে নিল, বুঝি বা আবার কাঁদবারই আয়োজন হচ্ছে; কিন্তু সহসা যেন নিজের সংগে লড়াই করতে শরীরটাকে একটু ঝাঁকি দিয়ে সে শান্ত গলায় বলল: "কিন্তু আপনার সংগে আমার কাজের কথা আছে।"

সতর্কতার সংগে "অটোমান"-এর স্প্রিংগুলো চেপে রেখে পিয়তর

আইভানভিচ মাথাটা নোয়াল।

"শেষের কটা দিন সে বড়ই কষ্ট পেয়েছে।"

"তিনি কি খুবই কষ্ট পেয়েছেন?" পিয়তর আইভানভিচ জিজ্ঞাসা করল।

"ওঃ, খুব কষ্ট! শেষের দিকটা, শেষ কয়েক ঘণ্টা সে তো অনবরত চিৎকার করেছে। তিন দিন তিন রাত সে একটানা আর্তনাদ করেছে। অসহ্য। কি ভাবে যে সহ্য করেছি জানি না; তিনটে বন্ধ দরজা পার হয়েও সে আর্তনাদ কানে আসে। ওঃ, কী কষ্টই না গেছে!"

"তার জ্ঞান ছিল?" পিয়তর আইভানভিচ জিজ্ঞাসা করল।

সে ফিস ফিস করে বলল, "হ্যাঁ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মৃত্যুর পনেরো মিনিট আগে সে আমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল; ভলদ্যাকেও সরিয়ে নিয়ে যেতে বলল।"

নিজের এবং এই নারীর কপটতা সম্পর্কে অপ্রীতিকর সচেতনতা সত্ত্বেও যে মানুষটিকে প্রথমে হাল্কা মনের একটি স্কুলের ছেলে হিসাবে ও তারপরে বড় হয়ে "হুইস্ট" খেলার সঙ্গী হিসাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সে চিনত, তার দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ভেবে পিয়তর আইভানভিচ সহসা অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সেই কপাল, সেই ঠোঁটের উপর চেপে-বসা নাক আবার তার নজরে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেরই ভয় হল। "তিন দিন তিন রাত ভীষণ যন্ত্রণা ও মৃত্যু। সে তো যে কোন মুহূর্তে, এখনই আমার জীবনেও ঘটতে পারে", এই কথা ভেবে মুহূর্তের জন্য ভয়ংকর রকমের ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু সে নিজেই বলতে পারে না কেন ঠিক পর মুহূর্তেই সেই চিরাচরিত চিন্তা তার মনকে শক্ত করে তুলল যে, এ রকমটা আইভান ইল্যিচ-এর বেলায় ঘটেছে, তার নিজের বেলায় নয়, আর তার বেলা এটা ঘটবে না, ঘটতে পারে না; তাছাড়া এ ধরনের চিন্তার প্রশ্রয় দিয়ে নিজে আতংকিত হওয়া যে উচিত নয় শ্‌ভার্ৎস্‌-এর মুখের ভাবই তো তার প্রমাণ। এই সব ভেবে পিয়তর আইভানভিচ আশ্বস্ত বোধ করল এবং সাগ্রহে আইভান ইল্যিচ-এর মৃত্যু সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে লাগল, যেন মৃত্যু আইভান ইল্যিচ-এর জীবনের একটি দুর্ঘটনামাত্র, তার সঙ্গে তার নিজের কোন সম্পর্কই নেই।

আইভান ইল্যিচ-এর ভয়াবহ দৈহিক যন্ত্রণার বিস্তারিত বিবরণ (আইভান ইল্যিচ-এর যন্ত্রণার যে প্রতিক্রিয়া প্রাস্কোভ্যা ফিয়দরভ্‌নার স্নায়ুতন্ত্রের উপর ঘটেছিল তার সাহায্যেই পিয়তর আইভানভিচ সে বিবরণ জানতে পেরেছে) সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য করার পরে বিধবাটি ভাবল যে এবার কাজের কথায় যাওয়া যাক।

"ওঃ, পিয়তর আইভানভিচ, সে যে কত কঠিন, কী ভয়ংকর রকমের

কঠিন !" বলতে বলতে সে আবার কান্না জুড়ে দিল।

পিয়তর আইভানভিচ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিধবাটির নাক ঝাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে কাজ হয়ে গেলে সে বলল, "সত্যি তাই", আর বিধবাটিও কথাপ্রসংগে তার কাজের কথাটি জানিয়ে দিল। কাজের কথাটি হল: স্বামীর মৃত্যুর পরে সরকারের কাছ থেকে কেমন করে সে একটি অনুদান পেতে পারে সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। কি করে একটা পেন্সন পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়েও বিধবাটি তার পরামর্শ জানতে চাইল। কিন্তু সে বুঝতে পারল; এই মৃত্যুর ফলে সরকারের কাছ থেকে কোথায়, কি ভাবে, কতটা আদায় করা যেতে পারে তার বিস্তারিত বিবরণ বিধবাটি যতটা জানে সে নিজেও তা জানে না; সে শুধু জানতে চাইছিল, আরও কিছু বেশী পাবার কোন পথ আছে কি না। তারপরই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অতিথিদের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা ওজুহাত সে খুঁজতে লাগল। সেটা বুঝতে পেরে পিয়তর আইভানভিচ সিগারেটটা নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বিধবার হাতটাতে চাপ দিয়ে দালানে বেরিয়ে গেল।

একদা যে পুরনো কালের দেয়াল-ঘড়িটা কিনতে পেরে আইভান ইলুয়িচ খুব খুশি হয়েছিল সেটা খাবার ঘরেই ছিল। সেখানে পুরোহিত এবং আরও কয়েকজন পরিচিত লোকের সংগে পিয়তর আইভানভিচের দেখা হল। সকলেই মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এসেছে। আইভান ইলুয়িচ-এর সুন্দরী তরুণী কন্যাটিও এসেছে। তার পরনে কালো পোষাক। তার কৃশ তনু আরও কৃশ দেখাচ্ছে। তার বিষণ্ন, কঠিন মুখে যেন একটা রাগের ছাপ। পিয়তর আইভানভিচকে সে এমন ভাবে অভিবাদন জানাল যেন এ ব্যাপারের জন্য সেও কিছুটা দায়ী। মেয়েটির পিছনে সেই একই রকম বিরক্ত মুখে একটি ধনী যুবক দাঁড়িয়েছিল। পিয়তর আইভানভিচ জানে সে একজন তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট; সে শুনেছে, যুবকটি এই তরুণীর প্রণয়ী। বিষণ্ন চিত্তে তাকে অভিবাদন জানিয়ে সেও হয় তো মৃতের ঘরেই চলে যেত, এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল মৃতের ছেলে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র, দেখতে হুবহু আইভান ইলুয়িচ-এর মত। পিয়তর আইভানভিচ যে বালক আইভান ইলুয়িচকে চিনত সেই যেন আবার ফিরে এসেছে। তার চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে; তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের নোংরা ছেলেদের মত তার চোখের দৃষ্টি। পিয়তর আইভানভিচকে দেখে ছেলেটি বিষণ্ন ও লজ্জিত ভাবে মুখটা বাঁকাল। ইঙ্গিতে তাকে ডেকে পিয়তর আইভানভিচ মৃতের ঘরে ঢুকল। শেষকৃত্য শুরু হল—মোমবাতি, আর্তনাদ, ধুপধুনো, চোখের জল, চাপা কান্না। পিয়তর আইভানভিচ ভুরু কুঞ্চিত করে নিজের পায়ের উপর দৃষ্টি রেখে

দাঁড়িয়ে রইল। একবারও সে মৃতের দিকে তাকাল না, অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত কোন সময়ই দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ হতে দিল না, এবং সকলের আগে সেখান থেকে চলে গেল। হল-ঘরে কেউ ছিল না। চাষীছেলে গেরাসিম মৃতের ঘর থেকে ছুটে এসে শক্ত হাতে সবগুলি ফারের জোব্বার ভিতর থেকে পিয়তর আইভানভিচ-এর জোব্বাটা খুঁজে বের করে তার হাতে দিল।

যেন কিছু বলবার জন্যই পিয়তর আইভানভিচ বলল, "এই যে বাবা গেরাসিম, খুবই দুঃখের কথা, নয় কি?"

হেসে দাঁত বের করে গেরাসিম বলল, "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমাদেরও এ দিন আসবে।" তারপরই অত্যন্ত কাজের মানুষের মত সে চটপট দরজা খুলে কোচয়ানকে ডাকল, পিয়তর আইভানভিচকে গাড়িতে তুলে দিল, এবং পরবর্তী কাজ সারবার জন্য দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে গেল।

ধূপ, মৃতদেহ ও কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধের পরে খোলা হাওয়ায় এসে পিয়তর আইভানভিচ-এর খুব ভাল লাগতে লাগল।

কোচয়ান জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবেন?"

"এখনও সময় আছে। একবার ফিয়দর ভাসিলীভি-এর বাড়ি ঘুরে যাব।"

সেখানে পৌঁছে পিয়তর আইভানভিচ দেখল, সবে প্রথম রাবারটি শেষ হয়েছে; কাজেই এক হাত খেলবার পক্ষে ঠিক সময়েই সে হাজির হয়েছে।

॥ ২ ॥

আইভান ইল্‌য়িচ-এর পূর্ব-ইতিহাস খুবই সরল, খুবই সাধারণ এবং অত্যন্ত ভয়াবহ।

বিচারক পরিষদের সদস্য আইভান ইল্‌য়িচ পয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা যায়। সে ছিল একজন সরকারী কর্মচারীর ছেলে। তার বাবা ছিল সেই ধরনের একজন কর্মচারী যারা পিতার্সবুর্গের কর্মজীবনে বহু মন্ত্রিসভা ও বিভাগ ঘুরে ঘুরে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছয় যখন তাদের দ্বারা কোন সত্যিকারের কাজ হবে না জেনেও দীর্ঘ দিনের চাকরির কথা এবং পদ-মর্যাদার কথা ভেবে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যায় না; সুতরাং একটি কাল্পনিক পদ বিশেষ ভাবে সৃষ্টি করে তাদের দেওয়া হয়, এবং কাল্পনিক হাজার হাজারের বদলে ছয় থেকে দশের উপর নির্ভর করেই শেষ বার্ধক্য পর্যন্ত তাদের জীবন-যাত্রা চালাতে হয়। এমনি এক

খাস মন্ত্রিসভার সদস্য, নানা বাড়তি প্রতিষ্ঠানের বাড়তি সদস্য ছিল ইলিয়া এফিমভিচ গলোভিন।

তার ছিল তিন ছেলে। আইভান ইল্‌য়িচ দ্বিতীয় ছেলে। একটা স্বতন্ত্র বিভাগে হলেও বড় ছেলের কর্মজীবন ঠিক তার বাবার মতই, এবং চাকরিতে প্রায় অনুরূপ অবস্থায় উপনীত হবার সময় তারও এসে গেছে। তৃতীয় ছেলেটির জীবনে কিছুই হয় নি। নানা চাকরির ক্ষেত্রে তালগোল পাকিয়ে এখন সে রেল বিভাগে চাকরি করে। তার বাবা ও দাদারা, বিশেষ করে তাদের স্ত্রীরা, শুধু যে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎটা অপছন্দ করত তাই নয়, অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে তার অস্তিত্বের কথাটাই ভুলে থাকত। তার বোন বিয়ে করেছিল ব্যারন গ্রেফ্-কে, সেও ছিল শশুরের মার্কা-মারা পিতার্সবুর্গের একজন চাকুরে। লোকে বলত, আইভান ইল্‌য়িচ ছিল পরিবারের একমাত্র ব্যতিক্রম। সে বড় ছেলের মত অনড়, কাঠখোট্টাও না, আবার ছোট ছেলের মত দুরন্তও না। সে ছিল দুয়ের মধ্যবর্তী একটি সুখী মানুষ—বুদ্ধিমান, চটপটে, ও সুশিক্ষিত। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সেও আইনের বিদ্যালয়ে পড়েছে। ছোট ভাই পড়া শেষ করবার আগে পঞ্চম শ্রেণীতে থাকতেই বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়। আইভান ইল্‌য়িচ সাফল্যের সঙ্গে পাঠক্রম সম্পূর্ণ করে। পরবর্তী সারাটা জীবন সে যে ভাবে কাটিয়েছে বিদ্যালয়েও ঠিক সেই রকমই ছিল,—বুদ্ধিমান, রসিক ও সামাজিক, কিন্তু কর্তব্যে অবিচলভাবে নিষ্ঠাবান। তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে কাজকে তার কর্তব্য বলে মনে করত সেও তাই মেনে নেওয়াকেই তার কর্তব্য বলে মেনে নিত। তাই বলে ছেলে বয়সেও সে কারও চাটুকার ছিল না, বড় হয়েও না; কিন্তু পতঙ্গ যেমন আলোর দিকে আকৃষ্ট হয় তেমনি সেও ছোট বেলা থেকেই পৃথিবীর বড় বড় মানুষদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করত, তাদের চাল-চলন ও জীবনযাত্রাকে নিজের জীবনে গ্রহণ করত, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু ক্রমে শৈশব ও যৌবনের সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়ল; তার কোন প্রভাবই তার জীবনে রইল না; সে ইন্দ্রিয়াসক্তি ও অহংকারের পথে নেমে গেল; বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে উঠবার পরে উদারনৈতিক মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল; কিন্তু সকল অবস্থাতেই স্বীয় প্রবৃত্তির দ্বারা নির্ভুলভাবে চিহ্নিত নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে চলতে লাগল।

বিদ্যালয়ে থাকতে সে এমন সব কাজ করেছে যাকে সে আগে পাপ বলে মনে করত এবং সেই সব কাজ করবার সময় নিজের প্রতি তার ঘৃণাও হত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সে দেখল যে উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন লোকরাও সে সব কাজ করে থাকে এবং তাকে খারাপ কাজ বলে মনে করে না, তখন

সেও সে সব কাজকে ভাল কাজ মনে না করলেও সে সব কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল এবং সে সব স্মৃতি আর তাকে মর্মাহত করত না।

দশম শ্রেণীতে আইন-বিদ্যালয় ত্যাগ করে বাবার কাছ থেকে পোষাক-আশাকের জন্য টাকা পেয়ে আইভান ইল্যিচ শারমার-এর দোকানে পোষাকের অর্ডার দিল; ঘড়ির চেনে "ফলেন পরিচিয়তে" কথাটা খোদাই করা একটা পদক ঝোলাল, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটা বিদায়ী ভোজসভার আয়োজন করল "দোনন"-এ, এবং নতুন কেনা সৌখীন সব জিনিসপত্র—ভ্রমণোপযোগী ট্রাংক, বিছানা, কয়েক প্রস্থ স্যুট, দাড়ি-কামাবার ও স্নানের সরঞ্জাম, ভ্রমণোপযোগী কম্বল ইত্যাদি বড় বড় দোকান থেকে কেনা সব জিনিস নিয়ে একটি প্রাদেশিক সরকারের বিশেষ কমিশনের সচিব-এর পদে যোগ দিতে চলে গেল; চাকরিটা তার বাবাই যোগাড় করে দিয়েছিল।

আইন-বিদ্যালয়ে থাকতে সে যেমন একটা সহজ পরিচিতি লাভ করেছিল, নতুন কর্মক্ষেত্রেও অচিরেই আইভান ইলয়িচ সেই পরিচিতি অর্জন করে নিল। সে যথাযথ ভাবে নিজের কাজ করল, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, আবার সেই সঙ্গে একটি সুস্থ, সুন্দর সামাজিক জীবনও যাপন করতে লাগল। মাঝে মাঝেই সরকারী কাজে তাকে বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনে যেতে হত; সেখানে সে উধর্বতন ও অধস্তন সকল কর্মচারীর সঙ্গেই মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করত; তার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সে এমন নিভুর্ল ভাবে ও সন্দেহাতীত সততার সঙ্গে পালন করত যে সেজন্য সে নিজেই গর্ববোধ করত। তার অল্প বয়স এবং হাল্কা আমোদপ্রমোদের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও সরকারী কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় সে থাকত অত্যন্ত সংযত, বিধিসম্মত, এমন কি কিছুটা কঠোর। কিন্তু সামাজিক জীবনে সে সব সময়ই ফূর্তিবাজ ও সুরসিক; তার স্বভাব ভাল, শিক্ষা-দীক্ষা ভাল; তার উপরওয়ালা ও তার স্ত্রীর সঙ্গে সে তো এক পরিবারের লোকের মতই থাকত; তারাই তাকে বলত "খাসা ছেলে।"

সে অঞ্চলে থাকার সময় সেই সব মহিলাদের একজনের সঙ্গে তার কিছু যোগাযোগও ঘটেছিল যারা সৌখীন আইনজ্ঞ যুবকটির উপর তাদের রূপের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। মাঝে মাঝে উৎসাহী কর্মচারীরা কাছাকাছি কোথাও গিয়ে পান-ভোজন করত; কখনও বা নৈশাহারের পরে শহরের উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলেও বেড়াতে যেত; উপরওয়ালা ও তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে কিছুটা হীন চাটুকারিতাও প্রকাশ পেত। কিন্তু সে সব কাজই সে এমন উন্নত রুচির সঙ্গে সম্পন্ন করত যে তাতে কোন রকম দোষ ধরা যেত না; সব দোষই ফরাসি প্রবাদ "যৌবনে দাও জয়-টীকা"-র দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যেত। সব কিছুই করা হত পরিচ্ছন্ন হাতে পরিচ্ছন্ন পোষাকে, অলংকার-

বহুল ফরাসি ভাষায় এবং সর্বোপরি অভিজাত সমাজে; কাজেই পদস্থ ব্যক্তিদের সমর্থন তাতে সব সময়ই থাকত।

আইভান ইল্‌য়িচ-এর জীবনের পাঁচটি বছর এই ভাবে কাটল; তার পরই তার চাকরি-জীবনে একটা পরিবর্তন এল। বিচারের নতুন পদ্ধতি প্রচলিত হোল; সেগুলি চালাবার জন্য নতুন লোকের প্রয়োজন দেখা দিল। আর আইভান ইল্‌য়িচ হল সেই নতুন লোকদের অন্যতম। তাকে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেওয়া হল। যদিও সেটা অন্য প্রদেশে এবং সেখানে গেলে এখানকার গড়ে তোলা সব বন্ধনকে ছিন্ন করে নতুন করে সব কিছু গড়ে তুলতে হবে, তবু চাকরিটা সে নিল। আইভান ইল্‌য়িচ-এর বন্ধুরা তাকে বিদায় জানাতে সমবেত হল, সকলের ফটো তোলা হল, একটি রুপোর সিগারেট কেস তাকে উপহার দেওয়া হল, আর তারপরেই সে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে যাত্রা করল।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে যেমন ছিল, তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেও আইভান ইল্‌য়িচ তেমনি উপযুক্ততা ও দক্ষতার পরিচয় দিল, তেমনি নৈপুণ্যের সঙ্গে সরকারী কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্য বজায় রেখে চলল, তেমনি সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়ে উঠল। নতুন পদের কাজকর্ম বরং তার কাছে আরও বেশী আকর্ষণীয় মনে হল। আগেকার চাকরিতে থাকার সময় সে যখন শারমার-এর তৈরি ইউনিফর্ম পরে তার জন্য অপেক্ষমান দরখাস্তকারী ও কর্মচারীদের ভিড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হেলেদুলে গভর্ণরের খাস কামরায় গিয়ে ঢুকত এবং তার সঙ্গে বসে চা ও সিগারেট খেত তখন খুবই ভাল লাগত বটে, কিন্তু তখন তার অধীনস্থ কর্মচারীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। শুধু যখন সে বিশেষ কোন কমিশনে কাজ করত তখন তার অধীনে থাকত পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও বিরোধীরা। সে অবশ্য তাদের সঙ্গে সহকর্মীর মতই সদয় ব্যবহার করত; তাদের বুঝিয়ে দিত যে তাদের সর্বনাশ করে দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে তাদের সঙ্গে এতখানি সরল ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করছে। কিন্তু তখন এ ধরনের লোকের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। কিন্তু এখন তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আইভান ইল্‌য়িচ বুঝতে পেরেছে যে প্রতিটি মানুষ—কেউ বাদ নেই—অত্যন্ত সম্মানিত ও অতীব আত্ম-তুষ্ট মানুষরা, সকলেই আছে তার হাতের মুঠোয়; একখানা নাম-ঠিকানা ছাপানো কাগজে সে কয়েকটি মাত্র কথা লিখলেই সেই সব সম্মানিত, আত্ম-তুষ্ট মানুষদের তার সামনে এনে হাজির করা হবে আসামী অথবা সাক্ষী হিসাবে; আর বসতে না বললে তার সামনে দাঁড়িয়েই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

আইভান ইল্‌য়িচ কখনও এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে নি; বরং সে

চেষ্টা করেছে তার প্রকাশকে যথাসম্ভব নরম করতে। কিন্তু এই ক্ষমতা যে তার আছে এবং ইচ্ছা করলেই সে ক্ষমতার ব্যবহারকে সে নরম করতে পারে এই চেতনাই নতুন পদ-মর্যাদাকে তার কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এ কাজ তার কাছে নতুন। ১৮৬৪ সালের আইনে বিচার-পদ্ধতির যে সংস্কার সাধন করা হয়েছে তাকে প্রথম যারা রূপায়িত করেছে সে তাদের একজন।

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে একটি নতুন শহরে বসবাস করার ফলে অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে আইভান ইল্যিচ-এর পরিচয় হল, নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হল; সে নতুন পথ তৈরি করল, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু দেখতে শিখল। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে সে চলতে লাগল, আর শহরের আইনজীবী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মত যারা সেরা মানুষ তাদেরই সঙ্গী হিসাবে বেছে নিল এবং সরকার, উদারনৈতিক মতবাদ ও মহৎ নাগরিক গুণাবলীর প্রতি ঈষৎ অপ্রসন্নতার মনোভাব গ্রহণ করল। এদিকে চেহারায় বা সাজ-পোষাকে সুরুচির কোন রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে আইভান ইল্যিচ নতুন কাজে যোগ দেবার পর থেকে দাড়ি কামান ছেড়ে দিল এবং তার দাড়ি স্বাধীনভাবে বাড়তে লাগল। নতুন শহরে তার উপস্থিতিকে সকলেই স্বাগত জানাল; যারা গভর্ণরের বিরোধিতা করেছিল তারা তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করল; তার উপার্জন অনেক বেড়ে যাওয়ায় সে "হুইস্ট" খেলায় আরও বেশী আনন্দ পেতে লাগল; এবং খোশ মেজাজে তাস খেলতে পারার জন্য ও অত্যন্ত দ্রুত সঠিক হিসাব করতে পারার জন্য তাসের আড্ডায় সে সব সময় বিজয়ীদের দলেই থাকত।

নতুন শহরে দুটি বছর কাটাবার পরে আইভান ইল্যিচ তার ভাবী স্ত্রীর দেখা পেল। যে সমাজে সে চলাফেরা করত তার মধ্যে প্রাস্কোভ্য়া ফিয়োদরভ্না মিহেল ছিল সব চাইতে আকর্ষণীয়, চটপটে, ও ভাল মেয়ে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাজের খাটুনির পরে অন্যবিধ আমোদ-প্রমোদ ও অবসর বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্নার সঙ্গে একটু হাল্কা পূর্ব-রাগের খেলাও খেলাতে শুরু করে দিল।

সহকারী সচিব হিসাবে আইভান ইল্যিচ রীতি হিসাবেই নাচে যোগদান করত; তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সে নাচে যোগদান করত ব্যতিক্রম হিসাবে। এখন সে নাচে যেন প্রতিবাদ হিসাবে; যেন সে বলতে চায়, "যদিও আমি সংশোধিত নতুন আইনের অনুবর্তী হয়ে কাজে যোগদান করেছি এবং সরকারী মর্যাদা অনুসারে আমার স্থান পঞ্চম, তবু নাচের প্রশ্ন যখন দেখা দেয় তখন সে ক্ষেত্রেও অন্যের চাইতে আমি

অধিকতর দক্ষ।" এই মনোভাব নিয়েই সে মাঝে মাঝে সান্ধ্য-আসরের একেবারে শেষের দিকে প্রাস্কোভ্য়া ফিয়োদরভ্নার সঙ্গে নাচত এবং এই সব নাচের ভিতর দিয়েই সে তার মনকে জয় করে। বিয়ে করার কোন স্পষ্ট বাসনা তার ছিল না; কিন্তু মেয়েটি যখন তার প্রেমে পড়ল তখন নিজেকেই সে প্রশ্ন করল: "তাহলে বিয়ে করতে আপত্তি কিসের?"

প্রাস্কোভ্য়া ভাল পরিবারের মেয়ে, দেখতে সুন্দরী। ছোটখাটো সম্পত্তিও ছিল। হয় তো আরও ভাল সম্বন্ধ আইভান ইল্যিচ-এর হতে পারত, কিন্তু এ সম্বন্ধও তো ভাল। আইভান ইল্যিচ-এর নিজের বেতন রয়েছে; মেয়েটিরও অনুরূপ আয় আছে। পরিবারটি ভাল; মেয়েটি মিস্টি, সুন্দরী, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত! আইভান ইল্যিচ তার স্ত্রীকে ভালবেসেছিল এবং তার জীবনযাত্রার প্রতি স্ত্রীর সহানুভূতি আছে এ কথা বুঝতে পেরেছিল বলেই সে তাকে বিয়ে করেছিল এ-কথা বললে যেমন অসত্যভাষণ হবে, ঠিক তেমনি পৃথিবীশুদ্ধু লোক তাদের বিয়েকে সমর্থন করেছিল এ-কথাও ঠিক নয়। এই উভয় প্রকার বিবেচনাই তাকে প্রভাবিত করেছিল; এ রকম একটি স্ত্রী পেয়ে সে খুসি হয়েছিল বলেই বিয়ে করেছিল, আবার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এটাকে সঠিক পথ বলে বিবেচনা করেছিল বলেও সে কাজটি করেছিল।

এবং আইভান ইল্যিচ বিয়ে করল।

বিয়ের ব্যাপারটা, বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক পর্বটা, স্বামী-স্ত্রীর আদর-ভালবাসা, নতুন আসবাব, নতুন বাসন-কোসন, নতুন শয্যাদ্রব্য—স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা পর্যন্ত সব কিছুই বেশ ভাল ভাবেই চলল; ফলে আইভান ইল্যিচ ভেবে বসল, যে খুসিভরা হাল্কা জীবনকে সে এতদিন স্বাভাবিক জীবন বলে ধরে নিয়েছে বিয়ের ফলে সে জীবন ভেঙে তো যাবেই না, বরং তাকে মধুরতর করে তুলবে। কিন্তু এই ব্যাপারে স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই এমন একটি অপ্রত্যাশিত, অপ্রীতিকর, ক্লান্তিকর ও অশোভন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হল যেটা সে আগে কখনও বুঝতে পারে নি, অথচ তার হাত থেকে অব্যাহতিও নেই।

আইভান ইল্যিচ-এর মনে হতে লাগল, তার স্ত্রী সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাদের জীবনের মাধুর্য ও শোভনতাকে বিঘ্নিত করছে। ঈর্ষার তিলমাত্র কারণ না থাকা সত্ত্বেও মহিলাটি নানা ভাবে জোর করে তাকে কাছে টানতে লাগল, সব কিছু নিয়ে খিটিমিটি বাধাতে লাগল এবং তাকে নিয়ে অত্যন্ত স্থূল ও অশালীন দৃশ্যের অবতারণা করতে লাগল।

প্রথম দিকে আইভান ইল্যিচ আশা করেছিল, অন্যান্য অসুবিধার ক্ষেত্রে যে রকম সহজ, হাল্কা ভাবে সে সব বিষয়ের মোকাবিলা করেছে ঠিক সেই

ভাবেই এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকেও নিষ্কৃতি পেতে পারবে। স্ত্রীর বদ-মেজাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে আগের মতই হাল্কা ভাবে জীবন চালাতে লাগল, বন্ধুদের তাসের আড্ডায় ডেকে আনল, অথবা নিজেই তাদের ক্লাবে বা বাড়িতে যেতে লাগল। কিন্তু একদিন তার স্ত্রী এমন উৎসাহের সঙ্গে স্থূল ভাষায় গালাগালি শুরু করল এবং তার দাবী মেনে সর্বদা বাড়িতে থাকতে আপত্তি করলেই এমন ভাবে সে গালাগালি চালিয়ে যেতে লাগল যে আইভান ইল্যিচ আতংকিত হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল, এই বিবাহ-বন্ধন, অন্তত তার স্ত্রীটির সঙ্গে, সব সময়ই জীবনের আনন্দের অনুকূল তো হয়ই না, বরং অনেক সময়েই সে পথের প্রতিবন্ধক হয়েই দাঁড়ায়; কাজেই এই সব গোলযোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটা প্রাচীর তোলা একান্তই প্রয়োজন। আর সেও আত্মরক্ষার সেই রকম একটা পথই খুঁজতে লাগল। একমাত্র তার সরকারী কাজকর্মকেই প্রাস্কোভ্য়া ফিয়োদরভ্না ভাল চোখে দেখত; কাজেই নিজের স্বাধীন জগতটাকে স্ত্রীর দৃষ্টির আড়ালে রাখার চেষ্টায় সে তার চাকরি ও তৎসংক্রান্ত কাজকেই ব্যবহার করতে লাগল।

একটি শিশু জন্মাবার পরে তার দেখাশুনা, তার খাবার ব্যবস্থা নিয়ে নানা রকম অসফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিশুর ও প্রসূতির প্রকৃত ও কাল্পনিক অসুস্থতা, প্রভৃতি ব্যাপারে আইভান ইলয়িচ-এর ধারণা পর্যন্ত না থাকলেও সে সব যখন তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হতে লাগল, তখন তার পক্ষে পারিবারিক জীবনের বাইরে একটি স্বতন্ত্র জীবন গড়ে তোলা একান্তভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠল। ফলে স্ত্রীর দাবী যত বাড়তে লাগল, সে যত বেশী বিরক্তিকর হয়ে উঠল, আইভান ইল্যিচ ততই সরকারী কাজকেই জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত করতে লাগল। সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের প্রতি তার আকর্ষণ ক্রমাগত বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল জীবনের উচ্চাকাংখা।

বিয়ের পর একটি বছর যেতে না যেতেই বড় তাড়াতাড়ি আইভান ইল্যিচ বুঝতে পারল, দাম্পত্য জীবনে কিছু সুখ ও আরাম থাকলেও আসলে সে জীবন এতই জটিল ও বিঘ্নসংকুল যে কেউ যদি সমাজসম্মতভাবে কর্তব্য পালন করে চলতে চায় তাহলে সরকারী চাকরির মত একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরেই তাকে চলতে হবে।

আইভান ইল্যিচও বিবাহিত জীবনে সেই রকম একটা পথ বেছে নিল। বাড়িতে তার প্রত্যাশা রইল শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এবং গৃহস্থালী ও শয্যার আরাম। তার বাইরে সে চায় প্রাণ-খোলা সহজ আনন্দ। সেটা যদি বাড়িতেই মেলে তাহলে তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু তার বদলে যদি জোটে বাধা ও কলহ, তাহলেই সে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নেয় সরকারী কাজ-

কর্মের বেড়ার আড়ালে তার স্বতন্ত্র জগতে, আর সেখানেই সে পায় শান্তি ও সান্ত্বনা।

সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইভান ইল্যিচ এর সুনাম হল; তিন বছর পরেই সে সহকারী সরকারী উকিলের পদটা পেয়ে গেল। নতুন পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তার মর্যাদা, যে কোন লোককে বিচার করবার ও জেলে পুরবার ক্ষমতা, সংবাদপত্রে বক্তৃতার প্রচার এবং কর্ম-জগতে সাফল্য—এই সব নানা কারণে সরকারী কাজকর্ম তার কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

আরও সন্তানের জন্ম হল। তার স্ত্রী ক্রমেই আরও কলহপ্রিয় ও বদমেজাজী হয়ে উঠল; কিন্তু গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে যে পথ আইভান ইল্যিচ বেছে নিয়েছিল তাতে স্ত্রীর কুঁদুলেপনা তার কাছে পৌঁছবার পথ খুঁজে পেত না।

সেই শহরে সাত বছর চাকরি করবার পরে আইভান ইল্যিচকে সরকারী উকিল হিসাবে আর একটি প্রদেশে বদলি করা হল। তারা সেখানে চলে গেল। টাকা-পয়সায় টান পড়ল। নতুন জায়গাটা স্ত্রীর পছন্দ হল না। বেতন কিছুটা বাড়ল বটে, কিন্তু খরচ বেড়ে গেল বিস্তর। তাছাড়া দুটি সন্তান মারা যাওয়াতে বাড়ির আবহাওয়া আইভান ইল্যিচ-এর পক্ষে আরও দুঃখকর হয়ে উঠল।

নতুন জায়গায় এসে যা কিছু অসুবিধা দেখা দেয় তার জন্যই প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না তার স্বামীকে দোষী করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম আলোচনা, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই আগেকার কোন ঝগড়ার জের টেনে নতুন করে ঝগড়া লেগে যেত। মাঝে-মধ্যে দুজনের প্রেম-ভালবাসার মুহূর্ত এলেও সে খুবই ক্ষণস্থায়ী। সেই মুহূর্তগুলি যেন এক-একটি দ্বীপবিশেষ; সেখানে কিছু সময় কাটিয়েই আবার তাদের যাত্রা শুরু হয় গোপন বিরোধের সমুদ্রে; পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমেই তারা দূরে সরে যায়। সে যদি মনে করত যে এ বিচ্ছিন্নতা ঘটা উচিত নয় তাহলে হয় তো এর জন্য সে দুঃখ পেত, কিন্তু এতদিনে সে এটাকেই স্বাভাবিক জীবন বলে গ্রহণ করেছে এবং গার্হস্থ্য জীবনে সেই লক্ষ্যের দিকেই সে এগিয়ে চলেছে। পারিবারিক জীবনের এই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে নিজেকে ক্রমাগত মুক্ত করে রাখা এবং সে সব পরিস্থিতি যাতে ক্ষতিকর না হতে পারে অথবা অশোভন হয়ে না ওঠে সেটাই তার লক্ষ্য। বাড়িতে যথাসম্ভব অল্প সময় কাটিয়ে সে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে; আর যতক্ষণ বাধ্য হয়ে বাড়িতে থাকতে হয় ততক্ষণ বাইরের অতিথি-সমাগম ঘটিয়ে নিজের শান্তিকে নির্বিঘ্ন করতে চেষ্টা করে। আপিসটাই তার কাছে খুব বড় হয়ে উঠল। তার জীবনের সব আগ্রহ ও স্বার্থ সেই কাজের জগতের মধ্যেই

কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। সেই স্বার্থের মধ্যেই সে ডুবে রইল। স্বীয় ক্ষমতা, কারও সর্বনাশ করতে চাইলে তা সাধন করবার শক্তি, আদালতে ঢুকবার সময় অথবা অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হলে সকলের কাছে নিজ পদের মর্যাদা, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারীদের চোখে তার সাফল্য এবং সর্বোপরি সমস্ত মামলায় তার সার্থক পরিচালনা—এ সব কিছুই তাকে খুসিতে ভরে তোলে; তার উপরে সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা, বাইরে আহারাদি ও "হুইস্ট" খেলা তার জীবনকে ভরে রেখেছে। সুতরাং মোটামুটিভাবে আইভান ইল্যিচ-এর জীবন সুখ ও শালীনতার সঙ্গে তার ঈপ্সিত পথেই চলতে লাগল।

এইভাবে সে আরও সাত বছর বেঁচে রইল। বড় মেয়েটির বয়স হল ষোল, আরও একটি সন্তান মারা গেল, রইল আর একটিমাত্র ছেলে, উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র; তাকে নিয়েও দুজনের মধ্যে মত-বিরোধ। আইভান ইল্যিচ-এর ইচ্ছা তাকে আইন-বিদ্যালয়ে পাঠাবে, অথচ তাকে বাধা দেবার জন্য প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না ছেলেকে পাঠাল উচ্চ বিদ্যালয়ে। মেয়েটি বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছে এবং বেশ ভালই হয়েছে; ছেলেটিও পড়াশুনায় বেশ ভাল।

॥ ৩ ॥

এই হল বিয়ের পর আইভান ইল্যিচ-এর সতেরো বছরের জীবন। বেশ কিছুদিন হল সে সরকারী উকিল হয়েছে এবং একটি আকাংখিত পদের আশায় বেশ কয়েকটি নতুন চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটায় তার মনের শান্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। আইভান ইল্যিচ আশা করে ছিল, একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরের প্রধান বিচারকের পদটি সে পাবে; কিন্তু জনৈক গোপ্পে তার উপর টেক্কা মেরে চাকরিটা বাগিয়ে নিল। আইভান ইল্যিচ অসন্তুষ্ট হল, ভদ্রলোককে গালাগালি করল, তার সঙ্গে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সঙ্গে ঝগড়া করল। সকলে তার উপর অসন্তুষ্ট হল এবং পরবর্তী নিয়োগের সময়ও তার দাবীকে মানা হল না।

এটা ১৮৮০ সালের কথা। আইভান ইল্যিচ-এর জীবনে সেটা সব চাইতে বেদনাদায়ক বছর। সেই বছরই বোঝা গেল যে, একদিকে তার মাইনে তার খরচের পক্ষে অপ্রতুল, আর অন্যদিকে যে ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত দানবীয় ও নিষ্ঠুরতম অন্যায় বলে মনে হল অন্য সবাই সেটাকে খুবই সাধারণ ঘটনা বলে মেনে নিল। এমন কি তার বাবা পর্যন্ত তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে

এল না। তার মনে হল, সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে, তার এই তিন হাজার পাঁচ শ' রুবলের চাকরিটাকে সকলেই স্বাভাবিক ও ভাগ্য বলে মনে করছে। কিন্তু তার উপর তখন চেপে বসেছে তার প্রতি কৃত অবিচার, স্ত্রীর সীমাহীন অবহেলা এবং সাধ্যাতীত খরচপত্রের দরুন ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা। তাই একমাত্র সেই জানে যে এ চাকরি তার পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

খরচপত্র কমাবার জন্য সে বছর গ্রীষ্মকালে ছুটি নিয়ে সে সস্ত্রীক তার শ্যালকের গ্রামে অবসর যাপন করতে চলে গেল।

গ্রামে গিয়ে হাতে কোন কাজ না থাকায় আইভান ইল্যিচ এই সর্বপ্রথম শুধু একঘেয়েমি নয়, একটা দুঃসহ অবসাদেরও শিকার হয়ে পড়ল। সে মনস্থির করে ফেলল যে এ ভাবে চলতে পারে না, একটা চূড়ান্ত পথ তাকে বেছে নিতেই হবে।

ছাদের উপরে পায়চারি করে একটা বিনিদ্র রাত কাটিয়ে দিয়ে আইভান ইল্যিচ স্থির করল, সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে সে পিতার্সবুর্গ যাবে এবং যারা তার কাজের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারে নি তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে সে অন্য কোন বিভাগে বদলির ব্যবস্থা করবে।

পরদিন শাশুড়ি ও স্ত্রীর যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও সে পিতার্সবুর্গ যাত্রা করল।

একটিমাত্র লক্ষ্য তার সামনে—পাঁচ হাজার আয়ের একটা চাকরি যোগাড় করা। যে কোন বিভাগে, যে কোন রকমের, যে কোন কাজ করতে সে রাজী। তার একটি চাকরি চাই—যে চাকরির মাইনে পাঁচ হাজার; তা সে শাসন বিভাগে হোক, ব্যাংক হোক, রেলওয়েতে হোক, এম্প্রেস মারিয়ার প্রতিষ্ঠানে হোক, এমন কি শুল্ক বিভাগে হোক—আসল কথা পাঁচ হাজার; আর একটি কথা, যে বিভাগ তার মূল্য বোঝে নি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

আর কী আশ্চর্য, আইভান ইল্যিচ-এর এই অভিযান আশ্চর্যজনক অপ্রত্যাশিতভাবে সাফল্য লাভ করল। কুর্স্ক্ স্টেশনে পূর্বপরিচিত এফ. এস. ইল্যিন সেই একই প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠল। সেই জানাল যে, কুর্স্ক্-এর গভর্ণর এইমাত্র একটি তারবার্তায় জেনেছে, মন্ত্রিসভায় একটি পরিবর্তন হতে চলেছে—আইভান সেমিয়নভিচ আসছে পিয়তর আইভানভিচ-এর জায়গায়।

এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের গুরুত্ব রাশিয়ার দিক থেকে যাই হোক, আইভান ইল্যিচ-এর পক্ষে বিশেষভাবে অর্থবহ; একটি নতুন লোক পিয়তর পেত্রোভিচ সামনের সারিতে আসা মানেই তার বন্ধু জোহর আইভানভিচ-এর প্রথম সারিতে আসা; আর সেটাই আইভান ইল্যিচ-এর পরিকল্পনার একান্ত অনুকূলে। জোহর আইভানভিচ আইভান ইল্যিচ-এর বন্ধু ও

সহপাঠী।

মস্কোতে সে সংবাদ সমর্থিত হল। পিতাস্‌বুর্গে পৌঁছে আইভান ইল্‌য়িচ জোহর আইভানভিচকে খুঁজে বের করল এবং তার পূর্বতন কর্মক্ষেত্র বিচার বিভাগেই একটি চাকরির সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেল।

এক সপ্তাহ পরে সে তার স্ত্রীকে তারবার্তা পাঠাল: "জোহর মিলারের বাড়ি। প্রথম সংবাদ চাকরি পেয়েছি।"

এই সব পরিবর্তনকে ধন্যবাদ, আইভান ইল্‌য়িচ অপ্রত্যাশিতভাবে আগেকার বিভাগেই এমন একটি চাকরি পেয়ে গেল যাতে সে পূর্বতন সহকর্মীদের চাইতে দু' ধাপ উপরে উঠে গেল, আর তার আয় দাঁড়াল পাঁচ হাজার এবং যাতায়াতের খরচ বাবদ আরও তিন হাজার পাঁচ শ' সরকারী ভাতা। আগেকার শত্রু ও বিভাগীয় লোকজনদের সঙ্গে যে মনোমালিন্য ছিল সব ভুলে গিয়ে আইভান ইল্‌য়িচ সব দিক থেকেই সুখী হয়ে উঠল।

অনেক দিন পরে বেশ হাল্কা মনে ও খোশ মেজাজে আইভান ইল্‌য়িচ গ্রামে ফিরে গেল। প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌নার মেজাজও ভাল হয়ে গেল; দুজনের মধ্যে শান্তি ফিরে এল। আইভান ইল্‌য়িচ সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল যে, পিতার্সবুর্গে সকলেই তাকে খুব শ্রদ্ধা-সম্মান করেছে, আগেকার শত্রুরা সব লজ্জায় মুখ নীচু করেছে, তার নতুন চাকরি ও পিতার্সবুর্গে তার মান-মর্যাদা দেখে তারা ঈর্ষায় জ্বলেছে।

প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না সব কথা শুনে বিশ্বাস করার ভাণ করল, কিন্তু তার কোন কথার প্রতিবাদ করল না; বরং শহরে গিয়ে কি ভাবে গুছিয়ে বসবে তারই পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর সে সব যে তারই পরিকল্পনা তা দেখে আইভান ইল্‌য়িচও খুসি হল; তার জীবনের গোলযোগের অধ্যায়টা কেটে গিয়ে আবার তার স্বাভাবিক হাল্কা মেজাজ ও শালীনতা ফিরে এল।

খুব অল্প কিছুদিনের জন্যই সে গ্রামে ফিরে এসেছিল। ১০ই সেপ্টেম্বর তাকে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে হবে; তাছাড়া নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসতে, আগেকার কর্মস্থল থেকে জিনিসপত্রগুলি আনাতে ও বাড়তি কিছু জিনিসপত্র কিনতে ও অর্ডার দিতে এক কথায় তার নিজের মনের মত করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌নার মনের মত করে সব কিছু বিধি-ব্যবস্থা করতেও তো কিছুটা সময় লাগবে।

এবারে সব ব্যবস্থাই ভালভাবে হয়ে গেল, সে আর তার স্ত্রী সব বিষয়ে এতখানি একমত হতে লাগল যে বিবাহিত জীবনের প্রথম কিছুদিন ছাড়া আর কখনও সে রকমটি হয় নি। আইভান ইল্‌য়িচ ভেবেছিল সপরিবারেই কর্মস্থলে যাবে, কিন্তু তার শ্যালক ও তার স্ত্রী হঠাৎ তাদের সকলের প্রতি এতই সদয় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং তাদের আরও কিছুদিন বাড়িতে

রাখতে এতই পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে সে একাই কর্মস্থলে যাত্রা করল।

আইভান ইল্যিচ চলে গেল; নতুন সাফল্যের দরুন তার হাল্কা মন-মেজাজ এবং স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভাব দুয়ে মিলে তার মনটা বেশ খুসিই ছিল। যে বাসাটা সে পেল সেটাও চমৎকার; ঠিক যে রকমটি স্বামী ও স্ত্রী কল্পনা করেছিল। পুরনো কালের ধাঁচে তৈরি একটা প্রশস্ত, উঁচু বসবার ঘর, তার নিজের জন্য একটি বেশ আরামদায়ক রুচিপূর্ণ পড়ার ঘর, স্ত্রী ও মেয়ের ঘর, ছেলের থাকা-পড়ার ঘর, সব কিছু যেন তাদের প্রয়োজন মত করেই তৈরি করা হয়েছে। আইভান ইল্যিচ মনের মত করে বাসাটা সাজাল; দেয়াল-কাগজ পছন্দ করল, বেছে বেছে পুরনো ধরনের আসবাবপত্র কিনে আনল কারণ ঐ রকম জিনিসই তার কাছে বেশ সভ্যভব্য মনে হয়। এইভাবে জিনিসপত্র বাড়াতে বাড়াতে সব কিছু তার মনের মত করে সাজাতে লাগল। কাজ যখন অর্ধেক এগিয়েছে তখন দেখা গেল যে তার নিজের মনের বাসনাকেও সে ছাড়িয়ে গেছে। সবটা সারা হয়ে গেলে না জানি কেমন দাঁড়াবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল বসবার ঘরটা কেমন দেখাবে; অগ্নিকুণ্ড, পর্দা, ফুলদানি, এখানে-ওখানে বসানো ছোট ছোট চেয়ার, দেয়ালে ডিস-প্লেট, ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি—সব যেন তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সব কিছু দেখে প্রাস্কোভ্যা ও লিজাংকা কেমন অবাক হয়ে যাবে ভাবতেও তার খুব ভাল লাগল। এ রকমটা নিশ্চয় তারা আশা করবে না। অনেক খুঁজে খুঁজে সে কিনে আনল বিশেষ করে পুরনো অথচ সস্তার আসবাব-পত্র, কারণ তাতে একটা বিশেষ ধরনের আভিজাত্যের ছাপ থাকে। চিঠিপত্রে সে ইচ্ছা করেই সব ব্যাপারটাকে খাটো করে লিখল যাতে তাদের একেবারে অবাক করে দিতে পারে। এই সব নিয়ে সে এতই মসগুল হয়ে পড়ল যে সরকারী কাজে এত উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তাতে তার মন আশানুরূপভাবে বসল না। আদালতে বসেই মাঝে মাঝে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত; তার মনে ভাবনা ঢুকত জানালার পর্দাগুলি কি ধরনের হলে ভাল হয়। গৃহস্থালির কাজে তার আগ্রহ এতখানি বেড়ে গেল যে অনেক সময় সে নিজের হাতেই কাজ করতে লাগল, একটা আসবাব ঠেলে সরিয়ে দিল, অথবা একটা পর্দা খাটিয়ে দিল। একদিন তো মজুরকে একটা কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য মই বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে ভুল করে পা ফেলে পড়ে যাচ্ছিল আর কি; কোন রকমে মইটা ধরে ঝুলে আত্মরক্ষা করল বটে, কিন্তু একটা ফ্রেমের ধাক্কা লাগল তার বুকে। জায়গাটা ছড়ে গিয়ে ব্যথা হল, তবে শিগগিরই সেরে গেল। এই সময়টা তার খুবই ভাল কাটতে লাগল। সে লিখল: "আমার বয়স যেন পনেরো বছর কমে গেছে।" সে ভেবেছিল, বাসা সাজানো সেপ্টেম্বরেই

শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু কাজটা চলল অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তবে ফল হল চমৎকার; শুধু সেই নয়, যে দেখল সেই বলল।

আসলে কিন্তু তার মধ্যে অসাধারণ কিছু ছিল না; যে সব লোক ধনবান না হয়েও নিজেদের ধনবান বলে জাহির করতে চায়, এবং তা করতে গিয়ে একে অন্যের অনুরূপ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সেই একই ঝাড়-লণ্ঠন, কালো কাঠ, ফুল, কম্বল, ব্রোঞ্জের মূর্তি, সব কিছু ঝকঝকে করে পালিশ করা, যে সব জিনিস এক শ্রেণীর সব লোকের আছে বলে অন্য আরেক শ্রেণীর লোকেরও থাকা চাই, সেই সব জিনিস দিয়েই আইভান ইল্‌য়িচও ঘর-বাড়ি সাজিয়েছিল। তার ফল এই দাঁড়াল যে সে সব জিনিস মনের উপর কোন বিশেষ প্রভাব ফেলতে না পারলেও সে নিজে ভাবল যে একটা বিশেষ রকমের কিছু করেছে। রেলস্টেশন থেকে পরিবারের লোকদের নিয়ে এসে সে যখন নতুন করে সাজানো বাড়িতে ঢুকল, তখন সমস্ত বাড়িটাতে আলো জেবলে দেওয়া হয়েছে; সাদা টাই-পরা একজন পরিচারক এসে দরজা খুলে দিল; প্রথম ঘরটা ফুল দিয়ে সাজানো; একে একে তারা বসবার ঘরে ও পড়ার ঘরে ঢুকে আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল; তা দেখে সেও খুসি হয়ে তাদের সব কিছু দেখাতে লাগল, আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে বার বার পানীয়ে চুমুক দিতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে সে যখন নানা বিষয়ে কথা বলছিল, তখন প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্‌না তার পড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটা তুলতেই সে হো-হো করে হেসে উঠে তাদের দেখিয়ে দিল কেমন করে একটা লাফ দিয়ে সে শয্যাকারীকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

"আরে, আমি তো একজন খেলোয়াড় মানুষ। অন্য কেউ হলে হয় তো মরেই যেত, কিন্তু আমার শুধু এখানটায় একটু লেগেছিল; এখানে হাত দিলে লাগে, তবে ধীরে ধীরে সেরে যাচ্ছে; একটুখানি ছড়ে গিয়েছিল মাত্র।"

সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, নতুন বাসায় বাস করতে করতে তাদেরও এক সময় মনে হতে লাগল যে বাসাটায় একটা ঘর যেন কম আছে, আর তাদের আয়টাও যৎসামান্য—মানে এই পাঁচশ' রুবলের মত কম হচ্ছে; নইলে আর সবই বেশ ভাল। সাজানো-গোছানো চূড়ান্তভাবে শেষ হবার আগে পর্যন্ত সবই ভালভাবে চলতে লাগল, কারণ তখনও অনেক কিছু করার ছিল—কিছু কেনাকাটা, কিছু অর্ডার দেওয়া, কিছু সরানো-নড়ানো, কিছু ঠিক মত ঠিক জায়গায় রাখা। অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু খিটিমিটি যে বাধল না তা নয়, তবে দুজনেই এত খুসি ছিল; আর হাতে এত কাজ ছিল যে বড় রকমের ঝগড়া-ঝাটি কিছু হল না। তবে সব

কাজকর্ম যখন সারা হয়ে গেল তখন কিছুটা একঘেয়ে লাগতে লাগল, কিসের যেন অভাব বোধ হতে লাগল। কিন্তু ততদিনে কিছু নতুন লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় এবং নতুন কিছু অভ্যাস গড়ে ওঠায় জীবন আবার ভরে উঠল।

সকাল বেলাটা আদালতে কাটিয়ে আইভান ইলয়িচ খাবার সময় বাড়ি ফিরত। সাধারণত সে সময় তার মেজাজ বেশ ভালই থাকত, তবে নতুন বাসাটা নিয়ে মাঝে মাঝে কিছুটা বিচলিত বোধ করত। টেবিল-ঢাকায় বা পর্দায় একটা দাগ পড়লে, অথবা জানালার পর্দার একটা দড়ি ছিঁড়ে গেলে সে ভারি বিরক্ত হত। এত কষ্ট করে সে ঘরগুলি সাজিয়েছিল যে তার একটু এদিক-ওদিক হলেই তার মনে লাগত। তবে মোটামুটিভাবে আইভান ইলয়িচ-এর জীবন তার আশানুরূপ ভাবেই চলতে লাগল—সহজ, স্বচ্ছন্দ, ও শোভন। ন'টায় উঠে সে কফি খেত, খবরের কাগজ পড়ত, তারপর সরকারী পোষাক পরে আদালতে যেত। সেখানে দৈনন্দিন কর্মসূচী তৈরি করাই থাকত, সেও কাজ শুরু করে দিত। দরখাস্ত হাতে লোকজন, নানা রকম খোঁজ-খবর, আপিসের কাজ, সরকারী ও বেসরকারী সাক্ষাৎকার। এ সব কাজে একমাত্র দরকার হল লোকের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক ছাড়া অন্য সব রকম সম্পর্ককে অস্বীকার করে চলা; সব কাজকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী; সমস্ত কাজটাই তো তাই। ধরা যাক, একটি লোক কোন খবর জানতে এল। আইভান ইলয়িচ যদি তখন কর্তব্যরত অবস্থায় না থাকে তাহলে লোকটির জন্য তার কিছুই করণীয় থাকবে না, কিন্তু আদালতের একজন সদস্য হিসাবে লোকটির সঙ্গে যদি তার কোন সম্পর্ক থাকে (যে সম্পর্ককে সরকারী শিরোনামভূষিত কাগজে লিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়) তাহলে তার জন্য সে যথাসাধ্য সব কিছু করবে এবং তা করতে গিয়ে মানবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক অর্থাৎ সামাজিক জীবনের রীতিনীতিকেই মেনে চলবে। কিন্তু সরকারী সম্পর্কের যেখানে ইতি, অন্য সব কিছুরও সেখানেই ইতি। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও বাস্তব জীবনের মধ্যে এই পার্থক্যকে বজায় রেখে চলবার কৌশলটা সে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করে নিয়েছিল; দীর্ঘ অনুশীলন ও স্বাভাবিক প্রবণতার গুণে সে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী ও মানবিক সম্পর্ককে এক সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ধূম পান করত, চা খেত, রাজনীতির কথাবার্তা বলত, সাধারণের কথা নিয়ে আলোচনা করত, তাসের কথাও হত; কিন্তু সব চাইতে বেশী কথা হত চাকরিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। খুসি মনে শ্রান্ত দেহে সে বাড়ি ফিরত। মেয়ে ও তার মা কোন দিন হয় তো কোথাও বেড়াতে যায়, কোন দিন বা অন্যরাই এ বাড়িতে

আসে ; ছেলে তার শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করে, বিদ্যালয়ের পড়াগুলি নির্ভুলভাবে শেখে। সব কিছু ঠিক-ঠিক মতই চলে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে কোন অতিথি না থাকলে আইভান ইল্যিচ কোন বহু-আলোচিত বই নিয়ে পড়তে বসে ; সন্ধ্যার পরে কাজ করে, অর্থাৎ সরকারী কাগজপত্রে চোখ বোলায়, আইনের সঙ্গে সেগুলি মিলিয়ে নেয়, এজাহারগুলি আইন-মোতাবেক সাজিয়ে রাখে। এসব কাজ তার কাছে ক্লান্তিকরও মনে হয় না, আকর্ষণীয়ও লাগে না। "স্ক্রু" খেলা থাকলে এসব কাজ ভাল লাগে না ; কিন্তু তা যখন না থাকে তখন একা একা অথবা স্ত্রীর সঙ্গে বসে কাটানোর চাইতে এ কাজ অনেক ভাল লাগে। ছোটখাট ভোজসভার আয়োজন করায় আইভান ইল্যিচ-এর খুব আনন্দ। তাই সে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন নারী-পুরুষদের প্রায়ই বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনে।

একবার তারা একটা পার্টিও দিল—নাচের পার্টি। আইভান ইল্যিচ সেটা খুব উপভোগ করল ; হ'লও বেশ ভাল ; শুধু চাট্নি ও মিষ্টির ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একটা তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না'র এক রকম ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু আইভান ইল্যিচ জিদ্ করে একটা দামী দোকান থেকে মিষ্টিগুলো আনাল, আর চাটনি আনাল অনেক বেশী পরিমাণে। এই নিয়ে লেগে গেল ঝগড়া, কারণ চাটনিটা পরেই রইল, আর মিষ্টিওয়ালার বিল উঠল পয়তাল্লিশ রুবল। ঝগড়াটা এতই তুঙ্গে উঠল যে এক সময় প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না তাকে বলল "বোকা, অপদার্থ," আর সেও দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে রাগের মাথায় বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলে ফেলল। কিন্তু পার্টি'টা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। সব সেরা লোকরা এসেছিল এবং "আমার বোঝা বহন কর" নামক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বোন রাজকুমারী ক্রুফনভ-এর সঙ্গে নেচেছিল আইভান ইল্যিচ নিজে। কিন্তু তার সব চাইতে ভাল লেগেছিল "স্ক্রু" খেলাটা, যার রুশ নাম "পোকার"। সে নিজেই স্বীকার করে, তখন তার জীবনে যত অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটে থাকুক, হৈ-চৈ করা খেলুড়ে নয় সত্যিকারের ভাল খেলুড়ের সঙ্গে বসে "স্ক্রু" খেলার আনন্দ সব কিছুকে ছাপিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার মত জ্বল জ্বল করে ; অবশ্য খেলাটা চার হাতের হওয়া চাই (অনেকে পছন্দ করলেও পাঁচ হাতের খেলাটা মোটেই জমে না) এবং ভাল তাস পাওয়া চাই ; তখন গম্ভীরভাবে খেল, ভোজন কর, তারপর এক গ্লাস মদে চুমুক দাও। "স্ক্রু" খেলা শেষ করে, অল্পসল্প কিছু বাজি জিতে (বেশী টাকা জেতা ভাল না) আইভান ইল্যিচ খুসি মনে ঘুমুতে চলে যেত।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। তারা উঁচু মহলে চলা ফেরা করত ; পদস্থ

লোক ও যুবকরাও তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। যুবকদের নজর পড়ল লিজাংকার উপর। দিমিত্রি আইভানভিচ পেত্রিশ্চেভ-এর ছেলে, তার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ও তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট পেত্রিশ্চেভ লিজাংকার প্রতি এতদূর মনোযোগী হয়ে উঠল যে তাদের দুজনকে একটি স্লেজ-ভ্রমণে পাঠাবার বা কোন থিয়েটারে পাঠাবার ব্যবস্থা করা দরকার কিনা সে কথা নিয়ে আইভান ইলয়িচ স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত শুরু করে দিল। এই ভাবেই দিন কাটতে লাগল। বিনা পরিবর্তনে সব কিছু এই ভাবেই চলতে লাগল এবং ভালই চলতে লাগল।

॥ ৪ ॥

সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল ছিল। আইভান ইলয়িচ মাঝে মাঝে বলত, তার মুখটা বিস্বাদ লাগে, আর পাকস্থলীর বাঁদিকটায় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। কিন্তু সেটাকে তো কেউ স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ বলবে না।

কিন্তু সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং ঠিক ব্যথা না হলেও একটা পাশ যেন ভারী মনে হতে লাগল, আর মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে উঠল। সেই খিটখিটে মেজাজটা বাড়তে বাড়তে ক্রমে গলোভিন পরিবারের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও শালীনতাকেই নষ্ট করে ফেলতে লাগল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হয়, জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিদায় নিল, অতি কষ্টে বাইরের চাল-চলনটা বজায় রেখে তারা দিন কাটাতে লাগল। মাঝে মাঝেই আবার অশালীন ঘটনা ঘটতে লাগল। বিনা সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীর মিলন আবারও গোলযোগের সমুদ্রে কয়েকটি ছোট দ্বীপসদৃশ হয়ে উঠল। প্রাস্কোভয়া ফিয়োদরভনা অকারণেই বলতে লাগল যে তার স্বামীর মেজাজ বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে। সব কিছু বাড়িয়ে বলার স্বভাবের জন্য সে বলতে লাগল, তার স্বামীর এই বদমেজাজ চিরদিনের ব্যাপার, নিজের স্বভাব ভাল বলেই সে বিশ বছর তার সঙ্গে ঘর করতে পেরেছে। তার রাগের ঝড় বইত ঠিক খাবার আগে, এবং প্রায়শই ঝোলটা মুখে দেবার ঠিক আগে। তার চোখে পড়ত, বাসনের একটা কোণা হয় তো ভেঙে গেছে, বা রান্নাটা ভাল হয় নি, অথবা ছেলে টেবিলের উপর কনুই তুলে বসেছে, বা মেয়ের চুলটা পরিষ্কার করে বাঁধা হয় নি। আর সে সব কিছুর জন্যই সে দায়ী করত প্রাস্কোভয়া ফিয়দরভনাকে। প্রথম প্রথম প্রাস্কোভয়া ফিয়দরভনাও পাল্টা জবাব দিত, স্বামীকে তুলো-

ধোনা করত; কিন্তু দু'দিন খাবার ঠিক আগে তার স্বামী এমন পাগলের মত রেগে গেল যে সে বুঝতে পারল, এটা মাথার গোলমালের জন্য ঘটেছে, আর তাই সে নিজেকে সংযত করে নিল; কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি খাবার পাট চুকিয়ে ফেলল। সে তখন ঠিক ধরে নিল যে তার স্বামীর মেজাজ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, ফলে তার জীবন হয়ে উঠেছে শোচনীয়, নিজের জন্য তার দুঃখের আর অবধি রইল না। যত নিজের দুঃখের কথা ভাবে, স্বামীর প্রতি ঘৃণা ততই বাড়ে। এক সময় তার মনে হল, এর চাইতে স্বামীর মৃত্যু হলেও ছিল ভাল; আবার তার মৃত্যুও সে কামনা করতে পারে না, কারণ তাহলে যে সংসারের কোন আয় থাকবে না। আর তাতেই স্বামীর প্রতি সে আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। নিজেকে সে ভয়ংকরভাবে ভাগ্যহীনা ভাবতে লাগল, কারণ তার স্বামীর মৃত্যুও তাকে বাঁচাতে পারবে না। মনের এই তীব্র বিরক্তিকে সে চেপেই রাখল; ওদিকে তার এই চাপা বিরক্তি তার স্বামীর মেজাজকে আরও খিটখিটে করে তুলল।

আবার একদিন তুমুল ঝগড়া হল। সেদিন আইভান ইল্‌য়িচ-এরই দোষ ছিল। নিজের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে সে বলল, সত্যি তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়েছে আর তার অসুস্থতাই এর কারণ। তখন স্ত্রীও বলল, সে যদি অসুস্থই হয়ে থাকে তাহলে তার উচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া এবং একজন নাম-করা ডাক্তারকে দেখাবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

তাই সে গেল। সেখানেও যেমনটি আশা করা গিয়েছিল সব কিছু সেই রকমই ঘটল। ডাক্তর বলল: এটা-ওটা দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে আপনার শরীরের মধ্যে এই-এই ত্রুটি ঘটেছে; কিন্তু সেটা যদি এটা-ওটার পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত না হয় তাহলে আমরা এটা অথবা ওটা ধরে নেব। যদি আমরা এটা অথবা ওটা ধরে নেই, তাহলে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আইভান ইল্‌য়িচ-এর একটিমাত্র প্রশ্ন: তার অবস্থাটা বিপজ্জনক কি না? ডাক্তার কিন্তু সে অবান্তর প্রশ্নের দিকেই গেল না। ডাক্তারের দিক থেকে সে-প্রশ্নটা গৌণ, আলোচনার মূল বিষয় নয়; আসল প্রশ্ন হল—মূত্রাশয়ের দুর্বলতা, পুরাতন শ্লেষ্মা ও অ্যাপেণ্ডিসাইটিস এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টির সম্ভাবনা অধিক। আইভান ইল্‌য়িচ-এর জীবনের কথাটা বড় নয়, মূল কথা হল মূত্রাশয়ের দুর্বলতা না আন্ত্রিক বিবর্ধন। আর আইভান ইল্‌য়িচ-এর মনে হল, ডাক্তার খুব চমৎকার ভাবেই আন্ত্রিক বিবর্ধনের সপক্ষে রায় ঘোষণা করল; অবশ্য একটি শর্ত যোগ করে দিল যে প্রস্রাব পরীক্ষা করলে যদি নতুন কোন হদিস পাওয়া যায় তাহলে তার রায়টাও বদলে যেতে পারে। এই সব দেখে শুনে আইভান ইল্‌য়িচ-এর নিজের জন্য যেমন করুণা হল, তেমনি রাগ হল ডাক্তারের উপর।

কিন্তু মুখে সে কিছুই বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের প্রাপ্য অর্থটা টেবিলে রেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা রোগীরা হয়তো অনেক সময়ই অসুবিধাজনক প্রশ্ন করে থাকি। আমাকে বলুন, এটা মারাত্মক রোগ কি না?"

ডাক্তার চশমার ভিতর দিয়ে এক চোখে তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল; যেন বলতে চাইল: "কাঠগড়ায় বন্দী, তোমাকে যে সব প্রশ্ন করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার সীমার মধ্যে যদি না থাক, তাহলে তোমাকে আদালতের সীমানার বাইরে পাঠাবার মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আমি বাধ্য হব।" মুখে বলল, "যা বলা দরকার ও উচিত তা তো বলে দিয়েছি; বাকিটা পরীক্ষায় ধরা পড়বে।" ডাক্তার অভিবাদন জানিয়ে তাকে বিদায় দিল।

হতাশ হৃদয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে আইভান ইলুয়িচ স্লেজে চড়ে বাড়ি ফিরে গেল। সারাটা পথ সে মনে মনে ডাক্তারের কথাগুলিই আওড়াতে লাগল; সেই সব জটিল, অস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক শব্দের একটা সরল নির্গলিতার্থ বের করে তার প্রশ্নের জবাব খুঁজতে লাগল—এটা কি খুব খারাপ, না কি এখনও তেমন খারাপ কিছু হয় নি? সব কিছু ভেবেচিন্তে তার মনে এই ধারণা জন্মাল যে, অবস্থা খুবই খারাপ। পথে যেতে যেতে আইভান ইলুয়িচ-এর কাছে সব কিছুই নিরানন্দ বলে মনে হতে লাগল। স্লেজ-চালকরা নিরানন্দ, বাড়িগুলি নিরানন্দ, চলমান জনস্রোত ও দোকানপাট সবই নিরানন্দ। এই ব্যথা, এই একটানা কামড়ানো ব্যথা, যে ব্যথা এক সেকেণ্ডের জন্যও থামে না, ডাক্তারের অস্পষ্ট কথাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা যেন নতুন করে গুরুতর হয়ে দেখা দিল। এখন থেকে একটা নতুন দুঃখ নিয়ে সে তার ব্যথাটার উপর নজর রেখে চলল।

বাড়িতে পেঁছে সব কথাই সে স্ত্রীকে বলল। তার স্ত্রী বসে শুনছিল; কিন্তু কথার মাঝখানে তার মেয়ে টুপিটা হাতে নিয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘরে ঢুকল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আধা বসে এই এক-ঘেয়ে বিবরণ শুনতে লাগল; কিন্তু বেশীক্ষণ শুনতে পারল না; তার মাও শেষ পর্যন্ত শুনল না।

বলল, "দেখ, আমি খুব খুসি হয়েছি; এবার তুমিও নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়মিত ওষুধ খাবে। ব্যবস্থাপত্রটা আমাকে দাও; গেরাসিমকে ওষুধের দোকানে পাঠাচ্ছি।" সেও বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে ঘর থেকে চলে গেল।

স্ত্রী যতক্ষণ ঘরে ছিল ততক্ষণ আইভান ইলুয়িচ নিঃশ্বাস নিতে পারে নি; সে চলে গেলে তবে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, "দেখা যাক, হয় তো এখনও তেমন কিছুই হয় নি।"

সে ওষুধ খেতে শুরু করে দিল। ডাক্তারের নির্দেশ মত চলতে লাগল।

প্রথম দিকে তাতে মনে বেশ স্বস্তিও ফিরে এল।

ব্যথাটা কমল না; কিন্তু আইভান ইল্‌য়িচ জোর করেই ভাবতে লাগল যে সে অনেক ভাল হয়ে গেছে। আর যতদিন উদ্বেগজনক কিছু না ঘটল ততদিন এই বিশ্বাসেই সে নিজেকে ঠকিয়ে চলল। কিন্তু যে মুহূর্তে একটা খারাপ কিছু ঘটত, হয় তো স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল, সরকারী কাজ ঠিক মত করা হল না, "স্ক্রু" খেলতে বসে হাতে খারাপ তাস এল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অসুখের কথা তার মনে পড়ে যেত। এর আগে এ ধরনের আকস্মিক ঘটনাকে সে মানিয়ে নিতে পারত, আশা করত ভুলটা শুধরে নেবে, সংগ্রাম করবে, কাজে সফলতা লাভ করবে, হাতে ভাল তাস পাবে। কিন্তু ইদানীং খারাপ কিছু ঘটলেই সে মুসড়ে পড়ে, হতাশায় ভেঙে পড়ে। নিজের মনেই বলে: "এই তো সবে ভাল হতে আরম্ভ করেছি, ওষুধের ফল ফলতে শুরু করেছে, এরই মধ্যে আবার দুর্ঘটনা ও হতাশা।" সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ঘটনা ও যারা সেটা ঘটিয়ে তাকে মেরে ফেলছে সে সব কিছুর উপর সে খাপ্পা হয়ে ওঠে; সে বুঝতে পারে যে এই মানসিক উত্তেজনা তার ক্ষতি করছে, কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারে না। কেউ ভাবতে পারে যে, এই উত্তেজনা যে তার ক্ষতি করছে এবং এই সব অপ্রীতিকর ঘটনার দিকে যে তার নজর দেওয়া উচিত নয় এ কথা তো তার বোঝা উচিত। কিন্তু তার চিন্তার ধারাটা ঠিক উল্টো দিকে চলে। সে বলে, সে শান্তি চায়, কাজেই যা কিছু তার শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায় তার প্রতিই তাকে নজর রাখতে হয়, আর সেই শান্তির তিলমাত্র বিঘ্ন ঘটলেই সে ক্রোধে ফেটে পড়ে। সে নিয়মিত ডাক্তারি বই পড়ে ও ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে বলেই তার অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। যখনই ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তখনই তার মনে হয় যে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে এবং বেশ দ্রুত গতিতেই খারাপ হয়ে চলেছে। আর তা সত্ত্বেও ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করা তার চাই।

সে মাসে আরও একজন খ্যাতনামা ডাক্তারকে সে দেখাল। প্রথম খ্যাতনামাটি যা যা বলেছিল দ্বিতীয় খ্যাতনামাটিও সেই একই কথা বলল; শুধু প্রশ্নগুলি করল ভিন্নভাবে; ফলে আইভান ইল্‌য়িচ-এর সন্দেহ ও আতংক আরও বেড়ে গেল। তার বন্ধুর বন্ধু একটি ভাল ডাক্তার রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করল; রোগ-নিরাময় সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস দিলেও তার নানা রকম প্রশ্ন ও ধারণার কথা শুনে আইভান ইল্‌য়িচ-এর মনে সব কিছু এমন ভাবে গুলিয়ে গেল যে তার সন্দেহটাই আরও বেড়ে গেল। একজন হোমিওপ্যাথ আবার অন্য রকম ভাবে রোগ-নির্ণয় করে ওষুধ দিল এবং সেও লুকিয়ে এক সপ্তাহ সে ওষুধ খেল। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও রোগ হ্রাস না পাওয়ায় অপর ডাক্তার এবং হোমিওপ্যাথ দুজনের উপরেই বিশ্বাস হারিয়ে সে আরও

মন-মরা হয়ে পড়ল। পরিচিত এক মহিলা একদিন পবিত্র ছবির সাহায্যে রোগ-নিরাময়ের কথা বলল। আইভান ইল্‌য়িচ মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনল এবং বিশ্বাসও করে বসল। এই ঘটনাটি তাকে আরও আতংকিত করে তুলল। নিজে নিজেই বলল, "আমার বুদ্ধি কি এতই ভোঁতা হয়ে গেছে? যত সব অর্থহীন বাজে কথা! এ ধরনের স্নায়বিক আতংক আর নয়। এবার থেকে একজন ডাক্তার ঠিক করে তার চিকিৎসামতই চলব। তাই করব। এটা একেবারে পাকা। আগামী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত আর এ নিয়ে ভাবব না। যা হয় তারপর দেখা যাবে। এই দো-টানা ভাবটা বন্ধ করতেই হবে।" কথাটা বলা সহজ, কিন্তু মেনে চলা কঠিন। পাশের ব্যথাটা লেগেই আছে, ক্রমেই যেন বাড়ছে আর এক নাগাড়ে চলেছে; মুখের স্বাদটাও যেন অদ্ভুত ঠেকছে, নিঃশ্বাসেও যেন একটা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, আর ক্ষুধা ও গায়ের জোরও কমে আসছে। নিজেকে ঠকিয়ে তো লাভ নেই; আইভান ইল্‌য়িচ-এর জীবনে এমন কিছু ঘটছে যা এর আগে কখনও ঘটে নি, যা ভয়ংকর ও নতুন। এ কথা শুধু সেই জানে। তার আশেপাশের লোকরা তা জানে না, জানতে চায়ও না। তারা মনে করছে, জগতটা ঠিক আগেকার মতই চলছে। আর এটাই আইভান ইল্‌য়িচকে সব চাইতে বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছে। তার নিজের বাড়ির লোকজন, বিশেষ করে তার স্ত্রী ও মেয়ে, অতিথিদের স্রোত নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে তার অবস্থাটা তারা বোঝেই না; বরং তার এই মন-মরা খুঁৎখুঁতে ভাবের জন্য বিরক্ত হয়ে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে। তার স্ত্রী তো সকলের কাছেই বলে বেড়ায়: "অন্য সাধারণ লোকদের মত আইভান ইল্‌য়িচ তো কোন ডাক্তারের কথা মতই চলে না। একদিন হয় তো ঠিক মত ওষুধ খেল, যথাসময়ে শুতে গেল; কিন্তু পরদিন আমি নজর না দিলেই সে ওষুধ খেতে ভুলে যাবে, 'স্টার্জন' গিলবে (যেটা ডাক্তারের বারণ) এবং মাঝ রাত পর্যন্ত জেগে 'স্ক্রু' খেলবে।"

বিরক্ত হয়ে আইভান ইল্‌য়িচ একদিন পিয়তর আইভানভিচকে বলল, "সে কি, সে রকমটা আবার কখন করলাম?"

"কেন, কাল, শেবেক-এর সঙ্গে।"

"তাতে কি হল? ব্যথার জন্য আমি ঘুমুতে পারছিলাম না।"

"দেখ, কি জন্য কি করেছ সেটা কথা নয়; মোদ্দা কথা, এভাবে চললে তুমি কোন দিন ভাল হয়ে উঠবে না, আর আমাদের জ্বালাবে।"

চাকরি জীবনেও তার প্রতি সকলের ব্যবহারে একটা পরিবর্তন সে লক্ষ্য করল, অন্তত তার সেই রকম মনে হতে লাগল। কখনও তার মনে হত, সকলে তার দিকে এমন কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে আছে যেন শীঘ্রই সে চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে; কখনও বা বন্ধুরা তার স্নায়বিক আতংক নিয়ে

তার পিঠটা একটু চাপড় দেয়, যেন তার জীবনের এই ভয়ংকর অবস্থাটাও তাদের কাছে একটা তুচ্ছ হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার। বিশেষ করে ফুর্তিবাজ শ্ভার্ত্স্ তার দশ বছর আগেকার জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে আরও উত্তেজিত করে তোলে।

আর এইভাবে একা তাকে জীবন কাটাতে হচ্ছিল যেন পর্বতের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে; তাকে বুঝতে পারে, তার জন্য কষ্টবোধ করতে পারে এমন কেউ তখন তার পাশে নেই।

॥ ৫ ॥

এইভাবে একমাস, তার পরের মাস কেটে গেল। নববর্ষের ঠিক আগে তার শ্যালক শহরে এল তাদের সংগে দেখা করতে। সে যখন পৌঁছল, আইভান ইল্যিচ তখন আদালতে; প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভনা বেরিয়ে গেছে কেনাকাটা করতে। বাড়িতে ফিরে পড়ার ঘরে গিয়ে সে দেখল, তার শ্যালক ট্রাংকটা খুলে জিনিসপত্র বের করছে। আইভান ইল্যিচ-এর পায়ের শব্দ শুনে সে মাথাটা তুলল, এবং কোন কথা না বলে এক সেকেন্ড তার দিকে তাকাল। সেই তাকানোই আইভান ইল্যিচকে সব কিছু বলে দিল। সবিস্ময়ে "ওঃ!" কথাটা বলতে গিয়েও শ্যালক নিজেকে সংযত করে নিল। তাতেই সব বলা হয়ে গেল।

"কি! আমি বদলে গেছি, না?"

"হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে।"

তারপর আইভান ইল্যিচ কথা বলার চেষ্টা করেও শ্যালকের মৌনতা ভাঙতে পারল না। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না বাড়ি ফিরলে শ্যালক তার সংগে দেখা করতে গেল। আইভান ইল্যিচ দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল; প্রথমে মুখোমুখি, তারপর পাশ থেকে। স্ত্রীর সংগে তোলা ফটোখানা হাতে নিয়ে তার সংগে আয়নায় দেখা চেহারাটা মিলিয়ে দেখল। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তারপর কনুই পর্যন্ত হাতটা খুলে দেখে আবার আস্তিনটা নামিয়ে দিল; আবার "অটোমান"টায় গিয়ে বসল; তার মন তখন রাতের চেয়েও অন্ধকার।

"এ ভাবে চলবে না, চলবে না", নিজের মনেই কথাগুলি বলে সে লাফ দিয়ে উঠে টেবিলের কাছে গেল, দেরাজ খুলে কিছু সরকারী কাগজ বের করে পড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। দরজা খুলে বসবার ঘরে গেল। দরজাটা বন্ধ। পা টিপে টিপে এগিয়ে সে কান পাতল।

প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না বলছে, "না, না, তুমি বাড়িয়ে বলছ।"

"বাড়িয়ে বলছি? তোদের চোখ নেই। আরে, ও তো মরা মানুষের সামিল। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখিস—সেখানে আলোর চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ওর হয়েছে কি?"

"কেউ বলতে পারছে না। নিকোলেভ (জনৈক ডাক্তার) কি যেন বলছে, আমি জানি না। লেশ্চেতিস্কি (সেই বিখ্যাত ডাক্তার) বলেছে ঠিক তার উল্টো।"

আইভান ইল্যিচ ধীর পায়ে তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বলল: "মূত্রাশয়—দুর্বল মূত্রাশয়।" ডাক্তারের কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল; কেমন করে এটা ঘটেছে, মূত্রাশয়টি কেমন করে দুর্বল হয়ে পড়েছে; কল্পনায় সে যেন মূত্রাশয়টিকে চেপে ধরে তার শক্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। তার মনে হল, কত অল্পেতেই সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। "না, আবার আমি পিয়তর আইভানভিচ-এর কাছে যাব (এই হল সেই বন্ধু যার একজন ডাক্তার বন্ধু আছে)। ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোড়াটা জুত্তে বলে সে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরি হল।

মুখে বিশেষ বিষণ্ণতা ও অত্যন্ত বেশী করুণার ভাব ফুটিয়ে তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় চললে জিন?"

এই বিশেষ করুণার ভাবটাই তাকে মরিয়া করে তুলল। কঠোর দৃষ্টিতে সে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

"পিয়তর আইভানভিচ-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

বন্ধুর কাছে পেঁছে তাকে নিয়ে ডাক্তার-বন্ধুর কাছে গেল। ডাক্তার বাড়িতেই ছিল। তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাও হল।

ডাক্তারের মতে তার দেহে শারীর-সংস্থানগত যে সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে সেগুলি পর্যালোচনার ফলে সব ব্যাপারটা সে বেশ বুঝতে পারল। একটি-মাত্র জিনিস—একটু সামান্য আন্ত্রিক গোলযোগের ব্যাপার। সবই ভাল হয়ে যেতে পারে। শুধু একটি দুর্বল অঙ্গকে কিছুটা শক্তিশালী করে তোল, আর অপর একটি অঙ্গের অত্যধিক চলাচলকে সীমিত কর, তাহলেই দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়া যথাযথ হবে এবং সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

খেতে যেতে তার একটু দেরি হয়ে গেল। খাওয়া শেষ করে বেশ খুসি মনে সে কথাবার্তা বলল এবং বেশ কিছু সময় পরে তার ঘরে গেল হাতের কাজ শেষ করতে। আইনের কাগজপত্রগুলি পড়ল, কিছু কিছু কাজও করল, কিন্তু মন বসল না। যা হোক, কাজ শেষ করে সে চা খেতে গেল। বসবার ঘরে তখন অনেক লোক। কথাবার্তা, পিয়ানো বাজনা ও গান হচ্ছে। মেয়ের ভাবী বর সেই তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটও হাজির। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না

লক্ষ্য করল. আইভান ইল্‌য়িচ সন্ধ্যাটা বেশ খোস মেজাজই কাটাল। এগারোটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে তার ঘরে চলে গেল। রোগের পর থেকেই পড়ার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটা ছোট ঘরে সে ঘুমোয়। ঘরে ঢুকে পোষাক বদলে সে জোলা-র একটা উপন্যাস হাতে নিল, কিন্তু মোটেই পড়ল না; একটা চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। কল্পনায় সে দেখতে পেল, তার বহু-আকাংখিত রোগমুক্তি ঘটেছে। গ্রহণ ও বর্জনের পথ ধরে অন্ত্রের নিয়মিত কাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"কেন; ব্যাপারটা খুবই সরল," নিজেই নিজেকে বলল। "প্রকৃতিকে সাহায্য করা চাই।" ওষুধটার কথা মনে পড়ল, উঠে ওষুধটা বের করে খেল, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, তারপর ওষুধের ক্রিয়ায় ব্যথাটা কখন চলে যায় সেটা লক্ষ্য করতে লাগল। "ওষুধটা নিয়মিত খেতে হবে এবং অন্য সব ক্ষতিকর প্রভাবকে এড়িয়ে চলতে হবে; সে কি, এরই মধ্যে আমি ভাল বোধ করেছি, অনেকটা ভাল।" পাশটা চেপে ধরল; তাতে কোন রকম ব্যথা লাগল না। "হ্যাঁ, ব্যথা লাগছে না,—সত্যি, এর মধ্যেই অনেকটা ভাল।" মোমবাতিটা নিভিয়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। "আন্ত্রিক বিবর্ধনটা অনেক ভাল হয়ে এসেছে।" হঠাৎ আবার সেই একটানা কামড়ানো ব্যথাটা মাথা চাড়া দিল। মুখের ভিতরে আবার সেই অদ্ভুত স্বাদ। তার মন দমে গেল, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল, সব যেন কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া। "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর!" সে বলে উঠল, "আবার, আবার; এ বুঝি কোন দিন থামবে না।" সহসা সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা নতুন রূপ নিয়ে তার সামনে দেখা দিল। নিজের মনেই সে বলে উঠল, "আন্ত্রিক বিবর্ধন। মূত্রাশয়। এ সব কথা নয়, আসল কথা হল জীবন এবং……মৃত্যু। হ্যাঁ, জীবন আছে, কিন্তু এখন চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে; আমি তাকে থামাতে পারছি না। হ্যাঁ। নিজেকে ঠকিয়ে লাভ কি? একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই জানে যে আমি মরতে বসেছি; এখন শুধু সময়ের ব্যাপার—সপ্তাহ, দিন—হয় তো এই মুহূর্ত। ছিল আলো, এখন অন্ধকার। আমি এখানে ছিলাম, এবার চলে যাচ্ছি! কোথায়?" একটা শীতল হাওয়ায় সে কেঁপে উঠল; তার নিঃশ্বাস থেমে গেল। নিজের হৃদপিণ্ডের ধুক-ধুক শব্দ ছাড়া আর কিছুই সে শুনতে পেল না।

"আমি আর থাকব না; তখন তাহলে কি থাকবে? কিছুই থাকবে না। যখন এখানে থাকব না, তখন কোথায় থাকব? এরই নাম কি মৃত্যু? না, আমি মরতে চাই না!" লাফ দিয়ে উঠে সে মোমবাতিটা ধরাতে চেষ্টা করল; তার কাঁপা হাত থেকে বাতিদান শুদ্ধ মোমবাতিটা মেঝেতে পড়ে গেল; সেও আবার বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। হাঁ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে

নিজের মনেই সে বলে উঠল, "হৈ-চৈ করে লাভ কি? কিছুই যায়-আসে না। মৃত্যু। হ্যাঁ, মৃত্যু। আর তারা—তারা সকলেই—কিছু বোঝে না, বুঝতে চায় না, একটু করুণাও অনুভব করে না। তারা তো খেলছে। (অনেক কথার ঢেউ বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে) তাদের কোন খেয়ালই নেই। কিন্তু তারাও মরবে। বোকার দল। আমি আগে, তারা পরে; কিন্তু সকলেরই এক পরিণাম। অথচ তারা কী খুসি! জানোয়ারের দল!" রাগে তার গলা আটকে গেল। দুঃসহ যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। "সব কালে সব মানুষেরই এই ভয়ংকর নিয়তি—তা হতে পারে না।" সে আবার উঠে বসল।

"এই চিন্তার মধ্যে কোথাও ভুল আছে। আমাকে শান্ত হতে হবে; প্রথম থেকে আবার ভেবে দেখতে হবে।" সে আবার ভাবতে বসল। "হ্যাঁ, আমার রোগের গোড়ার কথা। বুকের পাশটায় একটা আঘাত লেগেছিল, কিন্তু সেদিন এবং তারপর অনেক দিন আমি যেমন তেমনই ছিলাম; একটু ব্যথা হল, ব্যথাটা বাড়ল, তারপর ডাক্তার, মন খারাপ, কষ্ট, এবং আবার ডাক্তার; এমনই করে ক্রমেই অতল গহ্বরের দিকে এগোতে লাগলাম। আর আজ শরীর ক্ষয় হয়েছে, চোখে আলো নেই। আমি ভাবছি কি করে আন্ত্রিক রোগ সারবে, কিন্তু এ তো মৃত্যু। এই কি মৃত্যু?" আবার আতংক তাকে ঘিরে ধরল; হাঁপাতে হাঁপাতে উপুড় হয়ে দেশলাই খুঁজতে গিয়ে কনুইটা পাশের টেবিলে ঠুকে গেল। টেবিলটা তার পথের মাঝখানে ছিল, তাই ধাক্কা লাগল। টেবিলটার উপরই রাগ হল, আর সেই রাগে আরও জোরে ধাক্কা মেরে সেটাকে উল্টে দিল। হতাশায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সে আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তখন অতিথিদের যাবার সময় হয়েছে। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না তাদের এগিয়ে দিতে গেছে। হঠাৎ একটা কিছু পড়ার শব্দ শুনে সে ঘরে ঢুকল।

"ব্যাপার কি?"

"কিছু না। হঠাৎ কি যেন একটা পড়ে গেছে।"

তার স্ত্রী বেরিয়ে গিয়ে একটা মোমবাতি নিয়ে এল। স্বামী শুয়ে আছে; সে এমন ভাবে হাঁপাচ্ছে যেন এক মাইল পথ দৌড়ে এসেছে। এক দৃষ্টিতে সে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে।

"ব্যাপার কি জিন?"

"কি—চ্ছু না। আমি বলছি। কি যেন ফেলে দিয়েছি।"—মনে মনে ভাবল, "বলে কি লাভ?" ও কিছু বুঝবে না।"

সত্যি তার স্ত্রী কিছু বুঝল না। মোমবাতিটা তুলে জ্বালিয়ে দিয়ে

সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল। একজন বিদায়ী অতিথিকে সম্ভাষণ জানানো তখনও বাকি। সে যখন ফিরে এল, আইভান ইল্‌য়িচ তখনও সেই একই ভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।

"কেমন আছ—আরও খারাপ?"

"হ্যাঁ।"

স্ত্রী মাথা নেড়ে বসে পড়ল।

"আচ্ছা জিন, লেশ্‌চেতিৎস্কিকে একবার এখানে ডেকে এনে দেখালে ভাল হত না?"

এর অর্থ খরচের পরোয়া না করে সেই বিখ্যাত ডাক্তারকে আবার ডাকা। অপ্রসন্ন হাসি হেসে সে বলল—"না।" স্ত্রী আর এক মুহূর্ত বসে থেকে উঠে তার কাছে গেল এবং তার কপালে চুমো খেল।

স্ত্রী যখন চুমো খাচ্ছিল সে তখন মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ঘৃণা করছিল; অনেক চেষ্টা করে তবে তাকে সরিয়ে দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছিল।

"শুভ রাত্রি। ঈশ্বর করুন, তুমি যেন ঘুমোতে পার।"

"হ্যাঁ।"

॥ ৬ ॥

আইভান ইল্‌য়িচ বুঝতে পারল তার মৃত্যু আসন্ন; হতাশায় তার বুক ভরে গেল।

অন্তরের গভীরে সে জানল যে তার মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু সে সত্যকে মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, সে সত্যকে সে উপলব্ধিই করতে পারল না—উপলব্ধি করতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম।

কাইয়ুস একটি মানুষ, মানুষরা মরণশীল, সুতরাং কাইয়ুস মরণশীল—কিসেভেটার-এর ন্যায়শাস্ত্রে ন্যায়-অনুমানের এই যে দৃষ্টান্তটি সে শিখেছিল সারাটা জীবন সে জেনে এসেছে সেটা কাইয়ুসের বেলায়ই সত্য, তার বেলায় নয়। সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল কাইয়ুসের, একটা মানুষের, একটা বিমূর্ত মানুষের, আর তাই সেটা ছিল সত্য; কিন্তু সে তো কাইয়ুস নয়, সে তো বিমূর্ত মানুষ নয়; সে তো আগোগোড়াই একটি প্রাণী, অন্য সবার চাইতে স্বতন্ত্র একটি প্রাণী; মা ও বাবা এবং মিতিয়া ও ভলদ্যুয়ার কাছে সে ছিল ছোট্ট ভানিয়া; তার খেলার সামগ্রী ছিল, কোচয়ান ছিল, নার্স ছিল; তারপর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সব সুখ, দুঃখ ও আনন্দ নিয়ে সে

কাতেংকার সঙ্গে দিন কাটিয়েছে। যে চামড়ার বলটা ভানিয়ার বড় প্রিয় ছিল তার সুঘ্রাণের কথা কাইয়ুস কি জানে? কাইয়ুস কি তার মায়ের হাতখানিতে অমন করে চুমো খেয়েছে? তার মায়ের রেশমের ঘাঘরার খস্‌খস্‌ শব্দ তো কাইয়ুস শোনে নি। সে তো স্কুলে পুডিং নিয়ে হৈ-চৈ করে নি। কাইয়ুস কি এমন ভাবে ভালবেসেছে? কাইয়ুস কি আদালতে প্রধানের আসনে বসেছে?

কাইয়ুস নিশ্চয়ই মরণশীল ছিল, তাই তার পক্ষে মরাই ঠিক হয়েছে; কিন্তু আমি, ছোট্ট ভানিয়া, আইভান ইল্‌য়িচ, আমার পক্ষে ব্যাপারটা আলাদা। তাই আমার মরা উচিত এটা কখনও ঠিক হতে পারে না। সেটা বড় বেশী ভয়ংকর।

এই তার মনের কথা। "কাইয়ুস-এর মত আমিও যদি মরণশীল হতাম, তাহলে আমি সেটা জানতে পারতাম, কোন অন্তরের কণ্ঠস্বর আমাকে তো বলে দিত। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটে নি। আমি এবং আমার বন্ধুরা বরং জানতাম যে, আমাদের অবস্থা কাইয়ুস-এর মত নয়। আর আজ এই অবস্থা! এটা হতে পারে না, কিন্তু হয়েছে! কি করে হল? এটাকে কি ভাবে বুঝব?" এটা সে বুঝতে পারত না; তাই এ ধারণাটাকে মিথ্যা, বেঠিক ও অসুস্থ মনে করে তাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য সঠিক ও সুস্থ ধারনার আমদানি করতে চেষ্টা করত। কিন্তু এটা তো শুধু ধারণা নয়, এ যে বাস্তব ঘটনা, তাই এটা ফিরে ফিরে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াত।

এক সময় সে হয় তো ভাবত, "আবার সরকারী কাজের মধ্যেই ডুবে থাকব। এক সময় তো তাই নিয়েই বেঁচে থাকতাম।" আর সব সন্দেহ দূরে ঠেলে দিয়ে আদালতেই যেত। সেখানে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, পুরনো অভ্যাস মত হেলান দিয়ে বসে যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে নীচের জনতাকে দেখত, আগেকার মতই ওক কাঠের চেয়ারের হাতলে শীর্ণ হাত দুটি রেখে কোন সহকর্মীর দিকে ঝুঁকে তার হাতে কোন কাগজপত্র দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কিছু বলত, আর তার পরেই হঠাৎ চোখ নামিয়ে খাড়া হয়ে বসে মামলার মুখবন্ধ হিসাবে অতি পরিচিত কথাগুলি উচ্চারণ করত। কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে সেই পাশের ব্যাথাটা মাথা চাড়া দিত। আইভান ইল্‌য়িচ-এর সব মনোযোগ সেই দিকে ঘুরে যেত। ব্যাথার চিন্তাটাকে সে মন থেকে তাড়িয়ে দিলেও তার কাজের বিরাম ঘটত না; আর তারপরেই সে এল, তার সামনে দাঁড়াল, তার দিকে তাকাল। আইভান ইল্‌য়িচ যেন পাথর হয়ে গেল, তার চোখের আলো নিভে গেল, সে আবার নিজেকে প্রশ্ন করল, "তাহলে সেই কি একমাত্র সত্য?" আর তার সহকর্মী

ও অধস্তন কর্মচারীরা সবিস্ময়ে ও সখেদে লক্ষ্য করল যে সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন সফল বিচারক হয়েও সে কথার খেই হারিয়ে ফেলছে, ভুল বলছে। নিজেকে নাড়া দিয়ে সে আত্ম-সংযম ফিরে পেতে চেষ্টা করল, এবং কোন রকমে মামলাটা শেষ করে এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরল যে, আগেকার মত বিচারসংক্রান্ত কাজকর্ম দিয়েও সে সব কিছু চাপা দিতে পারে না; সরকারী কাজের আড়াল দিয়েও সে তার কাছ থেকে পালাতে পারে না। আর এ ব্যাপারের সব চাইতে খারাপ দিকটা হল, কোন বিশেষ কাজের জন্য সে আইভান ইলয়িচকে নিজের দিকে আকর্ষণ করত না; সে চাইত সে শুধু তার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকুক, তাকিয়ে থাকুক আর কোন কাজ না করে অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করুক।

এই রকম অবস্থার মধ্যে কখনও কখনও সে তার নিজের হাতে সাজানো বসবার ঘরটায় যেত, সেই ঘর যেখানে সে পড়ে গিয়েছিল, যার জন্য—আজ সে কথা ভাবাও কী ভয়ংকর রকমের হাস্যকর—যে ঘর সাজাবার জন্য সে তার জীবনটাই বলি দিয়েছে, কারণ সে জানে সেই ছড়ে যাওয়া থেকেই এই রোগের সূত্রপাত। ভিতরে ঢুকেই তার নজরে পড়ল, পালিশ-করা টেবিলটায় অনেক আঁচড় লেগেছে। কারণ খুঁজতে গিয়ে সে বুঝতে পারল, অ্যালবামটার ব্রোঞ্জের আংটাটার ঘসাতেই আঁচড়গুলো পড়েছে। অ্যালবামটা দামী। কত যত্ন করে সে এটাকে সাজিয়েছিল। সেটাকে হাতে নিয়ে মেয়ে ও তার বন্ধুবান্ধবদের অযত্নের জন্য সে বিরক্ত হল। কোথাও একটা পাতা ছিঁড়ে গেছে, কোথাও বা ফটোটা স্থানচ্যুত হয়েছে। সযত্নে সেগুলি ঠিক করে সে অ্যালবামটা সরিয়ে রাখল।

তখন তার মনে হল, অ্যালবামের পুরো সরঞ্জামটাই ঘরের অপর কোণে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সে পরিচারককে ডাকতেই তার স্ত্রী ও মেয়ে এসে হাজির হল। তারা তার সঙ্গে একমত হল না, তার কথার প্রতিবাদ করল; সেও পাল্টা তর্ক করল, রেগে গেল। তবু সেও ভাল, কারণ তখন সে আর 'তার' কথা ভাবছিল না; 'সে' আর তখন দেখা দিচ্ছিল না।

কিন্তু সে যখন নিজেই কিছু জিনিস সরাতে গেল তখন তার স্ত্রী বলল, "কাজটা চাকরদের করতে দাও, নইলে তুমি হয়তো আঘাত পাবে।" বাস, সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ভিতর দিয়ে আবার 'সে' উঁকি দিল, আর সেও 'তাকে' দেখতে পেল। সে 'তাকে' দেখতে পেলেও সে তখনও আশা করছিল যে 'সে' নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে। আপনা থেকেই নিজের পাশটাতে তার দৃষ্টি পড়ল; সেখানে ব্যথাটা এক ভাবেই আছে, সে-ব্যথা সে ভুলতে পারছে না। আর পিছন থেকে 'সে' প্রকাশ্যে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এ সবের দরকার কি?

"আর প্রকৃত ঘটনা হল এখানে, এই পর্দার উপরে যেন একটা দুর্গ দখল হয়ে গেল; আমি আমার জীবনকে হারালাম। এও কি সম্ভব? কী ভয়ংকর! আর কী বাজে! এ হতে পারে না, অথচ তাই হয়েছে।"

সে নিজের ঘরে চলে গেল, শুয়ে পড়ল, একলা ঘরে তখনও সে।' তার মুখোমুখি 'সে,' অথচ 'তাকে' নিয়ে কিছুই করার নেই। শুধু 'তার' দিকে তাকিয়ে থাকা আর থর থর করে কাঁপা।

॥ ৭ ॥

আইভান ইল্যিচ-এর অসুখের তৃতীয় মাসে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াল সেটা বলা অসম্ভব, কারণ সেটা ঘটল একটু একটু করে, সকলের অলক্ষ্যে; কিন্তু অবস্থাটা এই দাঁড়াল যে তার স্ত্রী, তার মেয়ে, তার ছেলে, এবং তাদের চাকর-বাকর, তাদের পরিচিত জন, ডাক্তার, এবং সর্বোপরি সে নিজে— সকলেই বুঝতে পারল যে তাকে নিয়ে অন্য সকলের সমস্যা হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি সে তার জায়গাটা খালি করে দেবে, তার উপস্থিতির বোঝা থেকে জীবিত লোকদের রেহাই দেবে এবং নিজেও সব জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

তার ঘুম কমতে লাগল; তারা তাকে আফিম দিল, মর্ফিন ইন্জেক্শন দিল। কিন্তু তাতেও সে আরাম পেল না। আধা ঘুমন্ত অবস্থায় যে বোবা ব্যথাটা সে বোধ করত প্রথম প্রথম একটা পরিবর্তন হিসাবে সেটা ভালই লাগত, কিন্তু পরে সেটা প্রকাশ্য যন্ত্রণার মতই, বা তার চাইতেও খারাপ লাগত। ডাক্তারের নির্দেশমত তার জন্য বিশেষ খাবার করে দেওয়া হত; কিন্তু সে খাবার ক্রমেই তার কাছে অধিকতর বিস্বাদ ও বিরক্তিকর লাগতে লাগল।

অন্যান্য জৈবিক প্রয়োজনের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, আর সেটা তার কাছে সব সময়ই কষ্টদায়ক মনে হত। ঐ সব কাজে অন্য লোকের সহায়তা নেবার কষ্ট ছাড়াও অপরিচ্ছন্নতা, অশোভনতা ও দুর্গন্ধজনিত কষ্টও ছিল।

কিন্তু রোগের এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকেই আইভান ইল্যিচ একটা আরামের সন্ধানও পেয়ে গেল। এই সব সময়ে তাকে পরিষ্কার করবার জন্য তার ঘরে আসত গেরাসিম নামক সেই চাষী যুবকটি যে খাবার পরিবেশন করত।

গেরাসিম এমনিতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; তার উপর শহরে বাস করার

ফলে বেশ শক্ত-সমর্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে। সব সময়ই হাসিখুসি ও ঝকঝকে। প্রথম দিকে রুশ ভঙ্গীতে পরিষ্কার পোষাক পরা এই ছেলেটিকে এ ধরনের নোংরা কাজ করতে দেখে আইভান ইল্যিচ অস্বস্তি বোধ করত।

একদিন মলত্যাগের পরে অত্যধিক দুর্বলতার জন্য পোষাক না পাল্টেই সে একটা নীচু নরম চেয়ারে বসে পড়ল ; খোলা, শক্তিহীন উরু দুটির দিকে তাকিয়ে তার কেমন ভয় করতে লাগল।

তখন হাল্কা, শক্ত পা ফেলে ঘরে ঢুকল গেরাসিম ; তার পায়ের ভারী বুট থেকে আলকাতরার সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে ; যেন এক ঝলক শীতের তাজা বাতাস ঘরে ঢুকল। তার পরনে শন পাটের পরিষ্কার এপ্রন ও পরিষ্কার সুতীর শার্ট। শার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গোটানো। তার মুখের খুসিভরা উজ্জ্বলতা চোখে পড়লে পাছে রুগ্ন লোকটির মনে আঘাত লাগে তাই তার দিকে না তাকিয়েই গেরাসিম মল-পাত্রের দিকে এগিয়ে গেল।

"গেরাসিম," আইভান ইল্যিচ অস্পষ্ট স্বরে ডাকল।

গেরাসিম চমকে উঠল ; তার ভয় হল হয় তো কোন ভুল করে বসেছে। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে সে রুগ্ন লোকটির দিকে তাকাল। তার তাজা, সরল, তরুণ মুখে সবে দাড়ির রেখা দেখা দিয়েছে।

"বলুন কর্তা।"

"আমি বুঝি কাজটা তোমার পক্ষে খুবই অপ্রীতিকর। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি নিরুপায়।"

"এ কী বলছেন স্যার!" গেরাসিম-এর চেখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল ; স্মিত হাসিতে তার সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। "কষ্ট কিসের? আপনি তো অসুস্থ স্যার।"

নিপুণ, শক্ত হাতে কাজ শেষ করে আস্তে আস্তে পা ফেলে সে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে সেই একই ভাবে হাল্কা পা ফেলে ফিরে এল।

আইভান ইল্যিচ তখনও সেই একই ভাবে হাতল-চেয়ারে বসে ছিল।

বলল, "গেরাসিম, আমাকে একটু সাহায্য কর ; এদিকে এস।" গেরাসিম এগিয়ে গেল। "আমাকে তুলে ধর। একা উঠতে পারি না ; এদিকে দিমিত্রিকেও বাইরে পাঠিয়েছি।"

গেরাসিম তার কাছে গেল ; যেমন হাল্কা পায়ে সে এসেছে তেমনি হাল্কা ভাবেই নিজের শক্ত বাহু দিয়ে তাকে আস্তে অথচ সুকৌশলে জড়িয়ে ধরে এক হাতে তার ট্রাউজারটা তুলে দিল। সে হয় তো আবার তাকে চেয়ারেই বসিয়ে দিত, কিন্তু আইভান ইল্যিচ তাকে সোফায় নিয়ে যেতে বলল। গেরাসিম অক্লেশে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ধরে প্রায় বয়ে নিয়ে গিয়ে

তাকে সোফায় বসিয়ে দিল।

"ধন্যবাদ ; কেমন সুন্দর ভাবে……তুমি সব কাজগুলি কর।"

গেরাসিম আবার হাসল। সে হয় তো চলেই যেত, কিন্তু সে কাছে থাকলে ভাল লাগে বলে আইভান ইল্যিচ তাকে যেতে দিতে চায় না।

"দেখ, ওই চেয়ারটা আমার কাছে একটু এগিয়ে দেবে? না, ওটা, আমার পায়ের নীচে দিয়ে দাও। পা দুটো একটু উঁচু হলে আরাম পাই।"

গেরাসিম চেয়ারটা এনে আস্তে ঠিক জায়গায় বসিয়ে আইভান ইল্যিচ-এর পা দুটি তার উপর তুলে দিল। আইভান ইল্যিচ-এর মনে হল, গেরাসিম যখন তার পা দুটি উঁচু করে ধরল তখন তার খুব ভাল লাগল।

সে বলল, "পা দুটো উঁচু হলে অনেক ভাল লাগে। কুশনটাকে পায়ের নীচে দাও।"

গেরাসিম তাই করল। কুশনটা পায়ের নীচে রাখতে সে আবার আইভান ইল্যিচ-এর পা দুটো তুলে ধরল। আর আইভান ইল্যিচ-এর আবার মনে হল, গেরাসিম পা দুটো তুললেই সে আরাম বোধ করে। আবার যখন সে পা দুটি নামিয়ে রাখল, তখনই সে অস্বস্তি বোধ করল।

সে বলল, "গেরাসিম, তুমি কি এখন ব্যস্ত আছ?"

"মোটেই না স্যার," গেরাসিম বলল ; শহুরে চাকরদের কাছ থেকে সে ভদ্রলোকদের সংগে কথা বলার আদব-কায়দা শিখে নিয়েছে।

"তোমার আর কি কাজ বাকি আছে?"

"সে কি, কি কাজ আবার বাকি থাকবে? সব কাজ শেষ করেছি, শুধু আগামী কালের জন্য কাঠটা কাটতে হবে।"

"তাহলে আমার পা দুটো ওই ভাবে একটু তুলে ধর—পারবে কি?"

"নিশ্চয় পারব।" গেরাসিম পা দুটো তুলে ধরল। সংগে সংগে আইভান ইল্যিচ-এর মনে হল, পা দুটো ওই অবস্থায় থাকলে ব্যথাটা একেবারেই থাকে না।

"কিন্তু কাঠের কি হবে?"

"সে নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না স্যার। অনেক সময় আছে।"

আইভান ইল্যিচ-এর কথামত গেরাসিম সেখানে বসে তার পা দুটো তুলে ধরে গল্প করতে লাগল। আর কী আশ্চর্য, গেরাসিম পা দুটো ধরতেই সে যেন অনেকটা ভাল বোধ করতে লাগল।

সেদিন থেকে আইভান ইল্যিচ মাঝে মাঝে গেরাসিমকে কাছে ডাকে ; সে এসে পা দুটো কাঁধের উপর রেখে সেখানে বসে ; আইভান ইল্যিচও তার সংগে গল্প করতে ভালবাসে। গেরাসিম এমন সহজ, সরল আন্তরিকতার সংগে কাজটা করে যে আইভান ইল্যিচ মুগ্ধ হয়ে যায়। অন্য সকলের স্বাস্থ্য,

শক্তি ও আন্তরিকতা তাকে ক্ষুব্ধ করে ; কিন্তু গেরাসিম-এর শক্তি ও আন্তরিকতা তাকে মর্মাহত করে না, বরং সান্ত্বনা দেয়।

আইভান ইল্‌য়িচ জানে, কেউ তার দুঃখ বোঝে না, কারণ তার অবস্থাটাই কেউ ধরতে পারে না। গেরাসিমই একমাত্র লোক যে তার অবস্থা বোঝে, তার জন্য দুঃখ বোধ করে। আর সেই জন্যই গেরাসিম কাছে থাকলে আইভান ইল্‌য়িচও আরাম বোধ করে। কখনও কখনও গেরাসিম একটানা সারা রাত তার পা দুটো তুলে ধরে থাকে ; কিছুতেই শুতে যেতে চায় না, বলে, "আপনি এ নিয়ে ভাববেন না তো, ঘুমুবার অনেক সময় পাব ; আপনি যদি অসুস্থ না হয়ে ভালও থাকতেন, তাহলেও তো আপনার সেবা আমাকে করতেই হত।" একমাত্র গেরাসিমই মিথ্যা বলে না ; সে এ সবের অর্থ বোঝে আর বোঝে বলেই কোন কিছু লুকোতে চায় না, শুধু তার রুগ্ন, ক্ষয়িষ্ণু মনিবের জন্য দুঃখ বোধ করে। একদিন আইভান ইল্‌য়িচ যখন তাকে চলে যেতে বলেছিল তখন কথাটা সে সোজাসুজিই বলে ফেলল।

"আমরা সবাই তো মরব। সুতরাং একটু-আধটু কষ্টে কি যায় আসে ?" এই কথার দ্বারা সে বলতে চায়, একজন মুমূর্ষু লোকের জন্য কষ্টটা ভোগ করছে বলেই সে এ নিয়ে কোন অভিযোগ করছে না, কারণ সেও আশা করে যে তার যখন এ রকম সময় উপস্থিত হবে তখন আর কেউ এসে এ রকম কষ্ট সহ্য করবে।

পরিবারের অন্য সকলের ধোঁকাবাজি ছাড়াও আইভান ইল্‌য়িচ-এর সব চাইতে বেশী দুঃখ এই যে কেউ তার কথা ভাবে না, অন্তত তারা আশানুরূপ ভাবে ভাবে না। দীর্ঘ দিন রোগে ভুগে ভুগে আইভান ইল্‌য়িচ কখনও কখনও চাইত যে কোন রুগ্ন শিশুর জন্য লোকে যে মমতা দেখায় তার প্রতিও সেই রকম মমতা দেখানো হোক। সে চাইত, ছোট শিশুর মত তাকেও কেউ আদর করুক, চুমো খাক, তার জন্য কাঁদুক। সে জানে, সে আদালতের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, তার মুখে পাকা দাড়ি, কাজেই সে সব সম্ভব নয়। তবু তাই সে চায়। আর গেরাসিম-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটা সেই রকমের বলেই গেরাসিম-এর সঙ্গ তাকে এতটা আরাম দেয়। আইভান ইল্‌য়িচ কাঁদতে চায়, চায় কেউ তাকে আদর করুক, তার জন্যে কাঁদুক, আর তখনই হয় তো সহকর্মী শেবেক এসে হাজির হয় ; ফলে চোখের জল ও আদরের বদলে আইভান ইলয়িচ মুখটা গুরুগম্ভীর করে তোলে এবং নিছক অভ্যাসবশতই আপিল-আদালতের রায়ের ফলাফল সম্পর্কে তার মতামত ঘোষণা করে তা নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। বাইরে ও ভিতরে এই মিথ্যাচার আইভান ইল্‌য়িচ-এর শেষের দিনগুলিকে বিষাক্ত করে তুলল।

॥ ৮ ॥

সকাল হয়েছে। আইভান ইল্যিচ-এর কাছে সকালের একমাত্র ঘটনা গেরাসিম চলে গেছে, আর তার বদলে ঘরে ঢুকেছে পরিচারক পিয়তর। সে মোমবাতিগুলো নিভিয়েছে, একটা পর্দা তুলে দিয়েছে এবং ঘরের এটা-ওটা কাজ করতে শুরু করেছে। সকাল কি সন্ধ্যা, শুক্রবার কি রবিবার, কোন তফাৎ নেই। সবই এক। তীব্র ব্যথাটা এক মুহূর্তের জন্যও থামছে না; আশাহীন জীবনের স্রোতে লেগেছে ভাঁটার টান, কিন্তু এখনও থেমে যায় নি; ভয়াবহ, ঘৃণ্য মৃত্যু নেমে আসছে তাকে লক্ষ্য করে; মৃত্যুই একমাত্র সত্য, আর সবই মিথ্যা। দিন, সপ্তাহ, বা ঘণ্টার কি মূল্য তার কাছে?

"চা দেব স্যার?"

"ও চায় সব কাজ যথাযথভাবে হোক। সকালেই সকলের চা খাওয়া উচিত," কথাগুলি ভেবে আইভান ইল্যিচ শুধু বলল—

"না।"

"সোফায় গিয়ে বসবেন কি?"

"ও ঘরটাকে পরিচ্ছন্ন করতে চায়, আমি তাতে বাধা। আমি মূর্তিমান অপরিচ্ছন্নতা, বিশৃংখলা", কথাগুলি ভেবে সে শুধু বলল—

"না, আমাকে একা থাকতে দাও।"

চাকরটি তবু কাজ করতে লাগল। আইভান ইল্যিচ হাতটা বাড়াল। তাকে সাহায্য করতে পিয়তর ছুটে গেল।

"আপনার কি চাই?"

"ঘড়িটা।"

হাতের নীচ থেকে ঘড়িটা তুলে পিয়তর তাকে দিল।

"সাড়ে আটটা। সবাই উঠেছে?"

"এখনও ওঠেন নি স্যার। ভ্লাদিমির আইভানভিচ (তার ছেলে) স্কুলে গেছে, আর প্রাস্কোভিয়া ফিয়দরভ্না হুকুম করেছেন, আপনি ডাকলে তবে তাকে ঘুম থেকে ডেকে দিতে হবে। তাকে ডেকে দেব কি?"

"না, দরকার নেই।"......"একটু চা খেলে কেমন হয়," সে ভাবল।

"হ্যাঁ, চা......নিয়ে এস।"

পিয়তর বেরিয়ে যাচ্ছিল। আইভান ইল্যিচ একা থাকতে ভয় পেল। "ওকে কেমন করে এখানে রাখি?...হ্যাঁ, ওষুধ, পিয়তর, ওষুধটা দাও। হয় তো ওষুধ খেলে কিছুটা ভাল হতে পারে।" চামচ নিয়ে সে ওষুধটা খেল। "না, কিছুই হল না। সব বাজে, ফাঁকি," বিস্বাদ ওষুধটা খেয়ে সে বলল। "না, কিছুতেই আর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ব্যথাটা, এই ব্যথাটা; এক মিনিটের জন্যও যদি থামত।" সে আর্তনাদ করে উঠল। পিয়তর ঘুরে

দাঁড়াল। "না, যাও। চা নিয়ে এস।"

পিয়তর চলে গেল। একলা ঘরে যতটা ব্যথার জন্য তার চাইতে বেশী মনের দুঃখে আইভান ইলয়িচ গোঙাতে লাগল। বার বার সেই একই জিনিস, সেই শেষহীন দিন ও রাত্রির আবর্তন। যদি আর একটু দ্রুত হত। দ্রুত হয়ে কোথায় যেত? মৃত্যু, অন্ধকার। না, না। মৃত্যু অপেক্ষা ভাল কোথাও!"

ট্রে-তে করে পিয়তর চা নিয়ে এলে আইভান ইলয়িচ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক-ভাবে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল; যেন বুঝতেই পারছে না সে কে এবং কি চায়। সেই দৃষ্টি দেখে পিয়তর অস্বস্তি বোধ করল। আর তার সেই অস্বস্তি দেখে আইভান ইলয়িচ-এর সম্বিত ফিরে এল।

সে বলল, "ওঃ, হ্যাঁ, চা এনেছ, ভাল, রাখ। হাতমুখ ধুয়ে একটা ফর্সা শার্ট পরতে আমাকে একটু সাহায্য কর।"

আইভান ইলয়িচ হাত-মুখ ধুতে শুরু করল। ধীরে ধীরে হাত ধুলো, তারপর মুখ ধুলো, দাঁত মাজল, চুলে চিরুনি চালাল, আয়নায় মুখ দেখল। আয়নায় যা দেখল, বিশেষ করে ম্লান কপালের উপর লেপ্টে থাকা চুলগুলো দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, শার্ট বদলাবার সময় শরীরের দিকে নজর পড়লে সে আরও ভয় পাবে, তাই সে সময় সে আয়নার দিকে তাকালই না। সে পর্ব শেষ হল। ড্রেসিং-গাউনটা পরে একটা কম্বলে শরীরটা ঢেকে সে চা খাবার জন্য হাতল-চেয়ারটায় বসল। মুহূর্তের জন্য নিজেকে বেশ তাজা মনে হল; কিন্তু চা খেতে শুরু করতেই আবার সেই বিস্বাদ, সেই ব্যথা। জোর করে চা-টা শেষ করে সে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সেই অবস্থায়ই সে পিয়তরকে ছেড়ে দিল।

সেই একই অবস্থা। মুহূর্তের জন্য আশার আলো ঝিলিক দেয়, তার পরই আবার সেই হতাশার সমুদ্র তাকে ঘিরে গর্জন করে ফেরে; সব সময়ই ব্যথা, শুধুই ব্যথা, হৃদপিণ্ডের ব্যথা, সব সময় একই অবস্থা। একা একা ভীষণ খারাপ লাগে; কাউকে ডাকতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আগে থেকেই জানে যে অন্য কারও উপস্থিতিতে অবস্থা আরও খারাপ হবে। "আবার যদি মর্ফিন দিত—শুধু ভুলে থাকবার জন্য। ডাক্তারকে বলতে হবে অন্য কিছু ভাবতে। এ ভাবে চলতে পারে না; এ ভাবে চলতে পারে না।"

এই ভাবে এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা কেটে যায়। সদর দরজায় ঘণ্টা বাজে। হয় তো ডাক্তার।

প্রচণ্ডভাবে ডাক্তার হাত দুটি ঘসতে থাকে।

"খুব ঠাণ্ডা লেগেছে। বাইরে বরফ পড়ছে। একটু গরম হয়ে নি," এমন ভাব দেখিয়ে ডাক্তার কথাগুলি বলে যেন তার একটু গরম হতে যা দেরী,

তারপরেই সে সব কিছু ঠিক করে দেবে।

"তারপর, কেমন আছেন?"

আইভান ইল্যিচ জানে, ডাক্তার বলতে চায়, "ব্যাথাটা কেমন আছে," কিন্তু সে কথা সে বলতে পারে না বলেই বলে, "রাতটা কেমন কেটেছে?"

আইভান ইল্যিচ চোখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকাল; যেন বলতে চাইল—

"এও কি সম্ভব যে মিথ্যা বলতে আপনার কখনও লজ্জা করে না?"

কিন্তু চোখের সে ভাষা বুঝবার বালাই ডাক্তারের নেই।

আইভান ইল্যিচ বলে—

"সেই একই রকম। ব্যাথাটা কখনও আমাকে ছাড়ে না, থামে না। যদি আর কোন পথ থাকত!"

"আঃ, আপনারা সকলেই ওই রকম, সব রোগীরাই একই কথা বলে। আসুন, ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছি। প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না পর্যন্ত আমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি ধরতে পারেন না। ঠিক আছে, আসুন, গুড মর্ণিং।" ডাক্তার কর-মর্দন করল।

আগেকার চপলতা পরিহার করে ডাক্তার এবার গম্ভীর মুখে রোগীকে পরীক্ষা করতে শুরু করল; নাড়ি দেখল, তাপ মাপল, তারপর বুক-পিঠ ঠুকে দেখল।

আইভান ইল্যিচ ভাল ভাবেই জানে যে এ সবই অর্থহীন, ফাঁকা ধোঁকাবাজি; তবু ডাক্তার যখন হাঁটু ভেঙে বসে তার উপর উপড় হয়ে শরীরের উপরে ও নীচে কান লাগিয়ে দেখল, এবং গম্ভীর মুখে নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে তাকে পরীক্ষা করতে লাগল, তখন আইভান ইল্যিচ কিছুটা প্রভাবিত হল, যেমন আদালতে সে অনেক সময় উকীলদের বক্তৃতো শুনে প্রভাবিত হত, যদিও সে ভাল ভাবেই জানত যে তারা সারাক্ষণ মিথ্যা কথাই বলছে এবং কি কারণে বলছে তাও জানত।

সোফার উপর হাঁটু ভেঙে ডাক্তার তখনও তাকে পরীক্ষা করে চলেছে। এমন সময় দরজার কাছে প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্নার রেশমী পোষাকের খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল; ডাক্তার যে এসেছে এ কথা তাকে না জানাবার জন্য সে পিয়তরকে বকাবকি করল।

সে ঘরে ঢুকে স্বামীকে চুমো খেল এবং তারপরই সকলকে জানাল যে সে অনেকক্ষণ ঘুম থেকে জেগেছে, কিন্তু একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য ডাক্তার আসা সত্ত্বেও সে এতক্ষণ এখানে আসতে পারে নি।

আইভান ইলয়িচ স্ত্রীর দিকে তাকাল, আগাগোড়া তাকে লক্ষ্য করল: তার ফর্সা মেদবহুল দেহ, তার পরিচ্ছন্ন হাত ও গলা, চুলের উজ্জ্বলতা, তার দুই চোখে পরিপূর্ণ জীবনের আভা। মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তাকে

ঘৃণা করে। স্ত্রী যখন তাকে স্পর্শ করে, তখন তার প্রতি তীব্র ঘৃণায় তার বুকের ভিতর জ্বালা করে ওঠে।

তার প্রতি ও তার রোগের প্রতি তার স্ত্রীর মনোভাব সেই একই আছে। ডাক্তার যেমন রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে একটা পথ গ্রহণ করেছে এবং এখন সে পথ থেকে সরতে পারে না, তেমনি মহিলাটিও তার স্বামীর ব্যাপারে একটা মনোভাব গ্রহণ করেছে—তার যা করা উচিত সে তা করে না, সব দোষই তার, আর এই ত্রুটির জন্য ভালবেসেই সে স্বামীকে বকে থাকে, এবং সে মনোভাব এখন আর বদলাতে পারে না।

"আপনারা তো জানেন, ও আমার কথাই শোনে না; ঠিক সময়ে ওষুধ পর্যন্ত খায় না। তার চাইতেও খারাপ, দুই পা উপরে তুলে দিয়ে এমন ভাবে সে শুতে চায় যেটা তার পক্ষে অত্যন্ত খারাপ।"

গেরাসিম যে তার কথায় পা দুটো উপরে ধরে রাখত সে কথাও সে সবিস্তারে বর্ণনা করে শোনাল।

কৃপাপরবশ হাসি হেসে ডাক্তার বলল, "দেখুন, এ ব্যাপারে কিছু করার নেই; রোগীদের এ রকম সব অদ্ভুত খেয়াল হয়ে থাকে; ও সব আমাদের ক্ষমা করেই চলতে হয়।"

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার ঘড়ি দেখল। তখন প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়োদরভ্‌না স্বামীকে জানাল, যদিও তার ইচ্ছা মতই সব কিছু হবে তবু আজ সে একজন বিখ্যাত ডাক্তারকে আনতে লোক পাঠিয়েছে; সে এসে তাকে পরীক্ষা করবে এবং মিখাইল দানিলোভিচ-এর (তাদের নিয়মিত ডাক্তার) সঙ্গে পরামর্শ করবে।

"দয়া করে এবার আর বাধা দিও না। আমার নিজের গরজেই এ ব্যবস্থা করেছি," ব্যঙ্গের সুরে প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না বলল। আইভান ইল্‌য়িচ ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। সে বুঝতে পারল, মিথ্যার জালে তাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে যে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে যাওয়া বড় শক্ত।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিখ্যাত ডাক্তারটি এল। আবার শরীর ঠুকে ঠুকে সেই পরীক্ষা, তার সামনে ও পাশের ঘরে মূত্রাশয় ও আন্ত্রিক বিবর্ধন নিয়ে সেই গুরুগম্ভীর আলোচনা, সেই প্রশ্নোত্তরের পালা; আবারও জীবন-মৃত্যুর মূল সমস্যার পরিবর্তে সেই একই মূত্রাশয়-আন্ত্রিক বিবর্ধন নিয়ে আলোচনাই চলল সারাক্ষণ।

বিদায় নেবার সময় বিখ্যাত ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হলেও আশাহীন ছিল না। আতংক ও আশায় জ্বল-জ্বল-করা দুটি চোখ তুলে আইভান ইল্‌য়িচ যখন ভীরু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, নিরাময়ের কোন আশা আছে কি?

তখন ডাক্তার জবাব দিল যে তা সে বলতে পারে না, তবে আশা নিশ্চয়ই আছে। ডাক্তার চলে যাবার সময় আইভান ইল্যিচ-এর আশা-ভরা চোখদুটি এতই করুণ দেখাচ্ছিল যে তা দেখে প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্নার চোখ ফেটে জল এসে গেল; বিখ্যাত ডাক্তারের ফী-টা দেবার জন্য সে পাশের ঘরে চলে গেল।

ডাক্তারের আশ্বাসের ফলে আশার যে আলোটুকু জ্বলেছিল তাও বেশী সময় স্থায়ী হল না। আবার সেই একই ঘর, একই ছবি, পর্দা, দেয়াল-কাগজ, ওষুধের বোতল এবং সেই চিরকালের যন্ত্রণাকাতর দেহ। আইভান ইল্যিচ গোঙাতে শুরু করল; ইনজেকশন দেওয়া হল; সে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। যখন জাগল অন্ধকার হয়ে এসেছে; তার খাবার এনে দেওয়া হল। জোর করে সে কিছুটা ঝোল খেল। তারপর আবার সেই একঘেয়েমি, আবার সেই আসন্ন রাত।

আহারাদির পর সাতটা নাগাদ প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্না উৎসবের সাজে সেজে ঘরে ঢুকল। তার বুকে শক্ত করে কাঁচুলি আঁটা, মুখে পাউডারের প্রলেপ। সকালেই সে স্বামীকে বলেছিল যে তারা থিয়েটারে যাবে। সারা বার্নহার্ড শহরে এসেছে; তাদেরও একটা বক্স নেওয়া আছে, আর আইভান ইল্যিচ-এর পীড়াপীড়িতেই সেটা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পরে সেকথা সে ভুলে গিয়েছিল, আর সেই জন্যই তার এই পোষাকের আড়ম্বর দেখে সে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু এখন তার মনে পড়েছে যে সেই জোর করে এই বক্সটা নিয়েছিল, কারণ এ ধরনের আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ছেলেমেয়েদের পক্ষে যেমন কল্যাণকর তেমনি শিক্ষাপ্রদ। তাই আগেকার মনোভাব সে মনের মধ্যেই চেপে রাখল।

বেশ খুসি মনে ঘরে ঢুকলেও প্রাস্কোভ্য়া ফিয়দরভ্নার মনে একটা অপরাধবোধও ছিল। পাশে বসে সে স্বামী কেমন আছে জিজ্ঞাসা করল; অবশ্য স্বামীও বুঝল যে কোন জবাব শুনবার জন্য নয়, জিজ্ঞাসা করবার জন্যই সে জিজ্ঞাসা করেছে। মহিলা আরও বলল, কেন থিয়েটারে যাওয়াটা একান্ত প্রয়োজন; সে কিছুতেই যেত না, কিন্তু বক্সটা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে, আর তাদের মেয়ে এলেন ও পেত্রিশ্চেভও (তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেয়ের প্রণয়ী) যখন যাচ্ছে তখন তাদের তো একা যেতে দেওয়া যায় না। এখন সে চলে যাবার পরে স্বামীটি ডাক্তারের ব্যবস্থা মত চলবে এটা জানতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

"দেখ, ফিয়দর পেত্রিশ্চেভ (প্রণয়ী) ভিতরে আসতে চায়। আসবে কি? আর লিজাও?"

"হ্যাঁ, তাদের আসতে বল।"

পুরো পোষাক পরে মেয়ে ঘরে ঢুকল। তার দেহের অনেকখানিই খোলা। তার নিজের শরীর তাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, আর মেয়ে তার শরীর দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সে এখন স্বাস্থ্যবতী, প্রেমময়ী; এই রোগ, যন্ত্রণা ও মৃত্যু তার সুখের পথে বিঘ্ন; এই এ সব কিছুর প্রতি সে বিরক্ত।

ফিয়দর পেত্রিশ্চেভও ঘরে ঢুকল। পরনে সান্ধ্য পোষাক। কোঁকড়া চুল, দীঘল পেশীবহুল গলা একটা সাদা কলারে শক্ত করে আটকানো, প্রশস্ত ফর্সা বুক, সরু কালো ট্রাউজারের তলায় শক্ত উরু দুটি স্পষ্ট প্রকাশমান, সাদা দস্তানা পরা হাতে দামী অপেরা হ্যাট।

তার পিছনে অলক্ষ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রটি। পরনে নতুন ইউনিফর্ম, হাতে দস্তানা, চোখের নীচে বিষণ্ণ নীল দাগ যার অর্থ আইভান ইল্যিচ ভালই জানে।

ছেলের জন্য সব সময়ই তার কষ্ট হয়। বাবার প্রতি সহানুভূতিবশত সেও কষ্ট পায়। তার সেই দুঃখমাখা মুখখানি বড়ই করুণ। আইভান ইল্যিচ মনে করে গেরাসিম ছাড়া একমাত্র ভলদ্যা-ই তাকে বুঝতে পারে, তার জন্য দুঃখ পায়।

সকলে বসল, সকলেই জানতে চাইল সে কেমন আছে। তারপর চুপচাপ। লিজা মার কাছে অপেরা-গ্লাসটার খোঁজ করল। কে সেটা নিয়েছে, বা কোথায় সেটা রাখা হয়েছে এই নিয়ে মা ও মেয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। ফলে একটা অপ্রীতিকর বিতণ্ডার সৃষ্টি হল।

ফিয়দর পেত্রিশ্চেভ জানতে চাইল, আইভান ইল্যিচ সারা বার্নহার্ডকে দেখেছে কিনা। আইভান ইল্যিচ প্রথমে প্রশ্নটা বুঝতেই পারল না; পরে বলল, "না। তুমি কি তাকে আগে দেখেছ?"

"হ্যাঁ। 'আদ্রিয়েন লেকুভরুর'-এ।"

প্রাস্কোভ্যা ফিয়দরভ্না মন্তব্য করল, ঐ ভূমিকায় সে বিশেষভাবে ভাল অভিনয় করে থাকে। মেয়েটিও কিছু কিছু মন্তব্য করল। ফলে শিল্প ও তার স্বাভাবিকতার উপরে এমন একটা আলোচনার সূত্রপাত হল যা সর্বত্র হয়ে থাকে এবং সব সময় একই রকম হয়।

আলোচনার মাঝখানে ফিয়দর পেত্রিশ্চেভ একবার আইভান ইল্যিচ-এর দিকে তাকিয়ে আবার চুপ করে গেল। অন্যরাও তার দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে গেল। আইভান ইল্যিচ ঝকঝকে চোখে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাদের উপর সে ভীষণ রেগেছে। তাকে শান্ত করা দরকার। কিন্তু সে কাজটা সোজা নয়। যেমন করেই হোক এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে হবে। সে সাহস কারও নেই। সকলেই শংকিত হয়ে পড়ল যে ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়ছে, প্রকৃত সত্য এবার প্রকাশ হয়ে পড়বে।

লিজাই প্রথম সাহস দেখাল। নিস্তব্ধতা ভাঙল। সকলের মনের কথা চাপা দিতেই সে চেয়েছিল, কিন্তু অনবধানতাবশত সবই বলে ফেলল।

বাবার দেওয়া ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, "যদি যেতেই হয় তাহলে আমাদের এখনই ওঠা দরকার।" এবং একটি প্রায়-অদৃশ্য অর্থপূর্ণ হাসি হেসে যুবকটিকে কিসের যেন ইঙ্গিত করে ঘাঘরার খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে সে উঠে দাঁড়াল।

সকলেই উঠল, বিদায় নিল, চলে গেল। সকলে যাবার পরে আইভান ইল্যিচ-এর মনে হল সে যেন কিছুটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছে; মিথ্যার অস্তিত্ব আর নেই, তাদের সঙ্গেই চলে গেছে; কিন্তু ব্যথাটা আছে। সেই একটা ব্যথা, একটানা আতংক, তার বৃদ্ধিও নেই, হ্রাসও নেই। সেটা সব সময়ই খারাপ।

আবার সেই মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সেই এক অবস্থা, তার শেষ নেই, আছে শুধু সেই ভয়ংকরতর অনিবার্য পরিণাম।

পিয়তর-এর প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, "হ্যাঁ, গেরাসিমকে পাঠিয়ে দাও।"

॥ ৯ ॥

অনেক রাতে স্ত্রী ফিরল। সে পা টিপে টিপে এল, তবু তার পায়ের শব্দ সে শুনতে পেল, চোখ খুলল, আবার তখনই বন্ধ করল। গেরাসিমকে পাঠিয়ে দিয়ে স্ত্রী নিজেই তার পাশে বসে থাকতে চাইল। চোখ খুলে সে বলল, "না, তুমি চলে যাও।"

"তোমার কি খুব বেশী ব্যথা হচ্ছে?"

"একই রকম।"

"একটা আফিম খাও।"

সম্মতি জানিয়ে তাই খেল। স্ত্রী চলে গেল।

তিনটে পর্যন্ত সে শোচনীয়ভাবে ঘুমোল। তার মনে হল, তার ব্যথা-শুদ্ধ তাকে যেন একটা সংকীর্ণ, গভীর, কালো বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একেবারে সেটার তলায় ফেলে দেবার জন্য তাকে অনবরত ঠুঁসে দিচ্ছে। এই ভয়ংকর কাজের ফলে তার খুব কষ্টও হচ্ছিল। ভয় পেয়েও সে বস্তার ভিতর ঢুকতেই চাইছে; বাধা দিলেও সে ওটার ভিতরে থাকতেই চেষ্টা করছে। হঠাৎ সে পিছলে নীচে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল। গেরাসিম তখনও সেই একভাবে পায়ের কাছে বসে শান্ত মনে ধৈর্য ধরে ঝিমুচ্ছে। আর মোজা-পরা শুকনো পা দুটিকে গেরাসিম-এর

কাঁধের উপর রেখে সে শুয়ে আছে ; অন্তহীন ব্যথাটা একভাবেই চলেছে।

"তুমি যাও গেরাসিম", সে ফিস্ ফিস্ করে বলল।

"ঠিক আছে স্যার। আর একটু থাকি।"

"না, চলে যাও।"

পা দুটি নামিয়ে সে পাশ ফিরে শুল। নিজের জন্যই তার কষ্ট হতে লাগল। গেরাসিম পাশের ঘরে যাওয়া পর্যন্ত সে কোন রকমে অপেক্ষা করল ; তারপর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, ছোট ছেলের মত কেঁদে উঠল। সে কাঁদল নিজের অসহায়তার জন্য, ভয়াবহ একাকিত্বের জন্য, মানুষের নিষ্ঠুরতার জন্য, ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার জন্য, ঈশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য।

"কেন তুমি এমন করলে ? কিসের জন্য আমার এই অবস্থা ? কেন, কেন আমাকে এত ভীষণ দুঃখ দিচ্ছ ?"

এ প্রশ্নের কোন জবাব সে আশা করে না ; আসলে সে কাঁদছিল কারণ এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই, জবাব থাকতে পারে না। যন্ত্রণাটা আবার বেড়ে গেল, কিন্তু সে একটুও নড়ল না, কাউকে ডাকল না।

শুধু নিজের মনেই বলতে লাগল, "এস, আরও কাছে এস ; এস, আঘাত কর। কিন্তু কেন ? আমি তোমার কি করেছি ? কেন ?"

তারপর সে চুপ করে গেল, কান্না থামাল, নিঃশ্বাস বন্ধ করল, কান পাতল ; কান পাতল কোন মুখর কণ্ঠস্বর শুনতে নয়, আত্মার কণ্ঠস্বর, নিজের ভিতরে যে চিন্তার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তাকেই শুনতে।

"তুমি কি চাও ?···কি বললে ? দুঃখ চাও না, চাও বাঁচতে", সেই জবাব দিল।

তারপর এমন গভীর মনোযোগের মধ্যে ডুবে গেল যে ব্যথাটাও তার মনকে সরাতে পারল না।

"বাঁচতে চাও ? কিন্তু কেমন করে বাঁচবে ?" আত্মার কণ্ঠস্বরই প্রশ্ন করল।

"কেন, আগে যে ভাবে বেঁচেছি সেই ভাবেই বাঁচতে চাই—সুখে ও স্বচ্ছন্দে।"

"যেমন সুখে ও স্বচ্ছন্দে আগে বেঁচেছিলে ?" কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল। তারপরেই কল্পনায় যেন সে সুখী জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে ফিরে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সুখী জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিকে এখন যেন আর আগেকার মত মনে হল না। অবশ্য শুধু তার শৈশবের স্মৃতিগুলি ছাড়া—সেই শৈশবে এমন কিছু আনন্দের উপকরণ ছিল যাতে সে জীবন ফিরে পেলে সকলেই খুসি মনে তার মধ্যে বাঁচতে চায়। কিন্তু হায়, সে সুখের

দিনগুলি যার জীবনে এসেছিল আজ আর সে নেই ; সে যেন অন্য কোন মানুষের স্মৃতি।

শৈশব থেকে যতই সে বর্তমানের দিকে এগোতে লাগল ততই সেদিনের আনন্দ তার কাছে অর্থহীন ও অনিশ্চিত হয়ে উঠল। আইন-বিদ্যালয়ের দিনগুলি থেকেই তার সূত্রপাত। তখন জীবনে সত্যিকারের ভাল কিছু ছিল ; স্ফূর্তি ছিল ; বন্ধুত্ব ছিল ; আশা ছিল। কিন্তু উপরের শ্রেণীতে উঠতে উঠতেই সেই শুভ মুহূর্তগুলি ক্রমেই বিরল হতে লাগল। পরবর্তীকালে, চাকরি জীবনের প্রথম অধ্যায়ে, গভর্নর হবার সময়ে, কিছু কিছু শুভ মুহূর্ত এসেছিল ; কিন্তু তাতে দুঃখের ভেজাল ছিল, সে শুভ ক্রমেই দুঃখের দিকে ঢলে পড়ছিল। শুভদিন ক্রমেই কমতে লাগল ; যতদিন দিন গেল সুখ ততই কমতে লাগল।

তার বিবাহ······তার স্ত্রীর নিঃশ্বাস ও জৈবিকতা, প্রবঞ্চনা ! তারপর সেই মারাত্মক চাকরি-জীবন, অর্থ-লিপ্সা ; সেই ভাবে এক বছর, দু' বছর, দশ, বিশ, সারাটা জীবন। যত দিন গেল, ততই অবস্থা মারাত্মক হতে লাগল। "আমি যেন ক্রমাগত নীচে নেমে যাচ্ছিলাম, অথচ মনে হচ্ছিল যেন উপরে উঠছি। আসলেও তাই। লোকের চোখে আমি উপরেই উঠছিলাম, কিন্তু আমি যতই উপরে উঠছিলাম, জীবনে ততই লেগেছিল ভাঁটার টান···আর এবার সব কাজের অবসান, এবার শুধু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা।"

"কিন্তু এটা কি হল ? কেন হল ? এ হতে পারে না ! জীবন কি এত অর্থহীন, এত ঘৃণার বস্তু হতে পারে ? আর তাই যদি হয়, তাহলে মৃত্যুতে এত কষ্ট কেন ? নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে।"

"তাহলে কি যে ভাবে বাঁচা উচিত আমি সে ভাবে বাঁচি নি ?" হঠাৎ এই প্রশ্নটা মাথায় এল। "কিন্তু তাই বা নয় কেন ? যা কিছু করণীয় সবই তো আমি করেছি।" সঙ্গে সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর সব রহস্যের এই একমাত্র সমাধানকে সে সম্পূর্ণ অবান্তর বলে বাতিল করে দিল।

"এখন তুমি কি চাও ? বাঁচতে ? কেমন করে বাঁচতে ? ঘোষক যখন চেঁচিয়ে বলে 'বিচারক আসছেন !' তখন আদালতে তুমি যে ভাবে বাঁচতে সেই ভাবে বাঁচতে চাও কি ?"···"বিচারক আসছেন ! বিচারক আসছেন !" কথাগুলি সে বার বার আবৃত্তি করল। ক্রোধে সে আর্তনাদ করে উঠল, "এই তো তিনি এসেছেন। বিচারক এসেছেন ! কিন্তু আমার তো কোন দোষ নেই ! তাহলে কেন এই দুঃখ ?" কান্না থামিয়ে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। বার বার সেই একই প্রশ্ন করতে লাগল, "কেন, কিসের জন্য এত আতংক ?"

কিন্তু সে যতই ভাবুক, কোন জবাব খুঁজে পেল না। যে ভাবে বাঁচা

উচিত ছিল সে ভাবে সে বাঁচে নি এই ধারণা যতবার তার মাথায় এল ততবারই নিজের সঠিক জীবনযাত্রার কথা ভেবে এই বিচিত্র ধারণাকে সে মন থেকে বাতিল করে দিল।

॥ ১০ ॥

আরও একটি পক্ষকাল পার হয়ে গেল। আইভান ইল্‌য়িচ এখন আর সোফা থেকে উঠতে পারে না। বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না বলে সে সোফায় শুয়ে থাকে। প্রায় সর্বক্ষণ দেয়ালের দিকে মুখ রেখে শুয়ে সে একাকিত্বের অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য করে, আর একা একা সেই ব্যাখ্যাতীত প্রশ্নের কথাই ভাবে: এটা কি? এই কি মৃত্যু? ভিতর থেকে কে যেন জবাব দেয়, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।" এর বাইরে আর কিছুই নেই।

আইভান ইল্‌য়িচ প্রথম যখন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল রোগের একেবারে সেই প্রথম সময় থেকেই তার জীবন দুটি পরস্পরবিরোধী মনোভাবে ভাগ হয়ে গেছে, সেই দুটি মনোভাবই তার জীবনে ঘুরে ঘুরে এসেছে—একটি হতাশা ও দুর্বোধ্য ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতীক্ষা; অপরটি আশা ও একান্ত মনোযোগের সঙ্গে নিজের শরীরের উপর লক্ষ্য রাখা। প্রথম দিকে সাময়িকভাবে অকেজো একটি মূত্রাশয় ও অন্ত্র ছাড়া আর কোন সমস্যা তার সামনে ছিল না; তার পরেই এল চির-অজ্ঞাত ভয়ংকর মৃত্যুর চিন্তা যার হাত থেকে কোনক্রমেই পরিত্রাণ নেই।

রোগের সূচনা থেকেই এই দুটি মনোভাব ঘুরে ঘুরে এসেছে; কিন্তু রোগ যতই বাড়তে লাগল, মূত্রাশয়ের অবস্থা ততই সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক হয়ে দেখা দিল, আর আসন্ন মৃত্যুর অনুভূতি ততই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল।

তিন মাস আগে সে কি ছিল আর আজ সে কি হয়েছে—এই কথাটা ভাবলেই বোঝা যায় কত দ্রুত সে নীচে নেমে যাচ্ছে যার ফলে সব আশাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

ইদানীং কালে দেয়ালের দিকে মুখ রেখে সোফায় শুয়ে যে একাকিত্বের মধ্যে সে দিন কাটায়; একটি জনবহুল শহরের মাঝখানে অসংখ্য পরিচিত জন ও পরিবার-পরিবৃত হয়েও যে একাকিত্ব তাকে সহ্য করতে হয়, যার চাইতে অধিক একাকিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না—না সমুদ্রের তলদেশে, না মৃত্যুর অতল গহ্বরে;—ইদানীং কালে সেই ভয়াবহ একাকিত্বের মধ্যে আইভান ইল্‌য়িচ অতীতের স্মৃতিচারণের মধ্যেই বেঁচে আছে। অতীতের সব ছবি

একের পর এক তার সামনে ভেসে ওঠে। সব সময়ই নিকট অতীত থেকে আরম্ভ করে সে স্মৃতি-চারণা ক্রমাগত পিছনে যেতে যেতে শৈশবকালে গিয়ে থামে। খাবার সময় কুলের ঝোল দেওয়া হলে তার মন চলে যায় শৈশবের সেই দিনগুলিতে যখন সে চটচটে, শুকনো ফরাসি কুল মজা করে খেত, তার মনে পড়ে যেত সেই কুলের বিচিত্র স্বাদ, বীচিগুলো চুষবার সময় মুখে জল আসার কথা ; আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে যেত সেই সময়কার অনেক স্মৃতি—তার নার্স, তার ভাই, খেলার সাথীরা। "না, এ সব আর নয়…এ সব বড় বেদনাদায়ক," নিজের মনেই কথাগুলি বলে আইভান ইল্যিচ আবার বর্তমানে ফিরে এল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা স্মৃতির মিছিল তার মনের সামনে এসে দাঁড়াল—তার রোগের সূচনা ও বৃদ্ধি। রোগ অনেক দিন থেকেই আছে, কিন্তু যত পিছনে ফিরে যাওয়া যায় ততই জীবনের দেখা মেলে। জীবনের যা কিছু ভাল সবই সেখানে ছিল ; ছিল জীবনও। দুইই মিলে-মিশে একাকার হয়ে ছিল। "ব্যথাটা যেমন ক্রমেই খারাপ হতে আরও খারাপ হয়ে চলেছে, তেমনি জীবনটাও খারাপ হতে আরও খারাপ হয়ে চলেছে। এ সব কিছুর পিছনে আছে জীবনের সূচনায় একটিমাত্র উজ্জ্বল বিন্দু, তারপরই নেমে এল কালো অন্ধকার—দ্রুত হতে দ্রুততর গতিতে। আইভান ইল্যিচ-এর মনে হল, "সে গতি চলেছে মৃত্যুর দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে।" তখনই ক্রমবর্ধমান গতিতে পতনশীল একটি পাথরের ছবি তার মনের মধ্যে গেঁথে গেল। ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণার পথ বেয়ে অতি দ্রুত গতিতে জীবন ছুটে চলেছে তার পরিণতির দিকে—"আমি পড়ে যাচ্ছি" এই অনুভূতিতে। সে কেঁপে উঠল, চোখ সরিয়ে নিল, গতিরোধ করতে চাইল, কিন্তু আগে থেকেই সে জানে যে বোধ করবার ক্ষমতা তার নেই ; সে দিকে চেয়ে চোখ শ্রান্ত হয়ে উঠল, তবু চোখ সরিয়ে নেবার ক্ষমতা নেই ; তাই সোফার পিছন দিকে চোখ ফিরিয়ে সেই ভয়াবহ পতন, আঘাত ও ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করে রইল। নিজে নিজেই বলল, "প্রতিরোধ অসম্ভব। তবু কেন এই ধ্বংস তা যদি বোঝা যেত। কিন্তু তাও অসম্ভব। যদি কেউ বলতে পারত যে যথাযথ জীবন যাপন করি নি, তাহলে হয় তো এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। কিন্তু সে অভিযোগও করা যাবে না। সেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।" একটা ব্যঙ্গের হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠল, যেন তার সেই হাসি দেখে কেউ ভুল বুঝতে পারে। "কোন ব্যাখ্যা নয়! যন্ত্রণা, মৃত্যু……কিন্তু কেন ?"

॥ ১১ ॥

এইভাবে একটি পক্ষ কেটে গেল। এর মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা আইভান ইল্‌য়িচ ও তার স্ত্রী মনে-প্রাণে চেয়েছিল। পেত্রিশ্‌চেভ বিয়ের প্রস্তাব করল। ব্যাপারটা ঘটল সন্ধ্যাবেলা। ফিয়দর পেত্রিশ্‌চেভ-এর প্রস্তাবের কথাটা কি ভাবে স্বামীকে জানাবে সে কথা ভাবতে ভাবতেই পরদিন প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌না তার ঘরে ঢুকল। সেদিন রাতে আইভান ইল্‌য়িচ-এর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। সে উপুড় হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে; এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে রয়েছে।

স্ত্রী ওষুধের কথা বলতেই সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে স্ত্রীর প্রতি এত তীব্র ঘৃণা ঝরে পড়ছিল যে সে তার কথা শেষ করতেই পারল না।

আইভান ইল্‌য়িচ বলল, "খৃস্টের দোহাই, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।"

স্ত্রী হয় তো চলে যেত, কিন্তু সেই সময় তার মেয়ে ঘরে ঢুকল এবং শুভ সকাল জানাবার জন্য বাবার দিকে এগিয়ে গেল। আইভান ইল্‌য়িচ যে ভাবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল সেই একই ভাবে মেয়ের দিকেও তাকাল। সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় শুকনো গলায় বলে দিল যে শীঘ্রই সকলে তার হাত থেকে রেহাই পাবে। মা ও মেয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল।

লিজা মাকে বলল, "এতে আমাদের কি দোষ বল তো? যেন আমরাই এ সব করেছি! বাবার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু তাই বলে আমাদের কষ্ট দেওয়া কেন?"

যথাসময়ে ডাক্তার এল। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আইভান "হ্যাঁ; না" বলেই কাটিয়ে দিল। শেষের দিকে বলল, "আপনি তো জানেন কিছু করতে পারবেন না; কাজেই আমাকে একা থাকতে দিন।"

"আমরা আপনার যন্ত্রণাটা কমিয়ে দিতে পারি," ডাক্তার বলল।

"তাও আপনি পারেন না; ছেড়ে দিন।"

বসবার ঘরে গিয়ে ডাক্তার প্রাস্কোভ্‌য়া ফিয়দরভ্‌নাকে বলল যে অবস্থা খুবই খারাপ; এখন আফিম খাইয়ে যন্ত্রণার লাঘব করাই একমাত্র পথ, কারণ সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার জানাল, শারীরিক কষ্ট খুব বেশী তো বটেই, কিন্তু তার চাইতেও বেশী কষ্ট পাচ্ছে মানসিক যন্ত্রণায়, আর সেটাই তার আসল কষ্ট।

সেদিন রাতে গেরাসিম-এর সরল, চওড়া-গাল ঘুমন্ত মুখের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ তার মাথায় একটা নতুন চিন্তা ঢুকে পড়ল: "তাহলে কি সত্যি সত্যি সারা জীবন, সারা সচেতন জীবন আমি ঠিক পথে চলি নি?" এই চিন্তা থেকেই তার নৈতিক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তার ধারণা জন্মে গেছে

যে এতদিন যেটাকে সে অসম্ভব বলে মনে করেছে তাই আজ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে : যে ভাবে তার জীবন চালানো উচিত ছিল তা সে করে নি। তার সরকারী কাজ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, এই সব সামাজিক ও সরকারী কাজকর্ম— কোন কিছুই তো ঠিকমত করা হয় নি। আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা সে করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাকে সে সমর্থন করতে চাইছে তার দুর্বলতা তার চোখে ধরা পড়ে গেল। সমর্থনের চেষ্টা বৃথা।

নিজের মনেই সে বলল, "কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে, আর এই কথা জেনে আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি যে যা কিছু আমি পেয়েছিলাম সবই হারিয়েছি এবং প্রতিকারের আর কোন পথ খোলা নেই, তাহলে কি হবে?" চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সে নতুন করে সমস্ত জীবনের পর্যালোচনা করতে লাগল। সকালে যখন পরিচারক ঘরে এল, এল তার স্ত্রী, তার মেয়ে, এল ডাক্তার, তখন তাদের দেখে, তাদের প্রতিটি কথা শুনে সে বুঝতে পারল যে গত রাত্রে যে ভয়ংকর সত্য তার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে তাই ঠিক। তাদের মধ্যে সে নিজেকেই দেখতে পেল, তার সমস্ত জীবনকেই দেখতে পেল, পরিষ্কার বুঝতে পারল যে তার কোন কিছুই ঠিক নয়; একটা বিরাট, ভয়ংকর প্রবঞ্চনা তার জীবন ও মৃত্যুকে লুকিয়ে রেখেছিল। এই চেতনা তার দৈহিক যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তুলল, দশগুণ বাড়িয়ে দিল। আর্তনাদ করতে করতে সে বিছানায় গড়াতে লাগল, গায়ের চাদরটা ধরে টানতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, চাদরটা তাকে চেপে ধরেছে, তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। আর সেজন্য সে সবাইকে ঘৃণা করতে লাগল।

তারা তাকে একমাত্রা আফিম খাইয়ে দিল; সে চেতনা হারাল; খাবার সময় আবার সেই একই কাণ্ড শুরু হল। সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল।

তার স্ত্রী কাছে গিয়ে বলল, "জন, প্রিয়তম, আমার জন্য এটা কর (আমার জন্য?) এতে কোন ক্ষতি নেই, বরং অনেক সময়ই এতে উপকার হয়। আরে, এ তো কিছু না। অনেক সময় সুস্থ লোকরাও—"

সে বড় বড় করে তাকাল।

"কি? ধর্মানুষ্ঠান? কিসের জন্য? না। তাছাড়া......।"

তার স্ত্রী কেঁদে উঠল।

"হ্যাঁগো। আমি পুরোহিতকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তিনি বড় ভাল মানুষ।"

"ঠিক আছে, খুব ভাল," সে বলল।

পুরোহিত এসে তার স্বীকারোক্তি নেবার পর সে অনেকটা নরম হল, সন্দেহের হাত থেকে মুক্তি পেল, ফলে যন্ত্রণারও বুঝি অবসান হল, মুহূর্তের

জন্য আশা জাগল মনে। আর একবার আন্ত্রিক বিবর্ধনের কথা এবং রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনার কথা সে ভাবতে লাগল। অশ্রুসিক্ত চোখে সে ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিল।

অনুষ্ঠানের পরে আবার যখন সকলে তাকে শুইয়ে দিল তখন সে আরাম অনুভব করল, তার মনে আবার জীবনের আশা জেগে উঠল। যে অস্ত্রপচারের কথা তাকে বলা হয়েছিল তার কথা সে ভাবতে শুরু করল। নিজেকেই বলল, "আমি বাঁচতে চাই।" স্ত্রী এসে তাকে অভিনন্দন জানাল; তার মুখে চিরাচরিত কথাগুলিই উচ্চারিত হল—

"আসলে তুমি অনেক ভাল হয়ে গেছ, তাই নয় কি?"

স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই সে বলল, "হ্যাঁ।"

তার পোষাক, তার চেহারা, তার মুখের ভাব, তার কণ্ঠস্বর—সব একই কথা বলছে: "এটা আসল কথা নয়। তুমি যা কিছু নিয়ে বেঁচেছিলে এবং এখনও বেঁচে আছ সে সবই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা; জীবন ও মৃত্যুকে তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" এই চিন্তা মনের মধ্যে আসামাত্রই তার মধ্যে জেগে উঠল ঘৃণা, সেই ঘৃণার সঙ্গে দেখা দিল দৈহিক যন্ত্রণা, আর সেই যন্ত্রণার সঙ্গে এল অনিবার্য, আসন্ন ধ্বংসের আভাষ। নতুন কিছু ঘটতে লাগল; তীক্ষ্ম, মোচড়ানো যন্ত্রণা দেখা দিল; নিঃশ্বাস আটকে আসতে লাগল।

যখন সে "হ্যাঁ" শব্দটি উচ্চারণ করল তখন তার মুখের ভাব ভয়ংকর হয়ে উঠল। "হ্যাঁ" বলে স্ত্রীর মুখের দিকে সোজা তাকিয়েই সে মুখ ফিরিয়ে নিল, আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল—

"চলে যাও, চলে যাও, আমাকে একা থাকতে দাও!"

॥ ১২ ॥

সেই মুহূর্ত থেকে সেই যে আর্তনাদ শুরু হল তিন দিন তা আর থামল না। সে আর্তনাদ এতই ভয়াবহ যে দুটো বন্ধ দরজার ওপার থেকে শুনলেও আতংকে বুক কেঁপে ওঠে। স্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দেওয়ামাত্রই সে বুঝতে পারল যে তার পতন ঘটেছে, ফিরবার কোন পথ নেই, পরিণাম—শেষ পরিণাম সমাগত, অথচ সন্দেহের অবসান এখনও হল না, সন্দেহ সন্দেহই থেকে গেল।

"আঃ! আঃ!—আঃ!" নানা স্বরে সে আর্তনাদ করতে লাগল।

আর্তনাদের শুরুতেই সে বলেছিল, "আমি চাই না-আ!" তাই তার আর্তনাদে সেই একই স্বরবর্ণ "আ" বার বার উচ্চারিত হতে লাগল।

তার কাছে তখন সময় বলে কিছু ছিল না বটে, কিন্তু এই তিনটি দিন সেই কালো বস্তার মধ্যে সে অবিরাম সংগ্রাম করেছে—একটি অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য শক্তি যেন জোর করে তাকে সেই বস্তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। নিজেকে বাঁচাতে পারবে না জেনেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন জল্লাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে সেও সেই ভাবেই সংগ্রাম করেছে। প্রতিটি মুহূর্তে সে বুঝতে পারছে, তার সব চেষ্টা সত্ত্বেও যাকে দেখে তার এত ভয় ক্রমাগত তার দিকেই সে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে। সে বুঝতে পারছে, ঐ কালো গর্তটার মধ্যে তাকে যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সে জন্য তো বটেই, কিন্তু তার চাইতেও বেশী সে যে সোজা তার মধ্যে ঢুকতে পারছে না—এই উভয় কারণেই তার এই যন্ত্রণা। তার জীবন যে ভাল ভাবে কেটেছে এই দাবীই তাকে ওখানে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। জীবনের এই শক্তিই তাকে জোর করে ধরে রেখেছে, তাকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না, আর সে জন্যই তার সব চাইতে বেশী যন্ত্রণা।

অকস্মাৎ একটি শক্তি তার বুকে ও পাশে আঘাত করল; ক্রমেই তার শ্বাস রোধ করে দিতে লাগল ; সে গড়িয়ে সেই গর্তের মধ্যে পড়ে গেল ; আর তার শেষ প্রান্তে সে একটা আলো দেখতে পেল। অনেক সময় রেলগাড়িতে যেতে যেতে যখন সে আসলে পিছন দিকে চলেছে তখন তার মনে হয়েছে যে সে সামনের দিকে যাচ্ছে এবং তারপর হঠাৎ আসল দিকটা বুঝতে পেরেছে। এখনও ঠিক তাই ঘটল।

নিজের মনেই সে বলল, "হ্যাঁ, কোন কাজই ঠিকমত করা হয় নি, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। ঠিক কাজটা সে তো করতে পারত। কিন্তু ঠিক কাজটা কি ?" প্রশ্নটা মনে জাগতেই সে চুপ করে গেল।

এটা তার মৃত্যুর দু'ঘণ্টা আগে তৃতীয় দিন শেষ হবার সময়কার কথা। ঠিক সেই সময় স্কুলের ছেলেটি চুপি চুপি বাবার ঘরে ঢুকে তার বিছানার পাশে গেল। মুমূর্ষু লোকটি আর্তনাদ করতে করতে হাত নাড়ছিল। তার একটা হাত স্কুলের ছেলেটির মাথায় পড়ল। ছেলেটি হাতটা ধরে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরে কেঁদে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আইভান ইলিয়িচ গড়িয়ে গর্তটার মধ্যে পড়ে গেল ; সেই আলোটা তার চোখে পড়ল ; সে দেখতে পেল, তার জীবন যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি বটে, কিন্তু সে জীবনকে এখনও ঠিক পথে নেওয়া যায়। সে নিজেকে প্রশ্ন করল; "ঠিক কথাটার মানে কি ?"—তারপর চুপ করে কান পেতে রইল। তখন তার মনে হল, কে যেন তার হাতে চুমো খাচ্ছে। চোখ মেলে সে ছেলেকে দেখতে পেল। তার জন্য দুঃখ হল। স্ত্রী তার কাছে এল। সে তার দিকেও চোখ ফেরাল। হাঁ করে স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে আছে,

না-মোছা চোখের জল তার নাক ও গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে, তার মুখে হতাশার ছায়া। স্ত্রীর জন্যও তার দুঃখ হল।

সে ভাবল, "হ্যাঁ, আমি তাদের দুঃখের মধ্যে ফেলে যাচ্ছি। এরা দুঃখ পাচ্ছে, কিন্তু আমি মারা গেলে এদের ভালই হবে।" এই কথাগুলি সে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলবার সাহস হল না। সে ভাবল, "তাছাড়া বলে কি হবে, কাজেই দেখাব।" স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছেলেকে দেখিয়ে সে বলল—

"নিয়ে যাও…ওর জন্য দুঃখিত…আর তুমিও…।" সে বলতে চেষ্টা করল "ক্ষমা কর," কিন্তু বলল শুধু "ক্ষমা…" দুর্বলতার জন্য সবট বলতে পারল না, শুধু মাথা নাড়ল; সে জানত, যাঁর জানা দরকার সেই ঈশ্বর ঠিকই জানবে।

আর সংগে সংগে সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, যা তাকে এতদিন কষ্ট দিয়েছে, কিছুতেই তাকে ছাড়ে নি, আজ তা হঠাৎ খসে পড়েছে—দুদিক থেকে; দশ দিক থেকে; সব দিক থেকে। সে তাদের জন্য দুঃখিত; তাই এমন কাজ সে করবে যাতে তারা দুঃখ না পায়। এই যন্ত্রণার হাত থেকে সে নিজে মুক্তি পাবে, তাদেরও মুক্তি দেবে। "কী ঠিক আর কত সরল!" সে ভাবল। "কিন্তু যন্ত্রণাটা?" নিজেকেই প্রশ্ন করল। "সে কোথায় গেল? এই যন্ত্রণা, তুমি কোথায়?"

সে যন্ত্রণাকে খুঁজতে লাগল।

"হ্যাঁ, এখানে আছে। বেশ তো, তাতে কি, থাকুক না।"

"আর মৃত্যু। সে কোথায়?"

চির-অভ্যস্ত মৃত্যুর আতংককে সে খুঁজতে লাগল, পেল না। "সে কোথায়? মৃত্যু কি?" আর কোন আতংক নেই; কারণ মৃত্যু আতংক নয়।

মৃত্যুর বদলে দেখা দিল আলো।

"তাহলে এই সে!" হঠাৎ সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল।

"কী আনন্দ।"

তার কাছে একটি মুহূর্তে এ সব কিছু ঘটে গেল; সেই মুহূর্তটির অর্থ পরে কোন দিন পরিবর্তিত হল না। যারা সেখানে ছিল তাদের কাছে তার যন্ত্রণা আরও দু'ঘণ্টা স্থায়ী হল। তার গলায় একটা ঘর্ ঘর্ শব্দ হল, তার শুকনো দেহটা কুঁচকে গেল। তারপর বেশ কিছু সময় পরে পরে ঘর্ ঘর্ শব্দ হতে লাগল, হাঁপ ধরতে লাগল।

"সব শেষ," তার উপর ঝুঁকে পড়ে কে যেন বলল।

কথাগুলিকে সে আঁকড়ে ধরল, আত্মার মধ্যে আবৃত্তি করতে লাগল।

নিজেকে বলল, "মৃত্যুর অবসান হল। সে আর নেই।"

সে নিঃশ্বাস টানল, মাঝ পথে থেমে গেল, শরীরটা টান-টান করল, মারা গেল।

মার্চ ২৬, ১৮৮৬

তিন সন্ন্যাসী

The Three Hermits

(ভল্‌গা অঞ্চলে প্রচলিত একটি উপকথা)

একজন বিশপ জাহাজে চড়ে আর্ক্যাঞ্জেল থেকে সলোভেৎস্ক মঠে যাচ্ছিল। সেখানকার পবিত্র স্থানগুলি দর্শনের উদ্দেশ্যে এক দল তীর্থযাত্রীও সেই একই জাহাজে যাচ্ছিল। যাত্রা নির্বিঘ্নেই চলল। বাতাস অনুকূল; আবহাওয়া পরিষ্কার। তীর্থযাত্রীরা ডেক-এর উপর আসন নিয়েছে; কেউ খাচ্ছে, কেউ বা দল বেঁধে গল্প করছে। বিশপও ডেক-এ নেমে এল। ডেক-এর উপর পায়চারি করতে করতে বিশপ দেখল, একদল লোক জাহাজের গলুইতে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে একটি জেলের কথা শুনছে। জেলেটি সমুদ্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাদের কি যেন বলছে। বিশপ পায়চারি থামিয়ে সেই দিকে নজর ফেরাল। সূর্যের আলোয় সমুদ্রের ঝিকিমিকি ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পেল না। ভাল করে শোনবার জন্য সে আরও এগিয়ে গেল, কিন্তু তাকে দেখেই লোকটি মাথার টুপি নামিয়ে চুপ করে গেল। অন্য সকলেও টুপি খুলে বিশপকে অভিবাদন জানাল।

বিশপ বলল, "বন্ধুগণ, আমার জন্য আপনারা বিব্রত হবেন না। এই ভালমানুষটি কি বলছে সে কথা শুনতেই আমি এসেছি।"

"জেলেটি সন্ন্যাসীদের কথা বলছিল," অপেক্ষাকৃত সাহসী বণিকটি জবাব দিল।

জাহাজের পাশে গিয়ে একটা বাক্সের উপর বসে বিশপ জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ সন্ন্যাসী? তাদের কথা আমাকে বল। আমিও জানতে চাই। আপনারা কি দেখাচ্ছিলেন আঙুল দিয়ে?"

"কেন, দূরে ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন ওই ছোট দ্বীপটা", একটু ডান দিক ঘেঁসে সামনের একটা জায়গা দেখিয়ে লোকটি বলল। "আত্মার মুক্তির জন্য সন্ন্যাসীরা তো ঐ দ্বীপেই থাকেন।"

"দ্বীপ কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না," বিশপ বলল।

"ঐ যে দূরে—আমার হাত বরাবর তাকান। এক টুকরো মেঘ দেখতে পাচ্ছেন তো? তারই নীচে, একটু বাঁয়ে, ঐ যে অস্পষ্ট রেখা, ওটাই দ্বীপ।"

বিশপ ভাল করে তাকাল; কিন্তু তার অনভ্যস্ত চোখে রৌদ্রালোকিত জলের ঝিকিমিকি ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ল না।

সে বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওখানে যে সন্ন্যাসীরা থাকেন তারা কারা?"

জেলেটি উত্তর দিল, "তারা ধর্মাত্মা লোক। অনেক দিন ধরে তাদের কথা শুনেছি, কিন্তু গেল বছরের আগে কখনও তাদের দেখার সুযোগ পাই নি।"

তারপর জেলেটি সব কথা খুলে বলল। একদিন রাতে মাছ ধরতে বেরিয়ে পথ হারিয়ে সে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল; তখন সে জানতেও পারে নি কোথায় গিয়ে উঠেছে। সকালে দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে একটি মাটির কুটির দেখতে পেল; একটি বুড়ো মানুষ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। আরও দুজন বেরিয়ে এল। তাকে খাইয়ে-দাইয়ে, তার জিনিসপত্র শুকিয়ে তারা তিনজন নৌকোটা মেরামত করতেও তাকে সাহায্য করল।

"আর তারা দেখতে কেমন?" বিশপ জিজ্ঞাসা করল।

"একজন বেশ ছোটখাট, পিঠটা কুঁজো। তার পরনে পুরোহিতের জোব্বা, আর খুব বুড়ো; আমার তো ধারণা, বয়স একশ'র উপরে। তিনি এত বুড়ো যে তার পাকা দাড়িতে সবুজের আভা লেগেছে, কিন্তু মুখখানি সর্বদাই হাসিখুসি, আর স্বর্গের দেবদূতের মতই উজ্জ্বল। দ্বিতীয় জন একটু লম্বা, কিন্তু তিনিও খুব বুড়ো। পরনে শতচ্ছিন্ন একটা চাষীদের কোট। চওড়া দাড়ি, তাতে হলদেটে ধূসর রঙের ছোপ। তিনি বেশ শক্ত-সমর্থ। আমি হাত লাগাবার আগেই তিনি এমন ভাবে আমার নৌকোটাকে উল্টে দিলেন যেন একটা গামলা। তিনিও খুব দয়ালু আর হাসিখুসি। তৃতীয় জনও লম্বা; বরফের মত সাদা দাড়ি হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কিছুটা কড়া ধাতের মানুষ; ভুরু দুটি ঝুলে পড়েছে; কোমরে জড়ানো এক খণ্ড মাদুর ছাড়া পরনে আর কিছু নেই।"

"আর তারা কি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?" বিশপ জিজ্ঞাসা করল।

"অধিকাংশ সময়ই তারা চুপচাপ কাজ করছিলেন; নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা বলছিলেন খুবই কম। একজন হয় তো চোখ তুলে তাকালেন, অন্যরা তাতেই তার মনের কথা বুঝে ফেললেন। সব চাইতে লম্বা লোকটিকে

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তারা অনেক কাল ধরে সেখানে আছেন কি না। তিনি ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন; মনে হল তিনি রাগ করেছেন। কিন্তু সব চাইতে বুড়ো মানুষটি তার হাত ধরে হাসলেন, আর তখনই লম্বা লোকটি শান্ত হলেন। বুড়ো মানুষটি শুধু বললেন, 'আমাদের করুণা করুন,' তারপর হাসলেন।"

জেলেটি কথা বলতে বলতেই জাহাজটা দ্বীপের আরও কাছে পেঁীছে গেল।

হাত বাড়িয়ে দ্বীপটা দেখিয়ে বণিকটি বলে উঠল, "ঐ যে, প্রভু যদি দয়া করে ও দিকে তাকান তাহলেই এবার পরিষ্কার দেখতে পাবেন।"

বিশপ তাকাল; এবার সে একটা কালোমত জিনিস দেখতে পেল—সেটাই দ্বীপ। সেদিকে একটুখানি তাকিয়ে সে গলুই ছেড়ে জাহাজের পিছন দিকে গিয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কোন্ দ্বীপ?"

লোকটি উত্তর দিল, "ওটার কোন নাম নেই। এই সমুদ্রে ও রকম অনেক দ্বীপ আছে।"

"আত্মার মুক্তিলাভের আশায় ওখানে সন্ন্যাসীরা বাস করেন এ-কথা কি সত্যি?"

"সে রকমই তো শুনেছি প্রভু, তবে সত্যি কি না জানি না। জেলেরা তো বলে তাদের দেখেছে; তবে তারা তো বানিয়ে গল্পও বলতে পারে।"

বিশপ বলল, "ঐ দ্বীপে নেমে লোকগুলিকে আমি দেখতে চাই। কি করে যাব বল তো?"

মাঝি বলল, "জাহাজ তো দ্বীপে ভিড়তে পারবে না, তবে নৌকোতে চেপে ওখানে যেতে পারেন। আপনি বরং কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলুন।"

কাপ্তানকে ডেকে পাঠাতেই সে এসে হাজির হল।

বিশপ বলল, "আমি ঐ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। নৌকো করে আমাকে কি তীরে নামিয়ে দেওয়া যাবে না?"

কাপ্তান তাকে নিবৃত্ত করতে অনেক চেষ্টা করল।

বলল, "সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যায়, তবে আমাদের অনেকটা সময় নষ্ট হবে। আর প্রভু যদি অভয় দেন তো বলি, এত কষ্ট করে গিয়ে দেখবার মত লোক সে বুড়োরা নয়। শুনেছি তারা বোকা-সোকা বুড়ো মানুষ, কিছুই বোঝে না, জলের মাছের মতই কখনও কোন কথাও বলে না।"

বিশপ বলল, "আমি ওদের দেখতে চাই। আপনাদের যে অসুবিধা ও সময় নষ্ট হবে সেটা আমি পুষিয়ে দেব। দয়া করে একটা নৌকোর ব্যবস্থা করে দিন।"

কোন উপায় নেই; অগত্যা সেই হুকুমই দেওয়া হল। নাবিকরা পাল নামিয়ে দিল, মাঝি হাল ধরল, আর জাহাজের মুখটা দ্বীপের দিকে ঘুরিয়ে

দেওয়া হল : আগা-গলুইতে বিশপের জন্য একটা চেয়ার পেতে দেওয়া হল। সেখানে বসে সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। যাত্রীরা সকলেই সেখানে জড়ো হয়ে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল। যাদের চোখ ভাল তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপের পাহাড় এবং তারপরেই একটা মাটির কুটির দেখতে পেল। একজন তো শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীদেরও দেখতে পেল। কাপ্তান একটা দূরবীন এনে চোখে লাগিয়ে তারপর সেটা বিশপের হাতে দিল।

"ঠিকই বটে। তীরে তিনটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে, বড় পাহাড়টার একটু ডান দিকে।"

বিশপ দূরবীনটা হাতে নিয়ে ঠিক মত চোখে লাগিয়ে তিনজনকেই দেখতে পেল : একজন লম্বা, একজন অপেক্ষাকৃত কম লম্বা, ও একজন বেঁটে আর কুঁজো ; হাত ধরাধরি করে তীরে দাঁড়িয়ে আছে।

কাপ্তান বিশপের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"জাহাজ তো আর এগোতে পারবে না প্রভু। যদি তীরে যেতে চান, আপনাকে নৌকোয় যেতে হবে ; আমরা এখানেই নোঙর ফেলে অপেক্ষা করব।"

দড়ি-দড়া বের করা হল ; নোঙর নামানো হল ; পাল গুটিয়ে ফেলা হল। একটা ধাক্কা খেয়ে জাহাজটা কেঁপে উঠল। তারপর নৌকোটা নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িরা লাফিয়ে নেমে পড়ল। বিশপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসন গ্রহণ করল। লোকজনরা দাঁড়ে টান দিল ; নৌকোটা দ্রুত দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলল। কাছাকাছি পৌঁছতেই তারা তিন বৃদ্ধকে দেখতে পেল : একজন লম্বা, কোমরে একখণ্ড মাদুর জড়ানো ; একজন তার চাইতে বেঁটে, পরনে শতচ্ছিন্ন চাষীদের কোট ; আর একজন খুব বুড়ো, বয়সের ভারে ন্যুব্জদেহ, পরনে পুরনো জোব্বা—তিনজন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িরা নৌকোটাকে টেনে তীরের কাছে নিয়ে গেলে বিশপ মাটিতে নামল।

তিন বৃদ্ধ তাকে অভিবাদন জানালে বিশপ তাদের আশীর্বাদ করল। তখন তারা মাথা আরও বেশী নোয়াল। তখন বিশপ তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি শুনেছি, আপনারা পুণ্যাত্মা লোক, নিজেদের আত্মার মুক্তির জন্য এবং আপনাদের প্রতিবেশীদের জন্য প্রভু যীশু খৃস্টের কাছে প্রার্থনা করেই আপনারা এখানে দিন কাটান। আমি খৃস্টের একজন অক্ষম সেবক ; ঈশ্বরের কৃপায়ই তাঁর মেষপালকে পালন করবার ও শিক্ষা দেবার দায় আমার উপর পড়েছে। আপনারাও ঈশ্বরের সেবক, তাই আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, যাতে আপনাদেরও কিছু শিক্ষা দিতে পারি।"

বৃদ্ধরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল, কিন্তু চুপ করে রইল।

বিশপ বলল, "আমাকে বলুন, আত্মার মুক্তির জন্য আপনারা কি করছেন, আর এই দ্বীপে কেমন করেই বা আপনারা ঈশ্বরের সেবা করছেন।"

দ্বিতীয় সন্ন্যাসীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সব চাইতে প্রবীণ লোকটির দিকে তাকাল। সে মৃদু হেসে বলল, "কি করে ঈশ্বরের সেবা করতে হয় আমরা জানি না। হে ঈশ্বরের সেবক, আমরা শুধু নিজেদের সেবা করি, নিজেদের পালন করি।"

"আর ঈশ্বরের কাছে কেমন করে প্রার্থনা করেন?" বিশপ জিজ্ঞাসা করল।

সন্ন্যাসী জবাব দিল; "এইভাবে আমরা প্রার্থনা করি: তুমিও তিন, আমরাও তিন, আমাদের দয়া কর।"

বুড়ো মানুষটি এই কথা বললে তিনজনই আকাশের দিকে চোখ তুলে তার পুনরাবৃত্তি করল:

"তুমিও তিন, আমরাও তিন, আমাদের দয়া কর।"

বিশপ মৃদু হাসল। বলল, "পবিত্র ত্রিমূর্তি'র কথা আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। কিন্তু আপনাদের প্রার্থনাটা ঠিক মত হচ্ছে না। আপনারা পুণ্যাত্মা; আপনাদের আমার ভাল লেগেছে। বুঝতে পারছি, প্রভুকে আপনারা খুসি করতে চান, কিন্তু কি ভাবে তাঁকে সেবা করতে হয় সেটা জানেন না। প্রার্থনা করার রীতি ওটা নয়; আমার কথা শুনুন, আমি আপনাদের শিখিয়ে দেব। আমার নিজস্ব কোন ধারা আপনাদের শেখাব না; পবিত্র গ্রন্থে ঈশ্বর স্বয়ং সকলকে যেভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন সেটাই আপনাদের শিখিয়ে দেব।"

তখন বিশপ সন্ন্যাসীদের বোঝাতে লাগল কি ভাবে ঈশ্বর মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন; ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা—এই তত্ত্বও সে তাদের বুঝিয়ে দিল।

বলল; "ঈশ্বরপুত্র মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন মানুষকে উদ্ধার করতে; আর তিনি আমাদের শেখালেন এইভাবে প্রার্থনা করতে। ভাল করে শুনুন, আর আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন: 'আমাদের পিতা।'

প্রথম বৃদ্ধটি বলল, "আমাদের পিতা"; দ্বিতীয় জন বলল, "আমাদের পিতা", আর তৃতীয় জনও বলল, "আমাদের পিতা।"

"যিনি স্বর্গে অবস্থান করেন;" বিশপ বলতে লাগল।

প্রথম সন্ন্যাসী বলল, "যিনি স্বর্গে অবস্থান করেন"; কিন্তু দ্বিতীয় সন্ন্যাসী কোন রকমে কথাগুলি উচ্চারণ করল, আর তৃতীয় সন্ন্যাসী ঠিক মত বলতেই পারল না। তার লম্বা চুল মুখের উপর এসে পড়ায় সে পরিষ্কারভাবে কথা বলতেই পারে না। একটা দাঁতও না থাকায় অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসীটির

কথাও জড়িয়ে যায়।

বিশপ কথাগুলি আবার বলল; বৃদ্ধরাও তার পুনরাবৃত্তি করল। বিশপ একটা পাথরের উপর বসল, আর তিন বৃদ্ধ তার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের ভঙ্গী দেখে দেখে কথাগুলি উচ্চারণ করতে লাগল। সারাটা দিন বিশপ এক নাগাড়ে পরিশ্রম করে গেল; একই কথা বিশ, ত্রিশ, একশ' বার বলল, আর বৃদ্ধরা তার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আওড়াতে লাগল। তাদের ভুল হলে সে শুধরে দিল, আবার নতুন করে শুরু করল।

প্রভুর প্রার্থনার সম্পূর্ণটা তাদের না শেখানো পর্যন্ত বিশপ সেখান থেকে গেল না। ক্রমে তার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো বলতে তো তারা শিখলই, এমন কি নিজেরাই কথাগুলি বলতেও শিখে ফেলল। মাঝামাঝি বৃদ্ধটিই সকলের আগে শিখে ফেলে একাই সবটা আবৃত্তি করতে পারল। বিশপ তাকে দিয়ে প্রার্থনাটা বার বার বলাতে লাগল, আর শেষ পর্যন্ত সকলেই সেটা বলতে শিখে গেল।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে গেল; সাগরের বুক থেকে চাঁদ উঠল। তখন বিশপ জাহাজে ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তারা ষাষ্টাঙ্গ হয়ে তাকে অভিবাদন জানাল। সে প্রত্যেককে তুলে তাদের চুম্বন করল, তার শেখানো মত করে প্রার্থনা করতে বলল। তারপর নৌকোতে চেপে জাহাজে ফিরে গেল।

নৌকোতে বসে জাহাজের দিকে যেতে যেতে সে শুনতে পেল, সন্ন্যাসীদের তিনটি কণ্ঠস্বর সোচ্চারে প্রভুর প্রার্থনা আবৃত্তি করে চলেছে। নৌকো যখন জাহাজের কাছে পেঁছে গেল তখন আর তাদের গলা শোনা গেল না; কিন্তু চাঁদের আলোয় দেখা গেল, ঠিক যে ভাবে বিশপ তাদের সমুদ্রের তীরে ছেড়ে এসেছিল ঠিক সেই ভাবেই তারা দাঁড়িয়ে আছে; সব চাইতে ছোট মানুষটি মাঝখানে, সব চাইতে লম্বা মানুষটি ডাইনে, আর মাঝারি মানুষটি বাঁয়ে। বিশপ জাহাজের কাছে পেঁছে উপরে উঠে যেতেই নোঙর তুলে পাল খুলে দেওয়া হল। পালে বাতাস লাগতেই জাহাজ চলতে শুরু করল; গলুইতে বসে বিশপ ফেলে-আসা দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ সন্ন্যাসীদের দেখা গেল; তারপর তারা অদৃশ্য হয়ে গেল; চোখের সামনে ভাসতে লাগল কেবলমাত্র চন্দ্রালোকিত সাগরের ঢেউগুলি।

তীর্থযাত্রীরা শুয়ে পড়ল; ডেকটা চুপচাপ। বিশপের ঘুমুতে ইচ্ছা করল না; একাকি সে গলুইতে বসে রইল। সমুদ্রের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েও দ্বীপটাকে দেখতে পেল না। ভাল মানুষ বৃদ্ধদের কথাই ভাবতে লাগল। মনে পড়ল, প্রভুর প্রার্থনাটা শিখতে পেরে তারা কত খুসিই না হয়েছে। এমন পুণ্যাত্মা লোকদের কিছু শেখাতে, কিছুটা সাহায্য করতে ঈশ্বর তাকে

সেখানে পাঠিয়েছেন বলে সে তাঁকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ জানাল।

বসে বসে এই সব ভাবতে ভাবতে সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। দ্বীপটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার চোখের সামনে চাঁদের আলো যেন ঢেউয়ের তালে তালে নেচে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল; চাঁদের আলো পড়ে সাগরের বুকে যে উজ্জ্বল পথটা তৈরি হয়েছে তার উপর একটা সাদা কিছু যেন ঝকঝক করছে। ওটা কি কোন সামুদ্রিক পাখি, না কি কোন ছোট নৌকোর চকচকে পাল? বিশপ অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

মনে মনে বলল, "নিশ্চয় কোন নৌকো পাল তুলে আসছে; কিন্তু এটা তো অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে। এক মিনিট আগেই অনেক দূরে ছিল, কিন্তু এর মধ্যেই অনেকটা কাছে এসে গেছে। ওটা তো নৌকো হতে পারে না, কারণ কোন পাল দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু যাই হোক না কেন, ওটা আমাদের লক্ষ্য করেই আসছে, আর প্রায় পৌঁছেও গেছে।"

কিন্তু জিনিসটা যে কি তা সে বুঝতে পারল না। নৌকো নয়, পাখি নয়, মাছও নয়। মানুষের চাইতে অনেক বড়। তাছাড়া সমুদ্রের মাঝখানে তো আর একটা মানুষ যেতে পারে না। বিশপ উঠে হালধারীকে বলল:

"ওদিকে দেখ তো বন্ধু, ওটা কি? আরে, এ কি?" কথাটা বললেও বিশপ এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—তিনটি সন্ন্যাসী জলের উপর দিয়ে দৌড়ে আসছে; সারা শরীর সাদা, পাকা দাড়ি চকচক করছে; তারা এত দ্রুত জাহাজের কাছে এগিয়ে আসছে যেন জাহাজটা মোটেই চলছে না।

সে দিকে তাকিয়ে হালধারী আতংকে হালটা ছেড়ে দিল।

"হে প্রভু! সন্ন্যাসীরা জলের উপর দিয়ে এমন ভাবে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে যেন ওটা শুকনো মাটি!"

তার কথা শুনে যাত্রীরা লাফ দিয়ে উঠে গলুই-র কাছে ভিড় করল। তারাও দেখল, সন্ন্যাসীরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে আসছে; দু' পাশের দু'জন ইঙ্গিতে জাহাজটাকে থামাতে বলছে। তিনজনই জলের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে পা না ফেলে। জাহাজটা থামাবার আগেই সন্ন্যাসীরা পৌঁছে গেল; মাথা উঁচু করে তিনজন এক সঙ্গে বলতে লাগল:

"ঈশ্বরের সেবক, আপনার শিক্ষা আমরা ভুলে গেছি। যতক্ষণ আবৃত্তি করছিলাম ততক্ষণ মনে ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বলা বন্ধ করতেই একটা শব্দ বাদ পড়ে গেল; আর এখন সব ভুলে গেছি। কিছুই মনে করতে পারছি না। আবার আমাদের শিখিয়ে দিন।"

বিশপ ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে জাহাজের পাশে ঝুঁকে পড়ে বলল:

"আপনারা ঈশ্বরের প্রিয়জন, আপনাদের নিজস্ব প্রার্থনাই প্রভুর কাছে পৌঁছবে। আপনাদের শেখাবার শক্তি আমার নেই। আমাদের মত পাপীদের

জন্য প্রার্থনা করবেন।"

তখন বিশপ নত হয়ে বৃদ্ধদের অভিবাদন করল; তারাও মুখ ঘুরিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে ফিরে গেল। যে জায়গায় গিয়ে তারা দৃষ্টি-পথের আড়ালে চলে গেল; ভোর না হওয়া পর্যন্ত সেখানে একটা আলো জ্বলতে লাগল।

১৮৮৬

ক্ষুদে শয়তান ও পাঁউরুটির ছিলকা

The imp and the crust

একদিন খুব সকালে একটি গরীব চাষী লাঙল চষতে গেল। প্রাতরাশের জন্য সঙ্গে নিল পাঁউরুটির উপরকার এক টুকরো ছিলকা। লাঙলটা ঠিকঠাক করে, রুটির ছিলকাটাকে কোট দিয়ে চাপা দিয়ে একটা ঝোপের নীচে রেখে সে কাজ শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল; তার নিজেরও ক্ষিধে পেয়ে গেল; তাই লাঙল থেকে খুলে ঘোড়াটাকে চরতে দিল এবং কোট ও প্রাতরাশ আনতে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল।

কোটটা তুলে দেখে, রুটিটা উধাও। অনেক খুঁজল, কোটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, ঝাড়ল—কিন্তু রুটিটা কোথাও নেই। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারল না।

ভাবল, "আশ্চর্য ব্যাপার! কাউকে তো দেখতে পাই নি। কিন্তু কেউ না কেউ নিশ্চয় এসেছিল; এসে রুটিটা নিয়ে গেছে!"

চাষী যখন জমিতে লাঙল দিচ্ছিল সেই সময় ক্ষুদে শয়তান এসে রুটিটা চুরি করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সে ঝোপের আড়ালেই বসে ছিল; অপেক্ষা করছিল কখন চাষীটা দিব্যি গেলে শয়তানকে ডাকবে।

প্রাতরাশটা হারিয়ে চাষীর খুব দুঃখ হল; তবু সে বলল, "তা আর কি করা যাবে। আমি তো আর ক্ষিদেয় মরে যাব না। হয় তো দরকার ছিল বলেই কেউ রুটিটা নিয়েছে। তার কাজে লাগুক!"

তখন সে কুয়োর কাছে গিয়ে অনেকটা জল খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর ঘোড়াটাকে লাঙলে জুতে আবার চষতে শুরু করল।

চাষী কোন পাপ কাজ করল না দেখে ক্ষুদে শয়তানটা মন-মরা হয়ে পড়ল; সব কথা জানাতে তার মনিব শয়তানের কাছে চলে গেল।

শয়তানের কাছে গিয়ে সে চাষীর রুটি নিয়ে নেবার কথাটা জানাল; আরও জানাল যে, এতে তাকে গালাগালি না করে সে বরং বলেছে, "তার

কাজে তো লাগুক।”

শয়তান রেগে জবাব দিল: “লোকটা যদি তোমার উপর টেক্কা মেরে থাকে, সেটা তোমার দোষ—তুমি নিজের কাজও বোঝ না। যদি চাষীরা ও তাদের বৌরা ওই পথেই চলে তাহলে তো আমাদের দফা রফা। এ ভাবে চলতে দেওয়া যায় না! এখনই ফিরে যাও, সব ঠিক করে ফেল। তিন বছরের মধ্যে যদি ওই চাষীর উপর টেক্কা দিতে না পার তাহলে তোমাকে পবিত্র জলে চুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব!”

ক্ষুদে শয়তানটা ভয় পেয়ে গেল। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে ভাবতে বসল কি করে তার দোষের প্রতিকার করা যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে একটা ভাল মতলব ঠাওড়াল।

একটা মানুষের বেশ ধরে গরীব চাষীর বাড়িতে গিয়ে চাকরি সে নিল। প্রথম বছর সে চাষীকে জলা জমিতে ফসল বুনবার পরামর্শ দিল। তার পরামর্শমত চাষীও জলাজমিতেই ফসল বুনল। সে বছরটা খুব খরা হল। ফলে অন্য সব চাষীর ফসল রোদের তাপে পুড়ে গেল, কিন্তু সেই গরীব চাষীর ফসল খুব ঘন, লম্বা, আর দানায় ভরা হল। শস্য যা পেল তাতে সারা বছর চলেও বেশ কিছুটা উদ্বৃত্ত হবে।

পরের বছর ক্ষুদে শয়তান পাহাড়ের উপরে ফসল বুনতে পরামর্শ দিল। আর সে বছর গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টি হল। অন্য সকলের ফসল জমিতে শুয়ে পড়ল, পরে গেল, দানাও ভাল হল না; কিন্তু পাহাড়ের উপরে বলে চাষীর খুব ভাল ফসল হল। আগের তুলনায় এত বেশী ফসল বেচে গেল যে তা নিয়ে কি করবে বুঝতে পারল না।

তখন ক্ষুদে শয়তান কেমন করে শস্য গুঁড়ো করে চোলাই মদ বানাতে হয় সেটা চাষীকে শিখিয়ে দিল। চাষীও কড়া মদ তৈরি করে নিজে খেল, বন্ধুবান্ধবদেরও খাওয়াল।

কাজেই ক্ষুদে শয়তান তার মনিব শয়তানের কাছে গিয়ে গর্ব করে জানাল যে তার পরাজয়ের বদলা সে নিয়েছে। শয়তান বলল, সে নিজে গিয়ে অবস্থাটা দেখে আসবে।

চাষীর বাড়িতে গিয়ে দেখল, চাষী সব প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে এনে মদ খাওয়াচ্ছে। তার বৌ অতিথিদের মদ পরিবেশন করছে। সকলের হাতে হাতে মদ দিতে গিয়ে টেবিলে হোঁচট খেয়ে সে এক গ্লাস মদ ঢেলে ফেলল।

চাষী রেগে গিয়ে বৌকে বকুনি দিল: “এটা কি করলি মাগী? এটা কি নর্দমার জল পেয়েছিস যে ভাল জিনিসটা মেঝেময় ছড়িয়ে দিলি?”

ক্ষুদে শয়তান কনুই দিয়ে তার মনিব শয়তানকে খোঁচা দিয়ে বলল,

"দেখ, এই লোকই তার একমাত্র রুটির ছিলকাটা হারিয়েও কিছু মনে করে নি।"

বৌকে বকতে বকতে চাষী নিজেই মদ পরিবেশন করতে লাগল। সেই সময় একটি গরীব চাষী কাজ থেকে ফিরে বিনা নিমন্ত্রণেই সেখানে হাজির হল। সকলকে অভিবাদন জানিয়ে সেও বসে গেল। সকলেই মদ খাচ্ছে। সারাদিনের খাটুনির ফলে সেও খুব শ্রান্ত; তাই তার মনে হল, এক ফোঁটা পেলে ভাল হত। সে বসে আছে তো বসেই আছে। তার মুখে জল আসতে লাগল। কিন্তু সেই চাষী তাকে মদ তো দিলই না, বরং নিজের মনে বক্‌বক্‌ করতে লাগল: "যে কেউ এসে হাজির হলেই তো তাকে আমি মদ দিতে পারি না।"

এতে শয়তানটা খুসি হল; কিন্তু ক্ষুদে শয়তান মুচকি হেসে বলল, "দাঁড়াও না, এখনও অনেক বাকি আছে।"

ধনী চাষীরা মদ খেল; বাড়ির মালিকও খেল। তারপর তারা পরস্পরকে বানানো সব খোসামুদে কথা বলতে লাগল।

সে সব শুনে শয়তানটা ক্ষুদে শয়তানের তারিফ করতে লাগল।

বলল, "মদ যখন ওদের এতখানি চালাক করে তুলেছে যে একে অন্যকে ঠকাতে শুরু করেছে, তখন শীঘ্রই ওরা আমাদের খপ্পরে এসে পড়বে।"

ক্ষুদে শয়তানটি বলল, "দেখই না কি হয়। আর এক পাত্র করে চলুক না। এখন তো সব শেয়াল বনে গেছে, লেজ নাড়তে নাড়তে একে অন্যের পিছনে ঘুরছে; একটু পরেই দেখবে সব বুনো নেকড়ে হয়ে গেছে।"

চাষীরা আরও এক গ্লাস করে টানল, আর তাদের কথাবার্তাও আরও বেপরোয়া ও ভয়ানক হয়ে উঠল। তেল-দেওয়া কথার বদলে এবার তারা পরস্পরকে খিস্তি-খেউড় করতে শুরু করল। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল লড়াই, নাকের উপর চলল ঘুঁসি। বাড়ির মালিকও তাতে মদত দিতে গিয়ে উত্তম-মধ্যম খেল।

শয়তান তো এ সব দেখেশুনে মহা খুসি।

"একেবারে পয়লা নম্বর।" সে বলে উঠল।

ক্ষুদে শয়তান বলল: "দাঁড়াও না—আসল খেলাই তো বাকি। আগে তিন নম্বর গ্লাস চলুক। এখন ওরা নেকড়ের মত গর্জাচ্ছে, আর এক পাত্তর পেটে পড়লে একেবারে শুয়োর বনে যাবে।"

তৃতীয় গ্লাসও ঘুরে গেল। সকলেই জন্তু বনে গেল। কোন কিছু না জেনে-বুঝেই হৈ-হল্লা শুরু করে দিল; কারও কথা কেউ কানে তুলছে না।

তারপর সভা ভঙ্গ হল। কেউ একা, কেউ জোড়-বেঁধে, কেউ বা তিন জন

এক জুটিতে—সকলেই টলতে টলতে পথ চলতে লাগল। বাড়ির মালিক অতিথিদের এগিয়ে দিতে গিয়ে একটা ডোবার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে গেল; পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি; সেখানে পড়েই সে শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল।

শয়তানটা আরও খুসি।

সে বলল, "আরে; তুমি তো দেখছি বেশ পয়লা নম্বরের মদের ব্যবস্থা করেছ; রুটির বেলায় যে ভুলটা করেছিলে সেটা শুধরে নিয়েছ। কিন্তু এবার বল দেখি এ-মদটা কেমন করে বানানো হয়। প্রথমে নিশ্চয় এতে শেয়ালের রক্ত মিশিয়েছিলে; তাই ওরা শেয়ালের মত ধূর্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর মনে হয় মিশিয়েছিলে নেকড়ের রক্ত: তাই ওরা নেকড়ের মত হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আর শেষ করেছিলে নির্ঘাৎ শুয়োরের রক্ত দিয়ে, যাতে ওরা শুয়োরের মতই আচরণ করে।"

ক্ষুদে শয়তান বলল, "না, ও ভাবে করি নি। চাষী যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল পায় শুধু সেই চেষ্টাই করেছি। পশুর রক্ত তো মানুষের মধ্যে সব সময়ই থাকে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ফসলটুকুই তার থাকে; ততক্ষণ সে পশুটা ঘুমিয়ে থাকে। সেই রকম অবস্থাতেই শেষ রুটির ছিলকেটুকুর জন্যও তার মন টলে নি। কিন্তু যখনই বাড়তি ফসল হাতে পড়ল তখনই সে তাকে ভোগের সামগ্রী করে তুলতে চাইল। আর সেই ভোগের পথটাই আমি দেখিয়ে দিলাম—সেটা মদ খাওয়া! আর যেই ঈশ্বরের দানকে সে আত্ম-সুখের মদে পরিণত করল, অমনি তার ভিতরকার শেয়ালের, নেকড়ের ও শুয়োরের রক্ত সব বেরিয়ে এল। মদ খেতে শুরু করলেই সে পশুতে পরিণত হবে।"

শয়তানটা ক্ষুদে শয়তানকে প্রশংসা করল, আগেকার ভুলের জন্য তাকে ক্ষমা করল, আরও উঁচু মর্যাদার আসনে তাকে বসিয়ে দিল।

১৮৮৬

মুরগির ডিমের মত বড় শস্য-কণা

A grain as big as a hen's egg

একদিন কিছু ছেলেমেয়ে পাহাড়ের খাদে একটা জিনিস পেল; দেখতে শস্য-কণার মত, মাঝ-বরাবর খাঁজ-কাটা; কিন্তু আকারে একটা মুরগির ডিমের মত বড়। সেই পথে যেতে যেতে জনৈক পথিক সেটা দেখতে পেয়ে ছেলে-

মেয়েদের কাছ থেকে এক পেনি দিয়ে কিনে শহরে গিয়ে দুর্লভ বস্তু হিসাবে রাজার কাছে বিক্রি করল।

রাজা জ্ঞানীজনদের ডেকে জানতে চাইল জিনিসটা কি। তারা অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত একদিন হল কি, জিনিসটা যখন জানালার গোবরাটে পড়েছিল তখন একটা মুরগি উড়ে এসে সেটাকে ঠুকরে একটা গর্ত করে ফেলল, আর তখনই সকলে বুঝতে পারল যে সেটা একটা শস্য-কণা। বিজ্ঞজনরা রাজাকে গিয়ে বলল :

"এটা একটা শস্য-কণা।"

শুনে রাজা খুব বিস্মিত হল; হুকুম জারী করল, এ রকম শস্য কবে কোথায় উৎপন্ন হয়েছিল সেটা খুঁজে বের করতে হবে। বিজ্ঞজনরা আবার ভাবতে বসল, পুথির পাতা ওল্টাল; কিন্তু কোন হদিস পেল না। অতএব রাজার কাছে ফিরে গিয়ে তারা জানাল :

"আমরা কোন জবাব দিতে পারলাম না। পুথিপত্রে এর কোন উল্লেখ নেই। আপনি চাষীদের জিজ্ঞাসা করুন। এ রকম বড় আকারের শস্য কবে ও কোথায় জন্মাত সে খবর তাদের কেউ কেউ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনে থাকতে পারে।"

তখন রাজা হুকুম দিল, খুব বুড়ো একজন চাষীকে তার কাছে ধরে আনতে হবে; চাকররাও সে রকম একজনকে পেয়ে তাকে রাজার কাছে হাজির করল। লোকটি বুড়ো ও কুঁজো; গায়ের রং ছাইয়ের মত, একটাও দাঁত নেই; কোন মতে দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজার কাছে উপস্থিত হল।

রাজা তখন শস্যটা দেখাল, কিন্তু বুড়ো লোকটি কিছু দেখতেই পায় না; জিনিসটা নিয়ে তাতে হাত বুলোতে লাগল। রাজা জিজ্ঞাসা করল :

"তুমি কি বলতে পার বুড়ো, এ ধরনের শস্য কোথায় জন্মাত? এ রকম শস্য কি কখনও কিনেছ, বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ?"

বুড়ো লোকটি এত কালা যে রাজার কথা তার কানেই গেল না; অনেক কষ্টে কিছুটা বুঝে নিয়ে বলল, "না! আমার ক্ষেতে এ রকম শস্য কখনও বুনিও নি, কাটিও নি, বা কখনও কিনিও নি। আমরা যখন শস্য কিনতাম তখন সেগুলি এখনকার মতই ছোট ছিল। আপনি বরং আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এ রকম শস্য কোথায় জন্মাত সেটা তিনি হয় তো শুনে থাকবেন।"

রাজা তখন বুড়ো লোকটির বাবাকে আনতে লোক পাঠাল, আর তারাও তাকে এনে রাজার কাছে হাজির করল। সে কিন্তু একটা লাঠিতে ভর দিয়ে

হে'টেই এল। রাজা তাকে শস্য-কণাটা দেখাল। বুড়ো চাষীটি এখনও চোখে দেখতে পায়। সেটাকে হাতে নিয়ে সে ভাল করে দেখতে লাগল। রাজা জিজ্ঞসা করল :

"তুমি কি বলতে পার বুড়ো এ রকম শস্য কোথায় জন্মাত ? এ রকমটা কি কখনও কিনেছ; বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ ?"

এই বুড়োটি কানে কম শুনলেও তার ছেলের চাইতে ভাল শুনতে পেত। সে বলল, "না। আমার ক্ষেতে এ রকম শস্য কখনও বুনি নি বা কাটি নি। আর কেনার কথা যদি বলেন, আমাদের আমলে টাকারই চলন ছিল না, কাজেই আমি কখনও কিছু কিনি নি। প্রত্যেকেই যার যার শস্য জন্মাত, এবং কারও কিছু প্রয়োজন হলে আমরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিতাম। এ ধরনের শস্য কোথায় জন্মাত আমি জানি না। আজকালকার গমের চাইতে আমাদের গম আকারে বড় ছিল এবং তা থেকে ময়দাও বেশী পাওয়া যেত, কিন্তু এত বড় শস্য আমি কখনও দেখি নি। অবশ্য বাবার কাছে শুনেছি, তার আমলে শস্য অনেক বড় হত এবং আমাদের কালের চাইতে বেশী ময়দা তা থেকে পাওয়া যেত। আপনি বরং তাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

কাজেই রাজা এই বুড়োর বাবাকে আনবার জন্য লোক পাঠাল, আর তারাও তাকে পেয়ে রাজার কাছে হাজির করল। সে লাঠি ছাড়াই সহজ ভাবে হে'টে এল; তার চোখ পরিষ্কার, কান ভাল, কথাও স্পষ্ট। রাজা তাকে শস্যকণাটা দেখাল : বুড়ো ঠাকুর্দা সেটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

বলল, "কতদিন পরে এত ভাল একটা শস্যকণা দেখতে পেলাম।" এক টুকরো দাঁতে কেটে নিয়ে সেটা খেতে লাগল।

"ঠিক সেই স্বাদ," সে আরও বলল।

রাজা বলল, "বল তো ঠাকুর্দা; কবে ও কোথায় এ রকম শস্য জন্মাত ? তুমি কি এ রকম শস্য কখনও কিনেছ, বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ ?"

বুড়ো লোকটি জবাব দিল :

"আমার আমলে এ রকম শস্য সব জায়গায়ই জন্মাত। যৌবনকালে আমরা তো এই রকম শস্যই খেতাম, অপরকেও খাওয়াতাম। আর এই রকম শস্যই তো আমরা বুনতাম, কাটতাম, ঝাড়াই করতাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করল, "বল তো ঠাকুর্দা, সে শস্য কি তোমরা কিনতে; না সবটাই নিজেরা ফলাতে ?"

বুড়ো লোকটি হাসল। জবাবে বলল, "আমার কালে রুটি কেনা-বেচার মত পাপের কথা কেউ ভাবতেই পারত না; তাছাড়া টাকা কাকে বলে তাও

আমরা জানতাম না। প্রত্যেকেই যথেষ্ট ফসল ফলাত।”

রাজা জিজ্ঞাসা করল, “তাহলে বল তো ঠাকুর্দা, তোমাদের জমি কোথায় ছিল—কোথায় তোমরা এ ধরনের ফসল ফলাতে?”

ঠাকুর্দা জবাব দিল, “আমার জমি ছিল ঈশ্বরের পৃথিবীতে। যেখানেই লাঙল চালাতাম, সেখানেই আমার জমি। শুধুমাত্র পরিশ্রমেরই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা।”

রাজা বলল, “আমার আরও দুটো প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথম প্রশ্ন, তখন মাটিতে এত বড় ফসল ফলত, কিন্তু এখন আর ফলে না কেন? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমার নাতি হাঁটে দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে, তোমার ছেলের লাগে একটা লাঠি, আর তোমার একটাও লাগে না—এটা কি রকম ব্যাপার? তোমার দৃষ্টি পরিষ্কার, দাঁত ভাল, কথা স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর। এটা কেমন করে হল?”

বুড়ো লোকটি জবাব দিল:

“এ রকমটা ঘটার কারণ মানুষ নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন না করে অপরের পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেকালে মানুষ চলত ঈশ্বরের নিয়মে। যা নিজের তাই নিয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিল, অন্যের ফসলের উপর কখনও লোভ করত না।”

১৮৮৬

অনুতপ্ত পাপী

The Repentant Sinner

একটি লোক পৃথিবীতে সত্তর বছর বেঁচেছিল, আর সারা জীবনই পাপে ডুবে ছিল। সে অসুস্থ হল, তবু অনুতপ্ত হল না। শুধু মৃত্যুকালে শেষ মুহূর্তে কাঁদতে কাঁদতে বলল:

“প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, কারণ অবস্থায় তুমি ক্রুশবিদ্ধ চোরকেও তো ক্ষমা করেছ।”

এই কথা বলতে বলতেই তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেল। আর সেই পাপীর আত্মা, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও তাঁর করুণায় বিশ্বাসবশত, স্বর্গের দরজায় গিয়ে কড়া নেড়ে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি চাইল।

দরজার ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল:

“স্বর্গের দরজায় কে কড়া নাড়ছে, আর বেঁচে থাকতে সে কি কি কাজই বা করেছে?”

জবাবে অভিযোগকারীর কণ্ঠ জানাল যে, লোকটি সারা জীবন শুধু পাপ কাজই করেছে, একটাও ভাল কাজ করে নি।

তখন দরজার ভিতর থেকে কণ্ঠস্বরটি বলল :

"পাপীরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এখান থেকে চলে যাও!"

তখন লোকটি বলল :

"প্রভু, আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তোমার নামটাও জানি না।"

কণ্ঠস্বর উত্তর দিল :

"আমি শিষ্য পিটার।"

তখন পাপী বলল :

"শিষ্য পিটার, আমাকে করুণা কর! মানুষের দুর্বলতা আর ঈশ্বরের করুণার কথা স্মরণ কর। তুমি কি খৃস্টের শিষ্য নও? তাঁর নিজের মুখের বাণী কি তুমি শোন নি? তাঁর দৃষ্টান্ত কি তোমার সামনে নেই? তাহলে স্মরণ কর, দুঃখিত চিত্তে, পীড়িত হৃদয়ে যীশু যখন তিন তিন বার তোমাকে জেগে থেকে প্রার্থনা করতে বলেছিল, তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, কারণ তোমার চোখ ঘুমে ভারি হয়ে এসেছিল, আর তিনবারই যীশু তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল। আমারও সেই অবস্থা। আরও স্মরণ কর, আমৃত্যু তাঁর প্রতি অনুগত থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তুমি তিনবার তাঁকে অস্বীকার করেছ আর তিনবার তাঁকে কাইয়াফাস-এর সামনে হাজির করা হয়েছে। আমারও সেই অবস্থা। আরও স্মরণ কর, মোরগ ডেকে উঠতেই তুমি বাইরে তীব্রস্বরে কেঁদেছিলে। আমারও সেই অবস্থা। কাজেই আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে তুমি আপত্তি করতে পার না।"

তারপরই দরজার ওপাশের কণ্ঠস্বর চুপ হয়ে গেল।

তখন সেই পাপী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার কড়া নেড়ে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি চাইল।

দরজার ওপাশে আবার একটি কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল। সে বলল :

"লোকটি কে? পৃথিবীতে সে কি ভাবে জীবন কাটিয়েছে?"

অভিযোগকারীর কণ্ঠস্বর আবারও জানিয়ে দিল, সেই পাপী শুধু পাপ কাজই করেছে, একটাও ভাল কাজ করে নি।

আর দরজার ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর বলল :

"এখান থেকে চলে যাও! এই সব পাপীরা স্বর্গে আমাদের সঙ্গে বাস করতে পারে না।"

তখন পাপী বলল : "প্রভু, আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, তোমার নামও জানি না।"

কণ্ঠস্বর বলল :

"আমি ডেভিড, রাজা ও ঈশ্বর-ভক্ত।"

পাপী আশা ছাড়ল না, বা স্বর্গের দরজা ছেড়েও গেল না ; বলল :

"আমাকে করুণা কর রাজা ডেভিড! মানুষের দুর্বলতা ও ঈশ্বরের করুণার কথা স্মরণ কর। ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসত, অন্য মানুষের চাইতে উপরে তোমাকে বসিয়েছিল। তুমি তো সব পেয়েছিলে : রাজত্ব, সম্মান, সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান ; কিন্তু গৃহ-শীর্ষ থেকে একটি গরীব মানুষের স্ত্রীকে দেখে তোমার মনে পাপ ঢুকল, ইরিয়া-র স্ত্রীকে হরণ করে লোকটাকে তুমি অ্যামোনাইট্‌সুদের তরবারিতে হত্যা করলে। তুমি ধনী হয়েও একটি গরিব মানুষের মেষীটিকে অপহরণ করে লোকটিকে খুন করেছ। আমিও তাই করেছি। স্মরণ কর, তারপরই তুমি কি ভাবে অনুতাপ করেছিলে, কেমন করে বলেছিলে, 'আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি, আমার পাপ সর্বদাই আমার চোখের সামনে ভাসছে।' আমিও তাই করেছি। আমার ভিতরে ঢোকায় তুমি তো আপত্তি করতে পার না।"

দরজার ভিতরকার কণ্ঠস্বর চুপ হয়ে গেল।

পাপী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবারও কড়া নেড়ে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে চাইল। আর দরজার ভিতর থেকে তৃতীয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

"লোকটি কে? পৃথিবীতে সে কি ভাবে জীবন কাটিয়েছে?"

অভিযোগকারীর কণ্ঠস্বর তৃতীয়বার সেই পাপীর শুধু পাপ কাজের বিবরণই দিল, একটাও ভাল কাজের কথা বলল না।

দরজার ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর বলল :

"এখান থেকে বিদায় হও! পাপীরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।"

তখন পাপী বলল :

"তোমার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তোমার নামও জানি না।"

তখন কণ্ঠস্বর বলল :

"আমি খৃস্টের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা জন।"

পাপী খুসি হয়ে বলল :

"এবার নিশ্চয় আমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে। পিটার ও ডেভিড আমাকে ঢুকতে দিতে বাধ্য, কারণ মানুষের দুর্বলতা ও ঈশ্বরের করুণার কথা তারা জানে ; আর তুমি আমাকে ঢুকতে দেবে, কারণ তুমি সকলকে বড় ভালবাস। মহাত্মা জন, তুমিই কি লেখ নি যে ঈশ্বর প্রেমময় ; আর যে মানুষ ভালবাসে না সে ঈশ্বরকেও জানে না? আর বৃদ্ধ বয়সে তুমি কি মানুষকে বল নি :

'ভাইসব, একে অন্যাকে ভালবাস?' তাহলে কেমন করে তুমি আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে, আমাকে তাড়িয়ে দেবে? হয় তুমি যা কিছু বলেছ তা প্রত্যাহার করে নেবে, আর নয় তো আমাকে ভালবেসে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে দেবে।"

স্বর্গের দরজা খুলে গেল; জন অনুতপ্ত পাপীকে আলিঙ্গন করে তাকে নিয়ে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করল।

১৮৮৬

ধর্মছেলে

The Godson

এক গরিব চাষীর ঘরে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। ভারি খুশি হয়ে চাষী গেল এক প্রতিবেশীর কাছে। বলল, "তুমি আমার ছেলের ধর্ম-বাপ হও।" গরিবের ছেলের ধর্ম-বাপ হতে সে নারাজ; তাই সে চাষীকে ফিরিয়ে দিল। একই অনুরোধ নিয়ে চাষী আর এক প্রতিবেশীর কাছে গেল। সেও তাকে ফিরিয়ে দিল।

একে একে সারা গ্রাম সে ঘুরল, কিন্তু কেউ ধর্ম-বাপ হতে রাজি হল না। অগত্যা সে অন্য জায়গার খোঁজে বের হল।

পাশের গ্রামে যাবার পথে দৈবাৎ একজন পথিকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

পথিক চাষীকে থামিয়ে বলল, "শুভ দিন চাষী ভাই, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোথায় চলেছ?"

চাষী জবাব দিল, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার একটি ছেলে হয়েছে। সে আমার যৌবনের আনন্দ, বার্ধক্যের আশ্রয়, আর মৃত্যুর পরে আমার স্মৃতি-চিহ্ন। তবু আমি গরিব বলে কেউ তার ধর্ম-বাপ হতে রাজি হল না। তাই অন্য গাঁয়ে চলেছি তার ধর্ম-বাপ-মার খোঁজে।"

আগন্তুক বলল, "আমাকে ধর্ম-বাপ করে নাও।"

চাষী তো ভারি খুশি। এই প্রস্তাবের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "কিন্তু তার ধর্ম-মা তাহলে কে হবে?"

লোকটি জবাব দিল, "আমার পরিচিত এক বণিকের মেয়ে। শহরে চলে যাও। স্কোয়ারের মুখোমুখি দোকান-ওয়ালা একটা পাথরের বাড়ি পাবে। সেই বাড়িতে ঢুকে মালিককে বলবে তাঁর মেয়েকে তিনি যেন ধর্ম-মা হবার

অনুমতি দেন।"

চাষী একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু ভাই, একজন ধনী ব্যবসায়ীর সংগে দেখা করে এ কথা বলবার আমি কে? সে তো ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেবে। মেয়েকেও অনুমতি দেবে না।"

"তাতে তোমার তো কোন অপরাধ হবে না। সেখানে গিয়ে তাঁকে বলেই দেখ না। কাল সকালেই উৎসবের আয়োজন কর। আমি ঠিক সময়ে হাজির হব।"

চাষী বাড়ি ফিরে এল। তারপর গেল শহরে বণিকের বাড়ি। উঠোনে পেঁৗছে ঘোড়া বাঁধতে না বাঁধতেই বণিক স্বয়ং বেরিয়ে এল।

বলল, "কী চাই?"

চাষী জবাব দিল, "চাই—মানে, ঈশ্বর আমাকে একটি পুত্র-সন্তান দিয়েছেন। সে হবে আমার যৌবনের আনন্দ, বার্ধক্যের আশ্রয়, আর মৃত্যুর পরে সে হবে আমার স্মৃতি-চিহ্ন। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, আপনার মেয়েকে তার ধর্ম-মা হবার অনুমতি দিন।"

"উৎসব কখন হবে?"

"কাল সকালে।"

"তাই হবে। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। কাল আমার মেয়ে উৎসবে উপস্থিত হবে।"

ঠিক তাই হল; পরদিন সকালে ধর্ম-বাপ ও ধর্ম-মা দুজনেই এল। উৎসব সম্পন্ন হল। কিন্তু শেষ হবার সংগে সংগেই ধর্ম-বাপ নিজের পরিচয় না জানিয়ে চলে গেল। কেউ আর তাকে দেখতে পেল না।

॥ ২ ॥

ছেলে বড় হতে লাগল। বাপ-মার আনন্দ ধরে না। ছেলে শক্ত-সমর্থ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, শান্তশিষ্ট।

দশ বছর বয়সে বাপ-মা তাকে লেখা-পড়া করতে পাঠাল। অন্য ছেলেরা পাঁচ বছরে যা শেখে এ-ছেলে এক বছরেই তা শিখে ফেলল। অল্প দিনেই তার লেখা-পড়া শেষ হয়ে গেল।

একবার 'পবিত্র সপ্তাহে' ছেলে যথারীতি ধর্ম-মাকে ঈশ্বরের আলিংগন জানাতে গেল। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে সে বলল:

"বাবা; মা, আমার ধর্ম-বাপ কোথায় থাকেন? আমার বড় ইচ্ছা সেখানে গিয়ে তাঁকেও ঈশ্বরের অভিবাদন জানাই।"

বাবা বলল, 'বাবা, তোমার ধর্ম-বাপ যে কোথায় থাকেন তা তো আমরা জানি না। একথা আমরাও অনেকবার ভেবেছি। তোমার নামকরণ উৎসবের পরে আর তাঁকে আমরা দেখি নি, তাঁর কথাও কারও কাছে শুনি নি। কাজেই তিনি কোথায় থাকেন, অথবা তিনি বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না।"

ছেলেটি তখন বাপ-মার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "তোমরা অনুমতি দাও, আমি তাঁকে খুঁজে দেখি। হয়ত আমি তাঁকে খুঁজে পাব, ঈশ্বরের অভিবাদন জানাতে পারব।"

বাবা-মার অনুমতি পেয়ে ছেলে ধর্ম-বাপের সন্ধানে যাত্রা করল।

॥ ৩ ॥

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে বড়-রাস্তা ধরে চলতে লাগল। আধ-বেলা হাঁটবার পরে একজন লোকের সঙ্গে তার দেখা হল।

আগন্তুক থেমে বলল, "শুভদিন বাছা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি কোথায় চলেছ?"

ছেলেটি জবাব দিল, "আজ সকালে আমি গিয়েছিলাম আমার ধর্ম-মার সঙ্গে দেখা করে ঈস্টারের অভিবাদন জানাতে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আমার ধর্ম-বাবা কোথায় থাকেন? আমার ইচ্ছা, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেও ঈস্টারের অভিবাদন জানাই।" তখন বাবা-মা আমাকে বললেন: 'বাছা, তোমার ধর্ম-বাপ কোথায় থাকেন আমরা জানি না। তোমার নামকরণ উৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদের বাড়ি থেকে চলে যান। কাজেই তাঁর কথা আমরা কিছুই জানি না, তিনি বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না।' কিন্তু ধর্ম-বাবাকে দেখতে আমার ভারি ইচ্ছা হয়েছে। তাই তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছি।"

তখন আগন্তুক বলল, "আমিই তোমার ধর্ম-বাপ।"

ছেলে তো আনন্দে আত্মহারা। তৎক্ষণাৎ সে ধর্ম-বাপকে ঈস্টারের আলিঙ্গন করল।

বলল, "ধর্ম-বাপ, আপনি এখন কোথায় চলেছেন? যদি আমাদের ওদিকে যান, তাহলে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসুন। আর যদি আপনার বাড়িতে যান, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

ধর্ম-বাপ বলল, "না, এখন তোমাদের বাড়ি যাবার সময় নেই, কারণ এইসব গাঁয়ে আমার অনেক কাজ আছে। কাল সকালে আমি বাড়ি ফিরব,

তখন তুমি আমার কাছে আসতে পার।"

"আপনার বাড়ির পথ আমি চিনব কেমন করে ধর্ম-বাবা?"

"সূর্যোদয়ের পথে সোজা এগিয়ে যাবে। যেতে যেতে একটা জঙ্গল দেখতে পাবে। তার মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেইখানে বসে বিশ্রাম করবে, আর সেখানে যা কিছু ঘটে তা লক্ষ্য করবে। তারপর বন থেকে বেরিয়েই তোমার সামনে একটা বাগান দেখতে পাবে। সেই বাগানের মধ্যে দেখতে পাবে একটা ঘর, তার ছাদটা সোনার। সেইটেই আমার বাড়ি। বাগানের দরজা পর্যন্ত সটান চলে যাবে। সেখানেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।"

এই কথা বলেই ধর্ম-বাপ ধর্ম-ছেলের সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

তখন ছেলেটি ধর্ম-বাপের কথামত পথ ধরে চলতে লাগল।

চলতে চলতে পেল সেই জঙ্গল আর তার মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে ছিল একটা পাইন গাছ। গাছের একটা ডালে একটা দড়ি বাঁধা। দড়িটার অপরদিকে প্রায় তিন "পুড" ওজনের একটা ওক কাঠের খণ্ড ঝোলানো। কাষ্ঠখণ্ডের ঠিক নিচে ছিল একভাঁড় মধু। ছেলেটি ভাবতে লাগল, এখানে এভাবে মধুর ভাঁড়টা রাখা হয়েছে কেন? ঠিক সেই সময়ে বনের ভিতরে একটা খচমচ আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখে, কয়েকটা ভালুক আসছে। সকলের আগে মা-ভালুক, তার পিছনে একটা কচি বাচ্চা, আর তারও পিছনে আরও তিনটে বাচ্চা।

ভালুক-মা লম্বা নাক উঁচু করে কি যেন শুঁকল, তারপরে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সোজা ভাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল; প্রথমে সে নিজের নাকটা ভাঁড়ের মধ্যে ডুবিয়ে দিল, তারপর ডাক দিল বাচ্চাগুলোকে। বাচ্চাগুলো এক ছুটে গিয়ে ভাঁড়ে মুখ দিল। ফলে ঝোলানো কাঠটা এদিক-ওদিক দুলতে লাগল, আর তার ধাক্কায় বাচ্চাগুলোও ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল। ব্যাপার দেখে ভালুক-মা থাবা দিয়ে কাঠটাকে চেপে ধরে একদিকে সরিয়ে দিল। ফলে সেটা আরও বেশী জোরে দুলতে দুলতে ফিরে এসে দুটো বাচ্চাকে আঘাত করল—একটার মাথায় ও আর একটার পিঠে। বাচ্চাদুটো চেঁচাতে চেঁচাতে একপাশে লাফিয়ে পড়ল। এতে ভালুক-মা আরও রেগে গেল। এবারে দুই থাবা তুলে কাঠটাকে ধরে মাথার উপরে তুলে আরও দূরে ঠেলে দিল। কাঠটা অনেকটা উঁচুতে উঠে যেতেই বাচ্চা ভালুকটা একলাফে ভাঁড়ের উপর

উঠে মধুর মধ্যে নাক ডুবিয়ে হাপুস্-হুপুস্ গিলতে শুরু করে দিল। অন্য বাচ্চাগুলোও আবার সেদিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তারা ভাঁড়ের কাছে পেঁছবার আগেই কাঠটা দ্রুতবেগে এসে বাচ্চাটার মাথায় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মরে গেল।

ভালুক-মা এবার তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে কাঠটাকে চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে দূরে ঠেলে দিল। কাঠটা উপরে উঠতে লাগল। আরও—আরও উপরে। ডালটাকেও ছাড়িয়ে গেল। ছিঁড়েই যাবে বুঝি দড়িটা।

এদিকে ভালুক-মা বাচ্চাদের নিয়ে আবার ভাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল। উপরে উঠতে উঠতে কাঠটা একটু থামল, তারপর নিচে নামতে লাগল। যত নিচে নামছে, গতি তত দ্রুততর হচ্ছে। দ্রুত—আরও দ্রুত—কাঠটা এসে ভালুক-মাকে আঘাত করল; তার মাথাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

উপুড় হয়ে পড়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে ভালুক-মা মরে গেল। বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

ব্যাপার দেখে ছেলেটি তো অবাক। আবার সে চলতে শুরু করল। তারপর দেখতে পেল একটা বড় বাগান। বাগানের মাঝখানে একটা খুব উঁচু বাড়ি। তার ছাদটা সোনার।

বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ধর্ম-বাপ হাসছে। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সে ধর্ম-ছেলেকে ভিতরে টেনে নিল। এগিয়ে চলল দুজনে। সে বাগানে এত সৌন্দর্য ও মাধুর্য ছড়ানো ছিল যা ছেলেটি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি।

ধর্ম-বাপ তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। ভিতরটা বুঝি বাগানের চেয়েও বেশী সুন্দর। তারা ঘরের পর ঘর পার হয়ে চলল। প্রতিটি ঘরই যেন আগের ঘরের চাইতে বেশী জমকালো ও মনোহারী।

অবশেষে তারা একটা সীল-করা দরজার কাছে পেঁছল।

ধর্ম-বাপ বলল, "এই দরজাটা দেখছ? এতে কোন তালা নেই, শুধু সীল-করা। যদিও এটা অনায়াসে খোলা যায় তবু তোমাকে বলছি, অমন কাজও করো না। তুমি এখানে থাকতে পার, খেলা করতে পার, যেখানে খুশি যেমন খুশি যেতে পার, সবকিছু উপভোগ করতে পার। শুধু একটি বিধান তোমাকে দিচ্ছি—কখনও এই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকো না। যদি কখনও এ ঘরে ঢুকতে চাও, তাহলে একটু আগে তুমি বনের মধ্যে যা দেখেছ

তা স্মরণ করো।"

এই কথা বলে ধর্ম-বাপ অদৃশ্য হল। তার পর থেকে ধর্ম'-ছেলে একা একা সেখানে এতই আনন্দে ও খোশ মেজাজে দিন কাটাতে লাগল যে ত্রিশ বছর সেখানে বাস করবার পরেও তার মনে হল, সে বুঝি মাত্র তিন ঘণ্টা হল সেখানে এসেছে। এই ত্রিশ বছর পরে ধর্ম'-ছেলে একদিন সীল-করা দরজাটার কাছে গিয়ে নিজের মনে ভাবতে লাগল, "ধর্ম'-বাপ আমাকে এই ঘরে ঢুকতে নিষেধ করেছেন কেন? আমি যদি এই ঘরে ঢুকে ভিতরে কি আছে দেখি, তাহলে কি হয়?"

তখন সে দরজায় ধাক্কা দিতেই সীল ভেঙে দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দেখল, এ-ঘরটি অন্য সব ঘরের চাইতে বড় ও ঝলমলে, আর তার মাঝখানে বসানো রয়েছে একটি সোনার সিংহাসন। ঘরগুলির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে সিংহাসনের কাছে গিয়ে পেঁছিল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে বসে পড়ল সিংহাসনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়ল, সিংহাসনের পাশে একটি রাজদণ্ড রয়েছে। রাজদণ্ডটি হাতে তুলে নিতেই—

একি! মুহূর্তের মধ্যে চারদিকের সব ঘরের সবগুলি দেয়াল গোল পাকিয়ে মিলিয়ে গেল। চারদিকে তার দৃষ্টি হল অবাধ। এক পলকে সে দেখতে পেল সমস্ত জগৎ; আর সেখানকার মানুষের সব কাজকর্ম। সম্মুখে সে দেখতে পেল সমুদ্রের বুকে জাহাজগুলো পাল তুলে চলেছে। দক্ষিণে দেখতে পেল সমস্ত বিদেশী অ-খ্রীস্টান জাতিগুলোর জীবনধারা। বাঁদিকে দেখতে পেল রুশ ছাড়া অন্য সব খ্রীস্টান জাতির কর্মধারা। সর্বশেষে, চতুর্থ দিকে সে দেখতে পেল কেমন করে আমাদের নিজের জাতি—রুশরা জীবন কাটাচ্ছে।

নিজে নিজেই সে বলে উঠল, "আচ্ছা, আমার নিজের বাড়িতে কী হচ্ছে, ফসল ভাল হয়েছে কি না, যদি দেখতে চাই কেমন হয়?"

নিজের দেশের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, ফসলের আঁটিগুলো দাঁড় করানো রয়েছে। তখন সে গুণে দেখতে লাগল কতগুলি আঁটি আছে। এমন সময় তার চোখে পড়ল, মাঠের উপর দিয়ে একখানি গরুর গাড়ি চলেছে, আর একটি চাষী তাতে বসে আছে।

প্রথমে সে ভাবল; তার বাবাই চলেছে রাতারাতি ফসলের আঁটি ঘরে আনতে। কিন্তু আর একবার দেখেই সে বুঝতে পারল, গাড়িখানি চালাচ্ছে একটি পাকা চোর, ভাসিলি কুদ্নিসভ্। আঁটিগুলোর কাছে গিয়ে সে সব আঁটি গাড়িতে বোঝাই করতে লাগল।

ব্যাপার দেখে ধর্ম'-ছেলে রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা! ওরা তোমার ক্ষেত থেকে ফসলের আঁটি চুরি করছে যে!"

তার বাবা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। বলল, "মনে হল যেন স্বপ্ন দেখলাম, কারা আমার ফসলের আঁটি চুরি করছে। গিয়ে বরং দেখেই আসি।"

ঘোড়ায় চেপে সে বেরিয়ে পড়ল। মাঠে পেঁছে ভাসিলিকে দেখতে পেল, আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। চাষীরা সব জড় হল, ভাসিলিকে মারধোর করে জেলে পাঠিয়ে দিল।

তারপর ধর্ম-ছেলে শহরে তার ধর্ম-মার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সে তখন একজন বণিককে বিয়ে করেছে। ধর্ম-মা ঘুমিয়ে আছে, ওদিকে তার স্বামী লুকিয়ে এক উপপত্নীর ঘরে চলে যাচ্ছে। ধর্ম-ছেলে বণিকের স্ত্রীকে ডেকে বলল, "ওঠ, তোমার স্বামী যে পাপ কাজ করতে উদ্যত!"

ধর্ম-মা লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। পোশাক পরে বের হল স্বামীর খোঁজে। তাকে যাচ্ছেতাই করে বকল, উপপত্নীকে মারধোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

তারপর দৃষ্টি দিল তার মায়ের দিকে। দেখল, মা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে একটা ডাকাত ঘরে ঢুকে তার সিন্দুক ভাঙতে শুরু করেছে। ঠিক সেই সময় সে জেগে চিৎকার করে উঠল। ডাকাতটা তখন একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হল।

ধর্ম-ছেলে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না, ডাকাতটাকে লক্ষ্য করে হাতের রাজদণ্ড ছুঁড়ে মারল। ঠিক মাথায় আঘাত লেগে ডাকাতটা সেখানেই মারা গেল।

॥ ৬ ॥

ডাকাতটাকে মারবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাড়ির দেওয়ালগুলি আবার চারদিক থেকে ঘিরে এল এবং জায়গাটা আবার আগেকার মত হয়ে গেল।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ধর্ম-বাপ। ধর্ম-ছেলের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনল।

বলল, "আমার আদেশ তুমি মান্য করনি। এমন একটি কাজ তুমি করেছ যা তোমার করা উচিত ছিল না: নিষিদ্ধ দরজাটা তুমি খুলেছ। দ্বিতীয় আর একটি কাজ তুমি করেছ সেটাও তোমার করা উচিত ছিল না: তুমি সিংহাসনে বসেছ আর আমার রাজদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছ। তৃতীয় আর একটি কাজও তুমি করেছ যা তোমার করা উচিত ছিল না। পৃথিবীর অনেক ক্ষতি তুমি করেছ। আর এক ঘণ্টা যদি তুমি ওখানে বসে থাকতে

তাহলে অর্ধেক মানুষেকে তুমি ধ্বংস করে ফেলতে।"

ধর্ম-বাপ তখন তার ধর্মছেলেকে আবার সিংহাসনের কাছে নিয়ে গেল এবং রাজদণ্ডটি হাতে নিল। সবগুলি দেওয়াল আবার গোল পাকিয়ে সরে গিয়ে সারা জগৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

ধর্ম-বাপ বলল, "প্রথমে দেখ তুমি তোমার বাবার কী করেছ। ভাসিলি এক বছর জেলে কাটিয়ে সবরকম পাপ কাজ শিখেছে এবং প্রতিবেশীদের উপর তিত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এবার দেখ, এইমাত্র সে তোমার বাবার দুটো ঘোড়া চুরি করেছে এবং তার গোলা পুড়িয়ে দিচ্ছে। তোমার বাপের এই দুর্দশা তুমিই করেছ।"

ধর্ম-ছেলে দেখতে পেল, তার বাবার গোলা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু ঠিক তখনই ধর্ম-বাপ সে-দৃশ্য তার চোখ থেকে আড়াল করে তাকে অন্য দিকে তাকাতে বলল।

"ওখানে দেখ। এক বছর হল তোমার ধর্ম-মার স্বামী একটা অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারে তাকে পরিত্যাগ করেছে। মনের দুঃখে সে মদ ধরেছে। তার স্বামীর উপপত্নীরও অশেষ দুর্গতি হয়েছে। তোমার ধর্ম-মার এই হাল তুমিই করেছ।"

ধর্ম-বাপ এ-ছবিও তার ধর্ম-ছেলের চোখ থেকে আড়াল করে তার নিজের বাড়ির দিকে তাকে দৃষ্টি ফেরাতে বলল। সেখানে তার মা নিজের পাপের জন্য অনুশোচনায় চোখের জল ফেলছে আর বলছে: "ডাকাত যদি আমাকে মেরে ফেলত সেও এর চেয়ে ভাল ছিল, কারণ তাহলে আমার পাপ আরও কম হত।"

"তোমার মায়ের এই দশা তুমি করেছ।" এই কথা বলে ধর্ম-বাপ সে দৃশ্য ধর্ম-ছেলের চোখ থেকে আড়াল করে নিচের দিকে তাকাতে বলল। সেখানে সে দেখল, অন্ধকার এক কারাকক্ষের সামনে সেই ডাকাত দাঁড়িয়ে আছে। দু-জন প্রহরী তাকে দু-দিক থেকে ধরে আছে।

ধর্ম-বাপ বলল, "আজ পর্যন্ত এই লোকটা দশটি জীবন নষ্ট করেছে। তুমি না মেরে ফেললে এইসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হত। কিন্তু এখন সে সব পাপ তুমি তোমার ঘাড়ে তুলে নিয়েছ, তোমাকেই তার জবাবদিহি করতে হবে। এখন বোঝ, তোমার নিজের কী দশা তুমি নিজে করেছ।"

ধর্ম-বাপ আরও বলল: "মা-ভালুক যখন প্রথমবার কাঠটাকে ধাক্কা দিল, তখন তার বাচ্চাগুলো সামান্য ভয় পেল মাত্র। দ্বিতীয়বার সে যখন সেটাকে দূরে ঠেলে দিল, তখন ছোট বাচ্চাটা মারা গেল। আর তৃতীয়বার কাঠটাকে ঠেলে দিয়ে সে নিজেই মারা গেল। তুমিও তাই করেছ। তবু তোমাকে আমি ত্রিশ বছর সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে তুমি সারা জগৎ ঘুরে ঐ

ডাকাতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। তা যদি না পার তাহলে ঐ ডাকাত যেখানে গেছে তোমাকেও সেখানেই যেতে হবে।"

তখন ধর্ম-ছেলে বলল: "তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি কেমন করে করব?"

জবাবে ধর্ম-বাপ বলল: "জগতে যতটা পাপ তুমি এনেছ ততটা পাপ যেদিন দূর করতে পারবে সেইদিনই তোমার পক্ষে ডাকাতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে।"

ধর্ম-ছেলে আবার প্রশ্ন করল: "কিন্তু কেমন করে আমি জগতের পাপ দূর করব?"

ধর্ম-বাপ বলল, "সোজা চলে যাও সূর্যোদয়ের দিকে। একটা মাঠে অনেক লোকজন দেখতে পাবে। খুব ভালভাবে লক্ষ্য করবে তারা কি করে, আর তুমি যা কিছু শিখেছ তাও তাদের জানাবে। আবার এগিয়ে যাবে সামনের দিকে, যা কিছু দেখার ভাল করে লক্ষ্য করবে। চতুর্থ দিনে পাবে একটি বন। তার মধ্যে আছে এক ঋষির আশ্রম। সেই আশ্রমে এক বৃদ্ধ বাস করেন। তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তাঁকে বলবে। তিনিই তোমাকে উপদেশ দেবেন। তাঁর কথামত সব কাজ করা হলেই ডাকাতের পাপ ও তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে।"

এই কথা বলে ধর্ম-বাপ তাকে ফটক থেকে বিদায় দিল।

॥ ৭ ॥

ধর্ম-ছেলে চলেছে—চলেছে। যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল: "জগতের পাপ আমি কেমন করে দূর করব? পাপ দূর করা যায় পাপীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে, জেলে পাঠিয়ে, ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে। তাহলে অন্যের পাপ নিজের ঘাড়ে না নিয়ে কেমন করে আমি জগৎকে পাপ-মুক্ত করব?"

এমনি নানাভাবে সে ভাবতে লাগল, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান করতে পারল না।

চলতে চলতে সে একটা মাঠে এসে পেঁছল। সারা মাঠে ঘন হয়ে প্রচুর ফসল ফলেছে। এখন কেটে নিলেই হয়।

হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা বাছুর ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়েছে, আর চাষীরা দেখতে পেয়ে ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেতের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যখনই বাছুরটা ক্ষেত থেকে বের হবার চেষ্টা করছে, তখনই কেউ না কেউ তাকে তাড়া করছে। ফলে সে ভয়ে আবার

ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ঘোড়সওয়াররা তখন আবার তাকে মাঠময় তাড়া করছে। আর সারাক্ষণ একটি বুড়ি বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচিয়ে বলছে: "আমার বাছুরটাকে মেরে ফেললে গো!"

তখন ধর্ম-ছেলে চাষীদের বলল: "এভাবে ছুটছ কেন? তোমরা সবাই ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এস, তখন বুড়ি ডাকলেই বাছুরটা তার কাছে চলে যাবে।"

চাষীরা তার কথা শুনল। তারা এসে ক্ষেতের পাশে দাঁড়াল। বুড়ি তখন চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, "আয়, আয়, পাগলা আমার, চলে আয়!"

বাছুরটা কান খাড়া করে কিছুক্ষণ শুনল। তারপর ছুটে গিয়ে মাথা দিয়ে বুড়ির স্কার্টে এমন ধাক্কা মারল যে বেচারি পড়ে যায় আর কি। যাহোক, শেষ পর্যন্ত চাষীরা খুশি হল, বুড়িও খুশি হল, বুঝি ছাগলটাও তথৈবচ।

পথ চলতে চলতে ধর্ম-ছেলে ভাবতে লাগল: "এইবার বুঝতে পেরেছি, পাপ দিয়ে পাপকে দূর করা যায় না। মানুষ যত বেশী পাপ করে, ততই পাপ বেড়ে চলে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পাপের কাছে পাপ ক্ষমতাহীন। কিন্তু সে পাপ কেমন করে দূর করতে হবে তা আমি জানি না। বাছুরটা বুড়ির ডাক শুনল দেখে ভালই লাগল। কিন্তু সে যদি ডাক না শুনত, তাহলে বুড়ি কেমন করে তাকে ক্ষেত থেকে সরিয়ে আনত?"

এই কথা ভাবতে ভাবতে ধর্ম-ছেলে এগিয়ে চলল।

॥ ৮ ॥

চলতে চলতে সে একটা গ্রামে পেঁছিল। সেখানে প্রথম বাড়িটায় সে রাতের মত আশ্রয় চাইল, বাড়ির কর্ত্রীও তাকে আশ্রয় দিল। বাড়িতে সে একা মানুষ, সব কিছু ধোয়া-মোছা করছিল।

ঘরের ভিতর ঢুকে নিঃশব্দে স্টোভের কাছে গিয়ে সে স্ত্রীলোকটির কাজকর্ম দেখতে লাগল। মেঝে শেষ করে সে তখন টেবিল ধুতে শুরু করেছে। ঢক-ঢক করে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে একটা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে টেবিলটা মুছতে লাগল। প্রাণপণে ঘসেই চলেছে, তবু টেবিল পরিষ্কার হয় না, কারণ ময়লা ন্যাকড়ার দাগ থেকেই যাচ্ছে। আবার উল্টো দিক থেকে ঘসে কিছু দাগ তুলে ফেলল। কিন্তু আবার নতুন দাগ পড়ল। এবার লম্বালম্বি ঘসে আবার উল্টো দিক থেকে ঘসল। ফল কিন্তু একই রয়ে গেল,—ময়লা ন্যাকড়ার নতুন দাগ পড়ল অনেক।

ধর্ম-ছেলে কিছুক্ষণ দেখে দেখে শেষটায় বলল: "হ্যাগো ভালমানুষের

মেয়ে, এ তুমি কী করছ ?"

সে বলল, "কেন ? দেখতে পাচ্ছ না ? উৎসবের দিন আসছে, তাই সব ধোয়া-মোছা করছি। কিন্তু এত খেটেও টেবিলটা কিছুতেই পরিষ্কার করতে পারছি না।"

"কিন্তু ময়লা ন্যাকড়াটা ভাল করে ধুয়ে নিঙড়ে নিয়ে তবে তো টেবিলটা মুছবে।"

স্ত্রীলোকটি তাই করল, আর অল্প সময়ের মধ্যেই টেবিলটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। সে বলল, "তুমি আমাকে যা শেখালে সেজন্য ধন্যবাদ।"

সকালে কর্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে আবার চলতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে একটা বনে এসে পেঁছিল। সেখানে দেখল, জনাকয়েক চাষী চাকার বেড় তৈরি করছে। আরও কাছে এগিয়ে সে দেখল, বেড় তৈরির গোল চাকটার চারদিকে তারা যতই ঘুরুক, বেড়টা কিছুতেই বেঁকছে না। একটু লক্ষ্য করেই সে বুঝতে পারল যে চাকটা খিল দিয়ে মাটির সঙ্গে আটকানো নয় বলেই তারা ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গে চাকটাও ঘুরছে, তাই বেড়টা বেঁকছে না।

সে তখন বলল, "ভাই, তোমরা কী করছ ?"

তারা জবাব দিল: "আমরা চক্রবেড় বাঁকাচ্ছি। এগুলোকে দু-বার জলে ভেজালাম, ঘুরতে ঘুরতে হায়রান হয়ে গেলাম, তবু কিছুতেই বাঁকাতে পারছি না।"

সে বলল, "কিন্তু সকলের আগে চাকটাকে ভাল করে আটকে নাও, তখন দেখবে, যেমন তোমরা ঘুরতে শুরু করবে, বেড়টাও আবার বেঁকতে থাকবে।"

এই কথা শুনে চাষীরা চাকটাকে আটকে দিল। ফলে তাদের কাজ বেশ ভালভাবে এগোতে লাগল।

তাদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে সে আবার চলতে শুরু করল। সারা দিন সারা রাত সে হাঁটল। ভোর-ভোর হতে সে একদল পশু-বিক্রেতার দেখা পেয়ে তাদের পাশে বসে পড়ল। দেখল, পশুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে তারা আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। তারা করছে কি, শুকনো ডালপালায় আগুন দিয়ে ভাল করে ধরে উঠবার আগেই তার উপর কতগুলো ঝোপ-ঝাড় চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে আগুনটা নিভে যাচ্ছে। বার বার তারা শুকনো ডালপালায় আগুন ধরাচ্ছে, আর বার বার তার উপরে ভিজে ঝোপ-ঝাড় চাপা দেওয়ায় আগুন নিভে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা তারা করল, কিন্তু কিছুতেই আগুন জ্বালাতে পারল না।

শেষকালে ধর্ম-ছেলে বলল, "অত তাড়াতাড়ি ঝোপ-ঝাড়গুলো চাপা দিও

না। আগুনটাকে আগে ভালভাবে জ্বলে উঠতে দাও। যখন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে তখন ওগুলো চাপা দিও।"

পশু-বিক্রেতারা তাই করল। আগে আগুনটাকে বেশ ভাল করে ধরিয়ে দিয়ে তারপর ঝোপ-ঝাড় চাপা দিল। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোতেও আগুন ধরে দাউ-দাউ করে সবটা জ্বলে উঠল।

তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার সে চলতে শুরু করল। যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল, এই তিনটি ঘটনা সে কেন দেখল? কিন্তু ভেবে কোন কিনারা করতে পারল না।

॥ ৯ ॥

সারা দিন পথ চলে সে বনের মধ্যে এক ঋষির আশ্রমে এসে পৌঁছল। আশ্রমের কাছে গিয়ে সে দরজায় টোকা দিল। ভিতর থেকে স্বর ভেসে এল: "কে?"

ধর্ম-ছেলে বলল, "এক মহাপাপী অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছে।"

একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল: "অন্যের কী কী পাপ তোমার ঘাড়ে চেপেছে?"

ধর্ম-ছেলে একে-একে সবই তাকে বলল—তার ধর্ম-বাপের কথা, ভালুক ও তার বাচ্চাদের কথা, ধর্ম-বাপের নির্দেশের কথা, মাঠে-দেখা চাষীদের কথা, তাদের শস্য-ক্ষেতের উপর দিয়ে ঘোড়া চালানোর কথা; বাছুরটা যে স্বেচ্ছায় বুড়ির কাছে ফিরে গেল সে কথাও। তারপর সে বলল, "তখনই আমি বুঝলাম যে, পাপ দিয়ে পাপকে দূর করা যায় না। কিন্তু কেমন করে যে দূর করা যায় তা তো আমি এখনও জানি না। দয়া করে সেটা আমাকে শিখিয়ে দিন।"

তখন বৃদ্ধ বলল: "তাহলে আগে আমাকে বল আসতে আসতে পথে তুমি আর কী কী দেখেছ।"

ধর্ম-ছেলে তখন স্ত্রীলোকটির টেবিল পরিষ্কার করার কথা, যে চাষীরা চক্রবেড় বাঁকাচ্ছিল তাদের কথা এবং যে পশু-বিক্রেতারা আগুন জ্বালাচ্ছিল তাদের কথা বলল।

সব কথা শুনে বৃদ্ধ ঘরের ভিতর থেকে একখানি ছোট কুড়ুল এনে বলল, "আমার সঙ্গে এস।"

কিছু দূর এগিয়ে একটা গাছ দেখিয়ে বলল, "ওটা কাট।"

কুড়ুল চালিয়ে সে গাছটা কেটে ফেলল।

"এইবার এটাকে তিন টুকরো কর।"

ধর্ম-ছেলে তাই করল। বৃদ্ধ আবার ঘরের ভিতর গিয়ে একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল। বলল, "এই তিনটে কাঠের টুকরোতে আগুন লাগাও।"

মশালটা নিয়ে সে কাঠের তিনটে টুকরোতেই আগুন ধরাল। সব পুড়ে তিনটে পোড়া কাঠ মাত্র অবশিষ্ট রইল।

"এইবার এগুলোকে অর্ধেকটা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দাও।"

তাই সে করল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল, "পাহাড়ের নিচে একটা ছোট নদী আছে। সেখান থেকে মুখে করে জল এনে এই পোড়া কাঠ তিনটের উপর ছিটিয়ে দাও। কুটিরবাসিনী স্ত্রীলোককে যেমন উপদেশ দিয়েছিলে তেমনিভাবে প্রথম কাঠটার উপর জল ছিটোবে। চক্রবেড় বাঁকানো লোকগুলোকে যেমন পরামর্শ দিয়েছিলে তেমনিভাবে দ্বিতীয় টুকরোটার উপর জল ছিটোবে। আর পশু-বিক্রেতাদের যেমন পরামর্শ দিয়েছিলে তেমনিভাবে তৃতীয় টুকরোটার উপর জল ছিটোবে। এই তিনটি পোড়া কাঠে যখন পাতা গজাবে, পোড়া কাঠ যখন আপেল গাছে পরিণত হবে, তখনই তুমি বুঝতে পারবে মানুষের ভিতর থেকে কেমন করে পাপ দূর করা যায়; আর তখনই তোমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

এই কথা বলে বৃদ্ধ ঘরের ভিতর চলে গেল। ছেলেটি অনেক ভেবে-চিন্তেও তার কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারল না। তবু, বৃদ্ধ যেমনটি বলেছিল সেইভাবেই সে কাজ করতে শুরু করল।

॥ ১০ ॥

নদীতে গিয়ে একমুখ-ভর্তি জল এনে সে প্রথম পোড়া কাঠখানার উপর ছিটিয়ে দিল। এমনি করে সে বার বার জল এনে অপর দু-টুকরো কাঠেও ছিটিয়ে দিল। তারপর খুব শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত বোধ করায় সে পানাহার করার জন্য আশ্রমে ফিরে গেল। ঘরে ঢুকেই দেখে, বৃদ্ধ লোকটি উপাসনা-বেদীর উপরেই মরে পড়ে আছে।

চারদিকে তাকিয়ে কিছু শুকনো বিস্কুট দেখতে পেয়ে তাই সে খেল। তারপর একখানি কোদাল দেখতে পেয়ে বুড়ো লোকটির জন্য কবর খুঁড়তে লাগল। খোঁড়া শেষ করে বৃদ্ধকে কবর দিতে যাবে, এমন সময় পাশের গ্রামের

কয়েকটি চাষী বৃদ্ধ ঋষির জন্য খাবার নিয়ে হাজির হল।

তারা যখন শুনল বৃদ্ধ মারা গেছে এবং ধর্ম-ছেলেকেই তাঁর উত্তরাধিকারী করে গেছে, তখন তারা বৃদ্ধকে কবর দিতে তাকে সাহায্য করল, তার ব্যবহারের জন্য খাবার রেখে গেল, এবং আরও খাবার জোগাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল।

কাজেই ধর্ম-ছেলে সেই বৃদ্ধের আশ্রমেই রয়ে গেল, গ্রামবাসীদের দেওয়া খাবারেই তার দিন চলতে লাগল। বৃদ্ধের আদেশ-মতই সে কাজ করতে লাগল—অর্থাৎ, নদী থেকে মুখে করে জল এনে পোড়া কাঠগুলোকে ভেজাতে লাগল।

এইভাবে কেটে গেল একটি বছর।

চারদিকে রটে গেল, একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বনের মধ্যে সাধকের জীবন যাপন করছে,—সে রোজ পাহাড়ের নিচ থেকে জল এনে তিনটে পোড়া কাঠে ছিটিয়ে দেয়। ফলে বহু লোক তার কাছে আসতে আরম্ভ করল। অনেকে তাকে দর্শন করতে আসে, ধনী ব্যবসায়ীরা নানা উপহার নিয়ে আসে। কিন্তু সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করে না। আর যে যা দেয় সব সে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

ক্রমে তার জীবনের কর্মধারা এইরকম এসে দাঁড়াল। অর্ধেক দিন সে কাটায় মুখে করে জল এনে পোড়া কাঠে ঢালতে, আর বাকি অর্ধেক দিন কাটায় বিশ্রামে, বা দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তায়। ক্রমে তার মনে বিশ্বাস জন্মাল যে এইভাবে জীবন কাটালেই সে জগৎ থেকে পাপ দূর করতে সমর্থ হবে এবং তার নিজের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হবে।

দ্বিতীয় বছরও কেটে গেল। এক দিনের জন্যও সে কাঠে জল ঢালা বন্ধ করে নি। কিন্তু আজও পর্যন্ত তিনটের একটা কাঠেও পাতা আর গজাল না।

একদিন সে আশ্রমে বসে আছে এমন সময় শুনতে পেল একটি লোক ঘোড়ায় চড়ে আপন মনে গান গাইতে গাইতে চলেছে। লোকটা কেমন দেখবার জন্য বাইরে বেরিয়ে সে দেখতে পেল একটি সুন্দর শক্তিমান যুবক। পরনে মূল্যবান পোশাক, ঘোড়া এবং গদিও বেশ দামী।

ধর্ম-ছেলে তাকে কাছে ডেকে জানতে চাইল, সে কী কাজ করে, কোথায় চলেছে। লোকটি ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল।

বলল, "আমি একজন দস্যু। রাজপথে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াই আর মানুষকে হত্যা করি। যত বেশী লোক মারতে মারি ততই অধিকতর খুসিতে আমি গান গাই।"

ধর্ম-ছেলে আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগল: "এই লোকটার মন থেকে

পাপ দূর করব আমি কেমন করে? যারা আমার কাছে আসে তাদের সদুপদেশ দেওয়া সোজা, কারণ তারা অনুতপ্ত। কিন্তু এ লোকটা যে তার পাপ নিয়ে গৌরব বোধ করে।"

যাহোক, সে মুখে কিছু না বলে লোকটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল: "এখন আমি কী করি? এই দস্যু যদি এই পথে ঘোড়া ছোটায়, তাহলে লোকজন সব ভীত হয়ে পড়বে, কেউ আর আমার কাছে আসবে না। তাহলে এখানে থাকবার আমার দরকার কী?"

সেইখানে দাঁড়িয়ে সে দস্যুকে বলল: "সকলে আমার কাছে আসে—পাপের জন্য গৌরব করতে নয়, পাপের জন্য অনুতাপ করতে ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে। যদি ঈশ্বরকে তোমার এতটুকু ভয় থাকে তাহলে তুমিও অনুতাপ কর। আর যদি তা নাই কর, তাহলে অন্য পথে তোমার ঘোড়া চালাও, এদিকে আর কখনও এসো না, আমার শান্তি নষ্ট করো না বা লোককে আতঙ্কিত করো না।"

দস্যু হেসে উঠল।

"আমি ঈশ্বরকেও ভয় করি না, তোমার কথাও শুনব না। তুমি আমার প্রভু নও। তুমি থাক তোমার পূজা-অর্চনা আর ভাবভক্তি নিয়ে, আমি থাকব আমার নরহত্যা নিয়ে। সবাইকে তো বাঁচতে হবে। যেসব বুড়ি তোমার কাছে আসে তাদেরই তোমার উপদেশ শুনিও, আমাকে কিছু শেখাতে চেষ্টা করো না। তবে, যেহেতু আজ তুমি আমাকে ঈশ্বরের কথা শুনিয়েছ, আগামীকাল আমি দুটি মানুষ বেশী মারব। এই মুহূর্তেই আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি, কিন্তু সে কাজ করে আমার হাত কলুষিত করতে চাই না। সুতরাং, আমার কাছ থেকে দূরে থেকো।"

এইভাবে ভয় দেখিয়ে দস্যু ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তবে তারপর থেকে এ পথে সে আর আসে নি।

ধর্ম-ছেলেও আগের মত শান্তিতে আরও আট বছর কাটিয়ে দিল।

॥ ১১ ॥

একদিন রাতে কাঠে জল ছিটনো শেষ করে ধর্ম-ছেলে আশ্রমে ফিরে বিশ্রাম করছিল। সেইখানে বসেই সে লক্ষ্য করছিল, ছোট বনপথ দিয়ে কোন চাষী তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে কি না। সেদিন কেউ তার কাছে এল না। সারা সন্ধ্যা সে একাই বসে রইল। শেষটায় ক্লান্ত হয়ে সে নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবতে লাগল। তার মনে পড়ল, ভগবদ্ভক্তি নিয়ে বেঁচে আছে

বলে দস্যু সেদিন তাকে তিরস্কার করেছিল। এখন সে তার সারা জীবনের কথা ভাবতে বসল।

সে ভাবল, "ঈশ্বরের বিধান অনুসারে তো আমি জীবন কাটাচ্ছি না! বৃদ্ধ আমার উপর চাপিয়ে গেছে প্রায়শ্চিত্তের বোঝা, আর সেই বোঝাকে আমি জীবিকার ব্যবস্থা ও সুনামে পরিণত করেছি। এই ব্যবস্থা আমাকে এতই লোভী করে তুলেছে যে একদিন কেউ না এলে সময় যেন কাটতেই চায় না। আবার তারা এসে আমার ভগবদ্ভক্তির খুব প্রশংসা করলে তবেই আমি খুশি হই। এভাবে বেঁচে জীবন ধারণ করা তো আমার উচিত নয়! মানুষের প্রশংসা আমাকে বিপথগামী করেছে। কাজেই অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা দূরে থাক, আমি বরং নতুন পাপ সঞ্চয় করছি। আমি এবার বনে চলে যাব; এমন কোন নতুন জায়গায় যাব যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না। সেখানে আমি একেবারে একা বাস করব, যাতে আমার অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি, আবার নতুন কোন পাপও সঞ্চিত না হয়।"

মনে মনে এই রকম ভেবে বিস্কুটের একটি ছোট থলে ও একখানা কোদাল নিয়ে সে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ল। একটা পাহাড়ি নদীর খাত ধরে এগিয়ে চলল। ঠিক করল, অনেক দূরে গিয়ে একখানি মাটির ঘর বানিয়ে সেখানেই নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।

বিস্কুটের থলে আর কোদাল নিয়ে সে পথ চলছে, এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে হাজির হল সেই দস্যু। সে ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই দস্যু তাকে ধরে ফেলল।

দস্যু জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

সে বলল, "এমন এক জায়গায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাই যেখানে কেউ খুঁজে না পায়।" এ কথা শুনে দস্যু খুব অবাক হল।

বলল, "কেউ যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে না আসে তাহলে তুমি কি খেয়ে বাঁচবে?"

ধর্ম-ছেলে আগে এ-কথা ভাবে নি। দস্যু কথাটা তোলাতেই খাবারের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে বলল, "ঈশ্বর নিশ্চয় আমার খাবার ব্যবস্থা করবেন।"

আর কোন কথা না বলে দস্যু ঘোড়ায় চেপে বসল।

হঠাৎ ধর্ম-ছেলের মনে হল, "এ আমি কী ভাবছি? ওই লোকটাকে সে কেমন আছে তাও তো জিজ্ঞাসা করা হল না। হয়ত এখন সে অনুতপ্ত হয়েছে। আজ তাকে অনেকটা নরম মনে হল। একবারও তো সে আমাকে খুন করবার হুমকি দিল না!"

সে তখন দস্যুকে ডেকে বলল, "তবু তোমাকে বলছি, অনুতাপ কর,

কারণ ঈশ্বরের হাত থেকে কারও পরিত্রাণ নেই।"

এ কথা শুনে দস্যু ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে কোমর থেকে ছোরা বের করে ধর্ম-ছেলের দিকে উঁচিয়ে ধরল। ভয় পেয়ে সে সোজা বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। দস্যু তাকে আর তাড়া করল না। শুধু বলল, "বুড়ো, দু-দুবার তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সাবধান, তৃতীয়বার দেখা হলেই তোমাকে খুন করব।"

এই কথা বলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় যথারীতি পোড়া কাঠে জল দিতে গিয়ে দেখে—আরে! একটার গায়ে যে অংকুর গজিয়েছে! তার ভিতর থেকে একটা ছোট আপেল গাছ জন্ম নিচ্ছে!

॥ ১২ ॥

সেই থেকে ধর্ম-ছেলে লোকালয় থেকে লুকিয়ে সম্পূর্ণ নির্জন জীবন যাপন করতে লাগল।

সামান্য বিস্কুট যখন ফুরিয়ে গেল তখন সে ভাবল, "এইবার আমাকে গাছের মূলের খোঁজ করতে হবে।"

পথে পা দিয়েই সে দেখতে পেল, তার সামনে একটা ডাল থেকে ছোট একটা বিস্কুটের থলে ঝুলছে। সেটাকে নামিয়ে নিয়ে সে বিস্কুটগুলি খেল। খাওয়া শেষ হতে না হতেই দেখতে পেল, সেই একই ডালে আরেকটা থলে ঝুলছে।

এইভাবে বিনা উদ্বেগে তার দিন কাটতে লাগল। একটিমাত্র ভয় তখনও ছিল—দস্যুর ভয়। তার আসার শব্দ শুনলেই সে লুকিয়ে পড়ত, ভাবত: "ও যদি আমাকে মেরে ফেলে তাহলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে না।"

এইভাবে সে দশ বছর কাটাল। পোড়া কাঠটা থেকে গজানো আপেল গাছটি দিন দিন বড় হতে লাগল। অপর দুটি কাঠ কিন্তু যেমন ছিল তেমনই রইল।

একদিন সকালে উঠে সে কাঠে জল ছিটোতে গেল। কাজ শেষ হয়ে গেলে বড়ই ক্লান্ত বোধ করায় বসে পড়ল বিশ্রামের জন্য। সেখানে বসে সে ভাবতে লাগল: "নিশ্চয় আমার পাপ বেড়েই চলেছে, কারণ এখনও আমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি।"

সুতরাং সে দস্যুর সংগে মুখোমুখি দেখা করবার জন্য রওনা হল।

সে দেখল, অশ্বারোহী দস্যু একা নয়, তার পিছনে আর একটি লোক।

তার হাত বাঁধা, মুখে কাপড় গুঁজে বন্ধ করা। লোকটি কোন কথাই বলতে পারছে না, কিন্তু দস্যু তাকে অবিরাম গালাগালি করছে।

ধর্ম-ছেলে এগিয়ে ঘোড়ার সামনে দাঁড়াল।

বলল, "এ লোকটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?"

দস্যু জবাব দিল, "বনের মধ্যে। ও একজন ব্যবসায়ীর ছেলে। ওর বাবার টাকা-পয়সা কোথায় লুকোনো আছে কিছুতেই বলছে না। যতক্ষণ না বলবে চাবকে ওর পিঠের ছাল তুলে নেব।"

বলেই দস্যু ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ধর্ম-ছেলে ঘোড়ার রাশ টেনে তাকে থামাল, বলল, "ছেড়ে দাও ওকে।"

দস্যু রেগে তার দিকে ঘুষি তুলল। বলল, "ওর দশা তোমারও হোক তাই কি চাও ? অনেক দিন আগে বলেছিলাম, তোমাকে খুন করব। তাই বলছি, যেতে দাও আমাকে।"

কিন্তু ধর্ম-ছেলে আজ নির্ভয়। সে বলল, "আমি তোমাকে যেতে দেব না। আমি তোমাকে ভয় করি না, ভয় করি একমাত্র ঈশ্বরকে। ঈশ্বর আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাকে আটকাতে। ছেড়ে দাও ওকে।"

দস্যু ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবল। তারপর ছোরা দিয়ে বাঁধন কেটে ব্যবসায়ীর ছেলেকে ছেড়ে দিল। বলল, "দুজনই চলে যাও। কিন্তু আর কখনও আমার পথ মাড়িও না।"

ব্যবসায়ীর ছেলে লাফ দিয়ে নেমেই পালিয়ে গেল। দস্যু ঘোড়া ছাড়তে উদ্যত হতেই ধর্ম-ছেলে আবার তাকে থামাল, সেই অসৎ পথ ছাড়তে তাকে অনুরোধ করল।

দস্যু চুপ করে সব শুনল। জবাবে কিছুই না বলে চলে গেল।

সকালে কাঠে জল দিতে গিয়ে সে দেখে—আরে! দ্বিতীয় কাঠ থেকেও একটি আপেল গাছ জন্ম নিচ্ছে।

॥ ১৩ ॥

আরও দশ বছর কেটে গেল।

একদিন সে যখন সব রকম উদ্বেগ ও ভয় রহিত হয়ে মনে অপার শান্তি নিয়ে বসে ছিল, তখন তার মনে হল: "ঈশ্বর মানুষকে কত আশীর্বাদ করেন! যখন সর্বদাই তাদের শান্তিতে থাকা উচিত তখন অকারণেই তারা নিজেদের বিরক্ত করে।"

মানুষের সীমাহীন দুষ্কর্মের কথা সে ভাবতে লাগল। অকারণেই মানুষ

নিজেদের বিপদ ডেকে আনে। ভাবতে ভাবতে মানুষের জন্য তার করুণা হতে লাগল। সে ভাবল, "এভাবে থাকা আমার উচিত নয়। আমি যা জেনেছি তা মানুষকে বলা আমার কর্তব্য।"

ঠিক সেই সময় সে দস্যুর আসবার শব্দ শুনতে পেল। "এ লোকটাকে কোন কথা বলা নিরর্থক," এই কথা ভেবে প্রথমে সে দস্যুকে এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু একটু পরেই মত পরিবর্তন করে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

খুব নিরাশ মনে মাটির দিকে চোখ রেখে দস্যু ঘোড়া চালিয়ে আসছিল। তাকে দেখে ধর্ম-ছেলের ভারি করুণা হল। ছুটে তার কাছে গিয়ে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরল।

চিৎকার করে বলে উঠল, "ভাই, নিজের আত্মাকে দয়া কর, কারণ তোমার মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। এইভাবে যদি তুমি নিজেকে জ্বালাও, আর অপরকেও জ্বালাও, তাহলে কঠোরতর যন্ত্রণা তোমার কপালে আছে। শুধু ভাব, ঈশ্বর তোমার দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছেন, তোমার জন্য তাঁর আশীর্বাদের অন্ত নেই! ভাই; নিজেকে ধ্বংস কোরো না, শুধু জীবনের পথটা পাল্টাও।"

দস্যু ভ্রূ কুঁচকে সরে গেল। বলল; "ছেড়ে দাও আমাকে!"

ধর্ম-ছেলে তবু তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

দস্যু এবার চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে বলে উঠল, "বন্ধু; অবশেষে তুমি আমাকে জয় করেছ। কুড়ি বছর আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করেছি। ক্রমে ক্রমে তুমি আমার সব শক্তি হরণ করেছ, আজ আর আমি আমাতে নেই। আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশি তাই কর। প্রথম যখন তুমি আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলে তখন আমি আরও রেগে গিয়েছিলাম। তুমি যখন মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে গেলে, যখন বুঝলে মানুষের সাহায্যের তোমার দরকার নেই, তখনই তোমার কথাগুলো আমাকে চিন্তিত করে তুলল। সেই দিন থেকেই তোমার জন্য গাছের ডালে আমিই বিস্কুটের থলে ঝুলিয়ে রাখতাম।"

এইবার ধর্ম-ছেলের মনে পড়ল, কেন ময়লা ন্যাকড়া পরিষ্কার করে নিঙড়ালে তবে টেবিল পরিষ্কার হয়। সে বুঝল, যে মুহূর্তে সে নিজের ভাবনা ছেড়েছে তখনই তার হৃদয় পবিত্র হয়েছে, একমাত্র তখনই অপরের হৃদয় পবিত্র করবার ক্ষমতা তার হয়েছে।

দস্যু বলতে লাগল: "কিন্তু আমার হৃদয়ের প্রথম প্রকৃত পরিবর্তন হল যখন আমার হাতে আসন্ন মৃত্যুকে তুমি তুচ্ছ করলে।"

তৎক্ষণাৎ ধর্ম-ছেলের মনে পড়ল, চক্রবেড় পাকানোর লোকগুলি যখন মূল চাকটাকে শক্ত করে আটকে নিল একমাত্র তখনই বেড়গুলোকে বাঁকাতে

পারল। সেই রকম, যখন সে নিজের জীবনকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিল এবং নিজের দাম্ভিক মনকে বিনীত করতে শিখল, একমাত্র তখনই তার মৃত্যু-ভয় দূর হল।

দস্যু শেষকালে বলল, "আর আমার প্রতি যখন তোমার করুণা হল, আমার সামনে যখন তুমি কাঁদতে লাগলে, তখনই আমার হৃদয় সম্পূর্ণ বদলে গেল।"

গভীর আনন্দের সঙ্গে ধর্ম-ছেলে দস্যুকে সঙ্গে করে পোড়া কাঠের টুকরোগুলোর কাছে গেল। আরে! তৃতীয় কাঠটা থেকেও একটা আপেল গাছ গজিয়েছে!

তখন তার মনে পড়ল, পশু-ব্যবসায়ীদের আগুন যখন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল একমাত্র তখনই ভেজা ঝোপ-ঝাড়গুলোও জ্বলে উঠল। সেই রকম তার অন্তরের মধ্যে আগুন জ্বলেছে বলেই এখন সে অপরের হৃদয়ের আগুনকেও জ্বালাতে পেরেছে।

আনন্দের সঙ্গে সে উপলব্ধি করল, এতদিনে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

দস্যুকে সব কথা বলতে বলতে সে মারা গেল।

দস্যু তাকে কবরে শুইয়ে দিল। তারপর ধর্ম-ছেলের নির্দেশমত জীবন যাপন করতে লাগল, আর অপরকেও তাই করতে বলল।

১৮৮৬

আক্রমণ

The Raid

[একটি স্বেচ্ছা-সৈনিকের কাহিনী]

॥ ১ ॥

১২ই জুলাই তারিখে ক্যাপ্টেন হ্লপভ্ আমার কুটিরের নীচু দরজায় এসে হাজির হল। তার পরনে স্কন্ধত্রান ও তরবারি সমন্বিত পূর্ণ সামরিক পোষাক। ককেসাস-এ আসার পর থেকে তাকে কখনও এ পোষাকে দেখি নি।

আমার চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে সে বলল, "আমি কর্ণেলের কাছ

থেকে সোজা এখানে আসছি; আমাদের সেনাদল আগামীকাল যাত্রা শুরু করবে।"

"কোথায়?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এন.—এ—। সৈন্যরা সেখানেই জমায়েত হবে।"

"তাহলে কি সেখান থেকেই তাদের সামরিক তৎপরতা শুরু হবে?"

"খুব সম্ভব।"

"কোথায়? আপনি কি মনে করেন?"

"আমি কিছুই মনে করি না, যা জানি তাই আপনাকে বললাম। কাল রাতে একজন তাতার ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে সেনাপতির নির্দেশ নিয়ে—দু'দিনের মত বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে সেনাদলকে যাত্রা করতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে, কি জন্য যাবে, আর কতদিনের জন্য যাবে, সে কথা আমরা কেউ জানি না মশায়; আমাদের যাত্রা করতে বলা হয়েছে, বাস, ওই যথেষ্ট।"

"অবশ্য আপনারা যখন মাত্র দু'দিনের বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সেনাদলকে নিশ্চয় তার চাইতে বেশী দিন আটকে রাখা হবে না—"

"দেখুন, ও থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।..."

"কি রকম?" আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"কেন, তারা তো এক সপ্তাহের মত বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছিল দার্গি-তে, আর সেখানে ছিল প্রায় এক মাস।"

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি কি?"

"তা নিশ্চয় পারেন, তবে আমার পরামর্শ, না যাওয়াই ভাল। আপনি এ ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন?"

"না, আমাকে আপনার পরামর্শ মত না চলবার অনুমতি দিন। একটা যুদ্ধ দেখবার সুযোগের অপেক্ষায় আমি এখানে একটা পুরো মাস বসে আছি, আর আপনি আমাকে সে সুযোগটাও হারাতে বলছেন।"

"যেতে চান যাবেন। তবু এখানে থেকে গেলেই কি ভলে হত না? আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে পারেন; ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমরা চলে গেলে কিছু শিকারও করতে পারেন। সেটাই তো সব চাইতে ভাল হত!" এমন আবেগের সঙ্গে সে কথাগুলি বলল যে প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম যে সেটাই সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা। যা হোক, আমি দৃঢ়স্বরে জানালাম যে কোন কারণেই আমি এখানে পড়ে থাকতে চাই না।

তবু আমাকে বোঝাবার জন্য ক্যাপ্টেন বলল, "আচ্ছা, সেখানে এমন কি আছে যা আপনি দেখেন নি? যদি জানতে চান যে যুদ্ধ ব্যাপারটা কি

তাহলে মিহাইলস্কি ডেনিয়েলেভ্‌স্কি-র "যুদ্ধের বিবরণ" পড়ুন—চমৎকার বই। তাতে সবকিছু খুঁটিনাটি বিবরণ আছে—কোথায় কোন্ সেনাদলকে মোতায়েন করা হয়েছিল এবং কি ভাবে যুদ্ধটা হয়েছিল।"

"কিন্তু সে সব জানবার আগ্রহ আমার নেই", আমি জবাব দিলাম।

"তাহলে কিসে আপনার আগ্রহ? মনে হচ্ছে, মানুষ কি ভাবে খুন হয় আপনি শুধু সেটাই দেখতে চান।...১৮৩২ সালেও এখানে একজন অসামরিক লোক ছিল; সম্ভবত স্পেন-এর মানুষ। এক ধরনের নীল জোব্বা গায়ে চড়িয়ে সে দুটো অভিযানে আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল...তার জন্যও ব্যাপারটা ঐ রকমই ঘটেছিল। এখানে আপনি কাউকে অবাক করে দিতে পারবেন না মশাই।"

আমার অভিপ্রায়ের এমন একটা ঘৃণ্য ব্যাখ্যা করায় ক্যাপ্টেনের কথা শুনে আমি দুঃখিত হলাম; কিন্তু তার মনোভাব বদলাবার কোন চেষ্টা করলাম না।

"সে কি খুব সাহসী লোক ছিল?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কেমন করে বলব? সব সময়ই সে সামনের সারিতে এগিয়ে যেত; যেখানেই গুলি-গোলা চলত, সেখানেই সে হাজির।"

"তাহলে তো সাহসী লোকই ছিল," আমি বললাম।

"না, যেখানে তাকে দরকার নেই সেখানে ছুটে গেলেই প্রমাণ হয় না যে লোকটি সাহসী।"

"তাহলে কাকে আপনারা সাহসী বলেন?"

"সাহসী? সাহসী?" ক্যাপ্টেন কথাটাকে বার বার এমন ভাবে উচ্চারণ করল যেন এ ধরনের প্রশ্ন এই প্রথম তাকে করা হচ্ছে। একটুখানি ভেবে সে বলল, "তাকেই আমরা সাহসী বলি যে তার পক্ষে উচিত ব্যবহারটি করে।"

সাহসিকতার যে সংজ্ঞা প্লেটো দিয়েছেন সেটা আমার মনে পড়ে গেল—কাকে ভয় করতে হবে আর কাকে ভয় করতে হবে না সেই জ্ঞানই সাহস। ক্যাপ্টেনের বক্তব্যের মধ্যে যতই অস্পষ্টতা থাকুক না কেন, আমার মনে হল যে মূলতঃ দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই; আসলে গ্রীক দার্শনিকের সংজ্ঞার চাইতে ক্যাপ্টেনের সংজ্ঞাই অধিকতর সঠিক; কারণ সে যদি নিজেকে প্লেটোর মত ভালভাবে প্রকাশ করতে পারত তাহলে সে হয় তো বলত যে, যে-মানুষ যাকে ভয় করা উচিত তাকেই ভয় করে, যাকে ভয় করা উচিত নয় তাকে নয়, সেই মানুষই প্রকৃত সাহসী।

আমার মনোভাব ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে বলতে চাইলাম।

বললাম, "হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে সব বিপদের ক্ষেত্রেই বেছে নেবার

একটা সুযোগ থাকে, আর সেই বেছে নেবার কাজটা যখন কর্তব্যবোধের প্রেরণায় করা হয় সেটাই সাহসিকতা ; অপর পক্ষে বেছে নেবার কাজটা যখন করা হয় কোন নীচ প্রবৃত্তির বশে, সেটাই ভীরুতা ; কারণ যে মানুষ অহংকার, কৌতূহল বা লাভের বশবর্তী হয়ে জীবনের ঝুঁকি নেয় তাকে সাহসী বলা যায় না ; অপর পক্ষে যে মানুষ পরিবারের প্রতি কর্তব্যের মত কোন সম্মানজনক অনুভূতির বশবর্তী হয়ে অথবা অন্য কোন সুবিবেচনাপ্রসূত কারণে বিপদের সম্মুখীন হতে অস্বীকার করে তাকে ভীরু আখ্যা দেওয়া যায় না।"

আমি যখন কথা বলছিলাম তখন ক্যাপ্টেন একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

পাইপে তামাক ভরে সে বলল, "দেখুন, সে কথা প্রমাণ করবার মত যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু আমাদের একজন ধ্বজাবাহী সৈনিক আছে যে দার্শনিক আলোচনা ভালবাসে। আপনি তার সঙ্গে কথা বলুন। সে কবিতাও লেখে।"

রাশিয়ায় থাকতে ক্যাপ্টেন সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেও ককেসাস-এ এসেই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তার মা মারিয়া আইভানভ্না হ্লপভ্ আমাদের বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূরে তার ছোট জমিদারিতে বাস করেন। ককেসাস-এর উদ্দেশে যাত্রা করবার আগে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার পাশেংকা-র সঙ্গে আমার দেখা হবে (পাকা-চুল বয়স্ক ক্যাপ্টেনকে তিনি ঐ নামেই ডাকেন), জীবন্ত চিঠির মত তার জীবনযাত্রার সব কথা আমি ক্যাপ্টেনকে বলতে পারব, এবং বাড়ি থেকে দেওয়া একটা প্যাকেট তাকে পেঁছে দেব—এই সব ভেবে বৃদ্ধা মহিলাটি খুবই খুসি হলেন। চমৎকার পিঠে ও নোনা মাংস দিয়ে আমাকে ভালভাবে খাইয়ে মারিয়া আইভানভ্না শোবার ঘরে ঢুকলেন এবং কালো রেশমী ফিতে দিয়ে সেলাই-করা একটা বড় কালো কবচ নিয়ে এলেন।

সেটা আমার হাতে দেবার আগে ক্রুশ-চিহ্ন করে এবং যীশু-জননীর মায়ের মূর্তিকে চুম্বন করে তিনি বললেন, "ইনি আমাদের পবিত্র গৃহ-দেবতা, জ্বলন্ত জঙ্গলের জননী। দয়া করে এটা তাকে দেবেন। কি জানেন, সে যখন ককেসাস-এ যায় তখন তার জন্য আমি একটি প্রার্থনা-সঙ্গীতের আয়োজন করেছিলাম, আর শপথ নিয়েছিলাম যে সে যদি জীবিত ও অক্ষত থাকে তাহলে পবিত্র জননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করব। আজ আঠারো বছর হয়ে গেল আমাদের গৃহ-দেবতা ও পবিত্র সন্তগণ তাকে রক্ষা করে চলেছেন। একটি বারও সে আহত হয় নি, অথচ কী ভীষণ যুদ্ধই না সে করেছে!...তার সঙ্গী মিহাইলো যখন সে সব কথা আমাকে বলল তখন, আপনি কি বিশ্বাস

করবেন, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তার যা কিছু খবর সবই পাই অন্যের কাছ থেকে; সে নিজে কিন্তু তার অভিযান সম্পর্কে একটি কথাও আমাকে লেখে না—তার ভয়, পাছে আমি ভয় পাই।"

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে না হলেও ককেসাস-এ এসেই আমি জেনেছি যে চার-চার বার সে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, আর বলাই বাহুল্য যে কি তার অভিযানের কথা আর কি তার আঘাতের কথা কিছুই সে তার মাকে লিখে জানায় নি।

মহিলাটি বলতে লাগলেন, "কাজেই এই পবিত্র প্রতীকটা সে যেন ধারণ করে; এর সঙ্গেই রইল আমার আশীর্বাদ। গৃহ-দেবতা জননীই তাকে রক্ষা করবেন! সে যেন সব সময়, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, এটা ধারণ করে। দয়া করে তাকে বলবেন, এটা তার মায়ের আদেশ।"

তার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব বলে কথা দিলাম।

বৃদ্ধা বলতে লাগলেন, "আমি জানি আমার পাশেংকাকে তোমার ভাল লাগবে। সে বড় ভাল ছেলে! তুমি কি বিশ্বাস করবে, ফি বছর সে আমাকে টাকা পাঠায়, আর আমার মেয়ে অনুশ্কাও তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়ে থাকে।...আর সে সবই তো আসে তার মাইনে থেকে! এমন একটি ছেলে দেবার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।" তিনি কথা শেষ করলেন।—তার দুই চোখে জল ঝরতে লাগল।

"তিনি কি প্রায়ই আপনাকে চিঠি লেখেন?"

"প্রায়ই লেখে না; সাধারণত বছরে একবার; যখন টাকা পাঠায়, সেই সঙ্গে দু'একটা কথা লেখে, তার বেশী না। সে বলে, 'চিঠি না লিখলেই বুঝবে আমি বেঁচে আছি, ভাল আছি। ঈশ্বর না করুন, সে রকম কিছু ঘটলে ওরাই তোমাকে আমার কথা লিখবে।"

তার মায়ের উপহারটা যখন ক্যাপ্টেনকে দিলাম—সেটা আমার কুটিরেই ছিল—তখন সে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে সেটাকে সযত্নে মুড়ে রেখে দিল। তার মায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ তাকে শোনালাম; ক্যাপ্টেন একটি কথাও বলল না। আমার কথা শেষ হলে সে একটু দূরে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাইপে তামাক ভরল।

মুখ না ঘুরিয়েই কেমন একটা ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "হ্যাঁ, আমার মা চমৎকার মানুষ! জানি না ঈশ্বর আমাকে আর কখনও তার কাছে নিয়ে যাবে কিনা।"

সামান্য এই কটি কথার ভিতর দিয়েই অনেক ভালবাসা ও বেদনা যেন ফুটে বের হল।

"আপনি এ চাকরি করেন কেন?" আমি বললাম।

সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "আমাকে করতেই হবে। সামরিক চাকরির দ্বিগুণ বেতন আমার মত একজন গরিব মানুষের পক্ষে অনেকখানি।"

ক্যাপ্টেন খুব সাবধানে থাকে; খেলাধুলা করে না; মদ খায় না; যে সস্তা তামাক খায় কেন জানি না তাকে কড়া না বলে "সামব্রোতালিক" বলে। প্রথম থেকেই ক্যাপ্টেনকে আমার ভাল লেগেছে; তার মুখে সেই শান্ত, স্পষ্ট ভাব যেটা রুশদের বৈশিষ্ট্য; তার চোখের দিকে আনন্দে ও সহজে তাকানো যায়। কিন্তু এই আলাপচারির পরে তার প্রতি আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা হল।

॥ ২ ॥

পরদিন সকাল চারটের সময় ক্যাপ্টেন আমাকে তুলে নিতে এল। পরনে একটা সুতো বের-করা পুরনো কোট, তাতে স্কন্ধত্রাণ নেই, পুরো ককেসীয় ব্রীচেস, এলোমেলো হলুদে পশমের একটা সাদা অস্ত্রাখান টুপি, আর বাজে দেখতে একখানা এসিয়া-মার্কা তলোয়ার কাঁধ থেকে ঝুলছে। যে সাদা ককেসীয় টাট্টু ঘোড়ায় সে চড়েছে সেটা মুখ নীচু করে হাল্কা কদমে চলেছে, আর সরু লেজটাকে অনবরত দোলাচ্ছে। ভাল মানুষ ক্যাপ্টেনটির চেহারায় সামরিক বৈশিষ্ট্য বা সুদর্শন ভাব কিছু না থাকলেও তার ভিতর দিয়ে চারপাশের সব কিছুর প্রতি এমন একটা উদাসীনতা ফুটে উঠেছিল যে আপনা থেকেই একটা শ্রদ্ধার ভাব আমার মনে জেগে উঠল।

তাকে এক মিনিটও দাঁড় করিয়ে না রেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চাপলাম, এবং দুজনে এক সঙ্গে দুর্গের ফটক পার হয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যেই সেনাদল আমাদের থেকে প্রায় ছ শ' গজ এগিয়ে গেছে; তাদের দেখাচ্ছে একটা কালো ঘন বস্তুর মত। আমরা শুধু বুঝতে পারলাম ওটা পদাতিক বাহিনী, কারণ তাদের বেয়নেটগুলো দেখাচ্ছিল একচাপ সরু সূঁচের মত; মাঝে মাঝে সৈনিকদের গান, ঢাকের বাজনা ও ষষ্ঠ কোম্পানির প্রধান গায়কের চমৎকার সুরেলা গলার কিছু কিছু অংশ আমাদের কানে আসছিল। দুর্গের মধ্যে ঐ গান আমি একাধিকবার শুনেছি। একটা ছোট নদীর তীর ঘেঁসে একটা গভীর ও চওড়া গিরি-পথ ধরে রাস্তাটা চলে গেছে। ছোট নদীটা তখন "টই-টম্বুর", অর্থাৎ দু'কূল ছাপিয়ে চলেছে। বুনো পায়রারা ঝাঁক বেঁধে ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে; কখনও নদীর পাথুরে তীরে বসছে, আবার বাতাসে পাক খেতে খেতে চক্রাকারে উড়ে দ্রুত দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাচ্ছে। সূর্য এখনও চোখে পড়ছে না, কিন্তু ডান দিককার

পাহাড়ের চূড়ায় রোদের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। সূর্যোদয়ের স্বচ্ছ সোনালী আলোয় ধূসর, সাদাটে পাথর, হলদে-সবুজ শেওলা, ও নানা ধরনের বুনো গাছ-গাছালি অসাধারণ স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু সুরঙ্গ ও গিরি-খাতের বিপরীত দিকটা তখনও স্যাঁৎসেতে ও অন্ধকার ; একটা ঘন কুয়াসা ধোঁয়ার মত অসমান ভাবে তার উপর দিয়ে পাক খেয়ে চলেছে ; আর তারই ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে আশ্চর্য এক রঙের খেলা—কখনও হাল্কা লিলাক, কখনও প্রায় কালো, গাঢ় সবুজ ও সাদা। ঠিক আমাদের সামনে গাঢ় নীল দিগন্তরেখার পশ্চাৎপটে ঝকঝকে একঘেয়ে সাদা রঙের বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ; তাদের অদ্ভুত ছায়া ও আকার সুস্পষ্ট সুন্দর রেখায় ফুটে উঠেছে। কাঠ-ফড়িং, ঝিঁঝিঁ ও অন্য হাজার রকম কীট-পতঙ্গ বড় বড় ঘাসের মধ্যে জেগে উঠেছে ; তাদের কর্কশ অবিশ্রাম ঐক্যতানে বাতাসকে ভরে তুলেছে। অসংখ্য ছোট ছোট ঘণ্টা যেন ঠিক কানের কাছেই বাজছে। জল, ঘাস ও কুয়াসার গন্ধে, বস্তুত গ্রীষ্মের সুন্দর সকালবেলাকার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন আগুন জ্বালিয়ে পাইপ ধরাল ; "সাম্ব্রোতালিক" তামাক ও চকমকির গন্ধ আমার অদ্ভুত ভাল লাগল।

যাতে পদাতিক বাহিনীকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলা যায় সে জন্য আমরা রাস্তাটার ধার ঘেঁসে চলতে লাগলাম। ক্যাপ্টেনকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। "দাঘেস্তান" পাইপটাকে মুখ থেকে মোটেই নামাচ্ছিল না, আর প্রতি এক গজ অন্তরই টাট্টুটাকে আরও জোরে চলবার জন্য পা দিয়ে গুঁতো মারছিল ; ফলে সেটা এঁকেবেঁকে চলার দরুন পথের ভেজা লম্বা ঘাসের উপর একটা গাঢ় সবুজ পথের চিহ্ন ঈষৎ চোখে পড়ছিল। একটা বুড়ো মোরগ কলধ্বনি করে পাখা ঝটপটিয়ে টাট্টুটার একেবারে ক্ষুরের কাছ থেকে এমন ভাবে উড়াল দিল যাতে যে কোন খেলোয়াড়ের বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন সেটা নজরেও আনল না।

পদাতিক বাহিনীকে প্রায় ধরে ফেলতে যাচ্ছি এমন সময় আমাদের পিছনে জোর কদমে ছুটে-আসা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেলাম, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি অতি সুশ্রী অল্পবয়সী যুবক ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হল। পরনে অফিসারের পোষাক, মাথায় উঁচু সাদা অস্ত্রাখান টুপি। আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে সে হাসল, মাথা নাড়ল, চাবুকটা দোলাল।......ওই-টুকু সময়ে আমি শুধু দেখলাম, ঘোড়ার পিঠে বসে সুকুমার ভঙ্গীতে সে রাশটা হাতে ধরেছে, কালো চোখ দুটি বড় সুন্দর, নাকটা টিকলো, সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আমরা যখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন সে যে না হেসে পারে নি তাতেই আমি বিশেষভাবে

মোহিত হয়েছিলাম। ওই হাসিটুকু দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে সে এখনও নবীন যুবক।

ঠোঁট থেকে পাইপটা না সরিয়েই ক্যাপ্টেন ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, "ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলেছে কোথায় ?"

"লোকটা কে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"ধ্বজাবাহী এলানিন, আমার সেনাদলের অধীন একজন সৈনিক। মাত্র এক মাস হল সামরিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এখানে যোগ দিয়েছে।"

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে এই প্রথমে সে যুদ্ধে অংশ নিতে যাচ্ছে।"

"আর ঠিক সেই কারণেই এ নিয়ে সে এত খুসি!" পাণ্ডিতি ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন বলল। "হায় যৌবন!"

"আহা, খুসি না হয়ে কি সে পারে? আমি তো বুঝি, একজন তরুণ অফিসারের পক্ষে এটা খুবই আকর্ষণীয়।"

মিনিট দুয়েক ক্যাপ্টেন কোন কথা বলল না।

"আমিও ঠিক তাই বলছি; এই তো যৌবন!" নীচু গলায় সে বলতে লাগল। "কিন্তু ব্যাপারটা কি না জেনেই এতে খুসি হবার কি আছে! বার কয়েক যাতায়াত করলে তখন আর খুসির কিছু থাকবে না। ধরা যাক, আমাদের বিশ জন অফিসার এখন যুদ্ধে যাত্রা করেছে; কিছু লোক যে নিহত বা আহত হবে সেটা তো নিশ্চিত। আজ আমার পালা, কাল তোমার, পরশু আর কারও। কাজেই এতে খুসি হবার কি আছে?"

॥ ৩ ॥

পাহাড়ের পিছন থেকে উজ্জ্বল সূর্য উঠে উপত্যকার বুকে কিরণ ছড়াতে না ছড়াতেই কুয়াসার মেঘরা সরে গেল, আর বেশ গরম বোধ হতে লাগল। কাঁধে বন্দুক আর পিঠে থলে নিয়ে সৈন্যরা সব ধুলো-ভর্তি রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল; তাদের রুশ ভাষার কথাবার্তা ও হাসির টুকরো শব্দ মাঝে মাঝে আমার কানে আসছে। সাদা ক্যানভাসের পোষাক-পরা কিছু বুড়ো সৈনিক—তাদের অধিকাংশই সার্জেণ্ট বা কর্পোরাল—পাইপ টানতে টানতে শান্ত ভাবে কথা বলতে বলতে রাস্তার ধার ঘেঁসে এগিয়ে চলেছে। মালপত্রে উঁচু করে বোঝাই-করা তিন ঘোড়ায় টানা মাল-গাড়িগুলো ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। অফিসাররা ঘোড়ায় চেপে চলেছে সকলের আগে। তারা চাবুক মেরে ঘোড়াগুলোকে দিয়ে নানা রকম কসরৎ করাচ্ছে। অন্য সকলে মনের সুখে গান শুনছে, আর গায়করাও শ্বাস-রোধ-করা গরমের

মধ্যেও অবিশ্রান্ত ভাবে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। পদাতিক বাহিনীর প্রায় তিন শ' গজ আগে তাতার অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে একটা বড় সাদা ঘোড়ায় চেপে চলেছে একজন অফিসার; উদ্দাম দুঃসাহসিকতা এবং যে কোন লোকের মুখের উপর সত্য কথা বলার জন্য রেজিমেণ্টে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। লোকটি লম্বা, সুদর্শন, এশিয়া মহাদেশের কায়দায় সজ্জিত, পরনে জরির কাজ-করা কালো পোষাক; তার সঙ্গে মেলানো পায়ের পট্টি, দামী কাজ-করা আঁটো জুতো, হলুদে সির্কাশিয়ান কোট, এবং মাথার পিছন দিকে চেপে বসানো উঁচু অগ্রাখান টুপি। বুক ও পিঠের উপর দিয়ে ঝোলানো রুপোলি কাজ-করা ফিতের সঙ্গে সামনে ঝুলছে বারুদ-ভরা একটা শিঙা, আর পিছনে ঝুলছে তার পিস্তল। তার কোমর-বন্ধনীতে ঝুলছে তার দ্বিতীয় পিস্তলটি এবং রুপোর খাপে ঢাকা একখানা ছুরি। এ সব কিছুর উপর দিয়ে ঝুলছে জরির কাজ-করা লাল মরোক্কো চামড়ার খাপে ঢাকা একখানি তলোয়ার; আর কালো খাপে মোড়া একটা রাইফেল। তার সাজ-পোষাক, তার অশ্ব-চালনার ভঙ্গী, তার প্রতিটি চাল-চলনেই সে যেন বোঝাতে চাইছে যে সে একজন তাতার। এমন কি সঙ্গী তাতার অশ্বারোহীদের সঙ্গে যে ভাষায় সে কথা বলছে সে ভাষাটাও আমি জানি না। কিন্তু তাতার সৈনিকরা যে রকম বিভ্রান্ত হয়ে সকৌতুকে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল তাতে আমার মনে হল, তারাও তার কথা কিছু বুঝতে পারছে না। সে একজন তরুণ লেফ্‌টেন্যাণ্ট; সে তাদেরই একজন যাদের আদর্শ হল মার্লিনস্কি ও লার্মণ্টভ্‌। এই লোকগুলি "আমাদের সমকালীন বীর", মোল্লানুর ইত্যাদির চশমার ভিতর দিয়ে ছাড়া ককেসাসকে দেখতে জানে না; প্রতিটি পদক্ষেপে এই সব মহাবীরদের দৃষ্টান্তের দ্বারাই তারা পরিচালিত হয়, নিজেদের রুচিমাফিক কখনও নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এই লেফ্‌টেন্যাণ্টটি হয়তো উঁচু মহলের নরনারীর সঙ্গই পছন্দ করে—পছন্দ করে সেনাপতি, কর্ণেল ও সহকারীদের সঙ্গে মিশতে—বস্তুত আমি নিশ্চিত জানি যে ঐ ধরনের সমাজই তার প্রিয় কারণ সে অত্যন্ত অহংকারী। নিজের চরিত্রের কর্কশ দিকটা সকলের দিকে মেলে ধরাটাকেই সে তার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে, যদিও সে কর্কশতা খুব একটা চড়া রকমের নয়। কিন্তু যখনই কোন মহিলা দুর্গে আসে তখনই মনের মত সঙ্গীদের নিয়ে লাল শার্ট গায়ে চড়িয়ে, মোজাহীন পায়ে শুধুমাত্র চপ্পল পরে সে তার জানালার নীচে গিয়ে হাজির হবেই এবং যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার-চেঁচামেচি ও শপথ গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু মহিলাটির বিরক্তি উৎপাদনের জন্য যে সে এসব কাজ করে তা কিন্তু নয়, সে শুধু দেখাতে চায় তার দুটি পা কী চমৎকার সাদা, আর সে চাইলেই তার সঙ্গে

প্রেম করা কত সহজেই সম্ভব।

প্রায়ই রাতের বেলা দু'তিন জন শান্তিপ্রিয় তাতারকে সঙ্গে নিয়ে সে পাহাড়ের দিকে চলে যায়; সেখানে পথের পাশে ওঁৎ পেতে থেকে শত্রুপক্ষের তাতারদের দেখলেই তাদের মেরে ফেলে; সে-কাজটা যে খুব দুঃসাহসিক কিছু নয় তা সে মনে মনে বোঝে, তবু কোন না কোন কারণে তাদের উপর বিরূপ হবার জন্যই সে তাদের ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, আর সেই জন্যই যেন তাদের কষ্ট না দিয়ে পারে না। দুটি জিনিস সে কখনও শরীর থেকে খুলে রাখে না; গলায় একটি বড় দেবমূর্তি, আর শার্টের উপর ঝোলানো একটা ছুরি যেটা সে শোবার সময়ও সঙ্গেই রাখে। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে তার অনেক শত্রু আছে। কারও উপর প্রতিশোধ নিতে হবেই, আর রক্ত দিয়ে কোন অপমানের দাগ তাকে ধুয়ে ফেলতে হবেই—এ ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে সে ভারী আনন্দ পায়। তার দৃঢ় ধারণা, মানুষের প্রতি বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা ও ঘৃণাই মহত্তম এক কবিত্বময় অনুভূতি। কিন্তু এক সময় তার সির্কাসীয় মেয়েমানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হলে সে আমাকে বলেছিল যে তার মত দয়ালু ও ভদ্র মানুষ হয় না; প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার বিষণ্ণ চিন্তাধারাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে রুল-টানা কাগজে হিসাব-নিকাশ শেষ করে সে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে। হায়, তার আদর্শ অনুসারে চলবার জন্য কী কষ্টটাই না সে সহ্য করে! তার সহকর্মী ও সৈনিকদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা সে পেতে চায় তা তারা দেয় না। একদিন সঙ্গীদের নিয়ে নৈশ অভিযানে বেরিয়ে সে জনৈক শত্রুপক্ষীয় উপজাতি মানুষের পায়ে গুলি লাগিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার পরে লোকটি সাত সপ্তাহ ধরে লেফ্‌টেন্যান্টের বাসায়ই ছিল। সেই সময় লেফ্‌টেন্যান্ট এমন ভাবে তার দেখাশুনা ও সেবাশুশ্রূষা করছে যেন সে তার প্রিয়তম বন্ধু, আর তার ঘা শুকিয়ে গেলে প্রচুর উপহার সঙ্গে দিয়ে সে তাকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীকালে একদা কোন অভিযান-কালে লেফ্‌টেন্যান্ট যখন শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে গুলি চালাতে চালাতে তার স্কাউটদের নিয়ে পিছু হাটছিল, তখন শত্রুপক্ষের ভিতর থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল এবং তার সেই আহত অতিথি এগিয়ে এসে ইঙ্গিতে লেফ্‌টেন্যান্টকে আমন্ত্রণ জানাল। সেও এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কর-মর্দন করল। পাহাড়ী লোকগুলো দূরে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল না; কিন্তু লেফ্‌টেন্যান্ট ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া মাত্রই কয়েকজন তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল এবং একটা গুলি তার শিরদাঁড়ার নীচটা ঘেসটে গেল।

আর একটা ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা। একদিন রাতে দুর্গে আগুন লেগেছিল, আর দুই দল সৈন্য সেই আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত

ছিল। হঠাৎ কয়লা-কালো ঘোড়ায় চেপে একটি দীর্ঘকায় মানুষ ভিড়ের মধ্যে এসে হাজির হল। আগুনের লাল আভা তার উপর ছড়িয়ে পড়ল। ভিড় ঠেলে লোকটি সোজা আগুনের কাছে চলে গেল। একেবারে আগুনের কাছে পেঁছে লেফ্‌টেন্যাণ্ট লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বাড়িটার দিকে দৌড়ে গেল। সেই বাড়িটারই একটা অংশ তখন জ্বলছে। পাঁচ মিনিট পরে সে বেরিয়ে এল। তার চুল পুড়ে গেছে, কনুইর খানিকটা পুড়ে গেছে। আগুনের ভিতর থেকে কোটের পকেটে ভরে সে উদ্ধার করে এনেছে দুটো পায়রা।

তার উপাধি ছিল রোজেনক্রাঞ্জ ; কিন্তু সে প্রায়ই তার বংশ-পরিচয়ের কথা বলত। তারা যে ভারেঙ্গীয়দেরই বংশধর একথা বুঝিয়ে দিয়ে সে অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণ করে দিত যে সে ও তার পূর্বপুরুষরা পবিত্র রুশ রক্তেরই উত্তরাধিকারী।

॥ ৪ ॥

সূর্য মাথার উপর থেকে সরে গেল। তার কিরণরাশি ঝল্‌সানো বাতাসের ভিতর দিয়ে দগ্ধ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল। গাঢ় নীল আকাশটা ঝক্‌ঝক্‌ করছে ; শুধু বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলোর নীচে সাদাটে লিলাক রঙের মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাতাস যেন তখনও এক ধরনের স্বচ্ছ ধুলোয় আচ্ছন্ন। সে বাতাস অসহ্য গরম। অর্ধেকটা পথ পার হয়ে আমরা একটা ছোট নদী পেলাম। সৈন্যরা সেখানে থামল। রাইফেলগুলো জড়ো করে রেখে সৈন্যরা নদীর দিকে ছুটে গেল ; সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি ছায়ায় একটা ঢাকের উপর বসে পড়ল ; মুখের ভাব-ভঙ্গীতে নিজের পদমর্যাদাকে পরিস্ফুট করে সে অফিসারদের সঙ্গেই নিজের আহারের ব্যবস্থাটা করে নিল। ক্যাপ্টেন মালপত্রের গাড়িটার নীচে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। সাহসী লেফ্‌টেন্যাণ্ট রোজেনক্রাঞ্জ ও আরও কয়েকজন তরুণ অফিসার জোব্বা বিছিয়ে তার উপর বসে একটা মদের আসর বসাবার আয়োজন করে ফেলল। চারদিকে নানা আকারের মদের বোতল সাজানো ; গায়কের দল মহা উৎসাহে অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে "লেস্‌গিংকা"-র সুরে সুর মিলিয়ে একটা ককেসীয় নাচের গানের তালে নাচছে আর শিস দিচ্ছে :

"শামিল দিয়েছিল বিদ্রোহের ডাক
অনেক—অনেক কাল আগে।
ত্রি—রি, রা—তা—তি, ত্রি—রি—
অনেক—অনেক কাল আগে।"

এই সব অফিসারদের মধ্যে সেই তরুণ ধ্বজাবাহীও ছিল। সকালেই সে এসে দলে ভিড়েছে। সে খুব খোস-মেজাজে আছে; তার চোখ চক্‌চক্‌ করছে, জিভে মাঝে মাঝে কথা ফস্কে যাচ্ছে; সকলকেই সে চুমো খেতে চাইছে আর বলছে সে তাদের কত ভালবাসে।...বেচারি ছেলেমানুষ! সে এখনও বুঝতে শেখে নি যে এ ধরনের ব্যবহারের ফলে সে ঠাট্টার পাত্র বনে যেতে পারে; তার এই দিলখোলা ভাব, সকলকে ভালবাসার এই চেষ্টা অন্য সকলকে তার প্রতি আকৃষ্ট না করে বরং তার প্রতি বিদ্রূপাত্মক করেই তুলবে। অবশ্য সে এটাও জানত না যে সে যখন জোব্বার উপর শুয়ে পড়ে দুই হাতে ভর রেখে তার ঘন কালো চুলের রাশি নাচাচ্ছিল তখন তাকে অত্যন্ত মনোহরণ লাগছিল।

দুজন অফিসার একটা গাড়ির নীচে বসে একটা পিপেকেই তাসের টেবিল বানিয়ে "বোকা-বোকা" খেলছিল।

সাগ্রহে আমি সৈনিক ও অফিসারদের কথাবার্তা শুনছিলাম; মনোযোগ দিয়ে তাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু আমার নিজের মধ্যে যে অস্বস্তি বোধ করছিলাম তার তিলমাত্রও তাদের কারও মধ্যে দেখতে পেলাম না। ঠাট্টা-তামাসা, হাসি, আর গাল-গল্প—সব কিছুর ভিতর দিয়েই ফুটে উঠেছে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাদের চিন্তাহীনতা ও উদাসীনতা। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে এ পথ দিয়ে আর ফিরবে না সে কথাটা যেন কেউ ভাবছেই না।

॥ ৫ ॥

ধূলি-ধূসরিত ও শ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা সাতটায় আমরা "এন"—দুর্গের সুরক্ষিত ফটকের ভিতর প্রবেশ করলাম। সূর্য অস্ত যাচ্ছে; তার তির্যক লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গের সুসজ্জিত কামানশ্রেণীর উপর, বাগানের উঁচু পপলার-গাছের উপর, চাষ-করা হলুদ ক্ষেতের উপর, আর সাদা মেঘের উপর। সাদা মেঘগুলো যেন বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলোকে নকল করেই নানা রকম আশ্চর্য সুন্দর আকার ধারণ করেছে। দিগন্তরেখায় নবোদিত বাঁকা চাঁদ এক খণ্ড স্বচ্ছ মেঘের মত দেখাচ্ছে। দুর্গের কাছাকাছি একটি তাতার গ্রামে জনৈক তাতার কুঁড়ে ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে সকলকে প্রার্থনায় যোগ দিতে ডাকছে। আমাদের গায়করাও নতুন উৎসাহে আবার গান শুরু করে দিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আমার পরিচিত জনৈক সহকারীর সংগে দেখা করতে গেলাম, সে যাতে আমার উদ্দেশ্যটা সেনাপতিকে

জানায় সেই কথা বলতে। শহরের যে প্রান্তে আমি থাকতাম সেখান থেকে যাবার পথে "এন"—এর দুর্গে যা দেখলাম তা কখনও দেখতে পাব বলে আশা করি নি। চার-চাকার একটা সুন্দর "ভিক্টোরিয়া" গাড়ি আমাকে ধরে ফেলল। তার ভিতরে দেখতে পেলাম একটা কেতাদুরস্ত টুপি, আর শুনতে পেলাম ফরাসী ভাষার গুঞ্জণ। সেনাপতির বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে ভেসে এল পিয়ানোতে অত্যন্ত বেসুরে বাজানো কিছু "লিজাংকা" অথবা "কাতেংকা" পল্‌কা-নাচের সুর। একটা সরাইখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, কয়েকজন করণিক সিগারেট হাতে বীয়ারের গ্লাস নিয়ে বসে আছে; শুনতে পেলাম তাদেরই একজন আর একজনকে বলছে: "মাফ করবেন... কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে মারিয়া গ্রিগরেভ্‌নাই আমাদের প্রধানা নেত্রী।" ন্যুব্জদেহ, রুগ্ন চেহারার একটি ইহুদি ছেঁড়া কোট পরে একটা ভাঙা পিপে-বাদ্যযন্ত্র টেনে নিয়ে চলেছে আর সারা অঞ্চলটা তার "লুসিয়া" সুরের শব্দে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঘাঘরা-পরা, মাথায় রেশমী রুমাল-বাঁধা, উজ্জ্বল রঙের ছোট ছাতা হাতে দুটি স্ত্রীলোক কাঠের ফুটপাথ ধরে আমার পাশ দিয়ে যেন ভেসে চলে গেল। একটা নীচু ছোট বাড়ির সামনে দুটি মেয়ে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। একজনের পরনে লাল পোষাক, অপর জনের নীল। তারা উচ্চকণ্ঠে নকল হাসি হাসছে। স্পষ্টতই রাস্তা দিয়ে হেঁটে-যাওয়া অফিসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। নতুন কোট, সাদা দস্তানা ও ঝক্‌ঝকে স্কন্ধত্রাণ পরে অফিসাররা রাজপথ ও বীথিকা দিয়ে খোশ-মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেনাপতির বাড়ির একতলাতেই আমার পরিচিত লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবে আমার বক্তব্য বুঝিয়ে বলেছি আর সেও জবাবে জানিয়েছে যে সে ব্যবস্থাটা সহজেই করা যেতে পারে, এমন সময় ফটকে যে সুন্দর গাড়িখানা দেখেছিলাম সেটা আমাদের জানালার পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকল। মেজরের স্কন্ধত্রাণসমন্বিত পদাতিক বাহিনীর পোষাকে সজ্জিত একটি দীর্ঘকায় সুগঠিতদেহ লোক গাড়ি থেকে নেমে সেনাপতির বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে আমার পরিচিত সহকারীটি বলল, "মাফ করবেন, এখনই সেনাপতিকে খবর দিতে হবে।"

"কে এলেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কাউন্টেস;" জবাবটা দিয়েই পোষাকের বোতাম এঁটে সে দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল।

কয়েক মিনিট পরে একটি বেঁটে কিন্তু খুবই সুদর্শন পুরুষ স্কন্ধত্রাণবিহীন কোট পরে বোতামের ঘরে একটা সাদা ক্রুশ ঝুলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে

নেমে এল। তার পিছনে এল মেজর, সহকারী ও আরও দু'জন অফিসার। গাড়িটা দেখে, কণ্ঠস্বর শুনে এবং প্রতিটি ভঙ্গী দেখেই বোঝা যায় যে সেনাপতিটি তার পদমর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

গাড়ির জানালায় হাত রেখে সে বলে উঠল, "মাদাম লা-কোঁতেস, বোঁ সয়ের (শুভ সন্ধ্যা)।"

কিড-চামড়ার দস্তানা-পরা একখানি হাত তার হাতটা চেপে ধরল; গাড়ির জানালায় দেখা দিল একখানি সুন্দর হাসি-মাখা মুখ।

কথাপ্রসঙ্গে সেনাপতি কি যেন বলতেই গাড়ির মধ্যে খিলখিল হাসির শব্দ হল। তারপর বিদায় জানিয়ে সেনাপতি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল, আর গাড়িটাও চলে গেল।

বাসায় ফিরবার পথে আমি ভাবতে লাগলাম, "এই আর একটি মানুষ একজন রুশ যা কামনা করে তার সব কিছুই যার আছে: মর্যাদা, অর্থ ও সম্মান—অথচ যে যুদ্ধের শেষ পরিণতি কি হবে তা শুধু ঈশ্বরই জানেন সেই যুদ্ধের প্রাক্কালে সেই লোকটিই একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে এমনভাবে হাসি-তামাসা করছে এবং পরের দিন তার সঙ্গে চা খাবে বলে কথা দিচ্ছে যেন একটা বল-নাচের আসরে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে!"

সহকারীর ওখানে আরও একটি লোকের সঙ্গে আমার দেখা হল; সে আমাকে আরও অবাক করেছে। সে কে. রেজিমেণ্টের একজন লেফটেন্যাণ্ট; যুবকটির আচরণে মেয়েলি ভীরুতা ও নম্রতার প্রকাশ। আসন্ন যুদ্ধে তার সৈনাপত্য লাভের বিরুদ্ধে কিছু লোক ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে এই অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও উষ্মা প্রকাশের জন্যই সে আমার বন্ধুর কাছে এসেছে। সে বলল, এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত বিরক্তিকর, সহকর্মীদের অনুপযুক্ত, এ কথা সে কোন দিন ভুলবে না, ইত্যাদি। সাগ্রহে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে এবং তার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে আমি না ভেবে পারলাম না যে, সির্কাসিয়ানদের গুলি করবার এবং নিজে তাদের গুলির সম্মুখীন হবার সুযোগ না পেয়ে সে সত্যি সত্যি মর্মাহত ও হতাশ হয়েছে। অকারণে চাবুক খাওয়া কোন শিশুর মতই সে আহত হয়েছে।…এ সবের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

॥ ৬ ॥

রাত দশটায় সৈন্যদের যাত্রা করবার কথা। সাড়ে আটটার সময় ঘোড়ায় চেপে আমি সেনাপতির বাড়িতে গেলাম। কিন্তু সেনাপতি ও সহকারী

দুজনেই তখন খুব ব্যস্ত থাকবে ভেবে আমি রাস্তার উপরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেড়ার সংগে ঘোড়াটাকে বেঁধে দেয়ালের একটা বের-করা খাঁজের উপর বসে রইলাম। মনে ইচ্ছা, সেনাপতি ঘোড়ায় চেপে বের হলেই তাকে ধরে ফেলব। সূর্যের তাপ ও ঝলসানির বদলে এখন নেমে এসেছে রাতের শীতল প্রশান্তি। নক্ষত্রখচিত গাঢ় নীল আকাশের বুকে অর্ধবৃত্তাকার অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে বাঁকা চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। বড় বাড়িগুলোর জানালায় এবং মাটির কুটিরগুলোর খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে আলো জ্বলছে। চুনকাম-করা কুটিরগুলোর খড়ের ছাদের উপর চাঁদের আলো পড়েছে। তারই পশ্চাৎ-পটে দিগন্ত-রেখার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বাগানের দীর্ঘ পপলার-শ্রেণীকে আরও লম্বা, আরও কালো দেখাচ্ছে। বাড়ি-ঘর, গাছপালা ও দেয়ালের লম্বা ছায়াগুলি ঈষৎ-উজ্জ্বল ধুলোভর্তি রাস্তার উপর ছবির মত ছড়িয়ে পড়েছে।··· নদীর ধারে ব্যাঙগুলো অবিশ্রাম ডেকে চলেছে; রাস্তায় দ্রুত পায়ের শব্দ, কথাবার্তা ও ঘোড়ার পা ঠুকবার শব্দ কানে এল; শহরতলি থেকে পিপে-বাদ্যযন্ত্রের সুর ভেসে আসছে; প্রথমে "বাতাস বহে সুমন্দ", ও পরে "উষা-সংগীত।"

আমার মনের কথা এখানে প্রকাশ করব না। প্রথমত, চারদিকে হাসি-গান ও আনন্দের ফোয়ারা ছাড়া আর কিছু না দেখতে পেয়ে আমার বুকের মধ্যে বিষাদের যে ছবি একের পর এক আঁকা পড়ছে সে কথা স্বীকার করতেও আমার লজ্জা বোধ করা উচিত; আর দ্বিতীয়ত, তার সংগে আমার গল্পের কোন সম্পর্ক নেই। নিজের চিন্তার মধ্যে আমি এতোই ডুবে গিয়েছিলাম যে কখন এগারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে, কখন সেনাপতি সদলবলে আমার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে, তা আমি খেয়ালই করি নি। সেনাদলের পিছনের অংশটাই তখন দুর্গের ফটকে পৌঁছে গেছে। কামান, বারুদের গাড়ি ও মালপত্রবাহী গাড়ির ভিড় ঠেলে, নির্দেশদানকারী অফিসারদের চীৎকার শুনতে শুনতে অনেক কষ্টে দুর্গের সেতুটা পার হলাম।

ফটক পেরিয়ে দুলকি চালে চলতে চলতে অন্ধকারে ধীরগতিতে এগিয়ে-চলা প্রায় এক ভার্স্ট লম্বা সেনাবাহিনীকে অতিক্রম করে আমি সেনাপতিকে ধরে ফেললাম। ভারী গোলন্দাজ বাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনীর দীর্ঘ সারি, এবং বন্দুকধারী সৈনিক, অফিসার ও অন্যান্যদের কোলাহলকে ছাপিয়ে একটা বেসুরো গম্ভীর ঐক্যতানের মত ভেসে এল একটি জার্মানের কণ্ঠস্বর:

"খৃস্টবিরোধী, কামান দাগবার একটা মশাল দাও!" সংগে সংগে জনৈক সৈনিক বলল: "শেভ্‌চেংকো! লেফটেন্যান্ট একটা আলো চাইছেন!"

আকাশের অনেকটা জুড়ে গাঢ় ধূসর মেঘ জমেছে; তার ফাঁকে ফাঁকে

এখানে-ওখানে তারাগুলি অস্পষ্টভাবে ঝিকমিক করছে। কালো পাহাড়গুলোর ওপারে দিগন্তে চাঁদ অস্ত গেছে; কিন্তু ডান দিকে এখনও চাঁদটা দেখা যাচ্ছে; তার ঈষৎ কাঁপা আলো পাহাড়ের চূড়ার উপর পড়েছে, অথচ পাহাড়ের পাদদেশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। আবহাওয়া এখনও গরম; চারদিক এত চুপচাপ যে একটা ঘাসের ডগা বা একটুকরো মেঘও যেন নড়ছে না। এত অন্ধকার যে হাতের কাছের জিনিসও ভাল দেখা যায় না। আমার মনে হল রাস্তার পাশে যেন পাহাড়, জন্তু ও বিচিত্র চেহারার সব মানুষ দেখতে পেলাম; কিন্তু পরক্ষণেই তাদের খস্‌খস্‌ শব্দে ও তাদের গায়ে জমে-থাকা তাজা শিশিরের গন্ধে বুঝতে পারলাম যে সেগুলো সবই ঝোপ-ঝাড়। আমার সামনে দেখতে পেলাম, একটি জমাট-বাঁধা কালো বস্তু এগিয়ে চলেছে, আর তার পিছন পিছন চলেছে চলমান কালো কালো দাগ; আসলে ওটা সেনাপতি ও তার দলবল এবং তাদের অনুবর্তী অশ্বারোহী বাহিনী। আমাদের মাঝখানেও অনুরূপ একটা কালো বস্তু এগিয়ে চলেছে; এটা আগেরটার চাইতে নীচু; এটা পদাতিক বাহিনী। সর্বত্র এত পরিপূর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করছে যে রাতের সব রকম শব্দ একত্র মিলিত হয়ে একটা আশ্চর্য আকর্ষণ নিয়ে কানে বাজছে। শেয়ালদের বহুদূরবর্তী আর্ত চীৎকার, কখনও হতাশার আর্তনাদের মত, কখনও বা মুচকি হাসির মত, কাঠ-ফড়িং, ব্যাঙ ও ভারুই পাখির একঘেয়ে ডাক, দূরে হতে ভেসে-আসা একটা অস্পষ্ট ধ্বনি, আর প্রকৃতির নিশাকালীন চলাফেরার যে সব শব্দের কোন ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা দেওয়া যায় না—সব মিলিয়ে এমন একটা সুরেলা ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়েছে যাকে আমরা বলি রাতের নৈঃশব্দ্য। সেই নৈঃশব্দ্য এখন বিঘ্নিত হচ্ছে, অথবা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই শ্লথ-গতি সেনাবাহিনীর একঘেয়ে অশ্বক্ষুরধ্বনি এবং তাদের পায়ের নীচেকার লম্বা ঘাসের খস্‌খস্‌ শব্দ।

মাঝে মাঝে সেনাবাহিনীর ভিতর থেকে ভারী কামানের গড়্‌গড়্‌ শব্দ, বেয়নেটের ঝন্‌ঝনানি, অস্পষ্ট কথাবার্তা, বা ঘোড়ার নাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত প্রকৃতি যেন শান্তিপ্রদ শক্তি ও সৌন্দর্যে ভরপুর।

এই নক্ষত্রখচিত সীমাহীন আকাশের নীচেকার এই সুন্দর পৃথিবীতে শান্তিতে বেঁচে থাকবার মত যথেষ্ট জায়গা কি মানুষের নেই? এই মোহময়ী প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বা মানুষকে খুন করবার বাসনা মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে কেমন করে? যে প্রকৃতিতে সৌন্দর্য ও কল্যাণ এমন অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার ছোঁয়ায় তো মানুষের মনের সব পাপ হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া উচিত।

॥ ৭ ॥

দু'ঘণ্টার উপর আমরা পথ চলছি। আমার শীত-শীত করছে। ঘুমও পাচ্ছে। অন্ধকারে সেই অস্পষ্ট বস্তুগুলি আবার ভেসে উঠেছে। কিছুটা দূরে সেই একই অন্ধকারের দেয়াল; মাঝে মাঝে চলমান বিন্দু। আমার ঠিক পাশেই একটা সাদা ঘোড়ার পাছা দেখা যাচ্ছে; তার লেজটা দুলছে, পিছনের পা দুটো ফাঁক করে চলেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটি কালো মূর্তি, পরনে সাদা সির্কাসিয়ান কোট, কালো খাপে একটা রাইফেল, ও কারুকার্য-করা খাপে-ভরা পিস্তলের সাদা কুঁদোটা। সিগারেটের আলোয় দেখা যাচ্ছে শনের মত একজোড়া গোঁফ, একটা বীভার কলার ও চামড়ার দস্তানায় ঢাকা একটা হাত।

চোখ বুজে ঘোড়ার পিঠের উপরই ঝুঁকে বসেছিলাম; কয়েক মিনিটের জন্য নিজেকে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলাম; হঠাৎ সেই একই পরিচিত খস্‌খস্‌ শব্দ ও পায়ের খট্‌খট্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে তাকিয়ে মনে হল যে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর সামনেকার কালো দেয়ালটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে, অথবা দেয়ালটাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আর আমিই এক মুহূর্তের মধ্যে তার উপর গিয়ে পড়ব। এই রকম একটা হঠাৎ জেগে ওঠার মুহূর্তে সেই অজ্ঞাত অবিশ্রান্ত গুঞ্জণ-ধ্বনি যেন কাছে আসতে আসতে একসময় খুবই জোরে কানে এসে লাগল; সেটা জলের শব্দ। আমরা একটা গভীর গিরি-নালায় প্রবেশ করেছি; কাছেই একটা পাহাড়ী নদী তীর ছাপিয়ে বয়ে চলেছে। শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল, ভেজা ঘাস ক্রমেই ঘণ ও লম্বা হতে লাগল, ঝোপগুলো ক্রমেই কাছে এগিয়ে এল, দিগন্ত-রেখাটা নিকটতর হল। পাহাড়গুলোর কালো পশ্চাৎ-পটের উপর এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে, আবার পর মুহূর্তেই নিভে যাচ্ছে।

আমার পাশেই যে তাতারটি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল তাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "দয়া করে বল তো ওই আলোগুলো কিসের?"

"সে কি, আপনি জানেন না?" সে জবাব দিল।

"না, আমি জানি না।"

ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় সে বলল, "পাহাড়ী লোকেরা একটা লাঠিতে খড় বেঁধে আগুনটাকে ঘোরাচ্ছে।"

"কি জন্য?"

"যাতে সকলেই জানতে পারে যে রুশরা আসছে।" সে হেসে আরও বলল, "সারা গাঁয়ে এবার আই-আই শুরু হয়ে যাবে, একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে; সকলেই যার যার জিনিসপত্র নিয়ে লুকিয়ে পড়বে।"

"সে কি! পাহাড়ী লোকেরা কি এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে যে সৈন্যরা

আসছে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আই! আই! নিশ্চয় জানে! ওরা সব সময়ই জানতে পারে! আমাদের লোকগুলোই ওই রকম।"

"তাহলে কি শামিল-ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। মাথা নেড়ে সে জবাব দিল, "না, শামিল যুদ্ধ করতে বেরিয়ে আসবে না। শামিল তার সাকরেদদের পাঠাবে আর উপর থেকে একটা নলের ভিতর দিয়ে সব কিছু দেখবে।"

"সে কি অনেক দূরে থাকে ?"

"না, খুব দূরে নয়! ওই দূরে বাঁ দিকে, দশ ভার্স্ট দূরে।"

"তুমি কেমন করে জানলে ?" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। "তুমি কি কখনও সেখানে গিয়েছ ?"

"তা গিয়েছি। আমরা সকলেই তো পাহাড়ে ছিলাম "

"তুমি কি শামিলকে দেখেছ ?"

"পিচ্! শামিলকে চোখে দেখা যায় না। একশ', তিনশ', হাজার রক্ষী তাকে ঘিরে থাকে। শামিল থাকে মাঝখানে!" দাসসুলভ প্রশংসার সুরে সে বলল।

আকাশের দিকে তাকালাম। বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। পূর্বদিকে একটা আলোর আভাষ চোখে পড়ছে। দিগন্তে সপ্তর্ষি অস্ত যাচ্ছে। কিন্তু যে গিরি-খাত ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি সেটা স্যাঁতসেতে ও অন্ধকার।

হঠাৎ আমাদের একটু সামনেই কয়েকটি আলোর ফুল্কি ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর সেই মুহূর্তে কয়েকটা গুলি শাঁ করে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। চারদিকে রাতের নিস্তব্ধতা। গুলির শব্দ অনেক দূর থেকে আমাদের কানে এল, কানে এল কান-ফাটানো চীৎকার। ওরা শত্রুপক্ষের অগ্রবর্তী দল। সেই তাতাররা হৈ-হৈ করতে করতে বেপরোয়াভাবে গুলি চালাতে চালাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

সব চুপচাপ। সেনাপতি দোভাষীকে ডাকল। সাদা সির্কাসিয়ান কোট-পরা তাতারটি ঘোড়া চালিয়ে তার কাছে হাজির হয়ে নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে ফিসফিস করে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বোঝাতে লাগল।

তখন সেনাপতি শান্ত, একটানা, কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, "কর্ণেল হাসানভ, হুকুম জারী করুন, স্কাউটরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ুক।"

সৈন্যদলটি নদীতে পেঁছে গেল। গিরি-খাতের পাহাড়গুলি পিছনে পড়ে রইল। আলো ফুটতে শুরু করল। মনে হচ্ছে, আকাশটা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তার বুকে ম্লান, অস্পষ্ট তারাগুলি আর ভাল করে চোখে পড়ছে না। পূবের আকাশে ভোরের প্রথম রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ছে।

পশ্চিম থেকে একটা নতুন তাজা বাতাস উঠে এসেছে। কলমুখর নদীর উপরে একটা ঝিকিমিকি কুয়াসা বাষ্পের মত ছড়িয়ে পড়েছে।

॥ ৮ ॥

পথ-প্রদর্শক নালাটা দেখিয়ে দিল। অগ্রগামী অশ্বারোহী বাহিনী এবং সেনাপতি ও তার দলবল সেই পথে চলতে লাগল। নালার জল ঘোড়াগুলোর বুক-সমান উঠে এল। জলের নীচে যে সাদা পাথরগুলো দেখা যাচ্ছে তার ভিতর দিয়ে তীব্রবেগে জলস্রোত বয়ে চলেছে। ফলে ঘোড়াগুলোর পায়ের চারদিকে ফেনায়িত স্রোতের ঘূর্ণি সৃষ্টি হচ্ছে। স্রোতের সেই শব্দে সচকিত ঘোড়াগুলো মাথা তুলে কান খাড়া করে অসমান গিরি-খাত ধরে স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়ে চলেছে। অশ্বারোহীরা পা তুলে বন্দুকগুলোও তুলে ধরে আছে। পদাতিক বাহিনীর পরনে শার্ট ছাড়া বিশেষ কিছু নেই ; গাদা-বন্দুকের মাথায় তাদের জামা-কাপড় ও থলে ঝুলিয়ে সেটাকে জলের উপর তুলে ধরে তারা এগোচ্ছে। লোকজনরা কুড়ি জন করে হাতে হাত ধরে সার বেঁধে অনেক কষ্টে সেই স্রোতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। গোলন্দাজ সৈনিকরা চীৎকার করতে করতে ঘোড়াগুলোকে জোর কদমে জলের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কামানগুলোর উপর দিয়ে মাঝে মাঝে জলের স্রোত বয়ে গেলেও সেগুলি নীচেকার পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল। আর কর্মঠ কসাক ঘোড়াগুলো জলে ফেনা ফুটিয়ে সব কিছু টেনে নিয়ে এগিয়ে চলল। তারপর এক সময় ভিজে লেজ ও লোম নিয়ে নালার ওপারে উঠল।

নালাটা পার হওয়ামাত্রই সেনাপতির মুখখানা সহসা গম্ভীর ও চিন্তিত হয়ে উঠল। ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে সে অশ্বারোহী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সম্মুখে প্রসারিত জঙ্গলের ভিতরকার খোলা পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কসাক অশ্বারোহী স্কাউটরা বনের প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সির্কাসিয়ান কোট ও টুপি পরা একজন পদযাত্রীকে আমরা জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পেলাম ; তারপর আর একজন......ও তৃতীয় জন। একজন অফিসার বলল : "ওই তো তাতাররা।" তারপর গাছের আড়ালে খানিকটা ধোঁয়া দেখা গেল...... একটা গুলি......আরও একটা। আমাদের গোলাগুলির শব্দে শত্রুপক্ষের গুলির শব্দ ঢেকে গেল। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা গুলি মৌমাছির গুঞ্জণের মত শব্দ করে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াতেই বুঝতে পারছিলাম যে গুলিটা শুধু আমাদের দিক থেকেই চালানো হচ্ছে না। তারপর পদাতিক বাহিনী এক দৌড়ে এবং গোলন্দাজ বাহিনী জোর কদমে স্কাউটদের

লাইনকে ভেদ করে এগিয়ে গেল। কামানের গম্ভীর গভীর শব্দ, কার্তুজের ক্লিক-ক্লিক ধাতব শব্দ; ছুটন্ত গোলার শাঁ-শাঁ ও বন্দুকের ফট্-ফট্ শব্দ কানে আসতে লাগল। খোলা জায়গাটার চারদিকেই অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর লোকজন চোখে পড়তে লাগল। কামান ও বন্দুকের ধোঁয়া জঙ্গলের সবুজের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে কুয়াসার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। কর্ণেল হাসানভ ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতির কাছে হাজির হয়ে হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল।

সির্কাসিয়ান টুপিতে হাত রেখে সে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, অশ্বারোহী বাহিনীকে আক্রমণ করবার হুকুম দিন; ওই নিশান দেখা যাচ্ছে।" সে চাবুক বাড়িয়ে কয়েকজন অশ্বারোহী তাতারকে দেখাল; তাদের আগে আগে দুটি লোক লাঠির সঙ্গে লাল-নীল কম্বল বেঁধে ঘোড়ায় চেপে চলেছে।

সেনাপতি বলল, "ঠিক আছে আইভান মিখাইলোভিচ।"

সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তলোয়ার শূন্যে দোলাতে দোলাতে চীৎকার করে বলল :

"হুররো!"

"হুররো! হুররো! হুররো!" সৈন্যরা সমস্বরে বলে উঠল। তার পিছনে ছুটে চলল অশ্বারোহী বাহিনী।

সকলেই সাগ্রহে তাকাল; প্রথমে একটা নিশান, তারপর আর একটা, তৃতীয়টা, চতুর্থটা…।

শত্রুপক্ষে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করল না। বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তারা গুলি চালাতে লাগল।

সেনাপতি ও মেজরের মধ্যে রণ-কৌশল নিয়ে কিছু কথাবার্তা হল। সেনাপতি কি একটা কথা বলে হেসে উঠল। মেজর অভিবাদন জানাল।

ঠিক সেই মুহূর্তে অপ্রীতিকর দ্রুত হিস্-হিস্ শব্দে শত্রুপক্ষের একটা গোলা আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে কাকে যেন আঘাত করল। পিছন থেকে কোন আহতের আর্তনাদ শোনা গেল। সেই আর্তনাদ আমাকে এমন ভাবে বিচলিত করে তুলল যে এই চমৎকার যুদ্ধ-দৃশ্যের সব আকর্ষণ মুহূর্তের মধ্যে আমার মন থেকে মুছে গেল; কিন্তু মনে হল শুধু আমি ছাড়া আর কেউই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নি। মেজর মনের সুখে হো-হো করে হাসছে। আর একজন অফিসার শান্তভাবে তার মুখের কথাটি শেষ করল। সেনাপতি উল্টো দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত হাসির সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কি যেন বলল।

জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতির কাছে এসে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিকর্তা জিজ্ঞাসা করল, "ওদের গুলির জবাব কি আমরা দেব?"

"হ্যাঁ! ওদের একটু ভয় দেখিয়ে দিন," একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে একান্ত উদাসীনভাবে সেনাপতি সম্মতি দিল।

শ্রেণীবদ্ধভাবে কামান সাজিয়ে শুরু হল গোলাবর্ষণ। সে শব্দে পৃথিবী আর্তনাদ করে উঠল। অবিশ্রাম আলোর ঝলকানি ও ধোঁয়া। তার ভিতর দিয়ে গোলন্দাজদের চেহারা ভাল করে দেখাও যায় না। চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

তাতার গ্রামের উপরেও গোলাগুলি চলতে লাগল। কর্নেল হাসানভ আবার সেনাপতির কাছে ছুটে এল এবং তার নির্দেশমত গ্রামের দিকে ছুটে গেল। আর একবার রণ-হুংকার উঠল; ধুলোর ঝড়ের মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী অদৃশ্য হয়ে গেল।

দৃশ্যটি চমৎকার। কিন্তু এতে আমার কোন ভূমিকা নেই। এ ধরনের দৃশ্য দেখতে আমি অভ্যস্তও নই। তাই একটা অনুভূতি আমার মনোভাবকে নষ্ট করে দিল: এই গতি, এই উত্তেজনা, এই চীৎকার—সবই আমার কাছে কেমন যেন অনাবশ্যক মনে হতে লাগল। একটা লোক যেন কুড়ুল বাগিয়ে ফাঁকা বাতাসে কোপ বসাচ্ছে—এমনি একটা চিন্তাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারলাম না।

॥ ৯ ॥

আমাদের সৈন্যরা তাতার গ্রামটি দখল করে নিল; সেনাপতি যখন সদলবলে—সে দলে আমিও ছিলাম—সে গ্রামে প্রবেশ করল তখন শত্রুপক্ষের একটি লোকও সেখানে ছিল না। উঁচু-নীচু পাহাড়ের চূড়ায় পরিচ্ছন্ন কুটিরের সারি তৈরি করা হয়েছে; উপরে সমতল মাটির ছাদ আর সুদৃশ্য চিমনি; পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে। একদিকে সব সবুজ বাগান; উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় আলোকিত। সেখানে বড় বড় ন্যাসপাতি ও কুলের গাছ। অপর দিকে অদ্ভুত সব ছায়া পড়েছে—কবরখানার লম্বা, খাড়া পাথর আর উঁচু কাঠের খুঁটি,—তার মাথায় গোলক ও নানা রঙের নিশান বাঁধা। (এইগুলিই "জিগিৎ"দের কবর।)

ফটকের পাশে সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই অশ্বারোহী, কসাক ও পদাতিক বাহিনীর লোকরা মনের আনন্দে গ্রামের অলিতে-গলিতে ঢুকে পড়ল; শূন্য গ্রামটা মুহূর্তের মধ্যে আবার যেন জীবন ফিরে পেল। এখানে একটা ছাদ ভেঙে ফেলা হল; শক্ত কাঠের উপর কুড়ুল মারবার শব্দ কানে এল; একটা দরজা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল; আর এক জায়গায় একটা খড়ের গাদা পুড়ছে; একটা বেড়া ও কুটির জ্বলছে; পরিষ্কার

বাতাসে ঘন মেঘের মত ধোঁয়া উঠছে। এখানে জনৈক কসাক এক বস্তা ময়দা ও একটা কম্বল টেনে নিয়ে চলেছে। একজন সৈনিক হাসতে হাসতে একটা টিনের কড়াই ও একটা কম্বল কুটিরের ভিতর থেকে টেনে বার করছে; আর একজন চেষ্টা করছে হাত বাড়িয়ে দুটো মুরগিকে ধরতে; মুরগি দুটো কক্-কক্ করে ডাকতে ডাকতে দেয়ালের গায়ে পাখা ঝাপটাচ্ছে; আরও একজন খুঁজে-পেতে পেয়েছে একটা বড় দুধের পাত্র; খানিকটা দুধ চুমুক দিয়ে খেয়ে সে হাসতে হাসতে বাকিটা মাটিতে ঢেলে দিল।

যে বাহিনীটির সঙ্গে আমি এন—দুর্গ থেকে এসেছিলাম সেটাও ওই গ্রামেই ছিল। একটা কুটিরের ছাদে বসে ক্যাপ্টেন একটা ছোট পাইপ থেকে এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে "সাম্রোতালিক" তামাকে ঘণ ধোঁয়া ছাড়ছিল যে তাকে দেখে আমি ভুলেই গেলাম যে আমি একটা শত্রুপক্ষের গ্রামে আছি; মনে হল যেন আমার বাড়িতেই আরামে আছি।

আমাকে দেখে সে বলল, "আরে, আপনি এখানেও হাজির।"

লেফ্‌টেন্যান্ট রোজেনক্রাঞ্জ-এর দীর্ঘ দেহটা সারা গ্রামময় ছুটে বেড়াতে লাগল। অনবরত নানা রকম নির্দেশ দিয়ে চলেছে; দেখে মনে হচ্ছে সে যেন কোন কিছু নিয়ে বিব্রত। এক সময় দেখলাম, বিজয়গর্বে সে একটা কুটির থেকে বেরিয়ে এল; পিছনে দুজন সৈনিক হাত-বাঁধা অবস্থায় একটা বুড়ো তাতারকে ধরে নিয়ে চলেছে। বুড়ো মানুষটির পরনে একটা ছেঁড়া রঙিন জামা আর শতচ্ছিন্ন ব্রীচেস; শরীরটা এতই কুঁজো যে পিছ-মোড়া দিয়ে কসে বাঁধা হাড় বের-করা হাত দুটো যেন কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে; খালি পা দুটো বুঝি আর চলতেও পারছে না। তার মুখ ও কামানো মাথার কিছুটা অংশ বলি-রেখায় ভর্তি। দাঁতহীন বিকৃত মুখটা ছোট করে ছাঁটা ধূসর গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলের ভিতর থেকেও অনবরত নড়ছে; যেন কিছু চিবিয়ে চলেছে; কিন্তু তার লোমহীন চোখের পাতার নীচে দুটি লাল চোখে এখনও যেন আগুন জ্বলছে; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জীবনের প্রতি বুড়ো মানুষটির কী তীব্র ঘৃণা!

দো-ভাষীর সাহায্যে রোজেনক্রাঞ্জ তাকে জিজ্ঞাসা করল, অন্যদের সঙ্গে সেও চলে যায় নি কেন?

শান্তভাবে চারদিকে তাকিয়ে সে বলল, "কোথায় যাব?"

"যেখানে আর সকলে গেছে," কে যেন জবাব দিল।

"জিগিৎ-রা গেছে রুশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কিন্তু আমি তো বুড়ো।"

"সে কি? তুমি কি রুশদের ভয় কর না?"

চারদিকে ঘিরে-আসা লোকগুলির দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আবার বলল, "রুশরা আমার কী করবে? আমি তো বুড়ো মানুষ।"

ফিরবার পথে সেই বুড়ো মানুষটিকে আবার দেখেছিলাম। মাথায় টুপি নেই, হাত দুটি বাঁধা, সেনাদলের জনৈক কসাকের জিনের টানে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে ; চোখে-মুখে সেই একই উদাসীনতার আভাষ। বন্দী-বিনিময়ের সুবিধার জন্যই তাকে প্রয়োজন।

ছাদে উঠে ক্যাপ্টেনের পাশে বসে পড়লাম।

এইমাত্র যা ঘটে গেল সে সম্পর্কে তার মতামত জানবার জন্য বললাম, "মনে তো হচ্ছে শত্রুপক্ষের কেউ এখানে নেই।"

"শত্রু ?" সে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল। "আরে, শত্রু তো কেউ ছিল না। এদের কি আপনি শত্রু বলেন ? সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, দেখুন আমরা কেমন করে এখান থেকে যাই। দেখবেন, ওরাই আমাদের পথ দেখিয়ে বাড়ি পেঁছে দেবে ; দেখবেন, তারা কেমন ডিগবাজী খায়।" মুখের পাইপটা বাড়িয়ে সেই ঝোপ-ঝাড়গুলো সে দেখাল যেগুলি আমরা সকালে পার হয়ে এসেছি।

"ওটা কি ?" ক্যাপ্টেনের কথায় বাধা দিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আমাদের এখান থেকে খানিকটা দূরে ডন কসাকদের একটা ছোট জটলাকে দেখিয়েই প্রশ্নটা আমি করলাম।

জটলার ভিতর থেকে একটা শিশুর কান্নার মত শব্দ এবং এই কথাগুলি আমাদের কানে এল :

"ছুরি মের না! থাম……ওরা আমাদের দেখে ফেলবে……তোমার কাছে কি ছুরি আছে এভ্স্টিগ্নীচ ? ছুরিটা আমাদের দাও।"

"ওরা কিছু ভাগাভাগি করছে, বদমাশের দল।" ক্যাপ্টেন ঠাণ্ডা গলায় বলল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সেই সুন্দর ধ্বজাবাহী সৈনিকটি মুখ লাল করে এক দৌড়ে মোড় ঘুরে হাত নাড়তে নাড়তে কসাকদের দিকে ছুটে গেল।

ছেলেমানুষী গলায় সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "এটাকে ছুঁয়ো না! এটাকে মেরো না!"

একজন অফিসারকে দেখে কসাকরা সরে দাঁড়িয়ে ছোট ছাগলছানাটাকে ছেড়ে দিল। তরুণ ধ্বজাবাহী একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে বিড়্ বিড়্ করে কি যেন বলতে বলতে লজ্জিত মুখে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক্যাপ্টেন ও আমাকে ছাদের উপর দেখতে পেয়ে তার মুখ লজ্জায় আরও লাল হয়ে উঠল। ধীর পায়ে দৌড়ে সে আমাদের কাছে এল।

লজ্জায় একটুখানি হেসে বলল, "আমি ভেবেছিলাম ওরা একটা শিশুকে খুন করতে যাচ্ছে।"

॥ ১০ ॥

অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়ে সেনাপতি চলেছে আগে আগে। যে সেনা-দলের সঙ্গে আমি এন—দুর্গ থেকে এসেছিলাম তারা চলেছে সকলের শেষে। ক্যাপ্টেন হ্লপভ্ ও রোজেনক্রাঞ্জ-এর সেনাদল ফিরে চলেছে এক সঙ্গে।

ক্যাপ্টেনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হল। যে ঝোপ-ঝাড়গুলোর কথা সে বলেছিল সেখানে পৌঁছবার পর থেকেই রাস্তার দুই ধারে অনেক পাহাড়ী মানুষকে আমরা অনবরত দেখতে পেলাম। কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা পায়ে হেঁটে। তারা এত কাছে এসে পড়েছে যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তারা বন্দুক হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে এক গাছ থেকে আর এক গাছের দিকে ছোটাছুটি করছে। ক্যাপ্টেন টুপিটা খুলে শ্রদ্ধার সঙ্গে ক্রুশ চিহ্ন করল। কিছু বয়স্ক সৈন্যও তাই করল। জঙ্গলের মধ্যে অনেক হাঁক-ডাক আমরা শুনতে পেলাম। তারা চেঁচিয়ে বলছে, "আয় গিয়ায়ুর! আয় উরুস্!" গাদা বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া শুরু হয়ে গেল। দুদিক থেকেই শাঁ-শাঁ শব্দে গুলি চলতে লাগল। আমাদের সৈন্যরাও নিঃশব্দে জবাব দিতে শুরু করল। শুধু মাঝে মাঝে তাদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে: "আরে, সে কোন্ জায়গা থেকে গুলি করছে?" "জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে সে তো বেশ আরামেই আছে!" (ককেসীয় সৈন্যরা শত্রুপক্ষকে বোঝাতে "সে" কথাটা ব্যবহার করে থাকে।) "আমাদের কামান ব্যবহার করা উচিত।"—এই সব।

কামানগুলোকে সার দিয়ে সাজানো হল। তার থেকে কিছু গোলা ছুঁড়বার পরেই শত্রুপক্ষ যেন দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু এক মিনিট পরেই পায়ে পায়ে সৈন্যরা এগিয়ে চলল। গুলির শব্দ, চীৎকার, হৈ-চৈ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

গ্রাম থেকে দুশ গজের বেশীও আমরা এগুই নি, অমনি শত্রুর কামানের গোলা আমাদের মাথার উপর দিয়ে সশব্দে ছুটে যেতে লাগল। দেখলাম, একটা গোলা লেগে একজন সৈনিক মারা গেল……কিন্তু আমি নিজেই যখন সে দৃশ্যকে ভুলে যাবার জন্য অনেক কিছু দিতে রাজী, তখন সে দুঃখময় দৃশ্যের বিবরণ দিয়ে আর কি হবে?

লেফটেন্যান্ট রোজেনক্রাঞ্জ নিজের বন্দুক থেকে গলি চালিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যও সে চুপ করে নেই; কর্কশ গলায় সৈন্যদের উৎসাহ দিচ্ছে; পূর্ণ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সেনাবাহিনীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। এখন তাকে কিছুটা ম্লান দেখাচ্ছে; কিন্তু তার সামরিক চেহারার সঙ্গে সেটা বেশ মানিয়ে গেছে।

সুদর্শন ধ্বজাবাহী খুশিতে ডগমগ: তার সুন্দর কালো চোখ দুটি সাহসে জ্বলছে; ঠোঁটে সামান্য হাসি; বার বার সে ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাপ্টেনের

কাছে গিয়ে জঙ্গলের ভিতর ছুটে যাবার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছে।

বেশ জোরের সঙ্গে সে বলল, "আমরা ওদের হটিয়ে দেব; নিশ্চয় দেব।"

ক্যাপ্টেন সংক্ষেপে জবাব দিল, "কোন দরকার নেই; আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে।"

ক্যাপ্টেনের সেনাদল বনের প্রান্তে ঘাঁটি গেড়ে শুয়ে পড়ে গুলি চালিয়ে শত্রুপক্ষকে দূরে সরিয়ে রাখছে। ময়লা কোট ও ভেজা টুপি মাথায় ক্যাপ্টেন তার সাদা ঘোড়ার রাশে ঢিল দিয়ে চুপ করে বসে আছে; রেকাব ছোট হওয়ায় তাকে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়েছে। (সৈন্যরা তাদের কাজ ভালই জানে, আর সেই ভাবে কাজও চালাচ্ছে, কাজেই কোন রকম নির্দেশের প্রয়োজন নেই)। শুধু মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে সৈন্যদের হাঁক-ডাক করছে। ক্যাপ্টেনের উপস্থিতির সামরিক গুরুত্ব কিছু ছিল না; কিন্তু তার ঐকান্তিকতা ও সরলতা আমার মনের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করল।

"এই তো সত্যিকারের সাহস", স্বতস্ফূর্তভাবে এই কথাটাই আমার মনে উদয় হল।

তাকে সর্বদা যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনই আছে; সেই শান্ত চলাফেরা, সেই শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের সেই অকপট খোলা ভাব; শুধু তার দৃষ্টির অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার মধ্যে চোখে পড়ে স্বীয় কর্তব্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার একান্ত প্রয়াস। "সর্বদা একই রকম" কথাটা বলা কত সহজ, কিন্তু অন্যের মধ্যে নানা সময়ে কত পার্থক্যই না চোখে পড়ে; কেউ চায় স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে নিজেকে বেশী প্রশান্ত দেখাতে, কেউ বা চায় দেখাতে কঠোরতর; আবার তৃতীয় জন হয় তো নিজেকে বেশী প্রফুল্ল দেখাতে চায়; কিন্তু ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, নিজেকে অন্য কোন রকম দেখাবার চেষ্টা যে লোকে কেন করে তা সে জানেই না।

যে ফরাসী লোকটি ওয়াটালুর রণক্ষেত্রে বলেছিল, "La garde meurt, mais ne se rend pas", এবং অন্য সব বীররা, বিশেষ করে ফরাসী মহাবীর যারা স্মরণীয় সব উক্তি করে গেছে, তারা সকলেই সাহসী, আর তাদের উক্তিগুলোও মনে রাখবার মত। কিন্তু তাদের সাহসিকতা আর এই ক্যাপ্টেনের সাহসিকতার মধ্যে তফাৎ আছে। যে কোন অবস্থায় আমার এই বীরের অন্তরে যদি কোন মহৎ বাণী জেগে ওঠে তাহলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে সে-বাণী সে উচ্চারণ করবে না; প্রথমত, সে ভয় পাবে যে ঐ মহৎ বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে সে তার মহৎ কাজটিকে নষ্ট করে ফেলবে; আর দ্বিতীয়ত, কোন লোক যখন বুঝতে পারে যে একটি মহৎ কাজ করবার মত শক্তি তার আছে তখন কোন বাণীরই প্রয়োজন হয় না। আমার মতে এই হল রুশ সাহসিকতার মহৎ ও বিশেষ লক্ষণ; তা যদি সত্য হয় তাহলে একজন রুশ যখন শুনতে

পায় যে আমাদেরই তরুণ অফিসাররা অপ্রচলিত ফরাসী বীরত্বের অনুকরণে গতানুগতিক ফরাসী বয়েৎ উচ্চারণ করছে তখন কি সে অন্তরে যন্ত্রণা অনুভব না করে পারে ?

হঠাৎ ধ্বজাবাহী সুদর্শন অফিসারটি যে দিকে দাঁড়িয়েছিল সেই দিক থেকে একটা ধ্বনি উঠল "হুররা !" শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় ত্রিশটি সৈন্য হাতে বন্দুক নিয়ে আর পিঠে থলে চাপিয়ে চষা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে। তাদের পা হড়্‌কে যাচ্ছে, তবু তারা চীৎকার করতে করতে এগুচ্ছে। তরুণ ধ্বজাবাহী অফিসারটি তলোয়ার উঁচিয়ে ঘোড়াশুদ্ধ তাদের সামনে লাফিয়ে পড়ল।

সকলেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মিনিট ধরে হৈ-চৈ ও বন্দুকের গুলি চলবার পরে একটি ভয়ার্ত ঘোড়া ছুটে বেরিয়ে এল, আর নিহত ও আহতদের বয়ে নিয়ে জঙ্গলের প্রান্তে দেখা দিল একদল সৈন্য ; আহতদের মধ্যে রয়েছে তরুণ ধ্বজাবাহী অফিসার। দুটি সৈন্য বগলের নীচে হাত রেখে তাকে তুলে ধরেছে। সে যেন রুমালের মত সাদা হয়ে গেছে ; তার ছোট্ট সুন্দর মুখখানিতে মুহূর্তকাল আগে দেখা সামরিক উল্লাসের একটা ক্ষীণ ছায়া তখনও লেগে রয়েছে ; দুটি কাঁধের ভিতর দিয়ে মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। বুক-খোলা কোটের নীচে সাদা শার্টের উপর একটা লাল দাগ দেখা যাচ্ছে।

এই করুণ দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি বলে উঠলাম, "আঃ ! কী দুঃখের কথা !"

একজন বুড়ো সৈনিক বিষণ্ণ মুখে বন্দুকের উপর ভর দিয়ে আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "সত্যি খুব দুঃখের।" তারপর আহত যুবকটির দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে বলল, "কোন কিছুকেই তিনি ভয় করতেন না ; একাজ যে লোকে কেমন করে পারে ? আহা, এখনও যে সে যুবক বোকাই আছে আর সেই জন্যই এ মূল্য তাকে দিতে হল।"

"সেকি ? আপনি কি ভয় পেয়েছেন ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"নিশ্চয়।"

॥ ১১ ॥

চারজন সৈনিক ধ্বজাবাহী অফিসারকে স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের পিছনে চলেছে দুর্গের একটি সৈনিক ; অস্ত্রোপচারের জিনিসপত্র ভর্তি দুটো সবুজ বাক্স পিঠে নিয়ে একটি পরিশ্রান্ত ঘোড়া চলেছে তাদের সঙ্গে।

তারা ডাক্তারের প্রতীক্ষা করছে। অফিসাররা ঘোড়ায় চেপে স্ট্রেচারের কাছে এসে আহত যুবকটিকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিতে লাগল।

তার কাছে এসে লেফটেন্যান্ট রোজেনক্রাঞ্জ হেসে বলল, "আরে ভাই আলানিন, আর বেশী দেরী নেই, একটু পরেই আবার আমরা নাচের আসরে নেমে পড়ব।"

সে হয় তো আশা করেছিল যে এই কথাগুলি শুনে ধ্বজাবাহী অফিসার মনে সাহস পাবে; কিন্তু তার মুখের ঠাণ্ডা, বিষণ্ণ ভাব দেখেই বোঝা গেল যে ঐ কথায় আশানুরূপ কোন ফল হয় নি।

ক্যাপ্টেনও তার কাছে এগিয়ে গেল। সে আগ্রহে আহত ছেলেটিকে দেখতে লাগল। সাধারণত তার মুখ ভাবলেশহীনই থাকে, কিন্তু এখন সেখানেও ফুটে উঠেছে সত্যিকারের সহানুভূতি।

"প্রিয় আনাতোল আইভানভিচ, মনে হচ্ছে এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা।" এমন সাদর মমতায় সে কথাগুলি বলল যেটা আমি তার কাছ থেকে আশা করি নি।

আহত ছেলেটি চারদিকে তাকাল; তার বিবর্ণ মুখে দুঃখের হাসি ফুটে উঠল।

"হ্যাঁ; আপনার কথা আমি শুনি নি।"

"তার চাইতে বল এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা," ক্যাপ্টেন আবার কথাটা বলল।

ডাক্তার এসে পড়ল। সহকারীর কাছ থেকে কিছু ব্যাণ্ডেজ, একটা শলাকা, ও অন্য টুকিটাকি জিনিস নিয়ে হাতের আস্তিন গুটিয়ে মুখে উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হেসে রোগীর দিকে এগিয়ে গেল।

নিস্পৃহ গলায় তামাসার ভঙ্গীতে সে বলল, "দেখি, মনে হচ্ছে একটা সুস্থ স্থানে তারা একটা ছোট গর্ত করে দিয়েছে। দেখান তো।"

ধ্বজাবাহী কথা মত কাজ করল; কিন্তু এই হাল্কা মনের ডাক্তারটির দিকে যে দৃষ্টিতে সে তাকাল তার মধ্যে মিশে ছিল বিস্ময় ও তিরস্কার; অবশ্য ডাক্তার সেটা লক্ষ্য করল না। সে ক্ষতস্থানটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব দিক থেকে পরীক্ষা করতে লাগল; কিন্তু আহত ছেলেটি ধৈর্য হারিয়ে তীব্র স্বরে আর্তনাদ করে হাতটা সরিয়ে নিল।

প্রায় অস্ফুট স্বরে সে বলল, "আমাকে ছেড়ে দিন। মরতে তো আমাকে হবেই।"

কথাগুলি বলেই সে একেবারে এলিয়ে পড়ল। যে লোকগুলি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল, পাঁচ মিনিট পরে তাদের কাছে গিয়ে একজন সৈনিককে জিজ্ঞাসা করলাম, ধ্বজাধারী অফিসারটি কেমন আছে; সে জবাব দিল, "তিনি পরলোকে যাত্রা করেছেন।"

॥ ১২ ॥

আরও অনেক পরে পুরো বাহিনীটা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে মার্চ করে দুর্গের দিকে চলতে লাগল। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত গেছে। স্বচ্ছ নির্মল দিগন্ত-রেখার উপর ঝুলে থাকা দীর্ঘ মেঘের সারির উপর তার শেষ গোলাপি রশ্মিরেখা ছড়িয়ে পড়েছে। বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলি একটা রক্তিম কুয়াসায় ঢেকে যাচ্ছে; অস্তসূর্যের লাল আলোয় শুধু তাদের সুউচ্চ রেখাগুলি আশ্চর্য স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে। চাঁদ অনেকক্ষণ উঠেছে; আকাশের গাঢ় নীলের পাশ্চাৎ-পটে স্বচ্ছ চাঁদটি ক্রমেই সাদা হতে শুরু করেছে। ঘাস ও গাছগাছালির সবুজ রং অন্ধকারে কালো হয়ে উঠছে; তাদের উপর ঝরে পড়ছে শিশির-কণা।

উর্বর প্রান্তরের ভিতর দিয়ে স্থির পদক্ষেপে সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে একটা অন্ধকার স্তূপের মত। চারদিক থেকে ভেসে আসছে বড় খঞ্জনী, ঢাক ও আনন্দ-সঙ্গীতের শব্দ। ষষ্ঠ বাহিনীর গায়ক গলা ছেড়ে গান ধরেছে; তার গভীর, জোরালো অনুভূতি-ভরা কণ্ঠস্বর সন্ধ্যার স্বচ্ছ বাতাসে দূর হতে দূরান্তরে ভেসে যাচ্ছে।

১৮৮৩

মোমবাতি: অথবা ভাল মানুষ চাষী কেমন করে নিষ্ঠুর ওভারসীয়ারকে পরাজিত করেছিল

The Candle: Or How the good peasant overcame the cruel Overseer

এই ঘটনাটি ঘটেছিল মালিকদের আমলে। (অর্থাৎ ১৮৬১ সালে ভূমিদাসদের মুক্তির আগে।) অবশ্য মালিক ছিল নানা রকমের। একদল ছিল যারা ঈশ্বরকে ও মৃত্যুর মুহূর্তকে স্মরণ করত বলে ভূমিদাসদের প্রতিও করুণা করত; আর একদল ছিল—তারা নেহাৎই পশু—যারা ও দুয়ের কাউকেই স্মরণ করত না। এই সব মহাপ্রভুদের মধ্যে আবার নিকৃষ্ট ছিল তারা যারা নিজেরাই এককালে ভূমিদাস ছিল—যারা পাঁক থেকে উঠে এসে হয়েছিল রাজার সহচর। তাদের অধীনে বাস করাই ছিল সব চাইতে শক্ত।

কোন জমিদারিতে এই রকম একজন ওভারসীয়ার নিযুক্ত হয়েছিল। সেখানকার চাষীরা কাজ করত "বার্স্টাচিনা" অর্থাৎ বেগার পদ্ধতিতে।

(সপ্তাহে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন বাধ্যতামূলক কাজের বিনিময়ে তারা জমি ভোগদখল করত।) স্ত্রী ও দুটি বিবাহিত মেয়েকে নিয়ে ছিল সেই ওভারসীয়ারের সংসার। লোকটা যেমন উচ্চাকাংখী, তেমনই দুষ্টপ্রকৃতির; সৎপথে অথবা অসৎপথে যে কোন উপায়ে টাকা রোজগার করাই ছিল তার লক্ষ্য। প্রথমেই সে "বাস্টচিনা" প্রথার নির্দিষ্ট কাজের দিনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তারপর একটা ইট-খোলা শুরু করে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব চাষীকেই খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবার যোগাড় করল, আর ইট বেচে প্রচুর টাকা করতে লাগল। কিছু চাষী মস্কোতে গিয়ে জমিদারের কাছে নালিশ করল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। জমিদার তাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিল; ওভারসীয়ারকে কিছুই বলল না। কথাটা ওভারসীয়ারের কানে যেতেই সে তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আরও শোচনীয় করে তুলল। তার উপর, চাষীদের মধ্যে কয়েকজন ছিল অসত্যপরায়ণ; তারা পরস্পরের কথা ওভারসীয়ারের কানে তুলে নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলল; ফলে কথাটা সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ল, আর ওভারসীয়ারও আরও নির্দয় হয়ে উঠল।

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে চাষীরা সেই ওভারসীয়ারকে ক্রুদ্ধ বুনো জন্তুর মত ভয় করতে লাগল। যখনই সে ঘোড়ায় চড়ে কোন গ্রামে যেত, সেখানকার প্রতিটি লোক নেকড়ের মত তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকত; সকলেই চেষ্টা করত তার চোখের আড়ালে থাকতে। ওভারসীয়ার সবই বুঝতে পারল। তারা তাকে এত ভয় করে দেখে সে আরও রেগে গেল। সে তাদের চাবুক মারতে লাগল, দিন-রাত খাটাতে লাগল, আর তার হাতে পড়ে অনেকেরই কষ্টের অবধি রইল না

যাই হোক, কালক্রমে তার অত্যাচারে চাষীরা বেপরোয়া হয়ে উঠল; এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শুরু করে দিল। কোন গোপন জায়গায় তারা একত্র হত, আর তাদের মধ্যে বেশী সাহসী কেউ হয় তো বলত, "এই উপর ওয়ালা জন্তুটাকে নিয়ে আর কতকাল আমরা চলব? এস, চিরদিনের মত এ অবস্থার শেষ করে দেই। এ রকম মানুষকে খুন করলে পাপ হবে না"

একবার সব চাষীদের হুকুম করা হল, জঙ্গলের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। পবিত্র সপ্তাহের ঠিক আগের কথা। দুপুরের খাবারের জন্য একত্র হয়ে তারা আবার বলাবলি শুরু করল।

তারা বলল, "এ ভাবে আর কতদিন চলবে? লোকটা আমাদের মরিয়া করে তুলেছে। সম্প্রতি সে আমাদের এত বেশী খাটাতে শুরু করেছে যে আমাদের নিজেদের বা মেয়েদের কারওই দিনে-রাতে এক মুহূর্ত বিশ্রাম

জুটছে না। তাছাড়া, কোন কাজ যদি ঠিক তার মনোমত না হয় তাহলেই সে রেগে গিয়ে আমাদের মারধোর করে। তার চাবুক খেয়ে সাইমন মারা গেল; আর এইমাত্র এনিসিমকে কত যন্ত্রণা ভোগ করতে হল। এরপরও কী দেখতে চাও? আজ সন্ধ্যায়ই জন্তুটা আসবে আর আমাদের উপর জিভের ঝাল ঝাড়বে। দেখ, আমাদের একমাত্র কাজ হল তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে মাথায় কুড়ুলের এক কোপ বসিয়ে দিয়ে সব শেষ করে দেওয়া। হ্যাঁ, তারপর দেহটাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দাও। একমাত্র দরকার—আমাদের সকলকে একমত হতে হবে, এক সংগে দাঁড়াতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতা করা চলবে না।"

ভাসিলি মিনীফ-ই এ ব্যাপারে বেশী উৎসাহী, কারণ ওভারসীয়ারের উপর তার ছিল বিশেষ রাগ। সে যে তাকে প্রতি সপ্তাহে চাবুক মারত তাই শুধু নয়, সে তার বউকে নিয়ে গেছে রাঁধুনির কাজ করাতে।

চাষীরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলল, আর সন্ধ্যাবেলা ওভারসীয়ার এসে হাজির হল। আসামাত্রই সে রাগে জ্বলে উঠল, কারণ কাঠগুলো তার মনের মত করে চেলা করা হয় নি। তা ছাড়া, জ্বালানি কাঠের স্তূপের মধ্যে সে একটা আস্ত কাঠও লুকনো দেখতে পেল।

বলে উঠল, 'তোদের না লেবুগাছ কাটতে বারণ করেছিলাম। এ কাজ কে করেছে? বল্, নইলে তোদের সব্বাইকে চাবকাব।"

লেবুগাছটা কার ভাগে পড়েছিল সে কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় চাষীরা সিদর-কে দেখিয়ে দিল। তখন ওভারসীয়ার চাবুক মেরে তার মুখটা রক্তাক্ত করে দিল, আর ভাসিলির কাটা জ্বালানির স্তূপটা ছোট হওয়ায় তাকেও চাবুক মারল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

সেদিন রাতে যথারীতি জমায়েত হবার পরে ভাসিলি বলল:

"তোমরা কেমন লোক হে। তোমরা কি মানুষ, না চড়ুই পাখি। তোমরা মুখে বল, তৈরি হও, এবার তৈরি হও, আর যখন সময় আসে তখন সকলেই ভয়ে কাঁপতে থাক। বাজপাখিকে বাধা দেবার জন্য চড়ুইপাখিরাও এই রকমই তৈরি হয়েছিল। তারাও বলেছিল, তৈরি হও, এবার তৈরি হও—কেউ কাউকে ধরিয়ে দিও না; কিন্তু বাজপাখি যখন ছোঁ মেরে নীচে নেমে এল তখন সকলেই কাঁটা-ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল, আর বাজপাখিটা ইচ্ছামত চড়ুইটাকে ধরে নখে ঝুলিয়ে উঠে চলে গেল। চড়ুইগুলো তখন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। "টুইট্, টুইট্!" বলে কাঁদতে কাঁদতে দেখল; তাদের মধ্যে একজন হারিয়ে গেছে। তারা বলল, 'আমাদের মধ্যে কে গেল? আহা, শুধু ছোট্ট ভানিয়া। এটাই ওর নিয়তি; আমাদের সকলের জন্য ও জীবনটা দিল।' তোমাদেরও সেই একই হাল; তোমাদের 'বিশ্বাসঘাতকতা

নয়, বিশ্বাসঘাতকতা নয়' বলে যত চীৎকার তারও ঐ একই পরিণতি। লোকটা যখন সিদর-কে মারতে লাগল তখন তোমাদের উচিত ছিল সাহসে ভর করে তাকে শেষ করে দেওয়া। কিন্তু না; মুখে বললে; 'তৈরি হও, তৈরি হও! বিশ্বাসঘাতকতা নয়, বিশ্বাসঘাতকতা নয়!'—কিন্তু বাজপাখি যখন ছোঁ মারল তখন তোমরা সকলেই ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলে।"

এই নিয়ে চাষীদের আলোচনা ক্রমেই বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা ওভারসীয়ারকে শেষ করে দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হল।

এদিকে, "খৃষ্টের মৃত্যু সপ্তাহের প্রাক সন্ধ্যা"য় সে খবর পাঠাল, যই-চায়ের জন্য "বার্স্টচিনা" জমিতে লাঙল দেবার জন্য তারা যেন তৈরি থাকে। চাষীরা এটাকে "মৃত্যু সপ্তাহ"-এর প্রতি অসম্মান বলে মনে করল এবং ভাসিলি-র খিড়কির উঠোনে সমবেত হয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে বসল।

তারা বলল, "সে যদি ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে এ ধরণের কাজের হুকুম দিতে পারে, তাহলে আমাদেরও অবশ্য কর্তব্য তাকে খুন করা। সে কাজটা চিরদিনের মত চুকিয়ে ফেলা হোক।"

ঠিক সেই সময় সেখানে হাজির হল পিটার মিসচিফ্। পিটার শান্তিপ্রিয় মানুষ; আজ পর্যন্ত এই সব আলোচনায় যোগ দেয় নি। সব কথা শুনে সে বলল:

"ভাইসব, তোমরা একটা বড় পাপ কাজের কথা ভাবছ। কোন মানুষের জীবন নেওয়াটা ভয়ংকর কাজ। অপরের জীবন নেওয়া তো সহজ, কিন্তু নিজের জীবন? এ লোকটা যদি খারাপ কাজ করে থাকে, তাহলে তার পরিণামও খারাপ হবে। তোমরা একটু ধৈর্য ধরে থাক ভাই সব।"

একথা শুনে ভাসিলি রেগে উঠল।

বলল, "তোমার মুখে তো ঐ এক কথা—মানুষকে মারা পাপ। হ্যাঁ; নিশ্চয় পাপ, কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে নয়। একটি ভাল মানুষকে মারা পাপ, কিন্তু এ রকম একটা কুত্তাকে? আরে, ঈশ্বরই আমাদের আদেশ করেছেন এটাকে খুন করতে। সেই বা আমাদের জীবন নষ্ট করতে থাকবে কেন? তাকে খুন করে যদি কষ্ট পেতেও হয়; তবু আমরা তাই করব আমাদের ভাইদের ভালর জন্য, আর তাই এ কাজের জন্য তারা আমাদের ধন্যবাদ জানাবে। তোমার এ সব ফাঁকা বুলি মিস্চিফ। খৃস্টের পবিত্র উৎসবের সময় মাঠে গিয়ে কাজ করলে কি আমাদের পাপ কিছু কম হবে? আরে, তুমি নিজেও নিশ্চয় কাজে যেতে চাও না?"

"কেন যাব না?" পিটার জবাব দিল। "আমাকে যদি চাষ করতে পাঠানো হয়, সে আদেশ আমি মানব। নিজের জন্য তো কাজটা করব না। পাপটা কার হবে সেটা ঈশ্বরই বিচার করবেন; আমরা শুধু চাষ করতে করতে

তাঁকে স্মরণ করব ; বাস, তাহলেই হবে। এগুলো আমার কথা নয় ভাইসব। আমরা পাপ দিয়ে পাপকে দূর করব—এই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হত তাহলে সেই মর্মে তিনি আমাদের বিধান দেতেন এবং এটাকেই পথ হিসাবে দেখিয়ে দিতেন। না। পাপ দিয়ে পাপকে দূর করলে সে আবার ফিরে আসবে। মানুষকে খুন করা বোকামি, কারণ রক্ত আত্মাকে কলুষিত করে। একজনের আত্মাকে নিলে তোমার নিজের আত্মাকেই রক্তে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। এমন কি তুমি যদি মনে কর যে, যাকে তুমি খুন করেছ সে লোকটি পাপী; এবং তাকে খুন করে তুমি পৃথিবী থেকে পাপকে দূর করেছ—তাহলেও ভেবে দেখ, তার চাইতেও অনেক বেশী খারাপ কাজটিই তুমি করে বসেছ। তার চাইতে বরং দুর্ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন কর, দেখবে দুর্ভাগ্যও তোমার কাছে আত্মসমর্পন করবে।"

এর ফলে চাষীরা দ্বি-মত হয়ে গেল ; কতক ভাসিলির সঙ্গে একমত হল, আবার কিছু লোক ধৈর্য ধরে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবার যে পরামর্শ পিটার দিয়েছে তাকেই মেনে নিল।

উৎসবের প্রথম দিন (রবিবার) চাষীরা ছুটি পালন করল ; কিন্তু সন্ধ্যায় জমিদার-বাড়ি থেকে "স্তারোস্তা" (গ্রাম-প্রধান) লোকজন নিয়ে এসে বলল :

"ওভারসীয়ার মাইকেল সেমেনোভিচ আমাদের পাঠিয়েছে তোমাদের সতর্ক করে দিতে : কাল তোমরা যই-চাষের জন্য লাঙল চালাতে প্রস্তুত হয়ে থেকো।"

"স্তারোস্তা" লোকজন নিয়ে সারাটা গ্রামে ঘুরে সব চাষীদের পরদিন মাঠে লাঙল চালাতে বলল। কিছু চাষী থাকে নদীর ওপারে, কিছু থাকে বড় রাস্তার ধারে ; সকলের কাছেই তারা গেল। চাষীরা পড়ল মহাবিপদে। তবু আদেশ অমান্য করবার সাহস হল না ; পরদিন সকালে লোকজন নিয়ে মাঠে চাষ করতে শুরু করল। প্রাতঃকালীন প্রার্থনা-সভার সময় গির্জার ঘণ্টা বাজতে লাগল ; সমস্ত দেশ জুড়ে চলেছে উৎসব ; আর চাষীরা—তারা ক্ষেতে লাঙল চালাচ্ছে।

ওভারসীয়ার সেদিন দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। যথারীতি সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখল। বাড়ির লোকজন সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাল পোষাক পরে গাড়িতে চেপে গির্জায় গেল। তারা ফিরে এলে দাসী সামোভার এনে দিল, ওভারসীয়ার গোলাবাড়ি থেকে ফিরে এল, আর সকলে একসঙ্গে বসে চা খেতে লাগল। চায়ের পাট শেষ হলে মাইকেল পাইপটা ধরিয়ে "স্তারোস্তা"কে ডেকে পাঠাল।

"চাষীদের লাঙল দিতে পাঠিয়েছ ?" সে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ মাইকেল সেমেনোভিচ।"

"সবাই গেছে, তাই না ?"

"হ্যাঁ, সকলেই গেছে ; আমি নিজে তাদের কাজ ভাগ করে দিয়েছি।"

"দেখো, তুমি হয় তো তোমার কাজ করেছ, কিন্তু তারা সত্যি সত্যি মাঠে লাঙল দিচ্ছে কি ? সেটাই প্রশ্ন। গিয়ে দেখে এস, আর তাদের বলে এস যে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি নিজে সেখানে যাব। তাদের আরও বলে দাও, প্রতি একজোড়া লাঙল দিয়ে এক 'দেসিয়াতিন' জমি চাষ করতে হবে, আর লাঙল চালানো যেন ভাল হয়। যদি দেখি কাজ ঠিকমত হয় নি, তা হলে কিন্তু যা করবার তাই করব—উৎসবই হোক আর যাই হোক।"

"ঠিক আছে মাইকেল সেমেনোভিচ", এই কথা বলে "স্তারোস্তা" বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই মাইকেল তাকে আবার ডাকল। তাকে আরও কিছু বলবার জন্যই সে ডাকল, কিন্তু কি ভাবে যে কথাটা বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণ গাঁই-গুঁই করে শেষ পর্যন্ত বলল :

"আমি চাই, ওই রাস্কেলরা আমার সম্পর্কে যা বলছে সেটা তুমি মন দিয়ে শুনবে। যদি শোন কেউ আমাকে গালাগালি করছে, তাহলে তার সব কথা আমাকে জানাবে। ওই গুণ্ডাদের আমি ভাল করে চিনি। তারা কাজ করতে চায় না—শুধু চায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে তার গোড়ালি নাচাতে। ঢক্ ঢক্ করে মদ গেলা আর ছুটি কাটানো—এই তো তারা ভালবাসে ; আর আমি যদি ঢিল দেই তাহলে জমিতে চাষ হল কি না, বা যার যার ভাগের কাজ শেষ হল কিনা—তা নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। কাজেই তুমি সোজা সেখানে চলে যাও, তাদের কথাবার্তা মন দিয়ে শোন, কারা কি বলছে খেয়াল রাখ, আর এখানে এসে আমাকে সব জানাও। চলে যাও, কড়া নজর রাখ, পুরোপুরি সব কথা জানাও, কিছুই চেপে রেখো না—তোমার উপর এই আমার হুকুম।"

"স্তারোস্তা" ঘাড় ফিরিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘোড়ার পিঠে চেপে জোর কদমে ছুটল মাঠে চাষীদের কাছে।

এদিকে "ওভারসীয়ারের" স্ত্রী সব কথাই শুনে ফেলল। চাষীদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার জন্য সে তার কাছে এল। স্ত্রীটি শান্ত প্রকৃতির মেয়েমানুষ ; তার মনটাও ভাল। সুযোগ পেলেই সে তার স্বামীর মনটাকে নরম করতে চেষ্টা করত এবং চাষীদের পক্ষ সমর্থন করত।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই স্বামীর কাছে এসে সে কথাটা পাড়ল।

"প্রিয়তম মাইকেল, প্রভুর বড় উৎসবের প্রতি এই মহাপাপ তুমি করো না। খৃস্টের দোহাই, চাষীদের যেতে দাও।"

কিন্তু মাইকেল তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে হেসে উঠল।

বলল, "অনেক দিন বুঝি তোমার পিঠে চাবুক পড়ে নি ? তাই যেটা

তোমার ব্যাপার নয় তাতে নাক গলাবার সাহস তোমার হয়েছে।"

"কিন্তু মাইকেল প্রিয়তম, তোমাকে নিয়ে এমন খারাপ একটা স্বপ্ন আমি দেখেছি। আমার কথা শোন, চাষীদের ছেড়ে দাও।"

সে জবাব দিল, "তোমাকে শুধু একটা কথাই বলতে চাই। তুমি তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তোমার পিঠে আবার চাবুক পড়া দরকার। এই নাও!" রাগে দিশেহারা হয়ে নিজের জ্বলন্ত পাইপের বাটিটা তার স্ত্রীর ঠোঁটের উপর চেপে ধরল; তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিতে হুকুম করল।

জেলি, মটরশুঁটি, শুয়োরের মাংস দেওয়া "শ্চি" (বাঁধাকপির ঝোল), ঝলসানো শুকর-ছানা, আর সেমাইয়ের পুডিং—সব কিছু গিলে চেরি-মদ দিয়ে সেগুলোকে গলা দিয়ে নামাল। আহারাদি শেষ করে রাঁধুনিকে ডেকে পাঠাল, তাকে পিয়ানো বাজাতে বসিয়ে দিল, আর নিজে গীটার হাতে নিয়ে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে লাগল।

এইভাবে মৌজ করে বসে সে যখন হিক্কা তুলছিল, গীটারের কান মোচড়াচ্ছিল; আর রাঁধুনিটির সঙ্গে হাসাহাসি করছিল, তখন "স্তারোস্তা" ফিরে এসে মনিবকে অভিবাদন করে মাঠে যা দেখে এসেছে তার বিবরণ দিতে লাগল।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "তারা কি যার যার নির্দিষ্ট জমিতে লাঙল দিচ্ছে?"

"স্তারোস্তা" জবাব দিল, "হ্যাঁ, অর্ধেকের বেশী কাজ এর মধ্যেই শেষ করে ফেলেছে।"

"কোন কাজ ফেলে রেখে নি তো?"

"না, আমি তো সে রকম কিছু দেখি নি। তারা ভালই লাঙল চালাচ্ছে, কারণ অন্য কিছু করতে তারা ভয় পায়।"

"আর জমি বেশ ভাল তৈরি হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ, খুব নরম হয়েছে; পোস্তদানার মত উড়ছে।"

ওভারসীয়ার একমুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপরেই বলে উঠল, "আচ্ছা, আমার সম্পর্কে তারা কি বলছে? গালাগালি করছে কি?"

"স্তারোস্তা" ইতস্তত করতে লাগল; কিন্তু ওভারসীয়ার সত্য কথা বলতে হুকুম দিল।

বলল, "সব কথা আমাকে বল। তুমি তো তোমার কথা বলছ না, বলবে তাদের কথা। সত্য কথা বল, তোমাকে পুরস্কার দেব। কিন্তু ওই লোকগুলোকে যদি আড়াল কর, তাহলে কিন্তু ক্ষমা করব না—কসে চাবুক মারব। হেই কাতিয়ুশকা! মনের জোর আনতে ওকে এক গ্লাস ভদ্‌কা

দাও।"

রাঁধুনি এক প্লাস-ভর্তি ভদকা এনে "স্তারোস্তা"কে দিল। তখন সে মনিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভদকাটা খেল এবং মুখটা মুছে সব কথা বলতে শুরু করল।

মনে মনে ভাবল, "যাই হোক, লোকটার যে প্রশংসা করবার মত কোন গুণ নেই সেটা তো আমার দোষ নয়; কাজেই তিনি যখন হুকুম করছেন, আমি সত্য কথাই বলব।'

সুতরাং "স্তারোস্তা" মনে সাহস এনে বলতে লাগল;

"তারা গোলমাল করছে মাইকেল সেমেনোভিচ। তারা ভীষণ গোলমাল করছে।"

"কিন্তু ঠিক ঠিক কি বলছে তাই বল।"

"একটা কথা তারা সকলেই বলছে—সেটা হল, ঈশ্বরে আপনার বিশ্বাস নেই।

ওভারসীয়ার হো-হো করে হেসে উঠল।

"তাদের মধ্যে কে কে এ কথা বলছে?"

"সকলেই। বস্তুত, তারা বলছে যে আপনি শয়তানের সেবা করেন।"

ওভারসীয়ার আরও জোরে হেসে উঠল।

বলল, "চমৎকার কথা। এবার বল, আলাদা আলাদা ভাবে তারা আমার সম্পর্কে কি বলে? যেমন ধর, আমাদের বন্ধু ভাসিলি কি বলে?"

এতক্ষন পর্যন্ত নিজের বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে "স্তারোস্তা" অনিচ্ছুক ছিল; কিন্তু তার ও ভাসিলির মধ্যে একটা অনেক দিনের ঝগড়া আছে।

সে জবাব দিল, "ভাসিলি আপনাকে শাপান্ত করে সকলের চাইতে বেশী।"

"সে কি বলে সেটা বল।"

"সে কথা উচ্চারণ করতে আমার সংকোচ হয়, কিন্তু তার মনের আশা, একদিন যেন আপনার একটা শোচনীয় পরিণতি ঘটে।"

ওভারসীয়ার চেঁচিয়ে উঠল, "তাই নাকি, সেই ছোকরাটা তাই বলে নাকি? দেখ, সে আমাকে কোন দিন খুন করতে পারবে না, কারণ আমার গায়ে হাত তুলবার সুযোগ সে কোন দিনই পাবে না। ঠিক আছে বন্ধু ভাসিলি, তোমার সংগে আমার বোঝাপড়া হবে। আর সেই খেকি কুত্তা তিশ্কা কি বলে?"

"দেখুন, কেউ আপনাকে ভাল বলে না। তারা সকলেই আপনাকে শাপান্ত করে, শাসায়।"

"আর পিটার মিস্‌চিফ? সে কি বলে? আমি জোর গলায় বলতে পারি, যারা আমাকে শাপ-শাপান্ত করে ঐ বুড়ো বদমাশটাও তাদেরই একজন।"

"না, তা কিন্তু নয় মাইকেল সেমেনোভিচ।"

"তাহলে সে কি বলে?"

"তাদের মধ্যে সেই একমাত্র লোক যে কোন কথাই বলে নি। একজন চাষীর তুলনায় সে অনেক কিছু জানে। আজ তো তাকে দেখে আমি অবাক।"

"কি রকম?"

'তার কাজকর্ম দেখে। অন্য সকলেও অবাক।"

"সে কি করেছে?"

"খুবই আশ্চর্য কাজ। তুর্কিন পাহাড়ের পাশে যে ঘাসের জমি আছে সেখানেই সে লাঙল দিচ্ছিল। ঘোড়া হাঁকিয়ে তার কাছে যেতেই মনে হল কে যেন সুন্দর নীচু গলায় গান করছে; আর তার হল-দণ্ডের মাঝখানে কি যেন জ্বলছে।"

"বটে?"

"জিনিসটা জ্বলছে একটা ছোট আগুনের শিখার মত। কাছে গিয়ে দেখলাম পাঁচ-কোপেক দামের একটা মোমবাতি হল-দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা। তখন বাতাস থাকলেও মোমবাতিটা নেভে নি।"

"আর সে বলছিল কি?"

"কিছুই বলে নি; শুধু আমাকে দেখেই ইস্টারের শুভকামনা জানাল, আর তারপরেই আবার গাইতে শুরু করল। একটা নতুন শার্ট পরে ইস্টার-স্তোত্র গাইতে গাইতে সে লাঙল চালাচ্ছে। একটা শিরালার শেষ প্রান্তে পেঁছে সে লাঙলটাকে ঘুরিয়ে দিল, সেটাকে নাড়া দিল, তবু মোমবাতিটা নিভল না। সত্যি, লাঙলের ফলা থেকে সে যখন ঠুকে ঠুকে মাটির ঢেলা সরাচ্ছিল আর হাতলটাকে তুলে ঘোরাচ্ছিল তখন আমি তার খুব কাছেই ছিলাম। তবু যতক্ষণ সে লাঙলটা চালাল, মোমবাতিটা আগের মতই জ্বলতে লাগল।"

"তুমি তাকে কি বললে?"

"আমি কিছুই বলি নি, কিন্তু অন্য সব চাষীরা সেখানে এসে তাকে দেখে হাসাহাসি শুরু করল। বলল, "চালিয়ে যাও বাবা। 'পবিত্র সপ্তাহে' লাঙল চালাবার প্রায়শ্চিত করতে মিস্‌চিফ-এর দেখছি এক শতাব্দী লেগে যাবে।"

"তা শুনে সে কি বলল?"

"শুধু বলল, 'পৃথিবীতে থাক শুধু শান্তি ও মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা।' তারপরই ঝুঁকে পড়ে লাঙলটা ধরে ঘোড়া চালিয়ে দিল, আর নীচু গলায় গান গাইতে লাগল। মোমবাতিটা কিন্তু সারাক্ষণই জ্বলতে লাগল, একবারও নিভল না।

ওভারসীয়ারের হাসি থেমে গেল। গীটারটা রেখে দিয়ে বুকের উপর মাথাটা নুইয়ে সে চিন্তায় ডুবে গেল।

রাঁধুনি ও "স্তারোস্তা"-কে বিদায় করে দিয়ে সে বসেই রইল। তারপর পর্দাটা সরিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বোঝাই খড়ের ভারে গাড়ি যে রকম আর্তনাদ করে বিছানায় শুয়ে সেও সেই রকম দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে আর্তনাদ করতে লাগল। স্ত্রী তার কাছে গিয়ে আবার বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু দীর্ঘ সময় সে তার কথার কোন জবাবই দিল না।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এক সময় বলল, "ঐ লোকটি আমার উপরে টেক্কা দিয়েছে। এখন আমি সব বুঝতে পারছি।"

স্ত্রী তখনও তাকে বোঝাতে লাগল।

মিনতি করে বলল, "এখনই চলে যাও। চাষীদের সবাইকে ছেড়ে দাও। এটা তো কিছুই না। ভাব তো তুমি কী কাজ করেছ; তবু তো ভয় পাও নি। তাহলে এখন এ কাজ করতে ভয় পাবে কেন?"

জবাবে সে শুধু বলল, "এই লোকটি আমাকে জয় করেছে। আমি শেষ হয়ে গিয়েছি; যদি আস্ত থাকতে চাও তো এখান থেকে চলে যাও। এ সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না।"

সে সেখানেই পড়ে রইল।

কিন্তু সকালে উঠে সে যথারীতি কাজে লেগে গেল। তবু সে যেন আগেকার সেই মাইকেল সেমেনোভিচ্ নয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তার মনে একটা আঘাত লেগেছে। তাকে যেন বিষণ্ণতায় পেয়ে বসেছে। কোন কাজেই মন নেই। চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে। তার দাপট আর বেশী দিন চলল না। সেণ্ট পিটার ভোজ উৎসবের সময় মালিক নিজে এল জমিদারি পরিদর্শনে। প্রথম দিনই ওভারসীয়ারকে ডেকে পাঠাল, কিন্তু সে তখন অসুস্থ। পরদিন আবার ডেকে পাঠাল, তখনও সে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। তখন জমিদার জানতে পারল যে মাইকেল ভীষণ মদ খাচ্ছে। কাজেই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। প্রাক্তন ওভারসীয়ার তখনও বাড়ির মধ্যেই দিন কাটাতে লাগল। কোন কাজ করে না। দিন দিন আরও বিমর্ষ হতে লাগল। যা কিছু ছিল সব মদে উড়িয়ে দিল; এমন কি স্ত্রীর শালটা পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে সরাইখানায় সেটা বিক্রি করে দিয়ে মদ খেল।

এমন কি চাষীরা পর্যন্ত করুণাবশে তাকে মদ এনে দিত। আর একটি বছরও সে বেঁচে রইল না ; ভদ্‌কা খেয়েই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হল।

১৮৮৬

গজকাঠি

Yardstick

(একটি ঘোড়াকে নিয়ে গল্প)

॥ ১ ॥

ক্রমেই বেশী করে আলো ফুটতে লাগল, সূর্য আরও উপরে উঠে এল; অস্বচ্ছ রুপোলি শিশিরকণাগুলো ক্রমেই সাদা হয়ে চকচক করতে লাগল, চাঁদের কাস্তেটা হয়ে এল অস্পষ্টতর, অরণ্য—গুঞ্জনমুখর, মানুষ চলাফেরা শুরু করল, আর জমিদার-বাড়ির আস্তাবলে নাকের ঘর-ঘর ও খড়ের খচ্‌মচ্‌ শব্দ ক্রমেই বাড়তে লাগল ; এমন কি কোন কিছু নিয়ে রেগে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ঘোড়াগুলো কর্কশ হ্রেষাধ্বনি করতে লাগল।

সশব্দে গেটটা খুলে আস্তাবলের বুড়ো সইসটি বলে উঠল, "হেই, ওদিকে! যথেষ্ট সময় আছে! তোমাদের কিছু না খাইয়ে রাখা হয় নি!" একটা ঘোটকি গেটের দিকে ছুটে যেতেই লোকটি হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল "ফিরে আয়!"

লোকটির নাম নেস্টার। চামড়ার বেল্ট-আঁটা একটা কসাক-কুর্তা তার গায়। সেই বেল্টে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ঝুলছে ; চাবুকটা রেখেছে কাঁধের উপর ; দাড়িটাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে বেল্টের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে। হাতে একটা জিন ও লাগাম।

নেস্টারের বকুনিতে ঘোড়াগুলো ভয়ও পেল না, রাগও করল না ; তার কথায় কান না দিয়ে আপন মনেই তারা ফটক থেকে সরে এল—শুধু লাল্‌চে বাদামী রঙের একটা ঘোটকি কান দুটো পিছনের দিকে ভাঁজ করে দ্রুতগতিতে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। তা দেখে একটা বাচ্চা ঘোটকিও হ্রেষাধ্বনি করে পিছনের দুই পায়ে পাশের একটা ঘোড়াকে দিল লাথি কসিয়ে।

আস্তাবলের এক কোণে সরে গিয়ে সইস রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "হেই-রে!"

আস্তাবলে যতগুলো ঘোড়া ছিল (প্রায় শ'খানেক) তার মধ্যে গায়ে

ফুট্‌ফুট্ দাগ একটা দামড়া ঘোড়া চালার নীচে একলা দাঁড়িয়ে চোখ দুটো অর্ধেক বুজে চারদিকে চাইতে চাইতে চালার ওক কাঠের খুঁটিটাকে চাটছিল। খুঁটিটায় কি যে স্বাদ ছিল বলা কঠিন, কিন্তু দামড়া ঘোড়াটা গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখে সেটা চেটেই চলেছে।

ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে নেস্টার জিন ও জিনের চকচকে চাদরটা একগাদা সারের উপরে রেখে দিয়ে সেই একই গলায় বলল, "আবার দুষ্টুমি হচ্ছে?"

খুঁটি চাটা বন্ধ করে দামড়া ঘোড়াটা একটুও না নড়ে নেস্টারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘোড়াটা হাসল না, ভ্রূকুটি করল না, রাগল না, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার পেটটা কেঁপে উঠল; একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে সরে গেল। হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে নেস্টার তাতে লাগাম পরিয়ে দিল।

নেস্টার শুধাল, "আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল কেন?"

দামড়াটা শুধু লেজ নাড়ল, যেন বলতে চাইল, "ও কিছু নয় নেস্টার।" নেস্টার জিন ও জিনের চাদরটা পেতে দিল, কান দুটো পিছনে ভাঁজ করে দামড়াটা আপত্তি জানাল, আর তার জন্য বোকা বলে বকুনি খেল। জিনের পেটিটা কোমরে কসে বাঁধা হলে সেটা থামাবার জন্য দামড়াটা হাঁক দিয়ে উঠল, আর সংগে সংগে মুখে একটা ঘুঁসি ও পেটে একটা হাঁটুর গুঁতো খেতেই তার আক্কেল গুড়ুম। তথাপি নেস্টার যখন দাঁত দিয়ে পেটিটা কসতে লাগল তখন দামড়াটা আবারও সাহস করে কান দুটো পিছন দিকে ফেরাল, এমন কি মুখটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল পর্যন্ত। সে জানে এতে কোন লাভ হবে না, তবু তার আপত্তিটা সে নেস্টারকে জানাতে চায়; আপত্তিটা চেপে যাবার কোন বাসনা তার নেই। জিন আঁটা হয়ে গেলে সে ফোলা ডান পাটা সোজা করে লোহার খলীনটা চিবুতে শুরু করল; অবশ্য খলীনটার যে কোনই স্বাদ নেই সে কথাটা এতদিনে তার জানা উচিত।

ছোট রেকাবে পা রেখে নেস্টার ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার হল। চাবুকটা খুলল; হাটুর নীচ দিয়ে কোটটা খুলে ফেলল; তারপর কোচয়ান, শেয়াল-শিকারী ও সইসদের বিশেষ ভংগীতে জিনের উপর বসে লাগামে টান দিল। যেখানে বলবে সেখানেই যাব—এমনই ভাব দেখিয়ে দামড়াটা মাথা উঁচু করল, কিন্তু নড়ল না। সে জানে যাত্রা শুরু করবার আগে তার সওয়ারী ভাস্‌কাকে, অন্য সইসদের ও ঘোড়াগুলিকেও নানা রকম হুকুম করবে। সত্যি তাই; নেস্টার চেঁচাতে শুরু করল।

বলতে লাগল, "ভাস্‌কা! হাই ভাস্‌কা! ঘোটকিগুলোকে বের করে দিয়েছিস তো? কোথায় গেলি রাস্কেল? এখনও ঘুমিয়ে আছিস?

গেটটা খোল্‌। আগে ঘোটকিগুলো বের করে দে।" এমনি সব কথা।

গেটটা কেঁচড়-কেঁচড় শব্দ করে খুলে গেল। বিরক্ত ভাস্‌কা ঘুম-ঘুম চোখে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে খুঁটিটার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে অন্য ঘোড়াগুলোকে বের করে দিল। খড়গুলো শুঁকতে শুঁকতে তার উপর সাবধানে পা ফেলে ঘোড়াগুলো একটার পর একটা গেট পার হয়ে গেল : ছোট-বড় নানা রকম বাচ্চা ঘোড়া আর গর্ভবতী ঘোটকিগুলো মস্ত বড় পেট নিয়ে ধীরে ধীরে সার ধরে চলল। একটু বড় বাচ্চাগুলো দুটো তিনটে করে দল বেঁধে একটার পিঠে আর একটা মাথা তুলে দিয়ে, তাড়াতাড়িতে কারও বা পা মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল, আর তার জন্য সইস তাদের বাপান্ত করে ছাড়ল। একেবারে দুধের বাচ্চাগুলো কখনও একেবারে অপরিচিত কোন ঘোটকির পায়ের ভিতর দিয়ে গলে গিয়ে মায়েদের হ্রেষা শুনে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল।

একটা ছোট ঘোটকি আহ্লাদে লাফাতে লাফাতে গেটটা পার হয়েই মাথাটা উপরে-নীচে দোলাতে দোলাতে পিছনের পা দুটি ছুঁড়ে আস্তে ডেকে উঠল, কিন্তু ফুট্‌ফুট্‌ দাগওয়ালা বুড়ো ঘোটকি ঝুল্‌দিবা-র কাছ থেকে দূরে ছুটে যেতে সাহস পেল না ; ঝুল্‌দিবা সব সময়ই বড় পেটটা এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে দোলাতে গভীরভাবে পা ফেলে ফেলে ধীর গতিতে অন্য সব ঘোড়ার আগে আগে চলে।

কয়েক মিনিট পরেই জমজমাট আস্তাবলটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু চালার খুঁটিগুলো একটা বিষণ্ণ, নির্জন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; আর রইল গোবর-মাখা ভাঙা-চোরা খড় ইতস্তত ছড়ানো। দামড়া ঘোড়াটা এসব দেখে অভ্যস্ত, তবু যেন তারও মন খারাপ হয়ে গেল। যেন কাউকে ইশারা করছে এইভাবে ধীরে ধীরে মাথাটা উপরে-নীচে দোলাতে দোলাতে সে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল, আর তারপরেই হাড়-জিরজিরে পিঠের উপর বুড়ো নেস্টারকে নিয়ে তার শক্ত, বাঁকা ঠ্যাংগুলো টানতে টানতে দলের পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, "বড় রাস্তায় পড়লে সে নিশ্চয় পিতলের পটি ও চেন লাগানো পুরনো পাইপটাতে আগুন দিয়ে টানতে শুরু করবে। আমার খুব খুশি লাগছে, কারণ ভোরবেলা শিশিরবিন্দুগুলো যতক্ষণ ঘাসের উপর থাকে ততক্ষণ তার পাইপের গন্ধ শুঁকতে বড় আরাম ; ঐ গন্ধটা আমাকে অনেক সুখের কথা মনে করিয়ে দেয়। আরাম শুধু একটাই আপত্তি ; বুড়ো মানুষটা যেই দাঁত দিয়ে পাইপটা চেপে ধরে অমনি তার মেজাজ বদলে যায়, নিজেকে একজন কেউকেটা কল্পনা করে সে এক পাশে চেপে বসে—আর সব সময়ই আমার ব্যথার পাশটাতেই চাপ দেয়। কিন্তু সে কথা থাক। পরের সুখের জন্য নিজেকে এই তো প্রথম বলি দিচ্ছি না।

ঘোড়া হলেও সে কথাটা ভাবতেও আমার আনন্দ হয়। বেচারি! না হয় একটু মেজাজ দেখালই। তবে এ ভাবটা সে তখনই দেখায় যখন সে একা থাকে, যখন আর কেউ তাকে দেখতে পায় না। তার যদি ভাল লাগে, না হয় একপাশেই বসুক।" নড়বড়ে পায়ে সাবধানে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে দামড়া ঘোড়াটা এই সব ভাবতে লাগল।

॥ ২ ॥

ঘাসখাওয়াবার জন্য ঘোড়ার পালকে নদীতীরে নিয়ে যাবার পরে নেস্টার দামড়াটার পিঠ থেকে নেমে জিনটা খুলে ফেলল। সেখানকার শিশির-ভেজা প্রান্তর চারদিক ঘোরানো নদী ও মাটির বুক থেকে উঠে-আসা কুয়াসায় ঢাকা। ঘোড়াগুলো ধীরে ধীরে সেই ভেজা প্রান্তরের দিকে এগিয়ে গেল।

লাগামটা খুলে নিয়ে নেস্টার দামড়াটার থুতনির নীচটা চুলকে দিতে লাগল; ঘোড়াটাও চোখ বুজে তার আরাম ও কৃতজ্ঞতা জানাল। নেস্টার বিড় বিড় করে বলল, "বোকা বুড়োর ভারি আরাম।" কিন্তু দামড়াটা এ কাজকে মোটেই পছন্দ করে না; ভদ্রতার খাতিরেই সে ভাল লাগার ভান করে আর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে! কিন্তু হঠাৎ কোন রকম সতর্ক না করে বা যুক্তি না দেখিয়েই (অবশ্য নেস্টার যদি মনে করে থাকে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার ফলে দামড়াটার চোখে তার গুরুত্ব কমে যেতে পারে সেটা আলাদা কথা) বুড়ো লোকটি ঘোড়ার মাথাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কোমরের পেটি দিয়ে ঘোড়াটার শুটকো পায়ে ভীষণ ভাবে আঘাত করতে লাগল; আর তারপর কোন কথা না বলে ঢিবির উপরকার একটা কাঠের দিকে এগিয়ে গেল; সেখানেই সে সাধারণত বসে।

এই আচরণে দামড়াটা বিরক্ত হলেও হাবভাবে তা প্রকাশ করল না। সে শুধু মুখটা ঘুরিয়ে দড়ির মত লেজটাকে ধীরে ধীরে দোলাতে দোলাতে, বাতাস শুঁকে, লোক-দেখানোর ভংগীতে ঘাস-পাতা চিবুতে চিবুতে নদীর দিকে নেমে গেল। বাচ্চা ঘোড়াগুলো সেই সুন্দর সকাল বেলায় মনের আনন্দে তাকে ঘিরে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতে লাগল, কিন্তু সে তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। সে জানে, খালি পেটে বেশ খানিকটা জল খেয়ে তারপর প্রাতরাশ খাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, বিশেষত তার মত বয়সে। তাই নদীতীরের সব চাইতে ঢালু ও চওড়া জায়গাটা বেছে নিয়ে ক্ষুর ও পায়ের লোম জলে ভিজিয়ে নাকটা জলে ডুবিয়ে দিয়ে কর্কশ ঠোঁটে জল খেতে লাগল; তখন তার পেটটা ফুলতে লাগল, আর সরু লেজটা দুলতে

লাগল।

ঘোড়ার পালে একটা ঘোটকি ছিল যেটা সব সময়ই বুড়ো দামড়াটাকে তিতিবিরক্ত করত ; যেন কোন দরকার আছে এমনি ভাব দেখিয়ে সেই ঘোটকিটা জল ভেঙে তার দিকে এগিয়ে এল ; কিন্তু সেটার আসল উদ্দেশ্য সেখানকার জলটাকে ঘোলা করে দেওয়া। কিন্তু ততক্ষণে দামড়াটার জল খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, যেন ঘোটকিটার বদ উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারে নি এমনি শান্তভাবে কাদার ভিতর থেকে একটার পর একটা পা তুলে মাথা নাড়তে নাড়তে বাচ্চাগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে প্রাতরাশ শুরু করল। তিনটি ঘণ্টা ধরে সে খেয়েই চলল ; মাথাটা পর্যন্ত তুলল না ; এমন অদ্ভুত ভাবে পাগুলোকে ছড়িয়ে দিল যাতে বেশী ঘাস চাপা না পড়ে। পেট পুরে খাবার ফলে ভর্তি বস্তার মত তার পেটটা পাঁজরের হাড় ঠেলে ঝুলে পড়ল ; সেই অবস্থায় চারটি ব্যথাওলা পায়ে বিশেষ করে সব চাইতে ঠুনকো ডানদিকের সামনের পা-টায় কোনক্রমে শরীরের ভর রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বার্ধক্য কখনও মহান, কখনও বিরক্তিকর, কখনও শোচনীয়। কখনও আবার একই সঙ্গে মহান ও বিরক্তিকর। এই ফুট্‌কি-ফুট্‌কি দামড়াটার বার্ধক্য সেই জাতের।

দামড়াটা বেশ বড় সড়—অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু। গায়ের রং প্রায় কালো—মাঝে মাঝে সাদা ফুট্‌কি। মানে, এককালে তাই ছিল, এখন ফুটকিগুলো আবছা বাদামী হয়ে গেছে। তার গায়ে সর্বসমেত তিনটে সাদা দাগ আছে ; একটা নাকের একপাশ থেকে বেঁকে মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে। চোরকাঁটা-জড়ানো ঘাড়ের লম্বা লোম কোথাও সাদা, কোথাও বাদামী। দ্বিতীয়টা ডান পাশ দিয়ে গিয়ে অর্ধেকটা পেটকে ঢেকে দিয়েছে। তৃতীয়টা পাছার উপর থেকে শুরু হয়ে লেজের উপরের দিক ও পাশের অর্ধেকটা পর্যন্ত ছড়ানো। লেজের বাকিটায় সাদা ফুটকি। মস্ত বড় মাথাটা হাড় বের-করা ; চোখের চারদিকে গভীর গর্ত ; আর কালো, কাটা-কাটা ভারী নীচের ঠোঁটটা যেন কাঠ-খোদাই ঘাড় থেকে অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। ঝুলে-পড়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মুখের ভিতরকার কালচে জিভটা ও কয়েকটা হলুদ দাঁতের গোড়া চোখে পড়ে। কাটা দাগওয়ালা একটা কানসহ দুটো কানই সারাক্ষণ ঘাড়ের উপর পাতা থাকে ; তবে মাঝে মাঝে মাছি তাড়াতে সেটাকে নাড়াতে হয়। কানের পিছনকার কিছুটা লোম এখনও ঝুলে আছে ; কপালটা বসে গেছে, তাতে অনেক বলি-রেখা ; আর গলকম্বল ঝুলে পড়েছে খালি বস্তার মত। একটা মাছি বসলেই মাথা ও ঘাড়ের গিঁট-গিঁট শিরাগুলো থর্‌থর্‌ করে কেঁপে ওঠে। মুখের ভাবে

কাঠোর সংযম, গাম্ভীর্য ও দীর্ঘ যন্ত্রণার প্রকাশ। সামনের পা দুটো হাঁটুর কাছে বাঁকা, দুটো ক্ষুরই ফুলে উঠেছে; ফুট-ফুট দাগওয়ালা সামনের ডান পাটার হাঁটুর কাছে হাতের মুঠোর মত বড় আকারের একটা মাংস-পিণ্ড ঠেলে বেরিয়েছে। পিছনের পা দুটো অনেকটা ভাল হলেও দুটো পাশের লোমগুলো কবে যে ঘসায়-ঘসায় উঠে গেছে, আর গজায় নি। চামড়া-সার শরীরের তুলনায় পাগুলোকে অনেক বেশী লম্বা দেখায়। পাঁজরগুলো গোল-গোল হলেও এমন ঠেলে বেরিয়েছে যে দেখলে মনে হয়, চামড়াটা পরে তার উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পিঠ ও পিঠের উঁচু জায়গাটায় অনেক চাবুকের দাগ; পাছার উপরে তো এখনও রয়েছে একটা দগ্‌দগে তাজা ফোলা ঘা। তবু বার্ধক্যের এতসব চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও সকলেরই মনে হবে, আর যে কোন বিশেষজ্ঞ তো বলতে বাধ্য, যে এককালে সেটা খুব ভাল ঘোড়াই ছিল।

বস্তুত, একজন বিশেষজ্ঞ অবশ্যই বলবে যে রাশিয়াতে মাত্র একটি জাতই আছে যে বংশে এ রকম চওড়া হাড়, এত বড় মালাই-চাকি, এত সুন্দর ক্ষুর, এমন পাতলা পা, এমন মনোরম ঘাড়, আর বিশেষ করে এত সুন্দর মাথা হয়ে থাকে; বড় বড় কালো জ্বলজ্বলে চোখ, মুখের ও ঘাড়ের শিরাগুলির আভিজাত্যব্যঞ্জক বাঁধুনি, চামড়া ও লোমের সুন্দর রং। বার্ধক্যের নানা বিরক্তির উপসর্গ সত্ত্বেও ঘোড়াটাকে ঘিরে যে বংশ-মাহাত্ম্য ও গভীর আত্ম-প্রত্যয় ফুটে উঠেছে তা একমাত্র যে সব জীব নিজেদের শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন তাদের মধ্যেই দেখা যায়।

একটা জীবন্ত ধ্বংস-স্তূপের মত ঘোড়াটা একাকি সেই শিশির-ভেজা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রইল, আর অনতিদূরেই ইতস্তত ছড়িয়ে পড়া বাচ্চা ও যুবক ঘোড়াগুলি নেচে-কুঁদে, হ্রেষা রবে চারদিক মুখরিত করে বেড়াতে লাগল।

॥ ৩ ॥

ক্রমে সূর্য গাছপালার উপরে উঠে এল; মাঠে ও নদীর বাঁকে ঝকঝকে রোদ ছড়িয়ে পড়ল। শিশির শুকিয়ে ছোট ছোট ফোঁটা হয়ে চিক চিক করছে; জলাভূমি ও বনের উপরে বিলীয়মান কুয়াসা পাতলা ধোঁয়ার মত ঘুরছে। আকাশে মেঘ জমেছে, কিন্তু এখনও বাতাস উঠে আসে নি। নদীর ওপারে যবের গাছগুলি নলের মত সবুজ শিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কচি পাতা ও ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। বনের ভিতর থেকে একটা কোকিল কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। আর নেস্টার চিৎ হয়ে জীবনের আর কতদিন বাকি আছে

তাই গ্নগতে লাগল। যবের ক্ষেতে ও জলাভূমির উপরে চাতক পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। ঘাসের ভিতর শুয়ে ভাস্‌কা ঘুমিয়ে পড়ল।' ঢালু জমির উপর ঘোড়াগুলো তাকে ঘিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরী ঘোটকিদের দলে সব চাইতে সুন্দরী ও দুষ্টু হল ফুট্‌ ফুট্‌ দাগওয়ালা ঘোটকিটা; সে যা করে অন্য সুন্দরীরাও তাই করে। সে যেখানে যায় অন্য সবাই দল বেঁধে সেখানেই যায়। আজ সকালে তার মেজাজটা বুঝি বিশেষ রকম ভাল; মানুষের যেমন মাঝে মাঝে মেজাজ ভাল হয় এও ঠিক তাই। নদীতীরে বুড়ো দামড়াটার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে যেন কোন কিছু দেখে ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে সে জলের ধার বরাবর ছুটতে শুরু করে দিল। তার দেখাদেখি অন্য ঘোড়াগুলিও ছুটতে লাগল। ফলে ভাস্‌কা ও তাদের পিছনে জোড় কদমে ছুটতে লাগল। খানিকক্ষণ ঘাস খেয়ে সে মাটিতে গড়াগড়ি দিল, বুড়ো ঘোটকিগুলোর নাকের কাছ দিয়ে ছুটাছুটি করে তাদের বিরক্ত করল, এবং শেষটায় একটা বাচ্চাকে তার মায়ের কাছ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে যেন কামড়ে দেবে এমনি ভাবে তার পিছনে ছুটতে লাগল। মাটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, বাচ্চাটাও ভয়ে ডাকতে লাগল, কিন্তু ঘোটকি তাতে একটু ছুঁলো না পর্যন্ত; শুধু তার ঘোটকি বান্ধবীদের মজার জন্যই সে বাচ্চাটাকে ভয় দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা ফন্দি এল; নদী থেকে অনেকটা দূরে একটি মুঝিক (রুশ চাষী) যবের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে একটা চাষের ঘোড়াকে নিয়ে যাচ্ছিল। ঘোটকিটা হঠাৎ থেমে গেল, সগর্বে মাথাটা তুলল, তারপর একটানা মিষ্টি স্বরে ডেকে উঠল। সে ডাকে ছিল মনের আবেগ ও একটা বিশেষ দুঃখের আভাষ। ছিল বাসনা, ভালবাসার প্রতিশ্রুতি আর ভালবাসার জন্য আকুলতা।

নলবনের মধ্যে একটা পাখি লাফিয়ে লাফিয়ে কর্কশ গলায় সঙ্গিনীকে ডাকছে; একটি কোকিল ও একটা ভাড়ুই পাখিও প্রেমের গান গাইছে; এমন কি ফুলেরাও পরস্পরের জন্য ছড়িয়ে দিচ্ছে সুগন্ধী পরাগ।

ঘোটকিটিও ডাকতে ডাকতে ভাবল, "আমি সুন্দরী যুবতী, কিন্তু আজও পর্যন্ত ভালবাসার মিস্টি স্বাদ পেলাম না; শুধু তাই নয়, এত দিনেও একটি প্রেমিকও আমার দিকে ফিরে তাকাল না।"

তার যৌবনের এই বিষণ্ণ হ্রেষার নদীর ঢালু পার বেয়ে দূরের মাঠের উপর দিয়ে গিয়ে একটা ধূসর রঙের ঘোড়ার কানে পেঁছল। ঘোড়াটা কান খাড়া করে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মুঝিক বাকলের জুতো দিয়ে তাকে লাথি মারল, কিন্তু ঘোড়াটা সেই রুপালি কণ্ঠস্বরে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছে যে সেখানে দাঁড়িয়েই ডাকতে লাগল। চাষী রেগে লাগাম ধরে টান দিল, আর এত জোরে আবার তার পেটে লাথি মারল যে ঘোড়াটা মাঝখানে ডাক

থামিয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু একটা মধুর বিষণ্ণতা তাকে পেয়ে বসল; তার আবেগভরা হ্রেষারব আর মুঝিক-এর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ এত দূর থেকেও নদীর ওপারে ঘোড়ার পালের কাছে গিয়ে পেঁছল।

হায়, একটা ঘোটকির ডাকেই যদি ধূসর ঘোড়াটাকে এতদূর মুগ্ধ করে থাকে যে সে তার কর্তব্যই ভুলে গেল, না জানি তার সব সৌন্দর্য দেখলে সে কী করত; তখন ঘোটকিটির কান দুটো খাড়া হয়ে উঠেছে, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হচ্ছে, বাতাসে ঘন ঘন শ্বাস টানছে, তার সুন্দর যৌবনপুষ্ট দেহটা থর্ থর্ করে কাঁপছে।

কিন্তু তার এই ভাব বেশীক্ষণ রইল না। ঘোড়ার ডাক ক্রমে থেমে যেতেই আর একটিবার মাত্র ডেকে সে মাথাটা নামিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো দামড়াটাকে নিয়ে ফস্টিনস্টি শুরু করে দিল। বাচ্চাগুলো সব সময়ই তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে; মানুষের চাইতে তাদের হাতেই সে নাজেহাল হয় বেশী।

অথচ সে কখনও কারও ক্ষতি করে নি। এখনও সে মানুষের কাজে লাগে, কিন্তু বাচ্চাগুলো তাকে কষ্ট দেয় কেন? .

॥ ৪ ॥

সে বুড়ো, তারা যুবক; সে চর্মসার, তারা নধর; সে বিষণ্ণ, তারা খুসি। এক কথায়, সে অপরিচিত, দলছুট একটা আলাদা জীব, কাজেই তার প্রতি করুণা দেখাবারও দরকার নেই। ঘোড়ারা পরস্পরকে করুণা করে, অবশ্য তার ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু বুড়ো, চর্মসার ও কুৎসিত হবার জন্য তো দামড়াটাকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্তত দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু অন্য ঘোড়াদের বিচারে তারই দোষ, আর যে সব ঘোড়া যুবক, শক্তিমান ও সুখী, যাদের সামনে আছে ভবিষ্যৎ, তিলমাত্র উত্তেজনাতেই যাদের মাংসপেশীগুলো কেঁপে ওঠে আর লেজটা খাড়া হয়, তাদের কোন দোষ নেই। হয়তো দামড়াটাও তা বোঝে, তাই যখন মন-মেজাজ ভাল থাকে তখন সেও স্বীকার করে যে এত দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকাটাই দোষের, আর তার খেসারৎ তাকে দিতেই হবে। কিন্তু সে তো একটা ঘোড়ামাত্র, তাই এই সব বাচ্চা ঘোড়াগুলো যখন তাকে অকারণে কষ্ট দেয়, অথচ একদিন জীবনের শেষভাগে তাদের প্রত্যেককেই তো এই অবস্থায় পড়তে হবে, তখন সে দুঃখিত, আহত ও বিক্ষুব্ধ না হয়ে থাকতে পারে না। ঘোড়াগুলোর এই নিষ্ঠুরতার পিছনে একটা আভিজাত্যবোধও কাজ করত। তারা সকলেই বিখ্যাত স্নেতাংকা

বংশের সন্তান, কিন্তু দামড়াটার বংশ-পরিচয় কেউ জানে না। তিন বছর আগে ঘোড়ার হাট থেকে তাকে কিনে আনা হয়েছে আশি রুবল দিয়ে।

ঘোটকিটা অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে তাকে দিল একটা ধাক্কা। এর চাইতে ভাল ব্যবহার সেও আশা করে নি; তাই চোখ তুলে কান দুটো নামিয়ে নেওয়া ও দাঁতগুলো মেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছু সে করল না। ঘোটকিটা তার দিকে পিছন ফিরে লাথি মারার ভঙ্গী করল। সে চোখ মেলে দূরে সরে গেল। ঘুম কেটে যাওয়ায় সে ঘাস খেতে লাগল। ঘোটকি ও তার বান্ধবীরা আবার তার চার পাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। একটা দুবছরের বাচ্চা বোকা ঘোটকি সব সময়ই বড় ঘোটকিটার নকল করে। এবার সেও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সব নকলনবীশের মতই তাকে বাড়াবাড়িভাবে নকল করতে শুরু করল। সে সোজা গিয়ে নিজের পেট দিয়ে দামড়াকে মারল এক ধাক্কা। এবার কিন্তু সে দাঁত বের করে হুংকার দিয়ে উঠল; তারপর অপ্রত্যাশিত তৎপরতার সঙ্গে সেটাকে তাড়া করে পাছায় একটা কামড় বসিয়ে দিল। টাক-মাথা বাচ্চাটাও পিছনের পা তুলে মারল তাকে লাথি; তার হাড়-বের-করা পাঁজরে ভীষণ লাগল। বুড়ো ঘোড়াটা নাক ঝেড়ে সেটাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েও কি যেন ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেখান থেকে চলে গেল।

স্বভাবতই দলের সব বাচ্চা ঘোড়াগুলো স্থির করল, এই দুঃসাহসিক আক্রমণের জন্য তারা দামড়াটার উপর প্রতিশোধ নেবে; তারা অনবরত এমন ভাবে তাকে খোঁচাতে লাগল যে বেচারি সারাদিনে খাবার ফুরসুতটাও পেল না। সইসটা অনেকবার সেগুলোকে তাড়িয়ে দিল; ওগুলো কেন যে এ রকম করছে তা সে বুঝতে পারল না। দামড়াটাও এত রেগে গেছে যে বাড়ি ফিরবার সময় হতেই সে নিজে থেকেই নেস্টার-এর কাছে ফিরে এল এবং তার পিঠে জিন চাপিয়ে সইস যখন তার পিঠে চেপে বসল তখন সে অনেক বেশী সুখী ও নিরাপদ বোধ করল।

বুড়ো সইসকে বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে যেতে তার মনে কি ভাবনার উদয় হয়েছিল তা কে জানে? হয় তো সে যৌবনের নিষ্ঠুরতার কথাই ভাবছিল; অথবা হয় তো অন্য সব বুড়োদের মতই সগর্ব নীরব ঘৃণার সঙ্গে তাদের সব দোষ ক্ষমা করেছিল। মনে যাই থাকুক, আস্তাবলে পেঁছিনো পর্যন্ত সে কথা সে মনেই রেখে দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় জনা কয়েক প্রতিবেশী নেস্টার-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জমিদার-বাড়ির চাকরদের কুড়ে ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে দেখতে পেল তার বাড়ির খুঁটির সঙ্গে একটা ঘোড়া ও একখানা গাড়ি বাঁধা রয়েছে। কাজেই তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরবার তাগিদে ঘোড়ার পালকে

আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিয়েই সে দামড়াটাকে ছেড়ে দিল; ভাস্‌কাকে ডেকে বলল জিনটা খুলে দিতে। তারপর ফটকে তালা লাগিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

সেদিন রাতে আস্তাবলের মধ্যে একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটল। হয়তো যে চামড়ার রোগে ভোগা ঘোড়াটাকে হাট থেকে কিনে আনা হয়েছে, যার বাপ-মায়ের খবর কেউ জানে না, সে যে স্নেতাংকা-র প্রো-দোহিত্রী সেই টাক-মাথা বাচ্চাটাকে (এবং সেই সঙ্গে সমস্ত দলটার আভিজাত্যকে) আপমান করেছে সেটাই এই ঘটনার কারণ; অথবা হয়তো উঁচু জিন-পরা সওয়ারহীন দামড়াটার কিম্ভুত চেহারাই তার কারণ। ছোট-বড় সবগুলো ঘোড়া দাঁত বের করে তার দিকে তেড়ে গেল, ক্ষুর দিয়ে তার পেটের দুই পাশে লাথি মেরে এদিক-ওদিক ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল, সে তারস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে দামড়াটা আস্তাবলের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; অক্ষম বৃদ্ধ বয়সের অসহায়তা মেশানো একটা ক্ষীণ ক্রোধ তার মুখে ফুটে উঠল। কান দুটো নামিয়ে হঠাৎ সে এমন একটা কাণ্ড করে বসল যাতে সবগুলো ঘোড়া যার যার জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। সব চাইতে বুড়ি ঘোটকি ভিয়াজোপুরিখা দামড়াটাকে একটুখানি শুঁকে একটা দীর্ঘশ্বাস টানল। দামড়াটাও দীর্ঘশ্বাস টানল।

॥ ৫ ॥

চন্দ্রালোকিত আস্তাবলের মাঝখানে উঁচু জিন-আঁটা দীর্ঘ দেহ নিয়ে দামড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। এইমাত্র সে যা বলেছে তা শুনে বিস্মিত হয়ে অন্য ঘোড়াগুলিও নীরব, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি তারা অবাক হয়ে গেছে।

আসলে ঘটনাটি এই।

*　　*　　*

প্রথম রাত

"আমি 'মনোহর-প্রধান' ও 'বাবা'-র সন্তান। যদিও বংশ-বিচারে আমার নাম মুঝিক-প্রধান, তবু সকলেই আমাকে 'গজকাঠি' বলে ডাকে: আমি যে রকম লম্বা পা ফেলে চলতে পারি সারা রাশিয়াতে আর কেউ তা পারে না বলেই লোকে আমাকে ঐ নামটা দিয়েছিল। পৃথিবীতে আর কোন ঘোড়ার ধমনীতেই আমার মত সৎ রক্ত বয় না। এ-কথা কোনদিনই তোমাদের বলতাম না—কেনই বা বলব—ভিয়াজোপুরিখা-র মত তোমরাও আমাকে

চিনতে পারতে না; অথচ এই ভিয়াজোপুরিখা আমার যৌবনকালে খ্রেনো-ভোতে আমার সংগেই থাকত, আর এতক্ষণ চিনতে না পারলেও এইমাত্র আমাকে চিনেছে: ভিয়াজোপুরিখা সাক্ষী না দিলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাসও করতে না; তোমাদের কোন দিনই একথা বলতাম না—একদল ঘোড়ার করুণা লাভের কোন দরকার আমার নেই—কিন্তু তোমরা আমাকে এ-কথা বলতে বাধ্য করেছ। হ্যাঁ, আমি সেই 'গজকাঠি' যাকে ঘোড়ার মাংসের বিশেষজ্ঞরা সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না, যে 'গজকাঠি'কে স্বয়ং কাউন্টও চিনত এবং তার প্রিয় 'রাজহাঁস'-কে দৌড়ে হারিয়ে দেওয়ার জন্য আস্তাবল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।"

* * *

"জন্মের সময় আমি জানতাম না সাদা-কাল ফুট্‌কিযুক্ত বলতে কি বোঝায়। শুধু জানতাম আমি একটা ঘোড়া। মনে পড়ে, আমার গায়ের রং সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য শুনে আমার মা ও আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। রাতের বেলা আমার জন্ম হয়েছিল; মা আমার শরীরটা চেটে পরিষ্কার করবার পরে সকাল বেলায়ই আমি পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলাম। মনে পড়ে, কি যেন চাইছিলাম, আর সব কিছুই বিস্ময়কর অথচ খুব সরল মনে হচ্ছিল। একটা লম্বা গরম বারান্দায় ছিল আমাদের আস্তাবল; তার গরাদে-দেওয়া দরজা দিয়ে সব কিছু দেখতে পেতাম। মা আমাকে মাই খেতে দিত, কিন্তু তখন আমি এত অজ্ঞ ছিলাম যে আমার নাকটা দিয়ে কখনও তার পায়ে কখনও তার তলপেটে ঢু মারতাম। হঠাৎ মা গরাদের ফাঁক দিয়ে কি যেন দেখতে পেয়ে আমার উপর একটা পা তুলে দিয়ে আমাকে পিছনে সরিয়ে নিল। সেদিনকার সইসটা গরাদের ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

"আরে দেখ, 'বাবা' বাচ্চা বিইয়েছে", এই কথা বলে সে হুড়কোটা ঠেলে দিল। তাজা খড়ের উপর দিয়ে হেঁটে এসে সে আমার গায়ে হাত রাখল।

বলল, 'তারাস, দেখবে এস। এটার গায়ে ছাতারে পাখির মত ফুট্‌-ফুট দাগ।'

"তার কাছ থেকে ছুট দিতে গিয়ে আমি পা ভেঙে পড়ে গেলাম।

'হেই! ব্যাটা বিচ্ছু!' সে বলল।

"মার খুব খারাপ লাগল, কিন্তু আমাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করল না; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে গেল। অন্য সইসরাও এসে আমাকে দেখতে লাগল। একজন আস্তাবলের রক্ষককে খবর দিতে গেল। আমার গায়ের রং দেখে সকলেই হাসতে লাগল; আর নানা রকম মজার মজার নাম দিতে লাগল। মা বা আমি সে সব নামের অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তখনও পর্যন্ত আমাদের পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ফুট-ফুট দাগ-ওয়ালা কেউ ছিল না। ঘোড়ার গায়ের রংএর মধ্যে যে দোষের কিছু থাকতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবু আমার গায়ের জোর ও সুন্দর শরীরের প্রশংসা সকলেই করতে লাগল।

"সইস বলল, 'দেখ বাচ্চাটা কেমন চট্‌পটে! ধরে রাখাই যাচ্ছে না।'

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আস্তাবল-রক্ষক এল; সেও আবাক হল; এমন কি তাকে চিন্তিতই দেখাল।

"বলে উঠল, 'এই ক্ষুদে দানবটা এল কোত্থেকে? সেনাপতি তো এটাকে পালে রাখবে না।' মার দিকে ফিরে বলল, 'হতভাগা 'বাবা', এটা কি করলে! এই ফুট-ফুট দাগওয়ালা ভাঁড়ের চাইতে একটা টাক-মাথা বাচ্চাও তো দিতে পারতে!'

"মা কিছুই বলল না; শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; এ রকম অবস্থায় এ রকমই সে করত।

'শয়তানটা কার মত দেখতে হয়েছে? ঠিক যেন একটা মুঝিকের মত,' সে বলতে লাগল। 'এটাকে তো পালে রাখা যাবে না, আমাদের তাতে বদনাম হবে। কিন্তু ঘোড়াটা—খুব সুন্দর।' যে আমাকে দেখলে সেই এ কথা বলল।

"কয়েকদিন পরে স্বয়ং সেনাপতি এল আমাকে দেখতে। সেও ভয় পেয়ে আমার চামড়ার রং-এর জন্য আমাকে ও মাকে বকতে লাগল।

'যাই হোক, ঘোড়াটা চমৎকার—ভারি চমৎকার,' যে দেখল সেই এ-কথা বলল।

"বসন্তকাল পর্যন্ত আমরা আস্তাবলেই যার যার মত কাটালাম; কিন্তু সূর্যের উত্তাপে ছাদের উপরকার বরফ যখন গলতে শুরু করল তখন মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে তাজা ঘাসে ভর্তি বড় ঘেরা মাঠটায় যেতে পেতাম। সেখানেই প্রথম নিকট ও দূর আত্মীয়দের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। দেখতাম, তখনকার সব বিখ্যাত ঘোটকিরাই বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে বেড়িয়ে আসত। তাদের মধ্যে ছিল বুড়ো গোলাংকা; স্মেতাংকার মেয়ে মুশ্‌কো; ক্রাশ্‌নুখা; ও দোব্রোখোতিখা—সেদিনের সব সেরা ঘোড়া। সুন্দরীতে ভরা সেই খোঁয়াড়ের কথা আজও আমার মনে পড়ে। আজ তোমাদের বিশ্বাস করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু একদিন আমিও যুবক আর চটপটে ছিলাম। সেখানেই ভিয়াজোপুরিখার সঙ্গে আমার দেখা হয়; সে তো তখন বাচ্চা, কিন্তু খুব হাসিখুসি আর তেজী ছিল। কোন খারাপ মতলব ছাড়াই আমি বলছি; আজ তোমরা তাকে যতই উঁচু বংশের বলে মনে কর না কেন, সেদিন সে পালের মধ্যে তার স্থান ছিল বেশ নীচেই। এ

কথা সে নিজেও মানবে।

"আমার এই ফুট-ফুট দাগ মানুষের যতই খারাপ লাগুক, ঘোড়াদের খুব ভালই লাগত। তারা আমাকে ঘিরে থাকত, আমার প্রশংসা করত, আমার সঙ্গে খেলা করত। গায়ের রং-এর ব্যাপারে মানুষের কথা ভুলে গিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই প্রথম দুঃখের অভিজ্ঞতা আমার হল, আর সে দুঃখ দিল আমার মা।"

"যখন বরফ গলতে শুরু করল, ছাদের নীচে চড়ুইপাখিরা কিচির-মিচির শুরু করে দিল, বসন্তের সুগন্ধে ভরে উঠল বাতাস, তখন আমার প্রতি মায়ের মনোভাব বদলে গেল। আসলে, তার সব কিছুই বদলে গেল: সারাটা খোঁয়াড় জুড়ে সে এমন ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে বেড়াত যেটা তার বয়সে মোটেই মানায় না; নয় তো দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে চিঁ-হি-হি করে ডেকে উঠত; নয় তো অন্য ঘোটকিকে লাথি মারত ও কামড়ে দিত; নয়তো আমাকে শুঁকতে শুঁকতে ঘৃণা ভরে নাক ডাকাত; আর নয়তো আমাকে রুক্ষভাবে দুধের বাঁট থেকে সরিয়ে দিয়ে তার জ্ঞাতি-ভাই কুপ্‌চিংকা-র ঘাড়ের উপরে মাথাটা তুলে দিয়ে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তার পিঠ চুলকে দিত।

"একদিন আস্তাবল-রক্ষক এসে গলায় লাগাম পরিয়ে তাকে নিয়ে গেল। তার হ্রেষারব শুনে আমিও নাক ডাকাতে ডাকাতে তার পিছু নিলাম। কিন্তু মা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। সইস তারাস এসে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। হাত-পা ছুঁড়ে সইসকে খড়ের গাদায় ফেলে দিলাম; কিন্তু দরজায় তালা ঝুলছে; মার হ্রেষা-রব ক্রমেই অস্পষ্টতর হতে লাগল। কিন্তু সে হ্রেষায় আমার জন্য কোন ডাক ফুটে উঠল না, সে ডাক সম্পূর্ণ আলাদা। পরে জেনেছিলাম, আর একটি কণ্ঠ, আরও গভীর ও জোড়ালো একটা ডাকেই সে সাড়া দিচ্ছিল; সেটা দোব্রি-র কণ্ঠস্বর; দুটি সইস তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মায়ের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য। আমার মনটা এতই ভেঙে গিয়েছিল যে তারাস কখন আস্তাবল ছেড়ে চলে গেছে আমি টেরও পাই নি। শুধু বুঝলাম, মায়ের ভালবাসা আমি চিরদিনের মত হারালাম। তখনই গায়ের রং সম্পর্কে লোকের কথাগুলি মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, 'আমার ফুট-ফুট দাগের জন্যই এ সব হল।' তখন আমার এত রাগ হতে লাগল যে আস্তাবলের দেয়ালে মাথা ও হাঁটু ঠুকতে লাগলাম; ঠুকতে ঠুকতে সারা শরীরে ঘাম ঝরতে লাগল; ক্লান্ত হয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই মা ফিরে এল। শুনতে পেলাম, অস্বাভাবিক ভাবে পা ফেলে ফেলে সে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। দরজাটা খোলা হল; কিন্তু সে এতই যুবতী ও সুন্দরী হয়ে গেছে যে আমি তাকে চিনতেই

পারলাম না। সে আমাকে শ্‌ুঁকল, নাক ডাকল, তারপর হেসে উঠল। সে যে আমাকে আর ভালবাসে না সেটা তার সব কিছ্‌ুতেই স্পষ্ট বোঝা গেল। সে আমাকে বলল, দোব্রি কত স্‌ুন্দর; আর তাকে কত ভালবাসে। বারে বারে তাকে দোব্রি-র কাছে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল, আর মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল।

"কিছ্‌ুদিন পরেই আমাদের ঘাস খাওয়ার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হল। ফলে জীবনে যে নতুন আনন্দ পেলাম তাতে মায়ের ভালবাসা হারাবার ক্ষতির কিছ্‌ুটা প্‌ুরণ হল। নতুন বন্ধ্‌ু ও কমরেড জ্‌ুটল; এক সঙ্গে ঘাস খেতে শিখলাম; বড় ঘোড়াদের মত ডাকতে শিখলাম, আর মায়েদের ঘিরে ঘিরে লাফাতে শিখলাম। কী স্‌ুখের দিনই ছিল। আমার সব কিছ্‌ু ক্ষমা করা হল, সবাই আমাকে ভালবাসত, প্রশংসা করত, আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত।

"কিন্তু বেশী দিন এ রকম চলল না। শীঘ্রই একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটল।" দামড়াটা গভীর শ্বাস টেনে চলে গেল।

ভোর হয়ে এল। দরজায় কেঁচড়-কেঁচড় শব্দ হল। ঘরে ঢ্‌ুকল নেস্টার। ঘোড়াগ্‌ুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল। সইস দামড়াটার পিঠে জিন এঁটে ঘোড়ার পালকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে চলল।

॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় রাত

সন্ধ্যায় আস্তাবলে ফিরবার পরেই ঘোড়ার পাল আবার ফ্‌ুট-ফ্‌ুট দাগ দামড়াটাকে ঘিরে ধরল।

সেও বলতে শ্‌ুর্‌ু করল, "অগস্ট মাসে আমাকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। তাতে আমার বিশেষ কোন কষ্ট হল না। ব্‌ুঝতে পারলাম আমার মা শীঘ্রই আমার ছোট ভাই (বিখ্যাত উসান)-কে জন্ম দিতে চলেছে; তাই একদিন আমি তার কাছে যা ছিলাম এখন আর তা নেই। আমার কোন রকম ঈর্ষা হল না। তাছাড়া, আমি জানতাম যে মাকে ছাড়বার পরে আমাকে বাচ্চা ঘোড়াদের আস্তাবলে রাখা হবে; সেখানে আমরা দ্‌ুজন তিন জন করে এক সঙ্গে থাকব, আর প্রত্যেক দিন আমা্‌দের হাওয়া খাওয়াতে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাকে ডার্লিং-এর সঙ্গে এক খোঁয়াড়ে রাখা হল। এই ডার্লিংই পরবর্তীকালে সম্রাটের ঘোড়া হয়েছিল; কত শিল্পী তার ছবি এঁকে-

ছিল, কত ভাস্কর তার মূর্তি বানিয়েছিল। সে সময় সে কিন্তু একটা সাধারণ বাচ্চাই ছিল। অবশ্য তার চামড়া ছিল নরম ও চকচকে, গলাটা ছিল হাঁসের মত, আর পাগুলো বীণার তারের মত সরু ও টান-টান। সে ছিল খুবই আমুদে ও সৎপ্রকৃতির; লাফিয়ে বেড়াতে, বন্ধুদের গা চাটতে এবং বড় ঘোড়া ও মানুষের সঙ্গে লাগতে ভালবাসত। সে ও আমি খুব বন্ধু হয়ে উঠলাম; সারা যৌবন কালই সে বন্ধুত্ব অটুট রইল। সে সময় সে ছিল খুব ফূর্তিবাজ ও চটপটে। তখন থেকেই সে বাচ্চা ঘোটকিদের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছিল; আমার ভালমানুষী দেখে সে শুধু হাসত। দুঃখের কথা কি বলব, আত্ম-মর্যাদার দায়েই আমিও তার পথে পা বাড়ালাম। শীঘ্রই আমিও প্রেমে পড়লাম। এই প্রথম মোহ আমার জীবনে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ, আমি প্রেমে পড়লাম। ভিয়াজোপুরিখা আমার চাইতে এক বছরের বড় হলেও সে আর আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম। কিন্তু হেমন্ত কাল আসতেই আমি লক্ষ্য করলাম যে আমাকে দেখে সে লজ্জা পাচ্ছে।......প্রথম প্রেমের সব কাহিনী বলতে চেষ্টা করব না; তার নিজেরই মনে আছে, সে সময় তার জন্য যে উন্মাদ আবেগ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তার পরিণতিতে আমার জীবনে কী গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল। সইসটি তাকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিল আর আমাকে নির্মম ভাবে মারধোর করল। একদিন তারা আমাকে একটা বিশেষ খোঁয়াড়ে নিয়ে গেল। সারাটা রাত চীৎকার করে কাটালাম; পরদিন আমার কপালে যা ছিল সেটা বোধ হয় আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

পরদিন সেনাপতি, আস্তাবল-রক্ষক, সইসরা সকলেই বারান্দা পার হয়ে আমার খোঁয়াড়ে এসে হাজির হল। ভয়ানক হৈ-চৈ পড়ে গেল। সেনাপতি আস্তাবল-রক্ষককে বকতে লাগল, সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য জানাল যে আমাকে বাইরে যেতে না দেবার হুকুম সে জারি করেছিল কিন্তু সইসরা তার কথা শোনে নি। সেনাপতি বলল, সে সবাইকে কড়কে দেবে আর বাচ্চা ঘোড়াটাকে অবশ্য দামড়া করে দিতে হবে। আস্তাবল-রক্ষক জানাল, তার সব হুকুমই পালন করা হবে। সব হৈ-চৈ থেমে গেল; তারাও চলে গেল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমাকে নিয়ে একটা কিছু যে করা হবে তা বুঝলাম।

* * *

পরদিনই আমার হ্রেষারব চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল; আজ আমি যা আছি তাই হলাম। আমার কাছে জগৎটাই বদলে গেল। কোন কিছুতেই আর আনন্দ পাই না। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিলাম আর নিজের

ভাবনাতেই ডুবে গেলাম। প্রথম দিকে কোন কিছুতেই আমার উৎসাহ ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে খেলা তো দূরের কথা, কিছু খেতাম না, পান করতাম না, বেড়াতাম না। কিছুদিন পরে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত একটু লাফ-ঝাঁপ করি, জোর কদমে ছুটি, হ্রেষাধ্বনি করি; কিন্তু তখনই সেই ভয়ংকর প্রশ্নটা মনে জাগত: 'কেন? কিসের জন্য?' আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব রস যেন শুকিয়ে যেত।

"একদিন ঘোড়ার পালকে মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনবার সময় আমাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনেক দূরে দেখলাম, একটা ধুলোর ঝড় আমাদের ঘোটকিগুলোর আবছা মূর্তিকে ঢেকে ফেলেছে। তাদের খুসির হাসি ও পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সইসের টানে গলার দড়িটা আমার গলায় বসে গেলেও আমি দাঁড়িয়ে পড়ে সেই দলটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম—ঠিক যে ভাবে চিরদিনের মত হারিয়ে-যাওয়া কোন সুখের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকে। কাছে এলে একের পর এক সব্বাইকে চিনতে পারলাম—সব পুরনো বন্ধুর দল; এখন তারা কত বড় হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, চিকন ও স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। কেউ কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাতে লাগল। সইস গলার দড়ি ধরে কেবলই টানছে, কিন্তু তখন সে যন্ত্রণা তো কিছুই না। নিজের অবস্থা ভুলে গিয়ে আমি আগেকার মতই ডেকে উঠে তাদের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু আমার গলার হ্রেষারব কেমন যেন বিষণ্ণ, হাস্যকর ও সঙ্গতিহীন শোনাল। পুরনো বন্ধুরা কেউ হাসল না বটে, কিন্তু সৌজন্যবশত অনেকেই আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। নিশ্চয়ই আমাকে দেখে তাদের বিরক্তিকর, করুণ, লজ্জাজনক এবং সর্বোপরি হাস্যকর মনে হয়েছিল। আমার সরু দড়ির মত গলা, মস্ত বড় মাথাটা (ইতিমধ্যে আমার ওজন অনেক কমে গেছে), লম্বা অদ্ভুত পাগুলো, আর বোকা-বোকা চলন দেখে নিশ্চয় তাদের হাসি পাচ্ছিল। আমার ডাকে কেউ সাড়া দিল না; সকলেই আমাকে ফেলে চলে গেল। হঠাৎ যেন সব কিছু বুঝতে পারলাম; তাদের কাছে আমি চিরদিনের মত পর হয়ে গেছি। তখন এত কষ্ট হয়েছিল যে কেমন করে যে আস্তাবলে ফিরে গিয়েছিলাম তার কিছুই মনে নেই।

"অনেক দিন থেকেই গম্ভীর ও চিন্তাশীল হয়ে পড়েছিলাম; এবার সেটা পুরোপুরি হয়ে গেলাম। গায়ের ফুট-ফুট দাগের জন্য সকলে কেন যে আমাকে ঘৃণা করে বুঝতে পারি না; আস্তাবলে আমার অদ্ভুত অবস্থার কারণও ধরতে পারি না; ফলে ক্রমেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে লাগলাম। সব সময় মানুষের অবিচারের কথাই ভাবি; গায়ের ফুট-ফুট দাগের জন্য তারাই তো আমাকে দোষ দেয়; মায়ের ভালবাসা, নারীমাত্রেরই ভালবাসা যে কত ভঙ্গুর, তা যে সম্পূর্ণ ভাবে একটা দেহগত ব্যাপার, তাও বসে ভাবি;

আর সব চাইতে বেশী করে ভাবি মানুষ নামক এক শ্রেণীর বিচিত্র জীবের কথা আমাদের জীবনে যাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—তাদের খেয়ালের জন্যই তো আজ আস্তাবলে আমার এমন দুরবস্থা হয়েছে যার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। মানুষের যে মনোভাব থেকে এই অবস্থার উৎপত্তি একটি ঘটনায় তা আমার কাছে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হোল।

"শীতকালীন ছুটির সময় ব্যাপারটা ঘটল। সারা দিন আমাকে কিছুই খেতে দেওয়া হল না—না খাদ্য, না পানীয়। পরে জেনেছিলাম, সইস মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়েছিল বলেই এটা ঘটেছিল। সেদিন আস্তাবল-রক্ষক খোঁয়াড়ে ঢুকে আমাকে অভুক্ত দেখে অনুপস্থিত সইসকে এক প্রস্থ গালাগালি করে চলে গেল। পরদিন সইস ও তার বন্ধু যখন আমাদের খোঁয়াড়ে খড় এনে দিল তখন দেখলাম সে খুবই মন-মরা হয়ে পড়েছে; তার পিঠের অবস্থা দেখে আমার করুণা হল। রাগের সঙ্গে সে খড়গুলো ছড়িয়ে দিল। গরাদের ভিতর দিয়ে মাথাটা বের করে তার কাঁধের উপর রাখতেই সে আমার নাকের উপর এক ঘুঁসি বসিয়ে দিল। তারপর পেটে মারল এক লাথি।

"এই ব্যাটাচ্ছেলের জন্যই যত গোলমাল," সে বলল।

"সে কি?" অন্য সইস বলল।

"আরে সে তো কাউণ্টের বাচ্চাগুলোকে একবারও দেখে না; অথচ নিজেরটাকে দেখতে আসে দিনে দু'বার করে।"

"নিজেরটা? ওই ফুট-ফুট দাগটাকে কি তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে?"

"দিয়েই দিয়েছে না বিক্রি করেছে কে তার খবর রাখে। কাউণ্টের বাচ্চাগুলো না হয় না খেয়ে মরুক তাতে কার কি, কিন্তু তার জিনিসকে আমি না খাইয়ে রাখলাম কোন সাহসে? 'শুয়ে পড়ু!' বলেই সে শুরু করে দিল। আচ্ছা খৃস্টান বটে! মানুষের চাইতে পশুর জন্য দরদ বেশী! লোকটা যে ঈশ্বরকে মানে না তা তো সকলেই জানে। এত বড় জানোয়ার যে চাবুকের মারগুলো নিজেই গুণেছে। সেনাপতিও কখনও এ ভাবে চাবুক মারে না—আমার পিটটা একেবারে চষে ফেলেছে। ব্যাটার মন বলে কিছু নেই।"

"খৃস্টধর্ম ও চাবুকের কথা সে যা বলল তা তো ভালই বুঝতে পারলাম, কিন্তু 'তার নিজের', 'তার জিনিস' এই সব কথার কোন অর্থই তখন বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে আস্তাবল-রক্ষক ও আমার মধ্যে একটা সম্পর্কের কথা তারা বলাবলি করছে। সেটা যে কি সে বিষয়ে কোন ধারণাই তখন আমার ছিল না। আরও কিছু দিন পরে যখন আমাকে অন্য সব ঘোড়া থেকে আলাদা করে রাখা হল তখন সব বুঝলাম। অবশ্য আমাকে কেন যে একজন মানুষের সম্পত্তি বলা হত সেটা আমার মাথায় ঢুকত না।

আমি একটা জ্যান্ত ঘোড়া, অথচ আমাকে বলত 'আমার ঘোড়া'; কথাটা আমার কানে অদ্ভুত ঠেকত; যেন সে বলছে 'আমার মাটি, আমার বাতাস, আমার জল।'

"তথাপি এই কথাগুলি আমার মনের উপর যেন চেপে বসল। অনেক ভেবেচিন্তে, মানুষের সম্পর্কে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবার পরে তবে বুঝতে পারলাম এই সব কথার ভিতর দিয়ে মানুষ কি বলতে চায়। এ সব কথার অর্থ: মানুষের জীবন পরিচালিত হয় কাজের দ্বারা নয়, কথার দ্বারা। কোন কিছু করা বা না করা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, কতকগুলি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করতেই তারা আনন্দ পায়। তাদের কাছে সব চাইতে দামী কথা হল "আমি" ও "আমার"; সব রকম প্রাণী ও জিনিস, এমন কি মাটি, মানুষ ও ঘোড়ার ব্যাপারেও তারা এই কথা দুটি ব্যবহার করে। নিজেদের মধ্যে তারা ঠিক করে নিয়েছে যে কোন একটি নির্দিষ্ট জিনিসকে "আমার" বলবার অধিকার শুধু একজনেরই থাকবে। আর এই খেলায় যে লোকটি সব চাইতে বেশীসংখ্যক জিনিস সম্পর্কে এই কথাটা ব্যবহার করবার অধিকার অর্জন করবে তাকেই বলা হবে সব চাইতে সুখী লোক। এটা যে কেমন করে হয় তা জানি না, কিন্তু তাই হয়। এতে যে কি সুবিধা হয় সেটা বুঝতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বুঝতে পারি নি।

"যেমন ধর, যারা আমাকে তাদের সম্পত্তি বলে এমন অনেক লোক আমার পিঠে চড়ে না, চড়ে অন্য লোক। তারা আমাকে খাওয়ায় না; খাওয়ায় অন্য লোক। তারা আমার সেবাও করে না, সে কাজ করে অন্য লোক—কোচয়ান, সইস, ও অন্যরা। এই ভাবে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে শুধু আমাদের মত ঘোড়ার কথা নয়, সব কিছুর ব্যাপারেই 'আমি' ও 'আমার' এই ধারণাগুলির মূল ভিত্তি হল মানষের সেই জঘন্য পাশব প্রবৃত্তি যাকে তারা বলে থাকে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবৃত্তি (বা অধিকার)। মানুষ বলে 'আমার বাড়ি', অথচ সে বাড়িতে সে বাস করে না; সে শুধু সেই বাড়িটা তৈরি করেছে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আবার কোন ব্যবসায়ী বলে 'আমার কাপড়ের দোকান,' অথচ সে-দোকানের কোন ভাল কাপড় সে পরে না। এমন অনেক লোক আছে যারা একটুকরো জমিকে তাদের জমি বলে, অথচ সে জমি তারা কখনও চোখেও দেখে নি, বা তাতে কোন দিন পাও ফেলে নি। এমন কি এমন অনেক লোক আছে যারা অন্য লোককে বলে তাদের সম্পত্তি, অথচ সে সব লোককে তারা কখনও চোখেও দেখি নি; আর সেই সব লোকের সঙ্গে তাদের একমাত্র সম্পর্ক তাদের ক্ষতি করা। অনেক লোক আছে যারা কোন কোন স্ত্রীলোককে বলে 'তাদের' মেয়ে মানুষ, 'তাদের' স্ত্রী, যদিও সেই সব স্ত্রীলোক অন্য পুরুষের সঙ্গে

বাস করে। মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—যত বেশী সম্ভব ভাল কাজ করা নয়, যত বেশী সংখ্যক জিনিসকে 'নিজস্ব' বলতে পারা। আমি তো একান্ত ভাবে বিশ্বাস করি, মানুষদের সঙ্গে এখানেই আমাদের তফাৎ। মানুষের কাজকর্ম, অন্তত যে সব মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি তাদের কাজকর্ম পরিচালিত হয় কথার দ্বারা, আর আমাদের কাজকর্ম পরিচালিত হয় কাজের দ্বারা; আর মানুষের তুলনায় আমাদের আর যে সব সুবিধা আছে সেগুলি ছেড়ে দিলেও কেবলমাত্র এই একটি কারণেই আমরা বলতে পারি যে প্রাণী জগতের মই-তে আমরা মানুষের তুলনায় এক ধাপ উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

"দেখ, আমাকে 'আমার' ঘোড়া বলবার এই অধিকার আস্তাবল-রক্ষককে দেওয়া হয়েছিল বলেই সে সইসকে চাবুক মেরেছিল। এ-কথা জেনে এবং আমার গায়ের রং-এর ব্যাপারে মানুষের মনোভাবের কথা জেনে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। মায়ের বিশ্বাসঘাতকতার দুঃখের সঙ্গে এই সব মিশেই আমাকে আজকের এই গম্ভীর ও চিন্তাশীল দামড়ায় পরিণত করেছে।

"তিন দিক থেকে আমি দুর্ভাগা: আমার গায়ে ফুট-ফুট দাগ, আমি দামড়া, আর প্রত্যেক জীবের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেই মতে একমাত্র ঈশ্বরের বা আমার নিজের সম্পত্তি না হয়ে হয়ে গেলাম আস্তাবল-রক্ষকের সম্পত্তি।

"আমার সম্পর্কে তাদের এই ধারণার অনেক রকম ফল ফলতে লাগল। তার প্রথমটা হল, আমাকে অন্য সব ঘোড়া থেকে আলাদা করে রাখা হত, ভাল খাবার দেওয়া হত; অনেক বেশী দলাই-মলাই করা হত। তিন বছর বয়সের সময় প্রথম আমাকে লাগাম পরানো হল। সে দিনটার কথা খুব ভালই মনে পড়ে। আস্তাবল-রক্ষক তো আমাকে তার নিজস্ব সম্পত্তি বলেই মনে করত। একদিন একদল সইসকে সঙ্গে নিয়ে সে এল আমাকে গাড়িতে জুড়তে। সে হয় তো ভেবেছিল আমি তাতে বাধা দেব, আর আমাকে সহজে বাগ মানানো যাবে না। তারা আমার ঠোঁটটাকে চিঁড়ল; শকট-দণ্ড দুটোর মাঝখানে আমাকে ঠেলে দিয়ে দড়ি দিয়ে কসে বাঁধল; পিঠের উপর আড়াআড়ি করে দুটো চামড়ার পেটি ফেলে শকট-দণ্ডের সঙ্গে এমন ভাবে বেঁধে দিল যাতে আমি পা চালাতে না পারি; অথচ সারাক্ষণ কাজের প্রতি ভালবাসা ও বাসনাই আমার মনটাকে ভরে রেখেছিল।

"আমি যখন একটা বুড়ো ঘোড়ার মত পা ফেলে বাইরে এলাম তখন তারা অবাক হয়ে গেল। তারা আমাকে চালাতে লাগল, আর আমিও কদমে চলা অভ্যাস করতে লাগলাম। আমি এত উন্নতি করে ফেললাম যে তিন মাস পরেই স্বয়ং সেনাপতি ও অন্য সকলেই আমার চলবার ঠাঁটের খুব প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি যে আমার নিজের নই, আস্তাবল-রক্ষকের সম্পত্তি এ-কথা ভাবত বলেই তাদের কাছে আমার এই ঠাঁটের অর্থ

দাঁড়াল সম্পূর্ণ আলাদা।

"অন্য সব বাচ্চা ঘোড়াদের ঘোড় দৌড়ের মাঠে নিয়ে যাওয়া হত, তাদের দৌড়ের রেকর্ড রাখা হত, লোকজন তাদের দেখতে আসত, সোনালী কাজ-করা এক্কায় তাদের জুড়ে দেওয়া হত, পিঠে বিছিয়ে দেওয়া হত দামী ঢাকনা। আর আমাকে জুড়ে দেওয়া হত রক্ষকের সাধারণ গাড়িতে, নিয়ে যাওয়া হত চেস্‌মেংকা ও আশেপাশের অন্য গাঁয়ে। আর সে সব কিছুরই কারণ আমার গায়ে ফুট্‌-ফুট্ দাগ, আর তাদের মতে কাউণ্টের বদলে আমি রক্ষকের সম্পত্তি।

"আমি তার সম্পত্তি—রক্ষকের এই ধারণা আমাকে কী গভীর গাড্ডায় নিয়ে ফেলল, যদি বেঁচে-বর্তে থাকি তো সে কথা কাল তোমাদের শোনাব।"

পরদিন সারাক্ষণ ঘোড়াগুলি 'গজকাঠি'কে খুবই সম্মানের চোখে দেখতে লাগল। নেস্টার কিন্তু আগের মতই খারাপ ব্যবহার করে চলল। মুঝিক-এর ধূসর রং-এর চাষের ঘোড়াটা আবার দলের মধ্যে ঢুকে ডাকতে লাগল, আর ফুট্‌-ফুট্ দাগওয়ালা ঘোটকিটা আবারও তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি জুড়ে দিল।

॥ ৭ ॥

তৃতীয় রাত

সবে বাঁকা চাঁদ উঠেছে। খোঁয়াড়ের মাঝখানে দাঁড়ানো 'গজকাঠি'র উপর ছড়িয়ে পড়েছে তার আলো। তাকে ঘিরে ভিড় করেছে অন্য ঘোড়ার দল।

ফুট-ফুট দামড়াটা বলতে লাগল, "সেনাপতির বা ঈশ্বরের না হয়ে আমি যে রক্ষকের সম্পত্তি বনে গেলাম তার বিস্ময়কর ফল এই দাঁড়াল যে, একটা ঘোড়ার সব চাইতে বড় গুণ আমার দ্রুত চলার ভঙ্গীই আমার নির্বাসনের কারণ হল।

"একদিন 'রাজহাঁস'কে দৌড়নো হচ্ছিল; এমন সময় রক্ষক চেস্‌মেংকা থেকে ফিরবার পথে আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। 'রাজহাঁস' আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল। সে ভালই ছুটছিল; তবে দেখতেই ভাল; একটা ক্ষুর মাটি স্পর্শ করামাত্রই আর একটা ক্ষুর তুলে নেবার যে কৌশল আমি আয়ত্ত করেছিলাম যার ফলে একটা পদক্ষেপও নষ্ট হত না এবং সর্বপ্রযত্নে শরীরটাকে সামনে ঠেলে দেওয়া যেত সে কৌশল তখনও সে শেখে নি। আগেই বলেছি, 'রাজহাঁস' আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল। আমিও মাঠের দাগ-টানা দৌড়ের পথের দিকে এগিয়ে গেলাম; রক্ষক বাধা দিল না। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই ফুট্‌-ফুট্‌-টাকে একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?' 'রাজহাঁস'

আর এক পাক ঘুরে আমাদের কাছে আসতেই রক্ষক আমাকে ছেড়ে দিল। 'রাজহাঁস' ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছে, কাজেই প্রথম পাকে সে আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু দ্বিতীয় পাকে আমি অনেকটা এগিয়ে গেলাম, গাড়িটাকে ধরে ফেললাম, গলায় গলায় এক হলাম, তারপর তাকে মেরে বেরিয়ে গেলাম। আমাকে আর একটা সুযোগ দেওয়া হল। আবারও একই ঘটনা। আমার গতি দ্রুততর। তাতে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। স্থির হল, এমন কোন দূর দেশে আমাকে বেঁচে দেওয়া হবে যেখানে কেউ আমার খোঁজ-খবর পাবে না। 'কাউন্ট এ সব শুনলে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে বসবেন।' তারা বলাবলি করতে লাগল।

"ফলে একজন-অশ্ব-ব্যবসায়ীর কাছে আমাকে বেচে দেওয়া হল। সেও আমাকে বেশী দিন রাখল না। জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক (হুজার) আমাকে কিনে নিল। তাকে নতুন করে ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে। এখানকার সব ব্যবস্থা এতই নিষ্ঠুর ও অন্যায় ছিল যে যখন আমাকে খেনোভো থেকে, যা কিছু এতদিন ছিল আমার প্রিয় তার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হল তখন আমি খুসিই হয়েছিলাম। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। তাদের জন্য ছিল—ভালবাসা, সম্মান, মুক্তি; আর আমার জন্য ছিল—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ আর অসম্মান, অসম্মান আর কাজ। কেন? হায় কেন? একমাত্র কারণ আমার গায়ে ফুট্-ফুট্ দাগ আর সেই জন্য আমি যে হয়েছি অপরের 'সম্পত্তি।'"

সে রাতে গল্পের বাকিটা বলবার সুযোগ 'গজকাঠি' পেল না। এমন একটা কিছু ঘটল যাতে ঘোড়াদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ঘোটকি কুপচিথা-র তখনও কোন বাচ্চা হয় নি; সেও মন দিয়ে গল্প শুনছিল; হঠাৎ উঠে পড়ে সে ধীরে ধীরে চালার দিকে চলে গেল; সেখানে এত জোরে সে গোঙাতে শুরু করল যে সব ঘোড়াই সেদিকে মুখ ফেরাল। তারা দেখল, সে একবার শুয়ে পড়ছে, কোন রকমে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার শুয়ে পড়ছে। বুড়ি ঘোড়াগুলো ব্যাপারটা বুঝতে পারল, কিন্তু বাচ্চাগুলো খুব ভয় পেয়ে দামড়াটাকে ছেড়ে গিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

সকাল নাগাদ আর একটা বাচ্চা নড়বড়ে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নেস্টার সইসকে ডাকল; সইস ঘোটকি ও তার বাচ্চাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল, আর সে বাকি ঘোড়ার পাল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

চতুর্থ রাত

সেদিন সন্ধ্যায় যখন ফটক বন্ধ হয়ে গেল আর চারদিক চুপচাপ হয়ে এল, তখন দামড়াটা তার গল্প শুরু করল।

"এক হাত থেকে আর এক হাতে ফিরতে ফিরতে অনেক রকম মানুষ ও ঘোড়া আমি দেখলাম। দুজন মনিবের কাছে আমি অনেক দিন করে ছিলাম: একজন প্রিন্স, একটি অশ্বারোহী বাহিনীর 'হুজার'; আর একটি বৃদ্ধা, থাকত অঘটন-ঘটনকারী সেন্ট নিকোলাস-এর গির্জার কাছে।

"আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছে সেই 'হুজার'-এর কাছে। সেই লোকটিই আমার সর্বনাশের কারণ; জীবনে সে কোন মানুষকে বা প্রাণীকে কখনও ভালবাসে নি; তবু তাকে আমি ভালবেসেছিলাম, ঠিক এই কারণেই ভালবেসেছিলাম। তাকে ভালবেসেছিলাম কারণ সে সুদর্শন, ধনী, ও সুখী আর সেই জন্যই সে কাউকে ভালবাসত না। তোমরা হয় তো ব্যাপারটা বুঝতে পারবে; ঘোড়াদের এটাই মহত্তম অনুভূতি। তার উদাসীনতা, তার উপর আমার একান্ত নির্ভরতা—এইসব কারণেই তার প্রতি আমার ভালবাসা আরও জোর পেল। সেই পুরনো সোনার দিনগুলিতে আমি ভাবতাম, 'আমাকে মার, আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দাও, তাতেই আমি আরও সুখী হব।'

"রক্ষক আমাকে যে অশ্ব-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছিল তার কাছ থেকেই সে আমাকে কিনেছিল আট'শ রুবল দিয়ে। ফুট্-ফুট্ দাগওয়ালা ঘোড়া আর কারও ছিল না বলেই সে আমাকে কিনেছিল। সেগুলিই আমার জীবনের সেরা দিন। তার একটি রক্ষিতা ছিল। রোজ আমি তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতাম, কখনও বা দু'জনকেই বেড়াতে নিয়ে যেতাম বলেই আমি কথাটা জানতাম। রক্ষিতাটি ছিল সুন্দরী, সেও তাই, আর তার কোচয়ানও তাই; সেই জন্যই আমি তাদের ভালবাসতাম। আমি তখন কত সুখীই না ছিলাম।"

"এই ভাবে আমার দিন কাটত: সকালে সইস আসত আমার দেখাশুনা করতে—কোচয়ান নয়, সইস। আমাদের গায়ের ভাঁপ বেরিয়ে যাবার জন্য সে দরজাটা খুলে দিত; গোবরগুলো বাইরে ফেলে দিত; তারপর পিঠের চাদরটা তুলে একটা মোটা চিরুনি দিয়ে আমার গা ঘসে দিত; সাদা সাদা লোমের গুচ্ছগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ত। আমি খেলার ছলে তার হাত কামড়ে দিতাম, পা ঠুকতাম। তখন সে উঁচু তারের বেড়ার উপর দিয়ে কিছু খড় ফেলে দিত এবং কাঠের গামলায় যই ঢেলে দিত। সব শেষে আসত বড় কোচয়ান ফিয়োফান।

"কোচয়ানটি ঠিক তার মনিবের মত। দুজনের একজনও শুধু নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভয়ও করত না, ভালও বাসত না ; আর সেই জন্যই সকলেই তাদের ভালবাসত। ফিয়োফান-এর পরনে লাল কুর্তা, ভেলভেটের ট্রাউজার ও আস্তিনবিহীন কোট। ছুটির দিনে সে যখন আস্তিনবিহীন কোট পরে, চুল ও গোঁফকে তেল দিয়ে চকচকে করে আস্তাবলে ঢুকে হাঁক দিত, 'কিরে জানোয়ার, আমাকে ভুলে গেছিস?' এবং তামাসা করার জন্য উকণঠেঙার হাতল দিয়ে আমার পাছায় একটা খোঁচা মারত, তখন আমার বেশ মজা লাগত। ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে জানতাম বলেই আমিও কান দুটো পেতে দাঁত কড়কড় করতাম।

একটা কালো বাচ্চার সঙ্গে আমি একত্রে কাজ করতাম। রাতেও আমাকে তার সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হত। পোল্কানটা হাসি-তামাসা বুঝত না, আর বেজায় হিংসুটে ছিল। আমাদের খোঁয়াড় ছিল পাশাপাশি ; গরাদের ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমরা সত্যি সত্যি কামড়া-কামড়ি করতাম। ফিয়োফান সেটাকে মোটেই ভয় পেত না। সোজা তার কাছে গিয়ে এমন ভাবে গর্জে উঠত যে তাকে বুঝি মেরেই ফেলবে ; কিন্তু না—দড়ির ফাঁসটা নিয়ে তার কাছে গিয়েই সে আবার ফিরে আসত। একদিন পোল্কান আর আমি বেরিয়ে গিয়ে কুজনেৎস্কি স্ট্রীট ধরে দিলাম ছুট জোড় কদমে। কিন্তু মনিব বা কোচয়ান কেউ ভয় পেল না ; তারা হাসতে হাসতে লোকজনদের চেঁচিয়ে সাবধান করে দিয়ে আমাদের দুজনকে এমন সুকৌশলে ফিরিয়ে নিয়ে এল যে একটা লোকেরও কোন রকম আঘাত লাগল না।

"জীবনের অর্ধেক সময় ও শ্রেষ্ঠ গুণগুলি তাদেরই দিয়েছিলাম। তারা আমাকে এত বেশী মদ খেতে দিত যে তাতেই আমার পাগুলির সর্বনাশ হয়ে গেল ; কিন্তু তবু সেই সময়টাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।

"বারোটার সময় এসে তারা আমাকে সাজ পরাত, ক্ষুরে চর্বি মাখাত, লোম ও ঝুঁটি ভিজিয়ে দিত এবং শকট-দণ্ড দুটির মধ্যে আমাকে জুড়ে দিত।

"আমাদের স্লেজটা ছিল বাঁশের তৈরি, তাতে ভেলভেটের পাড় বসানো, সাজটার গায়ে ছিল ছোট ছোট রুপোর বক্‌লস্, এবং রাশ ও জালটা ছিল রেশমের। ফিয়োফান-এর পাছার দিকটা তার কাঁধের চাইতে চওড়া ; এক হাতে ঘাঘরাটা তুলে ধরে রেকাবে পা রেখে মস্করা করে মিছিমিছিই হাতের চাবুকটা দোলাত, কারণ, সে কখনও ওটা আমার উপর ব্যবহার করত না ; তারপরই সে হাঁক দিত, 'জোরসে ছোট!' আমিও এক লাফে ফটকটা পার হয়ে যেতাম ; রাঁধুনিটা বালতি হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ত, আর মুঝিকরা উঠোনে জ্বালানি কাঠ আনতে আনতে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।

"ফটকের বাইরে কিছুটা গিয়েই আমরা থেমে যেতাম। তখন খানসামা

ও অন্য কোচয়ানরা এসে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে যেত আর গল্প-গুজব শুরু হয়ে যেত। আমরা ফটকের কাছেই অপেক্ষা করতাম ; কখনও বা একটু-আধটু দৌড়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

"শেষ পর্যন্ত ফটকের কাছে একটা হাঁক-ডাক শোনা যেত, আর পাকা চুল ভুঁড়িওয়ালা তিখোন একটা ফ্রক-কোট পরে দৌড়ে এসেই হাঁক ছাড়ত, "চালাও!" তখনকার দিনে তারা বোকার মত বলত না "আগে বাড়ো!" যেন আগে যেতে হবে, না পিছু হটতে হবে তাও আমরা বুঝি না। ফিয়োফান জিভ দিয়ে একটা শব্দ করত, আর আমরা ছুটতে শুরু করতাম। মেজাজ ভাল থাকলে প্রিন্স ফিয়োফান-কে দু'একটা মজার কথা বলত; আর ফিয়োফানও মাথাটা ঈষৎ ঘুরিয়ে লাগামে সামান্য টান দিত। তার অর্থ বুঝতাম শুধু আমি। সঙ্গে সঙ্গে জোর কদম—ক্লপ, ক্লপ ক্লপ ; প্রতি পদক্ষেপে গতি দ্রুততর হচ্ছে, শরীরের প্রতিটি পেশী কাঁপছে, পায়ের চাপে বরফ ও কাদা ছিটকে যাচ্ছে। তখনকার দিনে "হেঁট-হেঁট" করার বোকা অভ্যাসটাও ছিল না ; ওই শব্দটা শুনলেই মনে হয় বুঝি কোচয়ানের পেটব্যথা হয়েছে ; তখন তারা হাঁক দিতে "দেখে চল!" ফিয়োফানও বলত, "দেখ চল!" আর পথের লোকজন সরে গিয়ে রাস্তা করে দিত, এবং গলা বাড়িয়ে সুন্দর ঘোড়া, সুন্দর কোচয়ান ও সুন্দর প্রিন্সকে দেখতে।

"অন্য ঘোড়াকে দৌড়ে মেরে দিতে খুব ভালবাসতাম। কোন গাড়িতে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত ঘোড়া দেখলেই ফিয়োফান ও আমি বাতাসের গতিতে তার পিছনে ছুটতাম; একটু একটু করে দূরত্ব কমিয়ে এনে অন্য স্লেজটার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিতাম, স্লেজের যাত্রীকে পেরিয়ে গিয়ে ঘোড়াটার পাশাপাশি ছুটতে শুরু করতাম, আর তারপরে তাকে মেরে দিয়ে এত বেশী এগিয়ে যেতাম যে তখন আর সেটাকে দেখতে পেতাম না; শুধু শুনতাম তার চলার শব্দ অস্পষ্ট হতে হতে আমার পিছনে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে অন্য ঘোড়াকে মেরে বেরিয়ে যেতে যেমন ভালবাসতাম; তেমনি কোন ভাল ঘোড়াকে কদমে ছুটে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেও খুব ভাল লাগত : একটি মুহূর্তমাত্র, একটু সাঁ সাঁ শব্দ, একটি পলকের দেখা, তারপরেই সে উধাও ; আবার দু'জন ছুটে চলেছি যার যার পথে।"

ফটকটা সশব্দে খুলে গেল ; নেস্টার ও ভাস্কার গলা শোনা গেল।

পঞ্চম রাত

আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। সকাল থেকেই আকাশের মুখ গোমড়া ; শিশির পড়ে নি ; বাতাস গরম, আর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে।

ঘোড়ার পাল খোয়াড়ে ফিরে আসামাত্রই সকলে দামড়াটাকে ঘিরে ধরল, আর সে তার গল্পের শেষাংশ বলতে লাগল।

"শীঘ্রই আমার সুখের দিন শেষ হল। মাত্র দু'বছরের সে জীবন। দ্বিতীয় শীতের পরেই পেলাম জীবনের মধুরতম আনন্দের স্বাদ, আর ঠিক তার পরেই পেলাম তীব্রতম দুঃখের স্বাদ।

"শ্রোভ্‌টাইড্‌-উৎসবের সময় প্রিন্সকে নিয়ে গেলাম ঘোড়-দৌড়ে। দৌড় হবে আত্‌লাস্‌নি ও বাইচোক-এর মধ্যে। বাজির ঘরে গিয়ে মনিব কি কথা বলে এল জানি না, কিন্তু বেরিয়ে এসেই আমাকে দৌড়ের আসরে নিয়ে যেতে ফিয়োফানকে হুকুম করল। মনে আছে, অত্‌লাস্‌নির সঙ্গে দৌড়বার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আত্‌লাস্‌নি টানছিল একটা হাল্কা দুই চাকার গাড়ি, আর আমার ছিল একটা শহুরে স্লেজ। বাঁকের মুখে আমি তাকে পেরিয়ে গেলাম। চারদিক উচ্চ হাসি ও উল্লাস-ধ্বনিতে ফেটে পড়ল।

"আমাকে বাইরে নিয়ে এলে সারা মাঠ আমাকে ঘিরে ধরল। জনা পাঁচেক অশ্ব-প্রেমিক মনিবকে আমার জন্য হাজার-হাজার দিতে চাইল। কিন্তু মনিব শুধু তার সুন্দর সাদা দাঁতের পাটি বের করে হাসল।

বলল, "না, না; ও তো ঘোড়া নয়, আমার বন্ধু; এক পাহাড় সোনা পেলেও ওকে বেচব না। চলি, ভদ্রমহাশয়রা।" স্লেজের দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল।

"অস্তোঝেংকা স্ট্রীট-এ চল!" তার রক্ষিতার ঠিকানা। আমরা ছুটে চললাম।

"সেটাই আমার শেষ সুখের দিন।

"রক্ষিতার বাড়িতে পৌঁছলাম। প্রিন্স বলত রক্ষিতা তার, কিন্তু সে ভালবাসত অন্য একজনকে; তার সঙ্গেই চলে গেছে। রক্ষিতার ফ্ল্যাটে পৌঁছলে সেই কথাই জানানো হল। তখন পাঁচটা বাজে; আমাকে গাড়ি থেকে না খুলেই রক্ষিতার খোঁজে গাড়ি হাঁকিয়ে দেওয়া হল। আর আমার প্রতি এমন ব্যবহার করা হল যা এর আগে আর কখনও করা হয় নি: পিঠে চাবুক মেরে আমাকে জোরে ছুটতে বাধ্য করা হল। সেই প্রথম আমার পা ফেলতে ভুল হল; তাতেই লজ্জা পেয়ে নিজেকে শুধরে নিতে চাইলাম, কিন্তু হঠাৎ শুনলাম প্রিন্স গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে, "জল্‌দি ছোট্‌ ব্যাটা!" সপাৎ করে চাবুক পড়ল আমার পিঠে; জোর কদমে পা চালালাম। পঁচিশ ভার্স্ট পথ পেরিয়ে তবে রক্ষিতাকে ধরা গেল।

"মনিবকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, কিন্তু সারা রাত শরীরের কাঁপুনি থামল না; কিছু খেতেও পারলাম না। সকালে কিছুটা জল দিল। তাই খেলাম।

কিন্তু সেই থেকে আমি যেন বদলে গেলাম। অসুস্থ হয়ে পড়লাম ; তারাও আমাকে কষ্ট দিতে লাগল, ক্ষত-বিক্ষত করে তুলল—লোক যাকে বলে "ধোলাই দেওয়া" তাই করল। পায়ের ক্ষুর নড়বড়ে হয়ে গেল, ঘা হল, পাগুলো বেঁকে গেল, বুকটা ঢুকে গেল ; দেহে ও মনে নির্জীব হয়ে পড়লাম।

"তারা আমাকে এক অশ্ব-ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিল। সে আমাকে গাজর ও আরও অনেক কিছু খাওয়াল। যারা কিছু জানে না তাদের বোকা বানাবার জন্য আমি যা নই আমাকে তাই বানিয়ে তুলল। তখন আমার না আছে ক্ষমতা, না আছে দ্রুতগতি। যখনই কোন খদ্দের আসত তখনই সে আস্তাবলে ঢুকে আমাকে যন্ত্রণা দিত, চাবুক মারত। তারপর চাবুকের দাগ মুছে ফেলে আমাকে বাইরে নিয়ে যেত।

"এক বুড়ি আমাকে কিনল। সে আমাকে অঘটন ঘটনকারী সেণ্ট নিকোলাস-এর গির্জায় চালিয়ে নিয়ে যেত, আর কোচয়ানকে চাবুক মারত। কোচয়ান আস্তাবলে আমার কাছে এসে কাঁদত। তখনই প্রথম জানলাম, চোখের জলেরও একটা মধুর নোনতা স্বাদ আছে। বুড়ি মারা গেল। তার গোমস্তা আমাকে বেচে দিল এক দোকানির কাছে। তার কাছে থাকার সময় অনেক বেশী গম খাওয়ার ফলে আমার অসুখ বেড়ে গেল। সে আমাকে এক চাষীর কাছে বেচে দিল। তার লাঙল টানতাম, আর বলতে গেলে কিছুই খেতাম না। আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

"কিছু জিনিসের বিনিময়ে আমাকে দিয়ে দেওয়া হল এক বেদেকে। সে আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করত এবং শেষ পর্যন্ত এখানকার এক পেয়াদার কাছে আমাকে বেচে দিল। সেই থেকে এখানেই আছি।"

কারও মুখে একটি শব্দ নেই। বৃষ্টি পড়তে লাগল।

॥ ৯ ॥

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ার পালকে যখন বাড়ি ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল তখন তাদের সঙ্গে মনিবের দেখা হয়ে গেল। সঙ্গে একজন অতিথি। ঝুলুদিবাই তাদের প্রথম দেখতে পায়—দুটি পুরুষ মানুষ : একজন খড়ের টুপি মাথায় তরুণ মনিব, অপর জন সামরিক পোষাকপরিহিত, লম্বা ও মোটাসোটা। বুড়ো ঘোটকিটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল। কিন্তু বয়স অল্প হওয়ায় অন্য ঘোড়াগুলো লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, বিশেষ করে মনিব যখন অতিথিকে নিয়ে একেবারে তাদের মাঝখানে

ঢুকে গেল এবং তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিল।

"ঐ ধূসর-কালো ঘোড়াটা কিনেছিলাম ভোয়িকভ-এর কাছ থেকে," মনিব বলল।

"সাদা পা ঐ কালো বাচ্চাটা কার? ওটা তো ভারি সুন্দর," অতিথি বলল।

"দৌড় করিয়ে, দাঁড় করিয়ে নানা ভাবে অনেকগুলো ঘোড়া তারা দেখল। ফুট-ফুট দাগ ঘোটকিটাকেও দেখল।

মনিব বলল, "ওটা খেত্রনোভো-র সওয়ারী জাতের ঘোড়া," মনিব বলল।

তারা সবগুলো ঘোড়া দেখে উঠতে পারল না। মনিব নেস্টারকে ডাকল। দামড়াটাকে জোর কদমে চালিয়ে বুড়ো লোকটি হাজির হল। একটা পায়ে খুঁড়িয়ে চললেও দামড়াটা জোর ছুটে এল; পরিষ্কার বোঝা গেল, তাকে রুদ্ধশ্বাস গতিতে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ছুটে যেতে বললেও সে আপত্তি করত না। জোড় কদমে ছুটতে সে ভালবাসে; আর ভাল পাগুলোর সাহায্যে সেই চেষ্টাই করল।

অন্য একটা ঘোড়াকে দেখিয়ে মনিব বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করুন, সারা রাশিয়াতে ওর চাইতে ভাল ঘোটকি আপনি একটাও পাবেন না।" অতিথিও সেটার প্রশংসায় কিছু বলল। মনিব উত্তেজিত ভাবে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল; ঘোড়াগুলোকে দেখিয়ে তাদের ইতিহাস ও বংশ-মর্যাদার বিবরণ শোনাতে লাগল। সে সব কথা অতিথির ভাল লাগছিল না, তবু আগ্রহের ভান করে সে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

"হ্যাঁ? ওঃ।" অন্যমনস্কভাবে সে বলল।

অতিথির বিরক্তি বুঝতে না পেরে মনিব বলল, "এটাকে দেখুন। পাগুলো লক্ষ্য করুন। ওর পিছনে অনেক টাকা ঢেলেছি, কিন্তু ওর তিন বছরের বাচ্চাটা এর মধ্যেই কদমে ছুটতে শিখেছে।"

"খুব ভাল ছোটে বুঝি?" অতিথি প্রশ্ন করল।

একটার পর একটা ঘোড়ার কথা আলোচনা করতে করতে আর যখন বলবার কিছু রইল না, তখন তারা চুপ করল।

"আচ্ছা, এবার তাহলে চলি?"

"চলুন।"

তারা ফটক পেরিয়ে গেল। এবার বাড়ি ফিরে পান-ভোজন-ধূমপান করা যাবে ভেবে অতিথি মনে মনে খুসি হল। তখন তার মেজাজ বেশ খুশ্‌। দামড়ার পিঠে বসে নেস্টার হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় অতিথি তার মস্ত বড় মাংসল হাত দিয়ে দামড়াটার পাছায় জোর একটা

থাপ্পড় কসাল।

বলে উঠল, "এটি আপনার চমৎকার সম্পত্তি! আপনার কি মনে আছে, আপনাকে বলেছি এক সময় আমারও একটা ফুট্-ফুট্ দাগওয়ালা ঘোড়া ছিল?"

তার নিজের ঘোড়ার কথা নয় বলে মনিব সেদিকে কান দিল না; নিজের ঘোড়ার পালের দিকেই তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ একটা দুর্বল, অক্ষম, অদ্ভুত হ্রেষাধ্বনি কানে যেতেই সে চমকে উঠল। দামড়াটা ডাকছে; কিন্তু শেষ না করেই সেটা মাঝপথে থেমে গেল। মনিব বা অতিথি কেউ তার দিকে নজর না দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

"গজকাঠি" মোটা লোকটিকে চিনতে পেরেছে—সেই তার প্রিয় মনিব একদা ধনী ও সুদর্শন প্রিন্স সেরপুখভ্স্কোই।

॥ ১০ ॥

ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। খোঁয়াড়ের অবস্থা হল শোচনীয়, কিন্তু বড় বাড়িটার তাতে কিছু হল না। বিলাস-বহুল বসবার ঘরে বিলাস-বহুল চা পরিবেশন করা হল। চায়ের টেবিলে গৃহকর্তা, কর্ত্রী ও অতিথি সমাসীন।

গৃহকর্ত্রী গর্ভবতী। তার উঁচু পেট, সামোভারের ও পাশে খাড়া হয়ে বসবার ভঙ্গী, ফোলা-ফোলা চেহারা, বিশেষ করে তার অন্তর্মুখী দুটি গম্ভীর, নরম বড় বড় চোখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

গৃহস্বামীর হাতে দশ বছরের পুরনো বিশেষ গুণ-সম্পন্ন চুরুটের একটা বাক্স; এ ধরনের চুরুট তার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই, গর্বভরে এই কথাই সে অতিথিকে বলছিল। গৃহস্বামী পঁচিশ বছরের সুশ্রী যুবক—সুদর্শন, সুসজ্জিত, সুবেশ। বাড়িতে সে পরে লণ্ডনের দর্জি দিয়ে তৈরি ঢিলে পশমী সুট। ঘড়ির চেন থেকে ঝুলছে সোনার ভারী পদক। আস্তিনের ভারী সোনার বোতামে নীল পাথর বসানো। সে দাঁড়ি ছেঁটেছে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর ঢঙে; উপরের ঠোঁটের দু'দিকে ইঁদুরের লেজের মত ঠেলে উঠেছে; সেটাকে মোমে মাজা হয়েছে প্যারিসীয় পরিচ্ছন্নতায়।

অতিথি নিকিতা সেরপুখভ্স্কোই-র বয়স চল্লিশের উপরে—লম্বা, মোটা, টাক-মাথা, পুরু গোঁফ ও জুলপি। যৌবনে সে নিশ্চয়ই সুপুরুষ ছিল; কিন্তু এখন দেখে মনে হয় দৈহিক, নৈতিক, ও অর্থনৈতিক—সব দিক থেকেই সে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এক সময়ে নিকিতা সেরপুখভস্কোই-র বিশ লক্ষ রুবলের সম্পত্তি ছিল, আর এখন সে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার রুবল ঋণগ্রস্ত। এ ধরণের লোকের বাজারে যে সুনাম থাকে তার জোরেই সে এত রুবল ধার করতে পারে যাতে আরও দশটা বছর সেই একই হারে জাঁকজমকের ভিতর দিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যায়। ক্রমে সে দশ বছরও কেটে গেল; সুনাম গেল মিলিয়ে; আর তাই এখন নিকিতার কাছে জীবন একটা বোঝার মত হয়ে উঠেছে। সে মদ ধরেছে—তার মানে, মদই তাকে ধরেছে। আসলে মদ সে কখনও ধরেও নি, ছাড়েও নি। গৃহস্বামীর সুখ-সম্পদ দেখে নিকিতার নিজেকে বড়ই ছোট মনে হতে লাগল; যে অতীত চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে তার স্মৃতি মনে পড়ায় তাকে ঈর্ষাতুর করে তুলল।

"আমরা ধূমপান করলে কি আপনার আপত্তি হবে মেরী?"—বহু অভিজ্ঞতালব্ধ এমন সুরে ও ভঙ্গীতে সে কথাগুলি বলল যেভাবে ভদ্রজনরা বন্ধুর স্ত্রীর থেকে আলাদা করে তার রক্ষিতার সঙ্গে কথা বলে থাকে।

সে একটা চুরুট হাতে নিল। গৃহস্বামী বোকার মত মুঠো-ভর্তি চুরুট তুলে তার দিকে এগিয়ে ধরল।

"এই যে, এগুলো নিন; খেয়ে দেখুন কত ভাল জিনিস।"

নিকিতা সেগুলোকে এক পাশে সরিয়ে রাখল। তার দুই চোখে অপমান ও আঘাত যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"ধন্যবাদ।" নিজের সিগারেট-কেস বের করল। "আমার জিনিস একটা খান।"

গৃহকর্ত্রীটি আরও স্পর্শকাতর। এ সব দেখে শুনে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "চুরুট খেতে আমি ভীষণ ভালবাসি। আমার তো মনে হয়, আশেপাশের কেউ ধূমপান না করলেও আমার লোভ কমবে না।" বলেই সে মিষ্টি করে হাসল। জবাবে নিকিতাও আধখানা হাসি হাসল; তার দুটো দাঁত নেই।

গৃহস্বামী তবু বলল, "না, এটা খান। ওগুলো বড়ই নরম। ফ্রিজ, একটা নতুন বাক্স নিয়ে এস তো।"

জার্মান পরিচারক একটা নতুন বাক্স এনে দিল।

"আপনি কি বেশী ভালবাসেন? কড়া? তাহলে তো এই সেরা জিনিস। এই সবগুলোই আপনি নিন।" বিরল সম্পত্তি দেখাবার সুযোগ পেয়ে সে বুঝি বুদ্ধি-বিবেচনা সবই হারিয়ে ফেলেছে। সেরপুখভস্কোই একটা চুরুট ধরিয়ে আবার আলোচনা শুরু করল।

"আতলাসনি-র জন্য কত খরচ করেছেন বললেন?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"মোটা টাকা। অন্তত পাঁচ হাজার। তবে ঘোড়াটা তার উপযুক্তই বটে।

তার বাচ্চাটাকে আপনার দেখা উচিত।"

"ভাল দৌড়বাজ কি ?"

"প্রত্যেকটি। এ বছর তার বাচ্চাটা তিনটে পুরস্কার জিতেছে: একটা তুলা-য়, একটা মস্কো-তে, আর একটা সেন্ট পিতার্সবুর্গে। ওই ব্যাটা জকি যদি চার-চারটে ভুল না করত, তাহলে ও তো সেটাকে পতাকার কাছেই মেরে বেরিয়ে যেত।"

সেরপুখভস্কোই বলল, "এখনও একটু কাঁচা আছে। আমার কথা যদি মানেন তো বলি, ওর মধ্যে ওলন্দাজ রক্ত একটু বেশীমাত্রায়ই আছে।"

"আর ঘোটকিগুলো ? কাল আপনাকে সব দেখাব। দোব্রিনিয়ার জন্য খরচ করেছি তিন হাজার, আর লাস্কোভায়ার জন্য দুই।"

গৃহস্বামী আবার তার ধন-দৌলত নিয়ে গর্ব করতে লাগল। গৃহকর্ত্রীটি বুঝতে পারল যে, এতে সেরপুখভস্কোই কষ্ট পাচ্ছে, আর সব কথা শুনবার ভান করছে মাত্র।"

সে জিজ্ঞাসা করল, "এখন কি তোমরা একটু চা খাবে ?"

"না," বলেই গৃহস্বামী আবার গল্প জুড়ে দিল। মহিলাটি উঠে দাঁড়াতেই গৃহকর্তা তাকে বাধা দিল, দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমো খেল।

তাদের কাণ্ড দেখে সেরপুখভস্কোই হাসতেই যাচ্ছিল—যদিও একটু অস্বাভাবিক হাসি, কিন্তু গৃহস্বামী যখন স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, তখন হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ; তার ফোলা মুখে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল। এমন কি একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের ছায়াও পড়ল।

॥ ১১ ॥

হাসতে হাসতে ফিরে এসে গৃহস্বামী নিকিতার উল্টো দিকে বসল। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না।

এক সময় সেরপুখভস্কোই বলে উঠল, "আপনি ওকে ভোয়িকভ-এর কাছ থেকে কিনেছিলেন বললেন না ?"

"হ্যাঁ, আত্লাসুনি-কে। দুবোভিৎস্কির কাছ থেকেও একটা ঘোটকি কিনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পছন্দমত একটাও পেলাম না।"

"তার তো বারোটা বেজে গেছে," কথাগুলি বলেই সেরপুখভস্কোই হঠাৎ থেমে গিয়ে চারপাশে তাকাল। তার মনে পড়ল এই "বারোটা বেজে যাওয়া" ভদ্রলোকের কাছেই তার বিশ হাজার রুবল দেনা আছে। লোকে যদি

দুবোভিৎস্কি-কেই বলে সর্বস্বান্ত, তাহলে তাকে কি বলবে? সে চুপ করে গেল।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। অতিথির কাছে কি কি জিনিস নিয়ে গর্ব প্রকাশ করা যায় গৃহস্বামী মনে মনে তারই হিসাব করতে লাগল। আর সেরপুখভস্কোই ভাবতে লাগল, কেমন করে সে বোঝাবে যে তার বারোটা এখনও বাজে নি। চুরুটের কড়া মৌতাত সত্ত্বেও দুজনের চিন্তাই বেশ ধীরগতি।

সেরপুখভস্কোই মনে মনে বলল, "না জানি কখন ইনি কিছু পান করতে বলবেন?"

আবার গৃহস্বামীও ভাবতে লাগল, "একটু কিছু পান করা যাক, নইলে কিছুই ভাল লাগছে না।"

"আপনি কি এখানে অনেক দিন থাকবেন?" সেরপুখভস্কোই জিজ্ঞাসা করল।

"আর এক মাস। একটু কিছু খেলে কেমন হয়? ফ্রিজ, খানা তৈরি?"

তারা খাবার ঘরে গেল। ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে একটা টেবিল পাতা। তাতে কয়েকটা বাতিদান ও নানাবিধ রুচিসম্পন্ন জিনিস সাজানো: বক-যন্ত্র, পুতুলের মুখ লাগানো বোতল, ভদ্‌কা, ভাল মদে ভর্তি কাঁচের পাত্র, সুখাদ্য বোঝাই থালা। তারা পান করল, খেল, আবার পান করল, আবার খেল, তারপর আবার গল্প শুরু করল। সেরপুখভস্কোই-র মুখ লাল হয়ে উঠল, আর মুখের লাগামও গেল ঢিলে হয়ে।

তারা নারীসংক্রান্ত আলোচনায় মেতে উঠল। যে সব মেয়েমানুষ নিয়ে তারা দিন কাটিয়েছে সেই সব বেদেনী, ফরাসিনী ও নাচনেওয়ালীদের কথা বলতে লাগল।

গৃহস্বামী প্রশ্ন করল, "তাহলে মাতিয়ের-কে আপনি ছেড়ে দিলেন?" এই মাতিয়েরই সেরপুখভস্কোইর বারোটা বাজিয়েছে।

"আমি ছাড়ি নি, সেই আমাকে ছেড়েছে। আরে, পুরুষকে যে কত ভোগান্তিই ভুগতে হয়! আজকাল হাজার হাজার রুবল হাতে নিয়ে বেশ মজাতেই আছি। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কোথাও চলে যেতেই চাই। মস্কোতে আর থাকতে পারছি না। সব মনে পড়ে যায়!"

সেরপুখভস্কোই-র কথাবার্তা গৃহস্বামীর মোটেই ভাল লাগছে না। সে চায় নিজের কথা বলতে, ঐশ্বর্যের চমক দেখাতে। আর সেরপুখভস্কোই চায় তার কথা, তার অতীত জাঁকজমকের কথা বলতে। অতিথিকে এক গ্লাস মদ ঢেলে দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে তার গ্লাসটা ফুরোবে আর সেও তাকে প্রাণ ভরে শোনাতে পারবে কেমন করে সে এমন একটা ঘোড়ার

খামার তৈরি করেছে যেমনটি কেউ কোন দিন ভাবতেও পারে নি; সে আরও শোনাবে যে, মেরী তাকে হৃদয় দিয়েই ভালবাসে, শুধু টাকার জন্য নয়।

"আমি বলতে চাই যে আমার খামারে—" সে শুরু করতেই সেরপুখভস্কোই বাধা দিল।

"সত্যি বলছি, এমন এক সময় ছিল যখন আমি জীবনকে ভালবাসতাম, কেমন করে বাঁচতে হয় তা জানতাম। আপনি তো ঘোড়ায় চড়ার কথা বলছিলেন; বলুন তো, সব চাইতে দ্রুতগামী কোন্ ঘোড়ায় আপনি চড়েছেন?"

গৃহস্বামী মওকা পেয়ে যেই তার ঘোড়ার খামারের কথা বলতে যাবে অমনি সেরপুখভস্কোই আবার বাধা দিল।

"জানি, জানি, আপনারা খামারওয়ালারা বোঝেন শুধু নাম কেনা; কেমন করে জীবনকে ভোগ করতে হয়, মজায় দিন কাটাতে হয়, তা জানেন না। আমি কোনদিন ও রকম ছিলাম না। মনে আছে তো, আপনাকে বলছিলাম যে আপনার মত আমারও একটা ফুট্-ফুট্ দাগওয়ালা ঘোড়া ছিল? সে যে কী ঘোড়া বললে বিশ্বাস করবেন না! সে ধরুন '৪২ সালের কথা। সবে মস্কোতে এসেছি। ঘোড়া-ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে একটা ফুট্-ফুট্ দামড়া দেখতে পেলাম। পছন্দসই মাল। দাম? এক হাজার। পছন্দ হল, কিনে ফেললাম, সওয়ার হয়ে ছুটতে লাগলাম। সে রকম আর একটা ঘোড়া আপনি আমি, বা আর কেউ কোন দিন পাবে না! কি গতি, কি বল, কি রূপ—কিছুতেই তার জুড়ি নেই। আপনি তো তখন ছেলেমানুষ; তাকে চেনবার কথা নয়। তবে নাম নিশ্চয় শুনেছেন। তখন সারা মস্কো জুড়ে তার নাম।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহস্বামী বলল, "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন তার কথা শুনেছি। আমি আপনাকে বলতে চাই আমার—"

"সে তো বলেইছেন। সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেললাম; কাগজপত্র দেখলাম না, বংশ-মর্যাদার খোঁজ নিলাম না, কারও সুপারিশের জন্যও অপেক্ষা করলাম না। ভোয়িকভ ও আমিই তার পূর্বপুরুষের খোঁজ বের করলাম। নাম ছিল 'গজকাঠি'; মনোহর-প্রধানের ছেলে। এক একটা পা ফেলে এই এতখানি লম্বা। খ্রেনোভো ঘোড়ার খামার থেকে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল আস্তাবল-রক্ষকের কাছে। আস্তাবল-রক্ষক তাকে দামড়া করে এক অশ্ব-ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিল। সে রকম ঘোড়া আর হয় না! আহা, কী দিনই ছিল। যৌবন, আমার হারানো যৌবন।" মুখে বেদেদের একটা গানের কলি ভেঁজে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "সত্যি, সে সব দিনকাল ছিল বটে। বয়স পঁচিশ বছর, বছরে আশী হাজার আয়, মাথায় এক গাছি চুলও পাকে নি, মুক্তোর মত দাঁতগুলো সব ঠিক। যাতে হাত দিই তাতেই লক্ষ্মী; আর

আজ—সব শেষ।"

সে একটু থামাতে সুযোগ পেয়ে গৃহস্বামী বলল, "সেকালের ঘোড়াগুলো এখানকার ঘোড়াদের মত ছুটতে পারত না। যদি শোনেন তো বলি, আমার প্রথম ঘোড়াগুলো যখন দৌড়তে শুরু করে—"

"আপনার ঘোড়া! আরে, তখনকার ঘোড়া সব কত জোর ছুটত!"

"কি বলছেন? জোর ছুটত?"

"ঠিক বলছি—খুব জোর। মনে আছে, মস্কোর এক ঘোড়-দৌড়ে একবার 'গজকাঠি'-কে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার নিজের কোন ঘোড়ার নাম তালিকায় লেখাই নি। ঘোড়-দৌড় আমি কোন কালেই পছন্দ করি না; আমি কেবল ভাল ভাল ঘোড়া পুষতাম: সেনাপতি, শোলেট, মহম্মদ। ফুট-ফুট ঘোড়াকে নিয়ে গেলাম। কোচয়ানটাও ছিল চমৎকার। লোকটাকে ভালবাসতাম। মদ গিলেই মরল। যাহোক, দৌড়ের মাঠে তো গেলাম। সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'সেরপুখভস্কোই, কবে আপনি দৌড়ের ঘোড়া কিনবেন?' আমি বললাম, 'দৌড়ের ঘোড়া কিসে লাগবে? আমার এই টাট্টুই তোমাদের বাছা-বাছা দৌড়ের ঘোড়াকে মেরে বেরিয়ে যাবে।' তারা বলল, "সেটি আর আপনার জীবনে হচ্ছে না।' আমি বললাম, 'বেশ, এক হাজার রুবল বাজি।' কর-মর্দন করা হল। দৌড় শুরু হল। আমার ঘোড়াই পাঁচ সেকেন্ড আগে পেঁছে প্রথম হল। হাজার রুবল জিতে নিলাম। কিন্তু সেটা কিছুই নয়। একবার জাত-ঘোড়ার এক 'ত্রয়কা' (তিন ঘোড়ার গাড়ি) চেপে তিন ঘণ্টায় এক শ' ভার্স্ট পথ পাড়ি দিয়েছিলাম। মস্কোতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়ে-ছিল।"

সেরপুখভস্কোই এমন কৌশলের সঙ্গে একটানা মিথ্যা বলে যেতে লাগল যে গৃহস্বামী মুখ খুলবারই অবসর পেল না। মুখে একটা মন-মরা ভাব ফুটিয়ে তার মুখোমুখি বসে দু' জনের জন্য গ্লাসে মদ ঢালা ছাড়া আর কিছুই তার করবার ছিল না।

আলো দেখা দিল। তারা তখনও বসে। গৃহস্বামীর এত একঘেয়ে লাগছিল যে বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত সে উঠে দাঁড়াল।

"আচ্ছা, শোবার সময় হয়েছে," বলে সেরপুখভস্কোই গাল ফুলিয়ে স্খলিত পায়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

গৃহস্বামী তার ঘরণীর পাশে শুয়ে আছে।

"লোকটা একেবারে অসহ্য। মদে চুর হয়ে কেবলই মিথ্যা বলে গেল।"

"আর আমার সঙ্গেও ফষ্টিনষ্টির চেষ্টা করেছিল।"

"ভয় হচ্ছে, আবার ধার না চেয়ে বসে।"

পোষাক-পরা অবস্থাতেই সেরপুখভস্কোই বিছানায় শুয়ে আছে।

ভাবছে, "এক গাদা মিথ্যা বললাম। তাতে কি হয়েছে? মদটা ভাল, তবে লোকটা শুয়োরের বাচ্চা। ব্যবসায়ীর মত। আর আমিও তো শুয়োরের বাচ্চা।" সে হেসে উঠল। "আগে আমি তাদের রাখতাম, এখন তারাই আমাকে রাখে। সেই উইংক্লার মেয়েমানুষটাই আমাকে পুষছে—আমি তার কাছ থেকে টাকা নেই। সে-ব্যাটাকে ঠিক করেছে; য্যায়সা কা ত্যায়সা। কিন্তু পোষাকটা খোলা দরকার। এই বুটজোড়াকে কিছুতেই খুলতে পারছি না।"

"হেই!" চেঁচিয়ে হাঁক দিল; কিন্তু চাকরটা অনেক আগেই বিছানা নিয়েছে।

উঠে বসল, জোব্বা ও ওয়েস্টকোট খুলল; ট্রাউজারটাকেও কোনক্রমে লাথি মেরে ছুঁড়ে দিল; কিন্তু নরম ভুঁড়ির বাধা ডিঙিয়ে বুটজোড়াকে কিছুতেই খুলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত একটা যদি বা খুলল, অনেক টানা-হ্যাঁছিড়াতেও আর একটা কিছুতেই স্থানচ্যুত হল না। তখন সে বুটশুদ্ধুই বিছানায় ঢুকে গেল এবং নাক ডাকাতে শুরু করে দিল। সমস্ত ঘরটা তামাক, মদ ও বার্ধক্যের বদ গন্ধে ভরে গেল।

॥ ১২ ॥

সেদিন রাতে 'গজকাঠি' আরও অনেক কথাই মনে করতে পারত, কিন্তু ভাস্কা এসে বাধার সৃষ্টি করল। তার পিঠে একটা চাদর ফেলে ভাস্কা তাকে জোর কদমে ছুটিয়ে নিয়ে সারা রাত একটা সরাইখানার সামনে বেঁধে রাখল। তার পাশেই ছিল জনৈক চাষীর একটা ঘোড়া; তারা পরস্পরের গা চাটতে লাগল। সকাল হলে তারা দলের মধ্যে ফিরে এল; আর 'গজকাঠি' নিজের গা চুলকোতে শুরু করল।

"এত চুলকোচ্ছে কেন?" সে ভাবল।

পাঁচদিন কেটে গেল। তারা পশু-চিকিৎসককে ডেকে আনল।

ডাক্তার হেসে বলল, "এটার চুলকানি হয়েছে। বেদেদের কাছে বেচে দাও।"

"কি দরকার? এই মুহূর্তে ওটা যদি এখান থেকে দূর হয়ে না যায় তো ওর গলা কেটে ফেল, যা খুসি তাই কর।"

পরিষ্কার, শান্ত সকাল। ঘোড়ার পাল চরতে গেছে। গজকাঠি একা রয়ে গেছে। তার দিকে এগিয়ে এল একটি অদ্ভুত-দর্শন লোক—সরু চেহারা কালো, নোংরা, সারা কোটে কালো-কালো দাগ। সে পশুদের ছাল-চামড়া ছাড়ায়।

'গজকাঠি'র দিকে না তাকিয়েই তার মুখের দড়িটা ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। 'গজকাঠি' চুপচাপ চলতে লাগল। পিছনে ফিরেও তাকাল না। যথারীতি পা টেনে টেনে খড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। ফটক পার হবার সময় একবার কুয়োটার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা তাকে টেনে বলল :

"ওদিকে গিয়ে কি হবে ?"

ভাস্‌কা পিছন-পিছন আসছিল। দুজনে মিলে তাকে ইটের চালাটার পিছনকার একটা গিরি-খাতের মধ্যে নিয়ে থামল। সেই অতি সাধারণ জায়গাটায় বোধ হয় অসাধারণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ঘোড়ার দড়িটা ভাস্‌কার হাতে দিয়ে লোকটা গায়ের কোট খুলল, আস্তিন গোটাল, বুটের উপর থেকে একটা ছুরি ও শান-পাথর বের করে ছুরিটাতে শান দিতে লাগল। দামড়াটা দড়িটার দিকে মুখ বাড়াল, যাতে সেটা চিবুতে চিবুতে সময়টা কাটাতে পারে ; কিন্তু দড়িটা তার নাগালের বাইরে ; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চোখ বুজল। তার ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, হলুদে দাঁতের মাড়ি দেখা যাচ্ছে ; ছুরি শানাবার শব্দের তালে তালে সেও ঘুমে ঢুলতে লাগল। ফোলা পাটার ব্যথাই তাকে যা একটু কাবু করেছে। হঠাৎ তার মনে হল, কে যেন তার চোয়ালটা চেপে ধরে এক ঝাঁকিতে মাথাটাকে উপরের দিকে তুলে ধরেছে। চোখ খুলল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটো কুকুর। একটা সেই লোকটার দিকে মুখ নিয়ে বাতাসে কি যেন শুঁকছে ; অপরটি যেন তার কাছ থেকেই কিছু পাবার আশায় দামড়াটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের দিকে চোখ রেখে যে-লোকটি তাকে ধরে ছিল তার হাতের উপর সে নিজের গালটা ঘসতে লাগল।

ভাবল, "এরা আমাকে ওষুধ দেবে। ভাল কথা, দিক।"

আর ঠিক তাই ; সে বুঝতে পারল তারা ওর গলায় কি যেন করছে। তীক্ষ্ণ খোঁচার একটা যন্ত্রণা হল ; সে আঁতকে উঠেই লাথি কসাল ; তারপর নিজেকে সংযত করে এর পর কি ঘটে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার গলা ও বুক বেয়ে একটা গরম ধারা বয়ে যেতে লাগল। এত জোরে একটা নিঃশ্বাস টানল যে তার পেটের দু'পাশ ফুলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা ভাল বোধ করল। জীবনের সব বোঝা যেন সরে যাচ্ছে। সে চোখ বুজল, মাথাটা নীচু হয়ে পড়ল। কেউ তুলে ধরল না। গলাটা ঝুলে পড়ল, পা কাঁপতে লাগল, শরীরটা টলমল করতে লাগল। যত না ভয়, তার চাইতে বেশী বিস্ময়। সব কিছুই এত আলাদা। অবাক হয়ে সে সামনে ছুটতে, লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার পাগুলো পাকিয়ে গেল ; কাৎ হয়ে পড়ে যেতে লাগল। যে লোকটা চামড়া ছাড়ায় সে অপেক্ষা করছে দেহের খিঁচুনি যতক্ষণ না থামে ততক্ষণ কুকুর দুটোকে ঠেকিয়ে রাখল, তারপর

একটা পা ধরে ঘোড়াটাকে চিৎ করে শুইয়ে দিল ; আর ভাস্‌কাকে ধরতে বলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করল।

"বয়সকালে খুব ভাল ঘোড়া ছিল," ভাস্‌কা বলল।

লোকটি বলল, "আর একটু মাংস থাকলে চামড়াটাও খুব ভাল হত।"

সন্ধ্যায় ঘোড়ার পাল পাহাড় বেয়ে উঠে এল ; যারা বাঁদিকে ছিল তাদের চোখে পড়ল, মাটিতে লাল মত একটা বস্তুকে ঘিরে কয়েকটা কুকুর খুব ব্যস্ত, আর তাদের উপরে কিছু কাক ও চিল উড়ছে। একটা কুকুর বস্তুটাকে দুই থাবায় চেপে ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল; আর চপ্‌চপ্‌ শব্দ করে খানিকটা টুকরো ছিঁড়ে না আসা পর্যন্ত মাথাটা নাড়তে লাগল।

ফুট্‌ফুট্‌ দাগওয়ালা ঘোটকিটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল, গলাটা বাড়াল, আর অনেকক্ষণ ধরে বাতাসটা শুঁকতে লাগল। অন্যরা কিছুতেই তাকে সেখান থেকে সরাতে পারল না।

ভোরবেলা কয়েকটা নেকড়ের বাচ্চা পুরনো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে সেই গিরি-খাতের ঘন ঝোপের মধ্যে মনের সুখে লাফালাফি করতে লাগল। মোট পাঁচটা বাচ্চা; চারটে প্রায় এক বয়সের, আর একটা ছোট ; তার মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়। একটা শুট্‌কি মা-নেকড়ে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ; বাঁটওয়ালা পেটটা মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। বাচ্চাগুলোর সামনে গিয়ে বসতেই তারা তাকে ঘিরে ধরল। একেবারে ছোট বাচ্চাটার কাছে গিয়ে সামনের পা দুটো বেঁকিয়ে মাথাটা নীচু করল, মুখটা খুলল, এবং পেটটাকে বার কয়েক মোচড় দিয়ে বড় এক টুকরো ঘোড়ার মাংস উগড়ে বের করল। বড় বাচ্চাগুলো ছুটে আসতেই মা তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পুরো টুকরোটাই ছোট বাচ্চাটাকে দিল। ছোট বাচ্চাটা যেন রেগে গর্‌গর্‌ করে উঠল, মাংসের টুকরোটাকে দুই থাবায় ধরে ছিঁড়তে লাগল। সেই একইভাবে মাটা আরও একটা, আরও একটা টুকরো উগরে বের করল, আর এই ভাবে পাঁচটা বাচ্চারই খাদ্য জুটল ; তারপরেই মা-নেকড়েটা বাচ্চাদের পাশে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

এক সপ্তাহ কালের মধ্যে ইটের চালাটার কাছে একটা বড় খুলি ও দুটো জংঘাস্থি ছাড়া আর কিছুই রইল না ; আর সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটি মুঝিক গ্রীষ্মকালের জন্য হাড় কুড়োতে বেরিয়ে খুলি ও জংঘাস্থি-গুলোও নিয়ে গেল এবং দরকারের সময় কাজে লাগবে বলে জড়ো করে রেখে দিল।

আরও বেশ কিছুদিন পানাহারের পরে সের্‌পুখভ্‌স্কোই-র মৃতদেহটাকেও

মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হল। তার চামড়া, মাংস, আর হাড় কারও কাজে লাগল না। আর ঠিক যেমন তার জীবন্ত মৃতদেহটা বিশ বছর ধরে একটা বোঝার মতই পৃথিবীর বুকে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছিল, ঠিক তেমনই সে দেহটা যখন কবর দেওয়া হল তখনও যাদের উপর সে কাজের ভারটা পড়ল তাদের কাছে সে একটা বোঝার মতই হয়ে দাঁড়াল।

দীর্ঘদিন যাবৎই সে কারও কোন কাজে লাগছিল না, সে ছিল একটা উৎপাতবিশেষ; তবু যারা তাকে কবর দিল তারা তার ফুলে-ওঠা, পচনোন্মুখ দেহটাকে সুন্দর পোষাক পরাল, ভাল জুতো পরাল, চার কোণে নতুন ঝোম্পা লাগানো একটা সুন্দর নতুন শবাধারে তাকে শুইয়ে দিল, নতুন শবাধারটাকে আর একটা সীসের শবাধারের মধ্যে ভরে মস্কো নিয়ে গেল; আর সেখানে কবরখানায় মাটি খুঁড়ে অনেক মানুষের হাড় বের করল যাতে ঠিক সেই একই জায়গায় তার নতুন পোষাক ও চকচকে জুতো পরানো কীটে-কাটা ক্ষয়িষ্ণু দেহটাকে কবর দেওয়া যায়।

১৮৮৫

ক্রীসাস্ ও সোলন

Crœsus and Solon

প্রাচীন কালে—খৃস্টের আবির্ভাবের অনেক, অনেক বছর আগে—কোন এক দেশে ক্রীসাস নামে এক মস্ত বড় রাজা ছিল। তার ছিল অনেক সোনা-রুপো ও অনেক মণি-রত্ন, আর ছিল অসংখ্য সৈন্য ও ক্রীতদাস। বস্তুত, সে ভাবত সারা পৃথিবীতে তার চাইতে সুখী লোক আর কেউ নেই।

কিন্তু ঘটনাক্রমে সোলন নামে একজন গ্রীক দার্শনিক ক্রীসাস-এর রাজ্যে বেড়াতে এল। জ্ঞানবান ও ন্যায়বান মানুষ হিসাবে সোলন-এর খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত; তার খ্যাতি ক্রীসাসের কানেও পেঁীছেছিল; তাই রাজা আদেশ দিল, সোলনকে তার সামনে হাজির করা হোক।

অত্যন্ত জমকালো রাজবেশ পরে সিংহাসনে বসে ক্রীসাস সোলনকে জিজ্ঞাসা করল: "এর চাইতে চমৎকার কিছু কি আপনি কখনও দেখেছেন?"

"নিশ্চয় দেখেছি," সোলন জবাব দিল। "ময়ূর, মোরগ ও 'ফেজাণ্ট' পাখিরা এত বিচিত্র ও ঝকঝকে রঙে সজ্জিত যে মানুষের কোন কলা-কৌশলই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।"

ক্রীসাস চুপ করে ভাবতে লাগল : "এতে যখন হল না তখন তাকে অবাক করে দেবার জন্য আরও কিছু দেখাতে হবে।"

তখন নিজের সব ঐশ্বর্য সোলন-এর চোখের সামনে মেলে ধরে সে গর্ব ভরে বলতে লাগল, কত শত্রু সে মেরেছে আর কত রাজ্য সে জয় করেছে। তারপর দার্শনিককে বলল :

"এ পৃথিবীতে আপনি অনেক দিন বাস করছেন; অনেক দেশও আপনি দেখেছেন। আমাকে বলুন তো, জীবিত মানুষদের মধ্যে কাকে আপনি সব চাইতে সুখী বলে মনে করেন ?"

"আমার মতে এথেন্সের অধিবাসী জনৈক গরীব মানুষই জীবিত লোকদের মধ্যে সব চাইতে সুখী," সোলন জবাব দিল।

জবাব শুনে রাজা অবাক হয়ে গেল, কারণ সে নিশ্চিত ভেবেছিল যে সোলন তার নামই বলবে; অথচ সে কিনা একজন সম্পূর্ণ অখ্যাত লোকের কথা বলল।

"আপনি এ কথা বলছেন কেন ?" ক্রীসাস জিজ্ঞাসা করল।

সোলন জবাব দিল, "কারণ যার কথা আমি বলছি সেই লোকটি সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করেছে, অল্পেই সন্তুষ্ট থেকেছে, সন্তানদের ভালভাবে মানুষ করেছে, নিজের নগরকে সম্মানের সঙ্গে সেবা করেছে, আর সুখ্যাতি অর্জন করেছে।"

এ কথা শুনে ক্রীসাস চীৎকার করে বলে উঠল :

"তার মানে আমার সুখকে আপনি কোন মূল্যই দিচ্ছেন না এবং মনে করছেন যে আপনার উল্লেখিত লোকটির সঙ্গে আমার কোন তুলনাই হয় না ?"

উত্তরে সোলন বলল :

"অনেক সময়ই এ রকমটা ঘটে যে একটি গরীব মানুষ একজন ধনী মানুষের চাইতে বেশী সুখী হয়। মৃত্যুর আগে কোন মানুষকেই আপনি সুখী বলতে পারেন না।"

রাজা সোলনকে বিদায় দিল, কারণ তার কথাবার্তা তার ভাল লাগে নি; আর তার কথা সে বিশ্বাসও করে নি।

সে ভাবল, "দুঃখ নিয়ে বাড়াবাড়ি! মানুষ যতদিন বাঁচবে সুখের জন্যই বাঁচবে।"

ক্রমে রাজা সোলনকে একেবারেই ভুলে গেল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজার ছেলে শিকারে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হল আর তাতেই মারা গেল। তারপর, ক্রীসাস শুনল, শক্তিমান সম্রাট সাইরাস তাকে আক্রমণ করতে আসছে।

তখন ক্রীসাস এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সাইরাস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর

হল; কিন্তু শত্রুপক্ষ প্রবলতর হওয়ায় ক্রীসাস-এর সেনা-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করল ও রাজধানীতে ঢুকে পড়ল।

তারপর বিদেশী সৈন্যরা রাজা ক্রীসাস-এর সব সম্পত্তি লুঠ করতে লাগল, অধিবাসীদের হত্যা করল, রাজধানীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লুঠপাট শুরু করে দিল। একজন সৈন্য স্বয়ং ক্রীসাসকে ধরে ফেলে তাকে অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত হতেই রাজার ছেলে বাবাকে রক্ষা করতে ছুটে এসে চীৎকার করে বলল:

"ওর গায়ে হাত দিও না। ইনি রাজা ক্রীসাস!"

তখন সৈন্যরা ক্রীসাসকে বেঁধে সম্রাটের কাছে নিয়ে গেল; কিন্তু সাইরাস তখন বিজয়-উৎসবে ব্যস্ত থাকায় বন্দীর সঙ্গে কথা বলতে পারল না; ক্রীসাস-এর প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়ে গেল।

নগর-উদ্যানের ঠিক মাঝখানে সৈন্যরা মস্ত বড় একটা চিতা তৈরি করল; রাজা ক্রীসাসকে তার উপরে বসিয়ে একটা শূলের সঙ্গে বাঁধল; তারপর চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল।

ক্রীসাস চারদিকে তাকাল; দেখতে পেল তারই নগর, তারই প্রাসাদ। তখন গ্রীক দার্শনিকের কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল। চোখের জলে ভেসে শুধু বলে উঠল:

"হে সোলন, সোলন!"

সৈন্যরা চিতাটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় সম্রাট সাইরাস স্বয়ং সেখানে হাজির হল মৃত্যুদণ্ড দেখতে। ক্রীসাস-এর কথাগুলি তার কানে গেল, কিন্তু তার অর্থ কিছু বুঝতে পারল না।

তখন তার হুকুমে ক্রীসাসকে চিতা থেকে নামিয়ে আনা হলে সম্রাট জানতে চাইল সে কি বলছিল। ক্রীসাস জবাব দিল:

"আমি একজন জ্ঞানী লোকের নাম করছিলাম মাত্র—তিনি আমাকে একটি পরম সত্য কথা বলেছিলেন—সে সত্য সব পার্থিব সম্পদ, আমাদের সব রাজকীয় গৌরবের চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান।"

তারপর সোলন-এর সঙ্গে তার যে কথা হয়েছিল ক্রীসাস সে সবই সাইরাসকে বলল। সে কাহিনী শুনে সম্রাটের হৃদয়ও বিগলিত হল, কারণ সে ভাবল, সেও তো মানুষ, তার ভাগ্যেই বা কি আছে তা তো সেও জানে না। কাজেই শেষ পর্যন্ত ক্রীসাস-এর প্রতি তার দয়া হল এবং দুজনই পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল।

১৮৮৬

মনিব ও ভৃত্য

Master and Man

॥ ১ ॥

সত্তরের দশকের কথা। শীতকালে সেণ্ট নিকোলাস-এর ভোজের পরের দিন। যাজক-পল্লীতে একটা উৎসব চলছিল। ফলে গির্জার সেক্সটন (অধস্তন কর্মচারী) ভাসিলি আন্দ্রীচ ব্রেখুনফ ঐ সময়টা বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল; কারণ গির্জায় উপস্থিত থাকার প্রয়োজন ছাড়াও কিছু বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনও তার বাড়িতে ছিল। ভাসিলি দ্বিতীয় গিল্ড-এর একজন ব্যবসায়ীও বটে। এতদিনে তার শেষ অতিথিটিও চলে যাওয়ায় সে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনৈক জোতদারের বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। উদ্দেশ্য, অনেক দিন আগে কথা-দেওয়া কিছু কাঠ কেনা। পাছে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতা শহর থেকে এসে তার দাঁওটা মেরে দেয় এই আশংকায় সে খুব তাড়াহুড়া করছিল। কাঠের দামের এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে ভাসিলি আন্দ্রীচ সাত হাজার রুবল দাম দিয়েছে, আর শুধু সেই কারণেই তরুণ জোতদারটি দাম হাঁকিয়েছে দশ হাজার। ভাসিলি হয় তো আরও কিছু দর-দাম করত (কারণ কাঠটা ছিল তার নিজের জেলায়, আর স্থানীয় ব্যবসায়ী ও তার নিজের মধ্যে একটা স্বীকৃত চুক্তি আছে যে একই জেলার কোন ব্যবসায়ী অপর কোন ব্যবসায়ী অপেক্ষা বেশী দাম দিতে পারবে না) কিন্তু সে শুনেছে যে, সরকারী বন-বিভাগের কন্ট্রাক্টররাও ঐ গোভিয়াৎচ্কিন্স্কি-কাঠটা কিনবার কথা ভাবছে; আর সেই জন্যই অবিলম্বে সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা পাকাপাকি করে ফেলবার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে। সুতরাং উৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের সিন্দুক থেকে সাত শ' রুবল বের করল, গির্জার দরুন যে টাকা তার কাছে ছিল তার থেকে আরও দু'হাজার তিন শ' রুবল তার সঙ্গে যোগ করল (মোট হল তিন হাজার) এবং সব টাকাটা ভাল করে গুণে নিল। তারপর সেগুলোকে পকেট-বইতে রেখে সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল।

নিকিতা দৌড়ে গেল ঘোড়া আনতে। ভাসিলির মজুরদের মধ্যে একমাত্র নিকিতাই সেদিন মদ খায় নি। নিকিতা যে সেদিন মদ খায় নি তার কারণ ছিল। আগে সেও মদ খেত। কিন্তু মাংস-ভোজন উৎসবের সময় মদ খাবার জন্য নিজের কুর্তা ও চামড়ার জুতোজোড়া বন্ধক রাখার পরেই হঠাৎ সে প্রতিজ্ঞা করে বসল আর কোন দিন মদ ছোঁবো না এবং সারা দ্বিতীয় মাসটা একদম খেল না। এমন কি বর্তমান উৎসবের প্রথম দুদিন চারদিকে মদের স্রোত বয়ে চলা সত্ত্বেও সে প্রলোভনকে জয় করে নিজের প্রতিজ্ঞাকে সে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সে একজন মুঝিক (কৃষি-মজুর)। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। পাশের গ্রাম থেকে এসেছে। লোকে বলে, সেখানকার বাসিন্দাও সে নয়। জীবনের অধিকাংশ সময় সে অপরিচিত লোকদের সঙ্গেই কাটিয়েছে। তার কাজের ইচ্ছা, পরিশ্রমশীলতা ও শক্তির জন্য; এবং বিশেষ করে তার সদয়, হাসিখুসি স্বভাবের জন্য সর্বত্রই সে যথেষ্ট আদর পেয়েছে। তবু কোন একটা জায়গাতেই সে বেশী দিন থাকতে পারে না, কারণ বছরে দুই বা ততোধিক বার মাতাল হওয়া যেন তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, আর সেই সময় সে তার যথাসর্বস্ব বন্ধক তো দিতই, উপরন্তু অত্যন্ত বেশী হৈ-হুল্লোড় ও ঝগড়াঝাটিও করত। ভাসিলি নিজেও তাকে একাধিকবার বরখাস্ত করেছে, তবু তার সততার জন্য, গৃহপালিত পশুগুলির প্রতি যত্ন-আত্তির জন্য; এবং (যেটা সব চাইতে বড় কথা) অল্প মজুরির জন্য প্রতিবারই তাকে আবার কাজে নিয়েছে। বস্তুত; এ রকম একটি মজুরের প্রকৃত বাজার-দর বছরে আশী রুবলের বদলে ভাসিলি নিকিতাকে দিত মাত্র চল্লিশ রুবল। তার উপরে এই বেতনও তাকে দেওয়া হত অনিয়মিতভাবে কিস্তিতে—কিস্তিতে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগদের বদলে ভাসিলির নিজের দোকান থেকে বেশী দাম দিয়ে কেনা জিনিসপত্রের দামবাবদই সেটা কেটে নেওয়া হত।

নিকিতার বৌ মার্থা এক সময় দেখতে ভালই ছিল। কিন্তু এখন সে খুব কড়া ধাতের স্ত্রীলোক। ছোট ছেলে ও দুটি মেয়েকে নিয়ে সে বাড়িতে থাকে। কখনও সে বাড়িতে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে স্বামীকে ডাকেও না। তার প্রথম কারণ, গত বিশ বছর যাবৎ সে একজন মিস্ত্রির সঙ্গেই আছে (গোড়ায় এই 'মুঝিক'টি অনেক দূরের কোন গ্রাম থেকে এসে এই বাড়িতে উঠেছিল); আর দ্বিতীয় কারণ; স্বামী যখন ভাল অবস্থায় থাকে তখন তাকে খুসি মত চালাতে পারলেও সে যখন মাতাল হয় তখন বৌটি তাকে আগুনের মতই ভয় করে। যেমন একবার মাতাল হবার পরে ভাল অবস্থায় বৌয়ের আঁচল ধরে থাকার প্রতিশোধ নেবার জন্য নিকিতা বৌয়ের বাক্স ভেঙে তার সব ভাল ভাল জামা-কাপড় ও চটকদার জিনিসপত্র বের করে একটা কাঠের উপর ফেলে কুড়ুল চালিয়ে সেগুলোকে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিল। অথচ তার সবটা উপার্জনই সে কিন্তু মার্থার হাতেই তুলে দেয়। এই ব্যবস্থায় সে কোন দিন আপত্তি করে নি। এই তো উৎসবের দু' দিন আগেই বৌর গাড়ি চালিয়ে ভাসিলির দোকানে গেলে নিকিতা তাকে তিন রুবল দামের সাদা গম, চা, চিনি ও এক পাঁইট ভদ্‌কা এবং নগদ পাঁচ রুবল দিয়ে দিল—যদিও তখন ভাসিলির কাছে নিকিতার পাওনা ছিল কম করেও বিশ রুবল, তবু এই বিশেষ সুবিধা দেবার জন্য সে ভাসিলিকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

ভাসিলি নিকিতাকে বলত, "টাকা-পয়সা নিয়ে তোমার ও আমার মধ্যে চুক্তি করার কি দরকার? এ তো তোমারই উপার্জন; যখন যা দরকার হবে নিয়ে নেবে। অন্য লোকের মত ব্যবসা আমি করি না—পাওনাদাররা দাঁড়িয়েই থাকবে, আর আমি চুল-চেরা হিসাব করব, জমা-খরচ মেলাব, হেনা করব, তেনা করব। আমরা দুজন নিশ্চয় পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি। আমার কাজটা ভাল করে কর, আমিও প্রতিদান দিতে পিছ-পা হব না।"

এ সব কথা বলবার সময় ভাসিলি কিন্তু সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত যে সে নিকিতার উপকারই করছে; কারণ সে এতটা আবেগের সংগে কথা বলতে পারত এবং নিকিতা থেকে শুরু করে উপরের দিককার সব কর্মচারীই তার কথাকে এমন একবাক্যে সমর্থন জানাত যে ক্রমে তার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে সে মোটেই তাদের ঠকাচ্ছে না, বরং তাদের উপকারই করছে।

নিকিতাও জবাব দিত, "নিশ্চয়, নিশ্চয়; আমি সব বুঝি ভাসিলি আন্দ্রীচ, আপনাকে আমি ভালভাবেই চিনি; আমার বাবার জন্য যেমন কাজ করতাম আপনার জন্যও আমি সেই ভাবেই কাজ করব।"

তথাপি ভাসিলি যে তাকে ঠকাচ্ছে সেটা নিকিতার অজানা ছিল না। একটা কথা সে ভালই জানত যে তার মনিবের কাছ থেকে বিস্তারিত হিসাব পাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, আর যাবার মত আরেকটা জায়গা যতদিন ঠিক না হচ্ছে ততদিন দাঁতে দাঁত চেপে এটা মেনে নিয়ে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেওয়াই ভাল।

কাজেই ঘোড়াটাকে আনবার হুকুম দেওয়ামাত্র সে তার স্বাভাবিক হাসি-খুসি মেজাজে এঁকে-বেঁকে পা ফেলতে ফেলতে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। সেখানে পেরেক থেকে ঝোলানো বুকপেটি ও ঝোম্পাসমেত ভারী লাগামের মোস্তাটাকে নামিয়ে নিয়ে খোঁয়াড়ে ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেল।

মাঝারি আকারের গাঢ় বাদামি রঙের এঁড়ে ঘোড়াটা আস্তে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠতেই নিকিতা বলে উঠল, "আহা, সোনা আমার, অনেকক্ষণ এখানে আটকা পড়ে আছ, তাই না? আর না, এবার তোমার ছোটার পালা। কিন্তু তার আগে তোমাকে জল খাওয়াতে হবে। (ঘোড়াটার সংগে সে এমনভাবে কথা বলত যেন মানুষের সব কথা সে বুঝতে পারছে)। ব্রাউনি (ঘোড়াটার নাম)-কে নিয়ে সে জলের চৌবাচ্চার দিকে এগিয়ে গেল। পেট ভরে জল খেয়ে ব্রাউনি ভিজে ঠোঁট বাঁকাতে বাঁকাতে পিছনের পা ছুঁড়তে শুরু করল। নিকিতা চেঁচিয়ে বলল, "চুপ-চুপ, ব্যাটা ক্ষুদে বদমাশ।" দু' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই ঘোড়াটা হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে ডেকে উঠল।

"বুঝেছি, আর জল খাবে না। চাইলেও তো পেতে না, তাই আর চেয়েও

কাজ নেই।" বলতে বলতে ঘোড়াটাকে নিয়ে সে উঠোনে গিয়ে হাজির হল। কেবলমাত্র রাঁধুনির স্বামী ছাড়া আর কোন মজুর সেখানে ছিল না। সে লোকটি উৎসব উপলক্ষ্যে পাশের গ্রাম থেকে এসেছে।

নিকিতা তাকেই বলল, "একবারটি ভিতরে যাবে কি বাছা? গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস কোন্ স্লেজটায় ঘোড়া জুতব—বড়টা, না ছোটটা?"

লোকটি বাড়ির ভিতরে চলে গেল। (বাড়িটার ছাদ লোহার, আর একটা টিলার উপর তৈরি)। একটু পরেই সে ফিরে এসে জানাল, ছোট স্লেজটাই দরকার। ইতিমধ্যে নিকিতা ঘোড়াটার মাথার ভিতর দিয়ে কলারটা গলিয়ে দিয়েছে এবং পিতলের কাজ-করা জিনটাকে এঁটে দিয়েছে। তারপর এক হাতে "দুগা" (ঘণ্টা বাঁধা একটা বাঁকানো ফ্রেম) ও অন্য হাতে লাগামটা ধরে চালার পাশে দাঁড় করানো স্লেজটার দিকে এগিয়ে গেল।

"ছোট স্লেজ চাই তো ছোট স্লেজই সই," বলতে বলতে সেই ঘোড়াটাকে শকট-দণ্ডের কাছে নিয়ে গেল এবং অপর লোকটির সাহায্যে ঘোড়াটাকে স্লেজের সঙ্গে জুড়ে দিল। সব কাজ শেষ। শুধু লাগামটা পরানো বাকি। তখন নিকিতা তার সহকারীকে পাঠাল প্রথমে আস্তাবল থেকে কিছু খড় আনতে ও পরে ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা বস্তা আনতে। নতুন-কাটা যইয়ের খড় স্লেজে বোঝাই করে নিকিতা বলল, "ঠিক আছে; ওতেই হবে। আরে না, না, (ব্রাউনিকে) তোমাকে আর কান দুটো খাড়া করতে হবে না।—ধর; খড়টাকে এই ভাবে বিছিয়ে তার উপর যদি বস্তাটা পেতে দেই। তাহলে তো বসতে বেশ আরাম হবে।" যেমন কথা তেমনই কাজও হল।

রাঁধুনির স্বামীকে সে বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ বাছা। এক জোড়া হাতের বদলে দুই জোড়া হাতে কাজ অনেক তাড়াতাড়ি হয়।" তারপর লাগামের দুটো খোলা প্রান্ত একত্র করে সে স্লেজে চেপে বসল এবং অধৈর্য ঘোড়াটাকে চালিয়ে উঠোনের জমাট গোবরের ভিতর দিয়ে বাড়ির ফটকে গিয়ে হাজির হল।

"মিকিতু কাকা, মিকিতু কাকা!" বলে কর্কশ গলায় ডাকতে ডাকতে সাত বছরের একটি ছেলে দ্রুত পায়ে ফটক পেরিয়ে উঠোনে নামল। ছেলেটির পরনে কালো লোমের ছোট কুর্তা, সাদা বাকলের নতুন জুতো ও আরামদায়ক টুপি। কুর্তার বোতাম আটকাতে আটকাতেই সে অনুনয়ের সুরে বলল, "আমাকেও তুলে নাও।

"এস, এস, এখানে চলে এস সোনা," বলে নিকিতা তাকে টেনে তুলল। তারপর মনিবের বিবর্ণ, শীর্ণ ছোট ছেলেটিকে পিছনে বসিয়ে খুসি মনে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

বিকাল তিনটে। বরফ পড়ছে। তাপমানযন্ত্রে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি নেমে

গেছে। আবহাওয়া যেমন ঘোলাটে তেমনই ঝোড়ো ; অর্ধেকটা আকাশই নীচু কালো মেঘে ঢাকা। উঠোনে বাতাস থেমে আছে। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামলেই বাতাসের বেগটা মালুম হয় ; দেখা যায় যে পাশের বাড়ির ছাদ থেকে বরফ যেন কুণ্ডুলি পাকিয়ে ছুটে আসছে। সবেমাত্র ফিরে এসে নিকিতা ফটকটা পার হয়ে ঘোড়ার মুখটাকে সিঁড়ির দিকে ঘুরিয়েছে, এমন সময় ভাসিলি আন্দ্রীচ্ দরজা খুলে বরফে-ঢাকা সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে এসে দাঁড়াল। তার ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট ; ভেড়ার চামড়ার কোটটা গায়ে চাপানো ও নীচের দিকে একটা কটিবন্ধ দিয়ে কসে বাঁধা। তার পায়ের জুতোর চাপে সিঁড়ির বরফে মচ্-মচ্ শব্দ উঠল।

সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে শেষটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিল। তারপর গোঁফের নীচ দিয়ে ধোঁয়াটা ছেড়ে গাড়িটার দিকে তাকাল। কোটের কলারটাকে মুখের দুদিকে এমন ভাবে তুলে দিল যে তার লোম মুখের উপর এসে পড়ল (শুধুমাত্র গোঁফজোড়া ছাড়া তার মুখটা পরিষ্কার কামানো) অথচ তার নিঃশ্বাস লেগে সেটার ময়লা হবার কোন আশংকা রইল না।

স্লেজের মধ্যে ছোট ছেলেটিকে বসে থাকতে দেখে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওরে বাঁদর, তুমি তাহলে ব্যবস্থা করে নিয়েছ ?" অতিথিদের সঙ্গে বসে মদে চুমুক দেবার ফলে ভাসিলির মনে কিছুটা রং ধরেছে ; তাই জীবনে সে যা কিছু করেছে এবং যা কিছু পেয়েছে এই মুহূর্তে সে সবই মেনে নিতে সে প্রস্তুত। এই ছেলেটিকে সে তার উত্তরাধিকারী করতে ইচ্ছুক ; তাই দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটির এই কাজে আপাতত সে বেশ খুসিই হয়ে উঠেছে। তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল তার স্ত্রী ভাসিলিয়া আন্দ্রীচা ; যেমন বিবর্ণ, তেমনই কৃশতনু। স্ত্রীটি গর্ভবতী ; তার মাথা ও ঘাড় পশমী শাল দিয়ে এমনভাবে মোড়া যে শুধু চোখ দুটি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

ভীত পায়ে ফটক থেকে কিছুটা এগিয়ে স্ত্রী বলল, "নিকিতাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হত না ?" ভাসিলি জবাব দিল না ; তার কথায় অসন্তুষ্ট হবার ভাব দেখিয়ে রেগে চোখ দুটো ঘোরাল এবং মাটিতে থুথু ফেলল।

সেই একই উৎকণ্ঠার সঙ্গে স্ত্রী বলল, "দেখ, তোমার সঙ্গে অনেক টাকা থাকছে ; তাছাড়া আবহাওয়া আরও খারাপ হতে পারে।"

ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় সে যে ভাবে প্রতিটি কথাকে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে ঠোঁট দুটোকে অস্বাভাবিকভাবে শক্ত করে রাখে, ঠিক তেমনইভাবে সে গর্জে উঠল, "আমি কি রাস্তা চিনি না যে পথ দেখাবার জন্য একজনকে সঙ্গে নিতে হবে ?"

মুখের অপর দিকটা ঢাকবার জন্য শালটা তুলে স্ত্রী আবার বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, ওকে সঙ্গে নাও, আমি মিনতি করছি।"

ভাসিলি চেঁচিয়ে বলল, "আরে! তুমি যে দেখছি গামছার মত আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাও! স্লেজে ওর জায়গা হবে কেমন করে?"

নিকিতা সানন্দে বলে উঠল, "আমি যেতে রাজী আছি। শুধু আমি চলে গেলে আর কেউ যেন ঘোড়াগুলোকে খাওয়ায়।" (শেষের কথাগুলি কর্ত্রী-ঠাকরুণের জন্য)।

স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা আমি করব নিকিতা। সাইমনকে ও কাজটা করতে বলব।"

অনেক আশা নিয়ে নিকিতা বলল, "তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি তো ভাসিলি আন্দ্রীচ?"

ভাসিলি বলল, "আরে বাবা, ভদ্রমহিলাটিকে তো খুসি রাখতে হবে। তবে যদি যেতেই চাও তাহলে আর একটু ভাল, অর্থাৎ আর একটু গরম পোষাক পরে নাও।" ভাসিলি হাসতে হাসতে চোখ কুঁচকে নিকিতার লোমের কোটটা দেখাল। সত্যি কথা বলতে কি, সারা কোটটা ফুটোয় ভর্তি—বগলের নীচে, পিঠে ও দুই পাশে; তাছাড়া কোটটা তেল-চিটে, এবড়ো-থেবড়ো, হুক ছাড়া, আর নীচের দিকে ফালি ফালি ছেঁড়া-ছেঁড়া।

নিকিতা রাঁধুনির স্বামীটিকে ডেকে বলল, "এই যে ভালমানুষ! এগিয়ে এসে ঘোড়াটা একটু ধরবে কি?"

পকেটের ভিতর থেকে জমে-যাওয়া লাল ছোট হাত দুটি বের করে ঠাণ্ডা লাগামটা হাতে নিয়ে ছোট ছেলেটি বলে উঠল, "না; না, ওটা আমি ধরছি।"

ভাসিলি দাঁত বের করে নিকিতাকে বলল, "নতুন পোষাক পরতে বেশী সময় লাগিও না যেন।"

উঠোন পেরিয়ে চাকরদের মহলের দিকে যেতে যেতে নিকিতা বাধা দিয়ে বলল, "না, না ভাসিলি আন্দ্রীচ্, আমি এলাম বলে।"

এক দৌড়ে কুটিরের মধ্যে ঢুকে পেরেক থেকে কোমরবন্ধটা তুলে নিয়ে নিকিতা হাঁক দিল, "কই গো ভালমানুষের মেয়ে আরিনিশ্কা, আমার 'খালাত্' (এক ধরনের ফ্রক-কোট) টা দাও তো। আমি মনিবের সঙ্গে যাচ্ছি।" দুপুরের খাবার পরে বেশ ভাল একটি ঘুম দিয়ে রাঁধুনি তখন স্বামীর জন্য চা বানাচ্ছিল; নিকিতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সেও তাড়াহুড়ো শুরু করে দিল। স্টোভের পাশ থেকে একটা ময়লা অথচ খোলামেলা সুতীর 'খালাত্' হাতে নিয়ে সেটাকে ঝেড়ে-পুছে পরিষ্কার করতে লাগল।

"মনিবের সঙ্গে যাবার ব্যাপারে তুমি দেখছি আমার চাইতেও বেশী উপযুক্ত।" সকলের প্রতিই ভাল কথা বলবার স্বাভাবিক প্রবণতাবশতই

নিকিতা রাঁধুনিকে কথাগুলি বলল। তারপর পুরনো ময়লা কোমরবন্ধটিকে ভাল করে জড়িয়ে প্রথমে ছোটখাট ভুঁড়িটিকে বাগে আনল, এবং তারপরে অনেক কসরৎ করে সেটাকে দিয়ে লোমের কোটটাকে বাঁধল।

"এই তো ঠিক হয়েছে," কোমরবন্ধের দুটো দিক এক করে কথাগুলি সে বলল (রাঁধুনিকে নয়, কোমরবন্ধটিকে)। "আরে বাবা, এভাবে খুলে গেলে তো চলবে না।" তারপর কাঁধ দুটো ফুলিয়ে সুতীর খালাতটা গায়ে চাপিয়ে তাকের উপর থেকে দস্তানা দুটো পেড়ে নিল।

বলল, "বাস, এবার আমি তৈরি।"

রাঁধুনি বলে উঠল, "কিন্তু তোমার পায়ের ক'া তো ভুলেই গেছ। জুতো জোড়ার অবস্থা যে শোচনীয়।"

একথা শুনে নিকিতা থমকে দাঁড়াল।

"তা বটে, হয় তো জুতোটা বদলে"—এ পর্যন্ত বলেই মত-পরিবর্তন করে সে বলে উঠল, "না, এসব করতে গেলে তিনি হয় তো আমাকে ফেলেই চলে যাবেন। তাছাড়া আমাকে তো অনেক পথ হাঁটতে হচ্ছে না।" নিকিতা লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে গেল।

স্লেজের কাছে পেঁছিলে কর্ত্রীঠাকরুণ বলল, "মাত্র একটা 'খালাত' গায়ে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে না নিকিতা?"

"মোটেই না। ঠাণ্ডা লাগবে কেন? বেশ তো গরম," কথাগুলি বলতে বলতে স্লেজের সামনের দিকে খড়গুলোকে সে এমনভাবে বিছিয়ে দিল যাতে গাড়িতে চাপবার পরে তার পা দুটো খড়ের মধ্যে ডুবে যায়। তারপর চাবুকটাকে খড়ের নীচে গুঁজে রাখল (এমন ভাল ঘোড়ার জন্য চাবুকের কোন দরকার হবে না)।

ততক্ষণে ভাসিলিও উঠে বসেছে। দু'ভাঁজ করা কম্বলে ঢাকা তার চওড়া পিঠটা স্লেজের পিছনের অংশের প্রায় সবটাই জুড়ে বসেছে। তারপর লাগামটা হাতে নিয়ে সে ঘোড়াটাকে ঠুকে দিল। গাড়ি চলতে শুরু করতেই নিকিতা লাফিয়ে গাড়ির সামনের দিকটায় উঠে একটা পা ছড়িয়ে দিয়ে সামনে ঝুঁকে বসে পড়ল।

॥ ২ ॥

গ্রামে ফিরবার জমাট বরফের পথ ধরে ছোট ঘোড়াটা জোর কদমে স্লেজটাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। গাড়ির 'রানার'-এর সামান্য ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে।

কোন অপরিচিত যাত্রী গাড়ির পিছনকার 'রানার'-এ চড়ে বসেছে বুঝতে

পেরে ভাসিলি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, "আরে! তুই আবার লাফিয়ে উঠেছিস কেন? নিকিতা, চাবুকটা দাও তো। বাচ্চা শয়তান! চাবুকে লাল করে দেব। শিগ্‌গির মায়ের কাছে পালিয়ে যা!"

বাচ্চাটা লাফিয়ে নেমে গেল। ব্রাউনি প্রথমে কদমে ও পরে দুল্‌কি চালে ছুটে চলল।

ভাসিলি যে গাঁয়ে বাস করত তার নাম ক্রেস্তি। মাত্র ছ'খানা বাড়ির একটা ছোট গ্রাম। গ্রামের শেষ প্রান্তে কামারের কুটিরের কাছে পেঁছে তারা বুঝতে পারল যে তারা যতটা ভেবেছিল বাতাস তার চাইতেও জোরে বইছে, আর সামনের পথটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। স্লেজের পথটা বারবারই বরফে ঢেকে যাচ্ছে। দু'পাশের জমি থেকে রাস্তাটা একটু উঁচু বলেই সেটাকে চিনতে পারা যাচ্ছে। সারা গ্রামাঞ্চল জুড়ে বরফের ঝড় বইছে; দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; আর যে তেলিয়াতিন্‌স্কি অরণ্যটা সাধারণত স্পষ্ট চোখে পড়ে এখন সেটাকে বয়ফ-ঝড়ের ফাঁকে ফাঁকে আবছা অন্ধকার স্তূপের মত দেখাচ্ছে। বাতাস বইছে বাঁ দিক থেকে; ফলে ব্রাউনির ঘাড়ের লোম তার চওড়া গলার উপর উড়ে পড়ছে, আর তার মাথায় গিঁট-দেওয়া লেজটা বাতাসে উড়ছে। সেই বাতাসে নিকিতার কোটের উঁচু কলারও তার গাল ও নাকের উপর চেপে বসেছে।

ঘোড়াটাকে নিয়ে ভাসিলির মনে অনেক গর্ব। সে বলল, "পথে এত বরফ পড়েছে যে ঘোড়াটা আজ ভাল ছুটতে পারছে না। একদিন সে আমাকে আধ ঘণ্টায় পাশুতিনো-তে পেঁছে দিয়েছিল।"

কোটের উঁচু কলারের জন্য কথাগুলি ভাল শুনতে না পেয়ে নিকিতা প্রশ্ন করল, "কি বললেন?"

ভাসিলি চেঁচিয়ে জবাব দিল, "বললাম যে আধ ঘণ্টা সময়ে আমি পাশুতিনো গিয়েছিলাম।"

নিকিতা বলল, "বড় মুখ করে বলবার মত কথা বটে! এ রকম ঘোড়া খুব বেশী দেখা যায় না।" তারপর কিছুক্ষণ দু'জনই চুপচাপ। কিন্তু ভাসিলিকে আজ কথায় পেয়েছে।

"তুমি কি মনে কর? সে দিন আমি তোমার স্ত্রীকে বলেছি, তার মিস্ত্রিটাকেই যেন সবটা চা খেতে না দেয়," কথাগুলি ভাসিলি বেশ চড়া গলায়ই বলল। তার ধারণা, তার মত একজন পদস্থ উচ্চশিক্ষিত লোক যে তার সঙ্গে কথা বলছে তাতেই নিকিতার ধন্য হয়ে যাওয়া উচিত; তাছাড়া ঐ মিস্ত্রিকে নিয়ে ঠাট্টাটা যে নিকিতার কাছে ভাল লাগবে না এ কথাটাও তার মাথায়ই ঢোকে নি। যাই হোক, জোর বাতাসের জন্য নিকিতা এবারও তার মনিবের কথাগুলি শুনতে পায় নি; তাই এবার সে "শিক্ষিত" গলাটা আরও চড়িয়ে তামাসার

কথাটা উচ্চারণ করল।

সব কথা বুঝতে পেরে নিকিতা বলল, "ঈশ্বর তার সহায় হোন ভাসিলি আন্দ্রীচ। তাদের ব্যাপারে আমি কখনও নাক গলাই না। তাকে দোষ দেবার মত বিশেষ কোন কাজ সে করে নি। যতদিন সে ছেলেটাকে ভাল চোখে দেখবে ততদিন আমার একটিই কথা, "ঈশ্বর তার সহায় হোন!"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই," বলে ভাসিলি প্রসঙ্গটা বদলে দিল। জিজ্ঞাসা করল, "এই বসন্ত কালে তুমি কি একটা ঘোড়া কিনছ?"

কোটের কলারটা একটু বেঁকিয়ে মনিবের দিকে ঝুঁকে নিকিতা জবাব দিল, "ইচ্ছা তো আছে, এখন পারলে হয়। ছোট ছেলেটা বড় বেড়ে উঠেছে; এখন তার চাষের কাজ শেখা উচিত; কিন্তু আমি তো সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছি।"

"দেখ, আমার নীচু-পাছা ঘোড়াটা যদি তুমি নিতে চাও, তাহলে আমি বেশী দর হাঁকব না," ভাসিলি বলল। তার মেজাজ এখন বেশ খুসি হয়ে উঠেছে। কাজেই দর-কসাকসির যে প্রবৃত্তি তার মনকে সব সময়ই প্রভাবিত করে থাকে সেটাই তাকে এখন পেয়ে বসল।

নিকিতা ভাল করেই জানে, যে নীচু-পাছা ঘোড়াটা ভাসিলি তাকে কিনতে বলছে তার দাম জোর সাত রুবলের বেশী হতে পারে না; কিন্তু ঘোড়াটা তার হাতে গছাতে পারলেই ভাসিলি হলফ করে বলবে যে ওটার দাম অন্তত পঁচিশ; আর তার দরুন নিকিতার আধা বছরের মাইনেই হয় তো কেটে রাখবে। এ সব জেনেও নিকিতা জবাব দিল, "আমার বরং ইচ্ছা, আপনি আমাকে পঁচিশ রুবল ধার দিন, আর আমি ঘোড়ার বাজার থেকে একটা কিনে নিয়ে আসি"

ঠিক ব্যবসায়ীসুলভ গলায় ভাসিলি বলে চলল, "ঘোড়াটা চমৎকার। এটা নিলে তোমার-আমার দুজনেরই ভাল। সত্যি বলছি। ব্রেখুনফ কখনও কারও ক্ষতি করবে না। আমার নিজের পকেট ফাঁক হয় তো হোক, কিন্তু অন্যের পকেট যেন না হয়। সত্যি বলছি, আমার দিব্যি। ঘোড়াটা আশ্চর্য সুন্দর।"

"সে বিষয়ে আমিও নিশ্চিত," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিকিতা বলল। এ নিয়ে আর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বুঝতে পেরে সে আবার কোটের কলারটা তুলে দিল। চোখের নিমিষে তার মুখ ও কান ঢাকা পড়ে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা তারা নীরবে পথ চলতে লাগল। নিকিতার পায়ের নীচে ও দস্তানার ফুটোর ভিতর দিয়ে বাতাস ঢুকছে। ঘাড়টা কুঁজো করে মুখের উপর টেনে-দেওয়া কলারের মধ্যে সে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল; ফলে তার ঠাণ্ডা অনেকটা কম লাগতে লাগল।

"তুমি কি বল? কারামিশেভো হয়ে ঘুরে যাব, না সোজা যাব?"

ভাসিলি এক সময় প্রশ্ন করল। কারামিশেভো হয়ে যে রাস্তাটা গেছে সেটা যেমন লম্বা তেমনই উঁচু-নীচু, কিন্তু পথের দু'পাশে খুঁটি থাকায় পথটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক কাছে হয় বটে, কিন্তু সে পথ দিয়ে লোকে বড় একটা যাতায়াত করে না ; হয় রাস্তার দু'ধারে কোন খুঁটিতে পোতা নেই, আর না হয় তো খুঁটিগুলি এতই ছোট যে এখন বরফে একদম ঢেকে গেছে।

নিকিতা এক মুহূর্ত কথাগুলি ভেবে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বলল, "কারামিশেভোর পথটা অন্য পথের চাইতে দূরত্বে বেশী হলেও সে পথে গাড়ি চালানো অনেক সহজ।"

ভাসিলি কিন্তু তবু বলল, "আর আমরা যদি সোজা পথে যাই, তাহলে একবার গর্তটায় পড়তে পারলে আর পথ হারাবার কোন ভয়ই থাকবে না। তারপর থেকে বনের ভিতর দিয়ে পথচলাটা খুবই মনোরম।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা," বলে নিকিতা আবার কোটের কলারটা তুলে দিল।

কাজেকাজেই ভাসিলির কথাই রইল। প্রায় আধা ভার্স্ট (১ ভার্স্ট = ⅔ মাইল) পথ চলবার পরে বাঁ দিকে ঘুরেই একটা লম্বা ওক গাছ পাওয়া গেল। তার ডালপালা ও তাদের গায়ে যে সব মরা পাতা তখনও লেগেছিল বাতাসের বেগে সেগুলো পথিকদের চোখে-মুখে এসে লাগছে। আবার হাল্কা বরফ পড়তে শুরু করল। ভাসিলি লাগামটা টেনে ধরে গাল ফুলিয়ে নিশ্বাস-টাকে ধীরে ধীরে গোঁফের নীচ দিয়ে ছাড়তে লাগল। নিকিতা সমানে ঝিমুচ্ছে। এই ভাবে প্রায় দশ মিনিট চলবার পরে ভাসিলি হঠাৎ চীৎকার করে উঠল।

"কি হল ?" চোখ মেলে নিকিতা জিজ্ঞাসা করল।

ভাসিলি কোন জবাব দিল না, শুধু ঘাড় বাঁকিয়ে পিছনে তাকাল। তারপর সামনে তাকাল। ঘোড়াটা তখনও কদমে ছুটছে। তার গা বেয়ে ঘাম ঝরছে।

"কি হল ?" নিকিতা আবার জিজ্ঞাসা করল।

রেগে প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি করে ভাসিলি চেঁচিয়ে বলল, "কি হল তাই বলছ ? আরে বাবা, এখন যে একটা খুঁটিও দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় আমরা পথ ভুল করেছি।"

"তাহলে এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এগিয়ে দেখে আসি।" এই কথা বলে সে আস্তে লাফ দিয়ে স্লেজ থেকে নেমে পড়ল। খড়ের নীচ থেকে চাবুকটা নিয়ে এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল—অর্থাৎ যে দিকটায় সে বসেছিল। সে বছর বরফ খুব ঘন হয়ে পড়ে নি, তাই এখনও পর্যন্ত সারাটা পথই চলবার

মত অবস্থায় আছে ; কিন্তু কোন কোন জায়গায় বরফ হাঁটুর সমান উঁচু হয়ে পড়েছে এবং নিকিতার জুতোর ডগাকে চেপে ধরছে। তবু হাঁটতে হাঁটতেই সে পা ও চাবুক দিয়ে পথটা খুঁজতে লাগল ; কিন্তু পথ উধাও হয়ে গেছে।

নিকিতা স্লেজের কাছে ফিরে এলে ভাসিলি বলল, "কি হল ?"

নিকিতা জবাব দিল, "এদিকে কোন রাস্তা নেই। অন্য দিকটা দেখতে হবে।"

ভাসিলি বলল, "সামনে একটা কালো মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। ওটা কি এগিয়ে দেখে এস।"

নিকিতা এগিয়ে গেল। কালো জায়গাটা আর কিছুই নয়, কালো মাটির উপর শীতকালের কোন শস্যকণা পড়ে সেখানে কোন চারা গজিয়েছে, আর এখন বাতাসে নড়তে থাকায় বরফের উপর তার একটা কালো ছায়া পড়েছে। নিকিতা ডান দিকে এক পাক ঘুরে স্লেজের কাছে ফিরে এল, এবং তার 'খালাত' ও জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে আবার স্লেজে চাপল।

বলল, "আমাদের ডাইনে যেতে হবে। এতক্ষণ বাতাস আমাদের বাঁ দিকে বইছিল, কিন্তু এখন সোজা এসে আমাদের মুখে লাগছে। হ্যাঁ, ডাইনেই যেতে হবে," বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই সে কথাগুলি বলল।

তার কথামত ভাসিলি সেই দিকেই ঘোড়ার মুখ ফেরাল ; অথচ বেশ কিছুটা পথ এগিয়েও তারা কোন পথের হদিস পেল না। এদিকে বাতাসের থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ; বরফও সমানেই পড়তে লাগল।

"দেখুন ভাসিলি আন্দ্রীচ, আমরা বোধ হয় পুরোপুরিই পথ হারিয়ে ফেলেছি," হঠাৎ নিকিতা বলে উঠল। তার কথার ভাবে মনে হল এতে যেন সে কিছুটা খুসিই হয়েছে। বরফের উপরে ঠেলে-ওঠা একটা কালো আলুর মাথা দেখিয়ে সে বলতে লাগল, "না হলে এটা কি ?" ভাসিলি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা থামিয়ে দিল। তার সারা গায় ঘাম ঝরছে, আর ছুটতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে।

ভাসিলিও বলল, "তাই তো, ওটা কি ?"

"এর অর্থ আমরা জাখারোভেক জমিদারিতে পেঁছে গেছি। সেখানেই তো আসারও কথা।"

"নিশ্চয়ই নয়।" ভাসিলি চেঁচিয়ে উঠল।

নিকিতাও মত বদলাল না, বলল, "হ্যাঁ, আমি যা বলেছি তাই ঠিক। স্লেজের চলার শব্দ শুনে আপনিও বুঝতে পারবেন যে আমরা একটা আলুর ক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলেছি। দেখুন না, কতগুলো আলুর মাথা উপড়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাই জাখারোভেক সব্জি-বাগান।"

"খুব ভাল জায়গায়ই এসে হাজির হয়েছি বটে!" ভাসিলি বলল। "তা এখন কি করা যাবে?"

নিকিতা জবাব দিল, "ডান দিক বরাবরই এগিয়ে যেতে হবে। এক সময় কোথাও না কোথাও পেঁছে যাবই। জাখারোভেক যদি নাও যেতে পারি, কোন ভাড়াটের গোলাবাড়ি নিশ্চয় পেয়ে যাব।"

কথাটা মেনে নিয়ে ভাসিলি নিকিতার পরামর্শমতই ঘোড়া চালিয়ে দিল। বেশ কিছু সময় এইভাবে চলল। কখনও শুধু ঘাসের জমি; আবার কখনও এবড়ো-খেবড়ো শক্ত জমাট মাঠের উপর দিয়ে স্লেজটা সশব্দে এগিয়ে চলল। কখনও বা গাড়িটা চলতে লাগল শীত বা বসন্ত কালের ফসল-কাটা মাঠের ভিতর দিয়ে। বরফের উপর দিয়ে মাথা তোলা খড়ের শুকনো নাড়াগুলো বাতাসে ভীষণভাবে দুলছে। সারাক্ষণ বরফ-পড়া সমানে চলতে লাগল। বরফের গুঁড়ো বাতাসে পাক খেয়ে ঘুরছে। ঘোড়াটা আর চলতে পারছে না; তার শরীর সাদা হয়ে গেছে; ঘাম থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে; সে এখন হাঁটিতে হাঁটিতে চলেছে। হঠাৎ পা হড়কে সে বোধ হয় একটা খানায় বা ডোবায় পড়ে গেল। ভাসিলি ঘোড়াটাকে টেনে তুলতে চাইল, কিন্তু নিকিতা সমানে চেঁচাতে লাগল:

"থামলেন কেন? এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন! ওকে তো তুলতেই হবে। তাই হবে সোনা! তাই হবে বাছা!" মহা উৎসাহে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে যেতেই নিকিতা নিজেও খানার মধ্যে আটকে গেল। যাহোক ঘোড়াটা নিজের চেষ্টায়ই উঠে দাঁড়াল। বোঝা গেল, খানাটা হাত দিয়ে কাটা।

"আমরা কোথায় এসেছি?" ভাসিলি প্রশ্ন করল।

নিকিতা জবাবে বলল, "সেটাই তো জানতে হবে। আর একটু এগিয়ে চলুন, কোথাও না কোথাও পেঁছে যাবই।"

সামনে বরফের একটা বড় কালো বস্তুকে দেখিয়ে তার মনিব বলে উঠল, 'ওটা নিশ্চয় গোভিয়াৎচ্কিনস্কি অরণ্য, তাই নয় কি?"

"হতে পারে। বরং আরও একটু এগিয়ে দেখা যাক।" নিকিতা বলল। আসলে আলোচ্য কালো বস্তুটার গায়ে কিছু দ্রাক্ষালতার শুকনো পাতা সে ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছে; কাজেই সে বুঝতে পেরেছে যে ওটা কোন জঙ্গল না হয়ে বরং কোন রকমের একটা বসতি হওয়াই সম্ভব; কিন্তু সঠিক না জেনে কোন কথা বলতে ইতস্তত করছিল। এদিকে খানাটা ছাড়িয়ে গজ বিশেক এগোবার পরেই তাদের সামনে অনেকগুলি গাছ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল এবং একটা বিষণ্ণ আওয়াজও তারা শুনতে পেল। নিকিতা ঠিকই ধরেছিল; তারা যেখানে পেঁচেছে সেটা কোন জঙ্গল নয়, এক সারি দ্রাক্ষালতা; তার কিছু শুকনো পাতা বাতাসে কাঁপছে। দ্রাক্ষাক্ষেতের কাছাকাছি পেঁছে তারা

যখন বুঝতে পারল যে ডালপালার ভিতর দিয়ে হাওয়া ঢুকেই ওই শোঁ-শোঁ বিষণ্ণ শব্দটা হচ্ছে, ঠিক তখনই ঘোড়াটা সামনে দুই পা তুলে কিছুটা উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পিছনের পা দুটোকেও টেনে তুলে বাঁ দিকে চলতে লাগল। তখন কিন্তু বরফ তার হাঁটু পর্যন্তও উঠছে না। তাহলে তারা আবার রাস্তাটা পেয়ে গেছে।

নিকিতা চেঁচিয়ে বলল, "রাস্তাটা তো পেয়ে গেছি! কিন্তু জায়গাটা যে কোথায় তা শুধু ঈশ্বরই জানেন!"

ঘোড়াটা কিন্তু কোন রকম ভড়কে না গিয়ে বরফ-ঢাকা পথ ধরে সোজা এগিয়ে চলল। প্রায় একশ' গজ যাবার পরে তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি বেড়া-দেওয়া চার-কোণা গোলাঘর। তার ছাদের উপর বরফ জমেছে; বরফের গুঁড়ো মেঘের মত উড়ে যাচ্ছে। গোলাঘরটাকে পাশে রেখে রাস্তাটা মোড় নিতেই একটা বরফের স্রোত। আরও একটু এগিয়েই দেখা গেল দুটো দালানের মাঝখান দিয়ে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। স্পষ্ট বোঝা গেল যে এই বরফ-স্রোতের ভিতর দিয়েই পথটা চলে গেছে; কাজেই এটাকে পার হতেই হবে। ঠিক তাই। বরফ-স্রোতটা পার হতেই একটা গ্রাম্য রাস্তা পাওয়া গেল। কাছাকাছি একটা উঠোনে একটা দড়ি থেকে কিছু বরফ-ভেজা কাপড়-চোপড় মেলা ছিল। সেগুলো বাতাসে সশব্দে উড়ছে। কাপড়-চোপড়ের মধ্যে ছিল দুটো শার্ট—একটা সাদা, আরেকটা লাল—, এক জোড়া পাজামা, কিছু পায়ের পট্টি ও একটা পেটিকোট।

শার্টগুলোকে উড়তে দেখে নিকিতা বলল, "কী আলসে মেয়েমানুষরে বাবা! অবশ্য কথাটা বলতেও আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে! উৎসবের জন্য জামা-কাপড়গুলোও এখনও ঠিকঠাক করে নি—এ কথা ভাবতেও কেমন লাগে!"

॥ ৩ ॥

খোলা মাঠের মধ্যে বাতাস যেমন জোরে বইছিল, রাস্তাটার মুখেও তাই; সারা পথ বরফে ঢাকা। কিন্তু গ্রামের ভিতরে ঢুকে সব কিছুই বেশ গরম, শান্ত ও ভাল লাগল। একটা উঠোন থেকে কুকুর ডেকে উঠল। আর একটা উঠোন থেকে একটি বুড়ি কোথা থেকে যেন দৌড়ে এল। তার মাথায় রুমাল জড়ানো। নবাগতদের দেখতে পেয়ে সে একটা ঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল এবং চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকাল। গ্রামের মাঝখান থেকে একটি মেয়ের গান ভেসে এল। সব কিছু মিলিয়ে

বাইরের তুলনায় এখানে বাতাস অল্প, ঠাণ্ডা অল্প, বরফও অল্প।

"আরে, এতো নিশ্চয় গ্রিশ্‌কিনো," ভাসিলি বলল।

"তাই তো," নিকিতাও বলল। সত্যি, গ্রিশ্‌কিনোই বটে।

পরে বোঝা গেল, রাস্তা থেকে ডানদিকে ঘুরে তারা প্রায় আট ভার্স্ট পথ ঘুরেছে; যদিও গোভিয়াৎস্‌স্কিনা থেকে গ্রিশ্‌কিনোর দূরত্ব পুরো পাঁচ ভার্স্ট।

অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে পথের মাঝখানে একটি লম্বা লোকের সংগে তাদের দেখা হয়ে গেল।

সে থেমে হাঁক দিল, "তোমরা কে হে?" তারপর ভাসিলিকে চিনতে পেরে শকট-দণ্ডটা ধরে স্লেজে উঠে বসল। লোকটি ভাসিলির বন্ধু। নাম ইসাই। এ জেলার সেরা ঘোড়া-চোর বলে তার কুখ্যাতি।

সে এইমাত্র ভদ্‌কা খেয়েই আসছে। নিকিতার মুখময় ভদ্‌কার গন্ধ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ইসাই বলে উঠল, "আরে, ঈশরের ইচ্ছায় কোথায় চলেছ?"

"গোভিয়াৎস্‌স্কিনা-তে যাবার চেষ্টা করছি।"

"আহা! কী পথই বেছে নিয়েছ! তোমাদের তো মালাখোভো দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

ঘোড়ার লাগাম টেনে ভাসিলি বলল, "তা যখন যাইনি তখন আর সে কথা বলে লাভ কি।"

ঘোড়াটার উপর চোখ বুলিয়ে তার লেজে হাত বুলোতে বুলোতে ইসাই বলল, "বেশ ভাল ঘোড়াটা। তা তোমরা রাতটা এখানেই থাকছ তো?"

"না বন্ধু। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।"

"কিন্তু থেকে গেলেই ভাল করতে। কিন্তু এ লোকটি কে? আরে, নিকিতা স্তেপানিচ না!"

"হ্যাঁ গো, তাছাড়া আর কে হবে," নিকিতা জবাব দিল। "কিন্তু বলে দিন তো ভাই, কি করলে আর রাস্তা হারাবে না।"

"কি করে রাস্তা হারানোর হাত থেকে রেহাই পাবে? কেন, পিছন ফিরে রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে যাও, সামনেই বড় রাস্তা পেয়ে যাবে। বাঁ দিকে ঘুরবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত একটা বড় গ্রাম না পাবে ততক্ষণ সোজা এগিয়ে যাবে, আর তারপর—ডানদিকে।"

"কিন্তু গ্রামের কাছে গিয়ে কোন্‌ পথ ধরব—গ্রীষ্মের পথ, না শীতের পথ?" নিকিতা আবার প্রশ্ন করল।

"শীতের পথ। সেখানে একটা ছোট জঙ্গল পাবে। তার উল্টো দিকেই পাবে একটা পুরনো ওক-কাঠের খুঁটি। সেখানেই বাঁক নেবে।"

সেই কথামত ভাসিলি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

"আজকের রাতটা এখানে থেকে গেলেই পারতে," পিছন থেকে ইসাই চীৎকার করে বলতে লাগল ; কিন্তু তার কথার কোন জবাব না দিয়ে ভাসিলি ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পাঁচ ভার্স্ট পথ পার হওয়া, তারও দু'ভার্স্ট পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়, বিশেষত এখন মনে হচ্ছে বরফ পড়াটা বন্ধ হয়েছে এবং বাতাসটাও পড়েছে।

পায়ে-পায়ে রাস্তা বেশ শক্ত। এখানে-ওখানে কালো কালো গোবরের নাদা। চলতে চলতে তারা সেই উঠোনটার কাছে গেল যেখানে কাপড়-চোপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছিল (সাদা শার্টটা ততক্ষণে বাতাসে ছিঁড়ে গিয়ে দড়ির সঙ্গে ঝুলছে)। আরও কিছুটা এগিয়ে তারা সেই দ্রাক্ষা-ক্ষেতে পৌঁছে গেল। তার কিছু শুকনো পাতায় তখনও বাতাস লেগে একটা শব্দ হচ্ছে। এইখানে তারা আবার খোলা মাঠে এসে পড়ল—এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল তুষার-ঝড় কমে তো নাই, বরং আরও বেড়েছে। সামনের রাস্তার উপর দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। ফলে খুঁটিগুলো না থাকলে তারা রাস্তা ঠিক রেখে চলতেই পারত না। আর বাতাসও এত জোরে বইছে যে খুঁটিগুলোর উপর নজর রাখাও শক্ত।

খুঁটির উপর নজর রাখবার জন্য ভাসিলি সামনে ঝুঁকে ভুরু কুঁচকে তাকাতে লাগল। লাগামে ঢিল দিয়ে ঘোড়ার সুবিবেচনার উপরেই ভরসা করে চলতে লাগল। অবশ্য ঘোড়াটা পথ ভুল করল না ; আঁকা-বাঁকা রাস্তায় কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে বেঁকে ক্ষুরের সাহায্যে রাস্তার সঠিক হদিশ করে ঠিক পথেই চলতে লাগল। ফলে বাতাস ক্রমেই বাড়তে থাকলেও এবং বরফ ক্রমাগত ঘনতর হয়ে পড়তে থাকলেও দু'পাশের খুঁটিগুলি ঠিকই নজরে পড়তে লাগল।

এইভাবে দশ মিনিট চলবার পরে হঠাৎ ঘোড়াটার একেবারে সামনে একটা কালো বস্তু ভেসে উঠল—সে বস্তুটাও বরফ-ঝড়ের ভিতর দিয়েই সামনে এগিয়ে চলেছে। আরও একদল যাত্রী চলেছে। ব্রাউনি দ্রুততর গতিতে ছুটে তাদের ধরে ফেলেছে। বস্তুত; তার সামনের পায়ের ক্ষুর তাদের স্লেজ-এর পিছনটায় ধাক্কা মেরেছে।

"সরে যাও! হাই! সামনে দেখে চল!" সেই স্লেজ থেকে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। ভাসিলিও লাগাম টেনে ধরল। সেই স্লেজে ছিল তিনজন 'মুঝিক' ও একটি বুড়ি। গ্রামের উৎসব সেরে তারা বাড়ি ফিরছে। 'মুঝিক'দের একজন শুকনো একটা গাছের ডাল নিয়ে ঘোড়াটার বরফে ঢাকা পিঠের উপর মারছে; আর বাকি দুজন স্লেজ-এর সামনের দিকে বসে পরস্পরের প্রতি চীৎকার ও অঙ্গভঙ্গী করছে। আর বুড়িটা বরফে একেবারে সাদা হয়ে পিছনে চুপচাপ বসে আছে।

"তোমরা কার লোক ?" ভাসিলি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"আ-আ-আ-স্কি !" জবাবে এর বেশ কিছু শোনা গেল না।

"কি বললে ?"

"আ-আ-আ-স্কি !" একজন "মুঝিক" তারস্বরে চেঁচিয়ে বলল, কিন্তু তার কথা কিছু বোঝা অসম্ভব।

যে লোকটি ঘোড়ার পিঠে ডালের আঘাত করছিল অপর একজন তাকে বলল, "জোরসে ছোটাও ! ওদের যাবার পথ দিও না !"

"মনে হচ্ছে তোমরা উৎসব থেকে ফিরছ, তাই না ?"

"ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। জোরসে চালাও সেম্‌কা ! জোরসে !"

দুটো স্লেজের গায় ধাক্কা লাগতে লাগল। আবার তারা সরে গেল। শেষ পর্যন্ত "মুঝিক"দের স্লেজটা পিছিয়ে পড়ল। তাদের পেট-মোটা, বরফে-ঢাকা ঘোড়াটা শুকনো ডালের চাবুকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় ঘন বরফের ভিতর দিয়ে তার শুকনো পাগুলোকে নিয়ে ছুটতে লাগল। তার মুখের নীচের দিককার চোয়ালটা মাছের মত ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে, নাকের ফুটো বড় হয়ে উঠেছে, কান দুটো ভয়ে পিছনে হেলে পড়েছে। কয়েক সেকেণ্ড নিকিতার ঘোড়ার সঙ্গে তাল রেখে শেষ পর্যন্ত সেটা পিছিয়ে পড়তে লাগল।

নিকিতা বলে উঠল, "মদ গিললে মানুষের এই দশাই হয়। এ রকম করলে তো টাট্টুটা মরে যাবে। এই লোকগুলো কী এসিয়ার জন্তুরে বাবা !"

বেশ কয়েক মিনিট ধরে পিছন থেকে ক্লান্ত ঘোড়াটার শ্বাস টানার শব্দ আর "মুঝিক"দের মাতালের মত হৈ-হল্লা কানে আসতে লাগল। তারপর প্রথম শব্দটা এবং ক্রমে দ্বিতীয় শব্দটাও মিলিয়ে গেল। শুধু বাতাসের শব্দ আর মাঝে মাঝে গাড়িটার "রাণার"-এর শব্দ ছাড়া আর কিছুই যাত্রীদের কানে আসছে না।

অপর স্লেজটার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে ভাসিলি বেশ উত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অধিকতর নিশ্চিন্ত ভাবে সে গাড়ি চালাচ্ছে। খুঁটিগুলোর দিকেও আর নজর রাখছে না। সবটাই ঘোড়ার উপর ছেড়ে দিয়েছে। নিকিতারও কিছুই করার নেই। তাই এ অবস্থায় সাধারণত সে যা করে থাকে তাই করল; অর্থাৎ অন্য কোন সময়ের পাওনা ঘুমটা পুষিয়ে নেবার জন্য চুপচাপ বসে ঝিমুতে লাগল। হঠাৎ ঘোড়াটা থেমে গেল। তার ধাক্কায় নিকিতা স্লেজ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল।

ভাসিলি বলল, "আমরা আবার ভুল পথ ধরেছি।"

"কি করে বুঝলেন ?"

"কারণ একটা খুঁটিও দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় রাস্তাটা ছেড়ে এসেছি।"

"বেশ তো, ছেড়ে এসে থাকি তো আবার রাস্তা খুঁজে নেব," বলেই নিকিতা স্লেজ থেকে নেমে ধীরে ধীরে পা ফেলে বরফের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটল—এই সে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার দেখা যায়, আবার উধাও—তারপর সে ফিরে এল।

স্লেজ-এ চাপতে চাপতে বলল, "ওদিকে কোন রাস্তা নেই। নিশ্চয় আরও সামনে কোথাও আছে।"

গোধূলি নেমে আসছে। তুষার-ঝড় এক রকমই চলছে—বাড়েও নি, কমেও নি।

ভাসিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মুঝিক"দের কথাবার্তাও যদি কানে আসত !"

নিকিতা বলল, "তারা আর আমাদের ধরতে আসবে না। কারণ রাস্তাটা আমরা অনেক আগেই ছেড়ে এসেছি।" একটুখানি ভেবে সে আবার বলল, "হয় তো তারাও ঐ একই কাজ করে বসেছে।"

"তাহলে এখন যাব কোন্ পথে ?" ভাসিলি জিজ্ঞাসা করল।

"ঘোড়াটাকে তার বুদ্ধিমত চলতে দিন। হয় তো ওই আমাদের ঠিকমত নিয়ে যাবে। দেখি, লাগামটা আমাকে দিন।"

ভাসিলি সঙ্গে সঙ্গে লাগামটা দিয়ে দিল, কারণ গরম দস্তানার ভিতরেও তার হাত দুটো যেন জমে গিয়েছিল। নিকিতা লাগামটা নিল; কিন্তু সেটাকে আঙুলে শুধু ধরেই রাখলে, এতটুকুও টান দেবার চেষ্টা করল না। আসলে তার প্রিয় ঘোড়াটার বুদ্ধি পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়ে সে খুবই খুসি হয়ে উঠল। সত্যি বলতে কি, কান দুটোকে একবার এদিকে আবার ওদিকে খাড়া করে বুদ্ধিমান জন্তুটা মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল।

নিকিতা চেঁচিয়ে বলল; "আরে; এ যে প্রায় কথা বলার সামিল ! আমি বলছি, কি করতে হবে তা ও ভালই জানে। এগিয়ে চল বাবা এগিয়ে চল। চুক, চুক !"

বাতাসটা এখন তাদের পিছনে লাগছে। ফলে একটু গরম বোধ হচ্ছে।

প্রিয় ঘোড়ার কাণ্ড-কারখানা দেখে খুসি হয়ে নিকিতা বলল; "আঃ, ব্যাটার কী বুদ্ধি ! কিরঘিজেনোকএর চাইতে শক্তিশালী বটে, কিন্তু একেবারে বোকা ; অথচ এটা—দেখুন, শুধুমাত্র কান দিয়ে ও কত কিছু বুঝতে পারে ! ওর তো টেলিগ্রাফেরও কোন দরকার হয় না ; এক ভার্স্ট দূর থেকেই ও সঠিক রাস্তার গন্ধ পায়।"

আর সত্যি সত্যি, আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যেই একটা কালো বস্তু—কোন জঙ্গল বা গ্রামে—তাদের সামনে দেখা দিল; ডানদিকে রাস্তার খ‍ুঁটি-গ‍ুলোও আবার চোখে পড়ল; বোঝা গেল, পথিকরা আবার ঠিক পথই ধরেছে।

হঠাৎ নিকিতা চেঁচিয়ে উঠল, "এ যে আবার সেই গ্রিশ‍্কিনো!"

সত্যি গ্রিশ‍্কিনো। বাঁ দিকে সেই গোলঘরটা চোখে পড়ল। তার ছাদের উপর বরফের গ‍ুঁড়ো উড়ছে। কাপড় মেলবার দড়িটাও দেখা যাচ্ছে। শার্ট-পায়জামাগ‍ুলো এখনও বাতাসে উড়ছে। আবার তারা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। সব কিছ‍ুই আবার গরম, শান্ত ও ভাল মনে হল। আবার সেই কর্দমাক্ত পথ, সেই গলা ও গান, সেই কুকুরের ডাক। কিন্তু তখন সন্ধ্যা নেমে আসায় কিছ‍ু কিছ‍ু জানালায় আলো জ্বলতে দেখা গেল।

অর্ধেকটা রাস্তা পার হয়ে ভাসিলি একটা বড় বাড়ির দিকে ঘোড়ার ম‍ুখটা ঘ‍ুরিয়ে সিঁড়ির কাছে পেঁ‍ৗছে লাগামে টান দিল। নিকিতা বরফে-ঢাকা আলোকিত জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল এবং চাব‍ুকের হাতলের দিক দিয়ে জানালার কাঁচে আস্তে টোকা মারল।

"কে ওখানে?" নিকিতার ডাকে কে একজন সাড়া দিল।

নিকিতা বলল, "ভাই, ক্রেস্তি থেকে ব্রেখ‍ুনফরা এসেছি। দয়া করে দরজা খোল।"

কেউ যেন জানালা থেকে সরে গেল এ রকম শব্দ পাওয়া গেল। দ‍ু'মিনিট পরেই একটা 'রেঞ্জ'-এর সাহায্যে ভিতরের দরজা খোলার শব্দ এল। তারপর বাইরের দরজার হ‍ুড়কোটা সশব্দে খ‍ুলে একটা সাদা দাঁড়িওয়ালা ব‍ুড়ো 'ম‍ুঝিক' বেরিয়ে এল। পাছে বাইরের বাতাস কুটিরের ভিতর ঢ‍ুকে যায় সেজন্য সে দরজাটাকে আধ-খোলা রেখে এসে দাঁড়াল। তার গায়ে একটা লোমের কোট; তাড়াতাড়িতে ছ‍ুটির দিনের সাদা শার্টের উপর সেটাকে চড়িয়ে এসেছে; তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি য‍ুবক; তার পরনে লাল শার্ট ও উঁচু জ‍ুতো।

ব‍ুড়ো লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি আন্দ্রীচ?"

ভাসিলি জবাব দিল, "আমরা আবার পথ হারিয়েছি বন্ধ‍ু। গোভিয়াৎস‍ু-কিনা পেঁ‍ৗছতে গিয়ে এখানে এসে পড়েছিলাম। আবার যাত্রা শ‍ুর‍ু করেও রাস্তা ভুল করে বসেছি।"

ব‍ুড়ো লোকটি তব‍ু বলল, "এ রকম ভুল হল কেমন করে? এই যে পেত্র‍ুশ‍্কা," লাল শার্ট পরা য‍ুবকটির দিকে ফিরে সে বলল—"যাও তো, উঠোনের ফটকটা খ‍ুলে দিয়ে এস।"

"নিশ্চয়, সানন্দে" কথাটা বলে য‍ুবক বারান্দা পেরিয়ে ছ‍ুটে গেল।

ভাসিলি বাধা দিল, "না, না। আমরা রাতটা এখানে থাকব না।"

"কিন্তু এখন তোমরা যাবে কোথায়? রাত হয়ে এসেছে। বরং এখানেই থেকে যাও।"

"থাকতে পারলে খুবই খুসি হতাম, কিন্তু উপায় নেই। কি জান বন্ধু, ব্যবসার ব্যাপার—আর ব্যবসা তো বসে থাকবে না।"

"তাহলে অন্তত ভিতরে তো এস; একটু চা খেয়ে গরম হয়ে নাও," বুড়ো লোকটি বলল।

"হ্যাঁ, তা খেতে পারি," ভাসিলি জবাব দিল। রাতের অন্ধকার এখনকার চাইতে আর তো বাড়বে না, কারণ শিগ্‌গিরই চাঁদ উঠবে। আমরা কি ভিতরে গিয়ে একটু গরম হয়ে নেব নিকিতা?"

"হ্যাঁ, একটু গরম হতে পারলে ভালই হয়," নিকিতা জবাব দিল। তার ভীষণ শীত করছে। স্টোভের সামনে জমাট হাত-পাগুলো একটু সেঁকে নিতে সে খুবই আগ্রহী।

তখন ভাসিলি বুড়ো লোকটির সঙ্গে কুটিরের ভিতরে ঢুকল, আর পেত্রুশ্‌কা উঠোনের ফটকটা খুলে দিলে নিকিতা স্লেজটাকে উঠোনের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে গেল। তারপর পেত্রুশ্‌কার নির্দেশমত ঘোড়াটাকে একটা চালায় নিয়ে গেল। চালার ভিতর গোবর বোঝাই করে রাখা হয়েছে। ফলে ঘোড়ার লেজটা একটা বরগাতে বেঁধে গেল। তখন বরগার উপর যে সমস্ত মোরগ আর মুরগি আশ্রয় নিয়েছিল তারা নখ আঁচড়ে ইতস্তত উড়তে শুরু করল, কতকগুলি ভেড়ী ভয়ে ছুটতে লাগল, জমাট গোবরের মধ্যে তাদের পা বসে যেতে লাগল, আর একটা কুকুর প্রথমে আস্তে ও পরে সরোষে গর্জাতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত অনধিকার প্রবেশকারীকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

নিকিতা সকলকেই কিছু-না-কিছু বলল। মুরগিগুলোর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে আর বিরক্ত করবে না বলে তাদের শান্ত করল; অকারণ ব্যস্ততার জন্য ভেড়াগুলোকে বকুনি দিল; এবং ঘোড়াটাকে বাঁধতে বাঁধতে কুকুরটার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলল।

পোষাকের উপর থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে সে বলল, "এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।" কুকুরটাকে বলল, "এই দেখ, আবার গর্জাচ্ছে! চুপ! চুপ! এই তো সব ঠিক হয়ে গেল। চুপ কর বোকা কোথাকার! চুপ! অকারণেই নিজেকে বিরক্ত করছ। আমরা তো চোর নই।"

সবল হাতে স্লেজটাকে টেনে চালার ভিতরে আনতে আনতে পেত্রুশ্‌কা বলল, "ওদের আমরা বলতে পারি আমাদের তিন পারিবারিক পরামর্শদাতা।"

"পরামর্শদাতা কেন?" নিকিতা জিজ্ঞাসা করল।

পেত্রুশ্কা হেসে বলল, "কারণ পল্সন-এর বইতে লেখা আছে দেখবে: 'কোন চোর যখন বাড়ির কাছে ঘেঁসে তখন কুকুর তার নিজের ভাষায় বলে ওঠে—জাগো! মোরগ গেয়ে ওঠে—উঠে পড়! আর বিড়াল হাত-পা ধুতে শুরু করে—তার অর্থ সে বলতে চায়: অতিথি হাজির, তাকে অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হতে হবে!"

দেখা যাচ্ছে, পেত্রুশ্কা সাহিত্যরসিক; পল্সন-এর লেখা যে একখানি-মাত্র বই তার আছে সেখানা সে মুখস্থ করে ফেলেছে! যখন একটু পানীয় পেটে পড়ে—যেমন এখন পড়েছে—তখনই বইটা তার বিশেষভাবে ভাল লাগে এবং প্রয়োজনমত তার থেকে কিছু অংশ সে আউড়ে দেয়।

"খুব খাঁটি কথা," নিকিতা মন্তব্য করল।

পেত্রুশ্কা বলল, "ঠিক বলি নি? কিন্তু তুমি তো একেবারে জমে গেছ। এবার একটু চা খেতে যাবে কি?"

"হ্যাঁ, অতি অবশ্য," নিকিতা জবাব দিল। উঠোন পেরিয়ে তারা কুটিরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

॥ ৪ ॥

যে বাড়িতে ভাসিলি উঠেছে সেটা এই গ্রামের অন্যতম ধনীর বাড়ি। এই পরিবারের সম্পত্তির মধ্যে কম করেও পাঁচ কিতা জমি, ও কিছু ভাড়া-করা জমি আছে, আর আস্তাবলে আছে ছ'টা ঘোড়া, তিনটে গরু, দুটো ষাঁড় ও গোটা বিশেক ভেড়া। সবসমেত বাড়ির বাসিন্দা বাইশ জন—চার বিবাহিত ছেলে, ছয় নাতি (তাদের মধ্যে পেত্রুশ্কার বিয়ে হয়ে গেছে), দুই পুতি, তিনটি আশ্রিত লোক, এবং চার পুত্রবধূ ও তাদের ছেলেমেয়েরা। এ ছাড়া দুই ছেলে মস্কোতে পানিপাড়ের কাজ করে; আর তৃতীয়টি আছে সেনাবাহিনীতে। বর্তমানে বাড়িতে আছে শুধু বুড়ো, তার স্ত্রী; বিবাহিতদের মধ্যে দ্বিতীয় ছেলে, যে দুজন মস্কোতে কাজ করে তাদের মধ্যে যে বড় সে (উৎসব উপলক্ষ্যে এসেছে), নানা বৌরা ও তাদের ছেলেমেয়েরা এবং একজন গ্রাম্য কথক।

যে সমস্ত একান্নবর্তী পরিবার এখনও টিকে আছে এটি তারই একটি বিরল দৃষ্টান্ত। অবশ্য যে সমস্ত গভীর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রথমে পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শুরু হয়ে ক্রমে গোটা পরিবারকেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে এ পরিবারেও সেই সব গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

কুটিরের মধ্যে টেবিলের উপর একটা ঢাকা-দেওয়া আলো জ্বলছে। তারই পরিষ্কার আলো পড়েছে নীচের বাসনপত্রের উপর, এক বোতল ভদ্কার উপর,

এবং নানা খাদ্যসামগ্রী ও ঘরের মাটির দেয়ালের উপর। এক কোণে—"সুন্দর কোণটা "তে—দুটো দেবমূর্তি ঝোলানো রয়েছে; আর তার দু'পাশে ঝোলানো রয়েছে অনেক ছবি। টেবিলে সম্মানের আসনে বসেছে ভাসিলি ; তার পরনে শুধু একটা কালো কুর্তা ; বড় বড় বাজপাখির মত চোখ মেলে সে ঘরের চারদিকে ও আশেপাশের সব্বাইকে দেখছে। তার পাশেই বসেছে টাক-মাথা সাদা দাড়িওলা পরিবারের কর্তা (তার পরনে বাড়িতে তৈরি কাপড়ের সাদা শার্ট) ; তার পর থেকে পর পর বসেছে মস্কো থেকে উৎসব উপলক্ষ্যে আগত ছেলেটি (তার পরনে বাবার মতই শার্ট, তবে কাপড়টা আরও মিহি ধরনের ; ছেলেটির খাড়া পিঠ, চওড়া কাঁধ), আর একটি চওড়া-কাধ ছেলে (যে দুই ছেলে বাড়িতে থাকে তাদের মধ্যে বড়), এবং সকলের শেষে প্রতিবেশীটি—মাথায় লাল চুল, ঢ্যাঙা, ছিপছিপে জনৈক 'মুঝিক'।

'মুঝিক'রা নৈশাহার ও ভদ্‌কা শেষ করে সবে চায়ে চুমুক দেবে এমন সময় পথিকরা এসে হাজির হল। স্টোভের পাশে রাখা সামোভারে জল ফুটছে। স্টোভের পাশে ও বাংকে নানা ধরনের ছেলেমেয়ে ঘোরাফেরা করছে, আর বুড়ি ভাসিলির পিছনে ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে ; তার সারাটা মুখে বলি-রেখা, এমনকি ঠোঁট দুটোও কুঁচকে গেছে। নিকিতা যখন ঘরে ঢুকল বুড়ি তখন মোটা গ্লাসে ভদ্‌কা ঢেলে অতিথির দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সে বলল, "আপনি কিন্তু আপত্তি করতে পারবেন না ভাসিলি আন্দ্রীচ। না, না, আপত্তি করা চলবেই না। একটু তাজা হবার জন্য এটা আপনার দরকার। খেয়ে নিন স্যার।"

ভদ্‌কার গন্ধে নিকিতার মনেও বেশ উত্তেজনা দেখা দিল—বিশেষ করে এখন সে যেমন ক্ষুধার্ত তেমনই ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে। ভুরু দুটো কুঁচকে টুপি ও 'খালাত'-এর উপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সে দেবমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তিনবার ক্রুশ চিহ্ন এঁকে সে নতজানু হল ; তারপর প্রথমে গৃহকর্তার দিকে ফিরে তাকে অভিবাদন জানাল; অভিবাদন জানাল টেবিলে উপস্থিত অন্য সবাইকে; এবং তারপর স্টোভের পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীলোকটিকে। এবং সবশেষে "সকলের জন্য শুভ উৎসব কামনা করি" বলে 'খালাত'টা খুলে ফেলল—অবশ্য তখনও সে একবারও টেবিলের দিকে তাকাল না।

নিকিতার বরফ-ঠাণ্ডা চোখ, দাড়ি ও মুখের দিকে তাকিয়ে বড় ভাই বলল, "আরে ভাই, তোমার যে সারা শরীরটাই জমে গেছে।" জবাবে নিকিতা 'খালাত'টা খুলে একটু ঝেড়ে স্টোভের উপর ঝুলিয়ে রাখল, এবং তারপর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ভদ্‌কার গ্লাসটা বাড়িয়ে দিতে সে গ্লাসটা নিয়ে তার সুগন্ধি, ঝকঝকে পানীয় গলায় ঢালতে যাবে এমন সময় ভাসিলির দিকে চোখ

পড়তেই তার নিজের ভাড়া-করা জুতো এবং মিস্ত্রি ও ছেলেকে ঘোড়া কিনে দেবার প্রতিশ্রুতির কথা তার মনে পড়ে গেল। সুতরাং দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে হাতটা টেনে নিল।

"আমি ওটা খাব না ; সবিনয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই," ভুরু কুঁচকে কথাগুলি বলে সে জানালার পাশে বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল।

"কিন্তু কেন খাব না ?" বড় ভাই জিজ্ঞাসা করল।

"কারণ আমি খেতে পারি না, খাওয়া উচিত নয়," বাঁকা চোখে নিজের ছোট ছোট দাড়ি ও গোঁফের দিকে তাকিয়ে বরফের কুঁচি ঝাড়তে ঝাড়তে চোখ না তুলেই নিকিতা জবাব দিল।

মুচমুচে বিস্কুটটাকে চিবিয়ে ভদ্কার সঙ্গে গিলে ফেলে ভাসিলি বলল, "ও জিনিস ওর ভাল লাগে না।'

দয়ালু বুড়িটি বলল, "তাহলে চায়ের পাত্রটাই আমাকে দাও তো। তোমাকে একটু চা-ই দিচ্ছি, কারণ তুমি যে জমে যেতে বসেছ। আহা বাছা, সামোভারটা নিয়ে এতক্ষণ কি করছ ?"

সামোভারটাকে একখানি তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে একটি যুবতী বলল, এই যে, হয়ে গেছে। তখন বেশ কষ্ট করে সেটাকে তুলে নিয়ে সশব্দে টেবিলের উপর রাখল।

ইতিমধ্যে ভাসিলি সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল কেমন করে সে ও তার সঙ্গী পথ ভুল করে ইতস্তত ঘুরে বেরিয়েছে, একদল মাতাল 'মুঝিক'-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে, এবং দুই-দুই বার এই গ্রামে ঘুরে এসেছে। গৃহকর্তা গল্প শুনে খুসি হয়ে তাকে বোঝাতে লাগল কি ভাবে তাদের পথ ভুল হয়েছিল, মাতাল 'মুঝিক'রাই বা কারা এবং পুনরায় যাত্রা করে ভাসিলি ও নিকিতাকে ঠিক ঠিক কোন্ পথ ধরে চলতে হবে।

প্রতিবেশীটি বলল, "আরে, মল্‌ত্চানোভ্কা পর্যন্ত পথটা তো একটা ছোট ছেলেও চিনে যেতে পারে। আর একবার সেখানে যেতে পারলে গ্রামের কাছের বাঁকটা নিলেই তো হল। সেখানে একটা ঝোপ আছে। আপনারা কি সেখানটা পর্যন্তও যেতে পারেন নি !"

বুড়ি কিন্তু মিনতির সুরেই বলল, "কিন্তু রাতটা থেকে গেলেই কি ভাল হত না ? চাকরাণীরা এখনই শোবার ব্যবস্থা করে দেবে।"

তার স্বামীও বলল, "হ্যাঁ, তাই করুন, কারণ আবারও যদি পথ হারান তাহলে অবস্থাটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াবে।"

ভাসিলি বলল, 'না, না, সত্যি থাকতে পারছি না বন্ধু। ব্যবসা ব্যবসাই। এক ঘণ্টা দেরী হলে একটা বছরই হয়তো নষ্ট হবে," কাঠের কথা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতার কথা মনে করেই সে কথাগুলি বলল ; "এবার

কি আমরা রওনা হতে পারি ?" (এই শেষের কথাগুলি নিকিতাকে)।

সেই মুহূর্তে নিকিতা কোন জবাব দিল না ; দাড়ি-গোঁফ থেকে বরফের কুঁচি ঝাড়তেই সে ব্যস্ত। পরে কর্কশ গলায় বলল :

"আর একবার পথ হারালে কি খুব ভাল হবে ?"

আসল কথা, ভদ্‌কাটা তার খুবই দরকার ছিল বলেই সে রেগে আছে। এখনও সে তৃষ্ণা মিটাতে পারে একপাত্র চা পেলে—আর সে চা এখনও তাকে দেওয়া হয় নি।

ভাসিলি আপত্তি জানিয়ে বলল, "কিন্তু আমরা কোন রকমে ঐ মোড়টা পর্যন্ত পেঁছতে পারলেই হ'ল ; তারপর তো আর পথ হারাবার ভয় নেই। সেখান থেকে তো সবটাই জংগলের ভিতর দিয়ে পথ।"

এতক্ষণে চায়ের গ্লাসটা হাতে পেয়ে নিকিতা বলল, "সেটা আপনি বুঝুন ভাসিলি আন্দ্রীচ। যদি যেতেই হয় তো যাব, বাস।"

"তাহলে চা-টা খেয়ে নাও, আর ঝটপট বেরিয়ে পড় ;"

নিকিতা কোন কথা বলল না (যদিও আপত্তিসূচকভাবে মাথাটা নাড়ল) ; সযত্নে চা-টা পাত্রে ঢেলে তার ভাপে আঙুলগুলো গরম করতে লেগে গেল। তারপর মিছরিতে একটা কামড় দিয়ে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "আপনাদের সকলের স্বাস্থ্য ভাল হোক!" এবং সকৃতজ্ঞ চিত্তে চা-টা গলায় ঢেলে দিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাসিলি বলল, "কেউ যদি আমাদের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসত।"

বড় ভাই বলল, "সে ব্যবস্থা অবশ্য করা যেতে পারে। পেত্রুশ্‌কাই ঘোড়া নিয়ে সে পর্যন্ত আপনাদের সংগে যেতে পারে।"

ভাসিলি সোল্লাসে বলে উঠল, "তাহলে তাই কর ভাই ; তোমাকে পেয়ে আমরাও খুব খুসি হয়েছি।"

বড় ভাই নির্দেশের সুরে বলল, "পেত্রুশ্‌কো, যাও, ঘোটকিটাকে সাজ পরাও।"

ওরা ঘোড়াকে ঠিকঠাক করতে গেলে ভাসিলির আগমনে যে আলোচনায় বাধা পড়েছিল সেটাই আবার উঠল। বুড়ো মানুষটি তার প্রতিবেশীর (সে আবার এখানকার 'স্তারোস্তা' গ্রাম-প্রধান-ও বটে) কাছে নালিশ জানাচ্ছিল যে তার তৃতীয় ছেলে উৎসব উপলক্ষ্যে তাকে কোন উপহারই পাঠায় নি, অথচ তার বৌকে একটা ফরাসী শাল কিনে দিয়েছে।

বুড়ো বলল, "ছেলেরা আজকাল হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।"

প্রতিবেশীও একমত হয়ে জানাল, "সত্যি তাই যাচ্ছে। তাদের সংগে আর থাকা যাবে না। বড় বেশী চালাক হয়ে যাচ্ছে। দেমচ্‌কিন-এর কথাই ধর না—সেদিন তো অতি চালাকির বশে তার বাবার হাতটাই ভেঙে দিল।"

নিকিতা কান পেতে সব কথাই শুনল। বক্তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আলোচনায় যোগ দেবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও চা খেতে অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় সে মুখ খুলতে পারছিল না। শুধু মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছিল। গ্লাসের পর গ্লাস চা খেয়ে ক্রমেই সে বেশ গরম হয়ে উঠল; তার মেজাজও ক্রমেই বেশ ভাল হয়ে উঠল। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ায় খারাপ দিকটা নিয়ে এই আলোচনা বেশ দীর্ঘ সময় ধরে চলল; আলোচনায় সকলেই এতদূর ডুবে গেল যে অন্য কোন প্রসঙ্গের কথাই উঠল না; ক্রমে এক সময় এই বিশেষ পরিবারটির ভাঙনের কথাও উঠল। বুড়োর দ্বিতীয় ছেলে সারা-ক্ষণই গম্ভীর মুখে চুপচাপ বসে সব কথা শুনছিল। সেই যে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাবার প্রস্তাব তুলেছে কথাপ্রসঙ্গে সে কথাও উঠল। আলোচনার প্রকৃত উপলক্ষ্য এটাই ছিল। কিন্তু অপরিচিত লোকের সামনে পরিবারের গোপন কথা নিয়ে আলোচনা করাটা তাদের ভদ্রতায় বাঁধছিল। শেষ পর্যন্ত বুড়ো মানুষটির আর সহ্য হল না; অশ্রুসিক্ত গলায় সে বলতে লাগল, যতদিন সে বেঁচে আছে ততদিন সে ঘর ভাঙতে দেবে না; ঈশ্বরের নামে এ বাড়িটাকে সে আগলে রেখেছে; একবার যদি ভাগ শুরু হয় তাহলে বাড়িটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে।

প্রতিবেশী বলল, "হ্যাঁ, মাত্‌ভিফ্‌দের বেলায়ও তাই হয়েছে। এক সময় কী আরামের বাড়িই না ছিল—কিন্তু এখন ভাগাভাগি হয়ে এমন হয়েছে যে কারও হাতেই কিছু নেই।"

ছেলের দিকে ফিরে বুড়ো বলল, "আমাদের জন্যও কি তুমি তাই চাও?"

ছেলে কোন জবাবই দিল না। ঘরে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল। এমন সময় ঘোড়ার যথাযথ ব্যবস্থা করে পেত্রুশ্‌কা সেখানে ফিরে এল। কয়েক মিনিট ধরে কথাবার্তা শুনে সে হাসতে লাগল।

বলল, "পলসুন-এর একটা গল্প আমার মনে পড়ে গেল। কোন বাবা তার ছেলেদের একটা ডাল ভাঙতে দিল। কোন ছেলেই ভাঙতে পারল না। কিন্তু ছোট ছোট ডালপালাগুলি একটা একটা করে ভাঙা—সে তো খুবই সহজ। আমাদের বেলায়ও তাই হবে," ভাল রকম হেসে সে কথা শেষ করল। "আমি কিন্তু যাবার জন্য তৈরি।"

ভাসিলি বলল, "তুমি তৈরি হলে আমরাও উঠছি। আর আলাদা হবার ব্যাপারে—আপনি কিন্তু কখনও সায় দেবেন না ঠাকুর্দা। এ সংসার তো আপনার হাতে গড়া, কাজেই আপনিই এর হর্তা-কর্তা। দরকার হলে 'মিরোভয়' (স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট)-এর কাছে যাবেন। আপনার হয়ে তিনিই সব মিটিয়ে দেবেন।"

উচ্ছ্বসিত বেদনায় বুড়ো মানুষটি বলে উঠল, "কিন্তু এই ব্যবহার—এই

ব্যবহার ! এদের সঙ্গে বাস করা যায় না। এতো পুরোপুরি শয়তানের কাণ্ডকারখানা।"

এদিকে নিকিতা তখন পঞ্চম গ্লাস চা খাওয়া শেষ করেও গ্লাসটা ফিরিয়ে না দিয়ে পাশেই রেখে দিয়েছে ; মনের আশা, যদি ষষ্ঠ গ্লাসও মিলে যায়। কিন্তু সামোভার-এ আর জল ছিল না, কাজেই নতুন করে আর চা তৈরী হল না, ভাসিলিও লোমের কোটটা গায়ে চড়িয়ে ফেলেছে। কাজেই আর কোন আশা নেই দেখে মিছরির বাকি টুকরোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং কুর্তার কোণ দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে 'খালাত'টা গায়ে জড়াতে এগিয়ে গেল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গরম আলোকিত ঘরটা ছেড়ে বাইরের অন্ধকার, ঠাণ্ডা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বাতাসে দরজার পাল্লায় খট্-খট্ শব্দ হচ্ছে, আর বরফের চাঁই উড়ে এসে উঠোনে জমা হচ্ছে। পরক্ষণেই সে অন্ধকার উঠোনে নেমে গেল।

ভেড়ার চামড়ার কুর্তা পরে পেত্রুশ্কা উঠোনের মাঝখানে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে পল্‌সন-এর কবিতা আবৃত্তি করছে :

"ঘন মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে,
ঝড়ো হাওয়ায় বরফ আসে ধেয়ে ;
এই গর্জায় বুনো জন্তুর প্রায়
(আবার) কখনও শিশুর ঘ্যান্-ঘ্যান্ শোনা যায়।"

নিকিতা তালে তালে মাথা নাড়তে নাড়তে লাগামটা হুক থেকে তুলে নিল। একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বুড়ো ভাসিলিকে স্লেজ পর্যন্ত যেতে আলো দেখাতে চেষ্টা করল, কিন্তু চোখের নিমেষেই আলোটা নিভে গেল। উঠোনে দাঁড়িয়েই বোঝা গেল, ঝড়ের বেগ আগের চাইতে বেড়েছে।

ভাসিলি ভাবল, "কী ভয়ংকর আবহাওয়া! হয় তো আমরা কোন দিনই সেখানে পেঁছিতে পারব না। যাই হোক, ব্যবসার-কথা তো ভাবতেই হবে। তাছাড়া, নিজেও তৈরি হয়েছি, গৃহকর্তার ঘোড়ায়ও জিন বাঁধা হয়েছে। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন জায়গামত পেঁছিতে পারি।"

বুড়ো লোকটিও মনে মনে ভাবল, এরা রওনা না হলেই ভাল করত, কিন্তু সে তো আগেই তাদের বারণ করেছে, তারা শোনে নি। বার বার বলে তো কোন লাভ নেই।

সে আরও ভাবল, হয় তো বুড়ো বয়সের জন্যই আমাকে এতটা চিন্তিত করে তুলেছে, ওরা নিরাপদেই পেঁছে যাবে। আমাদেরও শুতে যাবার সময় হয়ে গেছে। আজ রাতের মত অনেক কথা হয়েছে।

পেত্রুশ্কার মনে বিপদের কোন চিন্তাই হয় নি। রাস্তা এবং আশপাশের

সব কিছু সে এত ভাল চেনে যে ভয়ের কোন কারণই থাকতে পারে না। নিকিতার অবশ্য যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিজের ইচ্ছামত না চলে অপরের সেবা করতেই সে অভ্যস্ত। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাদের যাত্রায় বাধা দেবার মত কেউই রইল না।

॥ ৫ ॥

ভাসিলি বারান্দা পেরিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে ভাল করে দেখে নিল স্লেজটা কোথায় আছে, তারপর লাগাম হাতে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসল।

"ঠিক আছে, চালাও," সে চেঁচিয়ে বলল। নিজের স্লেজে হাঁটু ভেঙে বসে পেত্রুশ্‌কা তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, আর সামনে একটা ঘোটকি আছে বুঝতে পেরে ব্রাউনি চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডাকতে ডাকতে তার পিছনে ছুটতে লাগল। এই ভাবে গ্রামের রাস্তায় পড়ে ঘর-বাড়ি পেরিয়ে আগেকার সেই রাস্তাটাই ধরল—যে রাস্তাটা চলে গেছে বরফ-ভেজা জামা-কাপড় মেলে-দেওয়া (সে জামা-কাপড় এখন আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না) উঠোনের পাশ দিয়ে, বরফ-ঢাকা গোলাঘরটিকে পাশে রেখে, একেবারে সেই শোঁ-শোঁ শব্দ-করা দ্রাক্ষাক্ষেতের পাশ দিয়ে। এই ভাবে যাত্রীরা আর একবার যেন বরফের সমুদ্রে গিয়ে পড়ল—সে সমুদ্র মাথার উপরে ও পায়ের নীচে সমানভাবে গর্জন করে চলেছে। বাতাস এত জোরে বইছে যে তার ধাক্কায় স্লেজটা একদিকে কাত হয়ে পড়ছে, আর ঘোড়ারও পা হড়্‌কে যাচ্ছে। পেত্রুশ্‌কা জোর গলায় চেঁচিয়ে তার ঘোড়াটিকে উৎসাহ দিতে লাগল, আর তা দেখে ঘোড়াটাও সমানে-সমানে ছুটতে লাগল।

প্রায় দশ মিনিট চলবার পরে পেত্রুশ্‌কা এক পাশে সরে গিয়ে চীৎকার করে কি যেন বলল; কিন্তু বাতাসের শব্দে ভাসিলি বা নিকিতা তার কিছুই বুঝতে পারল না। তবে এটা বুঝতে পারল যে তারা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেছে। পেত্রুশ্‌কাও গাড়ির চাকা ডাইনে ঘুরিয়ে দিল। ফলে যে বাতাস এতক্ষণ তাদের পাশে লাগছিল এবার সেটা সোজা মুখে এসে লাগছে, আর বরফের ভিতর দিয়ে ডান দিকে কালো মত একটা কিছু দেখা যাচ্ছে। ওটা নিশ্চয় মোড়ের মাথার সেই ঝোপটা।

পেত্রুশ্‌কা বলল, "ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ পেত্রুশ্‌কা!"

"ঝড়ে আকাশ ছেয়ে গেছে," বলেই ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিয়ে ভাসিলি বলল, "বাপরে! কত কবিতাই যে

আওড়াতে পারে!"

"হ্যাঁ, বড় ভাল ছেলে, একটি সত্যিকারের সৎ 'মুঝিক'," নিকিতা বলে উঠল। তারপর দু'জন চলতে লাগল। বাড়িতে যে চা-টা খেয়ে এসেছে তার গরম যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে সে জন্য নিজেকে বেশ ভাল করে জড়িয়ে নিল, ঘাড় দুটোকে এমনভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল যে দাড়িতে গলাটা বেশ ঢেকে গেল, তারপর চুপচাপ বসে রইল। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কালো রেখার মত দুটো শকট-দণ্ড, আর ঘোড়াটার দুটো পাশ ও বাতাসে আন্দোলিত তার লেজটা। মাঝে মাঝে রাস্তার খুঁটি চোখে পড়ায় বুঝতে পারছে যে স্লেজটা ঠিক পথেই চলেছে, কাজেই তার কিছুই করবার নেই। ভাসিলিও লাগামটাকে আলগা হাতেই ধরে রেখেছে, আর ঘোড়াটা তার নিজের ইচ্ছামতই চলছে। তবু গ্রামে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেলেও ব্রাউনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটছে, আর মাঝে মাঝেই এ-দিক ও-দিক মুখ ঘোরাতে চাইছে; তখন ভাসিলিও লাগাম টেনে ধরেছে।

"ডাইনে ওই একটা খুঁটি—দুই—তিন," ভাসিলি গুণতে লাগল। সামনেই অন্ধকারে কিছু দেখতে পেয়ে নিজের মনেই বলল, "ওই তো সামনে সেই জঙ্গলটা। অবশ্য যেটাকে সে জঙ্গল মনে করেছিল আসলে সেটা একটা ঝোপ মাত্র। সেটা পার হয়ে আরও পঞ্চাশ গজের মত অগ্রসর হতেই—আরে! কোথায় সে জঙ্গল, আর কোথায়ই বা চার নম্বর খুঁটি!

ভদ্‌কা ও চায়ের উত্তেজনায় লাগামে একটা ঝাঁকি দিয়ে ভাসিলি ভাবল, ভয় কিসের; এক মিনিটের মধ্যেই জঙ্গলে পেঁছে যাব। বাধ্য, অনুগত জন্তুটা চালকের নির্দেশ মতই কখনও আস্তে, কখনও কিছুটা জোরে চলতে লাগল, যদিও সে বুঝতে পারছিল যে তারা ভুল পথেই চলেছে। আরও দশ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু জঙ্গলের দেখা নেই।

শেষ পর্যন্ত লাগাম টেনে ধরে ভাসিলি চেঁচিয়ে বলল, "আবার আমরা পথ হারিয়েছি!" কোন কথা না বলে স্লেজ থেকে নেমে নিকিতা খালাতটাকে ভাল করে চেপে ধরে বরফের উপর ইতস্তত ঘুরতে লাগল। প্রথমে এ-পাশে তারপর ও-পাশে; তিনবার তো একেবারে উধাও হয়ে গেল। যা হোক; শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে সে ভাসিলির হাত থেকে লাগামটা নিল।

"আমাদের সোজা ডান দিকে যেতে হবে," ঘোড়ার মুখটা সেইদিকে ঘুরিয়ে সে দৃঢ় গলায় সোজাসুজি কথাগুলি বলল।

"ঠিক আছে; ডাইনে যেতে হয় তো ডাইনেই চল," লাগামটা ছেড়ে দিয়ে অবশ হাত দুটোকে আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে দিতে ভাসিলি বলল। নিকিতা আর কোন কথা না বলে শুধু ঘোড়াটাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, "সোনা আমার, এবার তোমার সাধ্যমত যা পার তা কর!" কিন্তু নিকিতা

লাগাম নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করুক, ঘোড়া কিন্তু ধীর পায়েই চলতে লাগল। জায়গায়-জায়গায় বরফ হাঁটু-সমান গভীর; ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে ঝাঁকি খেতে খেতে স্লেজটা তার ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলল। এই সময় নিকিতা চাবুকটা হাতে নিয়ে একবার ব্যবহারও করল; চাবুকে অনভ্যস্ত ঘোড়াটা সামনে লাফ দিয়ে জোর কদমে পা ফেলল—কিন্তু অনতিকাল পরেই আবার সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলতে শুরু করল। এইভাবে পাঁচ মিনিট কেটে গেল। চারদিকে এমন অন্ধকার, আর এমনভাবে বরফ ছুটছে যে প্রায় কিছুই নজরে আসছে না।

হঠাৎ ঘোড়াটা থেমে গেল, যেন সামনে কোন কিছুর আভাষ পেয়েছে। লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে নিকিতা আস্তে লাফ দিয়ে নেমে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য ঘোড়ার মাথার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াটাকে ছাড়িয়ে একটা পা ফেলামাত্রই তার পা দুটো কিসে যেন ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে উঠল, আর সে একটা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

"উঃ! উঃ! উঃ!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সে অনবরত গড়াতে লাগল আর নিজেকে থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলল। একেবারে নীচে গিয়ে একটা বরফের স্রোতে তার পা দুটো আটকে যাওয়াতে তবে তার গড়ানো বন্ধ হল; কিন্তু তার হাতের চাপে উপর থেকে এক চাঙড় বরফ তার মাথার উপর ভেঙে পড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঘাড়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কোটের কলার থেকে বরফের কুঁচি ঝাড়তে ঝাড়তে যেন বরফের স্রোত আর খাদটার কাছেই নালিশ জানিয়ে নিকিতা বলল, "তোমরা কেমন ধারা হে?"

"নিকিতা, নিকিতা!" উপর থেকে ভাসিলির গলা ভেসে এল, কিন্তু নিকিতা জবাব দিল না। জবাব দেবার মত সময়ও তার তখন ছিল না, কারণ নিজেকে ঝেড়ে-ঝুড়ে খাড়া করতে ও চাবুকটা খুঁজতেই সে তখন ব্যতিব্যস্ত; ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বার সময়ই চাবুকটা তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। সেটাকে খুঁজে পেয়ে আবার সে যেখান থেকে নেমে এসেছিল সেখানেই উঠে যেতে চেষ্টা করল; কিন্তু বুঝল যে ওঠা অসম্ভব, কারণ যতবার সে উপরে উঠতে চেষ্টা করছে ততবারই গড়িয়ে আরও নীচে নেমে যাচ্ছে; কাজেই শেষ পর্যন্ত নীচ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে উপরে উঠবার একটা পথ খুঁজতে লাগল। যাহোক, যেখানটায় সে পড়ে গিয়েছিল তার থেকে কয়েক গজ দূরেই এমন একটা জায়গা সে পেয়ে গেল যেখান থেকে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকমে উপরে উঠে গেল এবং ঘোড়াটা যেখানে থাকতে পারে বলে তার মনে হল সেই দিক পানে এগোতে লাগল। ঘোড়া এবং স্লেজ দুই-ই অদৃশ্য, কিন্তু যেহেতু বাতাসের উল্টো দিক থেকে সে

এগোচ্ছিল তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাসিলির চীৎকার ও ব্রাউনির চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক তার কানে এসে লাগল, আর পরক্ষণেই সত্যি সত্যি সে তাদের দেখতেও পেল।

চেঁচিয়ে বলল, "আসছি, আমি আসছি। আপনারা এত হৈ-চৈ করছেন কেন?"

একেবারে স্লেজের কাছে পেঁছে তবে সব দৃশ্যটা তার কাছে পরিষ্কার হল। ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভাসিলি—বাইরের অস্পষ্ট অন্ধকারের বুকে তার মূর্তিটাকে বেশ বড়সড় দেখাচ্ছে।

মনিব রেগে বলল, "এ ভাবে পড়ে গেলে কেমন করে? ফিরে চল, অন্তত গ্রীশ্‌কিনো-তে ফেরবার চেষ্টা তো করতেই হবে।"

"তা যেতে পারলে তো খুসিই হতাম," নিকিতা পাল্টা ফোড়ন কাটল। "কিন্তু কোন্ পথে যাব? এই খাদের মধ্যে একবার পড়লে আর উঠতে হবে না। আমি বলে তাই অনেক কষ্টে উঠে এসেছি।"

"কিন্তু এখানেও তো পড়ে থাকতে পারি না। যেখানে হোক যেতে তো হবেই," ভাসিলি পাল্টা চাপান দিল।

নিকিতা কথা বলল না। স্লেজের চাকার উপর বসে জুতো খুলে তার ভিতরে জমা বরফ ঝেড়ে ফেলতে লাগল। সে কাজ শেষ করে এক মুঠো খড় যোগাড় করে বাঁ পায়ের একটা ফুটো বন্ধ করে দিল।

ভাসিলিও উচ্চবাচ্য করল না। সব কিছুই সে নিকিতার উপর ছেড়ে দিতে চায়। জুতোয় পা ঢুকিয়ে নিকিতা স্লেজে চড়ে বসল; হাতে দস্তানা পরে লাগাম তুলে নিল; তারপর খাতের পাশ বরাবর এগিয়ে চলল। শ'-খানেক গজ চলবার পরেই ঘোড়াটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের সামনে আবার সেই খাত।

নিকিতা আবার নেমে গিয়ে বরফের উপর নজর রেখে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ তার দেখা নেই। তারপর স্লেজের উল্টো দিক থেকে সে এসে হাজির হল।

চেঁচিয়ে ডাকল, "আপনি আছেন তো আন্দ্রীচ?"

ভাসিলি জবাব দিল, "হ্যাঁ, ব্যাপার কি?"

"এ পথে বেরনো যাবে না; যেমন অন্ধকার তেমনই চারদিকে অনেক গিরি-খাদ। বাতাসের উল্টো দিকে আমাদের ফিরে যাবার চেষ্টা করতে হবে।"

ফিরতি পথে কিছুটা চলেই তারা থামল। নিকিতা আবার নীচে নেমে বরফের উপর হামাগুড়ি দিতে লাগল। আবার গাড়িতে চেপে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়ল; আর শেষ পর্যন্ত প্রায় দম আটকে আসার মত অবস্থায়

স্লেজের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কি হল?" ভাসিলি জিজ্ঞাসা করল।

"আর কি হবে! আমার অবস্থা সঙ্গীন; ঘোড়ার অবস্থাও প্রায় তাই।"

"তাহলে কি করা যায়?"

"এক মিনিট সবুর করুন।" নিকিতা আবার চলে গেল, কিন্তু তখনই ফিরে এল।

"আমার পিছনে পিছনে আসুন," ঘোড়াটার সামনে হেঁটে যেতে যেতে সে বলল। ভাসিলি এখন আদেশ দেওয়া বন্ধ করেছে; নিকিতা যা বলছে তাই করছে।

"এই পথে—আমার সঙ্গে আসুন," চেঁচিয়ে কথাগুলি বলে নিকিতা হঠাৎ ডাইনে মোড় ঘুরল। মাথাটা ধরে ব্রাউনিকেও নীচের একটা বরফ-স্রোতের দিকে টেনে নিয়ে চলল। ঘোড়াটা প্রথমে আপত্তি করলেও যেন বরফ-স্রোতটাকে পার হবার জন্যই ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু পার হতে না পেরে তার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গেল।

ভাসিলি তখনও তার আসনেই বসে ছিল। নিকিতা চেঁচিয়ে বলল, "স্লেজ থেকে বেরিয়ে আসুন।" তারপর শকট-দণ্ডটাকে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়াটাকে স্লেজ-শুদ্ধ তুলে আনতে চেষ্টা করল।

ব্রাউনির উদ্দেশ্যে বলল, "টানো বাছা আমার! ভালভাবে একটা টান, বাস, তাহলেই কাম ফতে। হেঁইও! আর একটা টান!"

ঘোড়াটা সাধ্যমত চেষ্টা করল, আবার চেষ্টা করল, কিন্তু নিজেকে সেই বরফ-স্রোতের ভিতর থেকে মুক্ত করতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; বুঝি বা অবস্থাটা ভেবে দেখতে লাগল।

নিকিতা ব্রাউনিকে আদর করে বলল, "এস, এস বাবা; এভাবে হবে না। আর একবার সকলে মিলে চেষ্টা করা যাক।" সে একদিক থেকে আর ভাসিলি আর একদিক থেকে শকট-দণ্ডটা ধরে টান দিল। ঘোড়াটা একবার মাথাটা নেড়েই দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"এই তো চাই! এ ভাবে তো আর বরফের মধ্যে ডুবে থাকতে পার না?" উৎসাহভরে নিকিতা বলে উঠল।

আর একটা ঝাঁপ—আবার—তৃতীয়বার বরফ-স্রোতটা পার হয়ে ঘোড়াটা কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। নিকিতা স্লেজটাকে আরও খানিকটা টেনে নিল; কিন্তু দুটো ভারী কোটের ভারে ভাসিলি এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল যে সে-চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সে আবার স্লেজেই চেপে বসল।

গ্রামটা ছাড়বার আগেই কোটের কলারের চারপাশে যে রুমালটা সে বেঁধে নিয়েছিল সেটাকে খুলে ভাসিলি বলল, "আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।"

নিকিতা জবাব দিল, "বেশ তো; তাড়াহুড়োর কিছু নেই। চুপ করে বসুন; আমি ঘোড়া চালাচ্ছি।"

ভাসিলি স্লেজের ভিতরে বসল। আর নিকিতা ঘোড়াটাকে নিয়ে প্রায় দশ গজ এগিয়ে একটা উৎরাই ধরে কিছুটা নেমে আবার কিছুটা উপরে উঠে থামল।

যেখানটায় সে থামল সেটা ঠিক খাত নয়। আশেপাশের পাহাড় থেকে যে ভাবে বরফ ছুটে আসছে তাতে ঐ গিরি-খাতের মধ্যে থাকলে বরফের নীচেই তারা চাপা পড়ে যেত। যে জায়গাটায় তারা এসে দাঁড়িয়েছে সেখানটায় পাহাড়ের খাঁজে হাওয়াটা লাগে না বলে অনেকটা নিরাপদ। মাঝে মাঝে বাতাসটা একটু কমছে; কিন্তু সে খুবই অল্পক্ষণের জন্য; আর তার পরেই যেন সেটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য তুষার-ঝড় দশগুণ বেড়ে পথিকদের নির্মম নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করছে। এক সময় নিকিতার সংগে পরামর্শ করবার জন্য স্লেজ থেকে নামতে গিয়ে ভাসিলি এমন একটা প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মুখে পড়ে গেল যে সেটা না থামা পর্যন্ত দুজনই চুপচাপ উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ব্রাউনি সারাক্ষণ কান দুটো খাড়া করে বিরক্তিতে মাথা নাড়তে লাগল। বাতাসটা একটু কমলে হাতের দস্তানা খুলে কোমরে গুঁজে নিকিতা হাত দুটো ঘসে নিয়ে ঘোড়ার গলা থেকে লাগামটা খুলতে শুরু করল।

""ওটা করছেন কেন?" ভাসিলি জিজ্ঞাসা করল।

নিকিতা জবাব দিল, "কারণ আর কিছু করার নেই। আমার শরীর ক্লান্তিতে একেবারেই ভেংগে পড়েছে।"

"তাহলে কি আমরা আর এগোবার চেষ্টাও করব না?"

"না, অকারণেই আমরা ঘোড়াটাকে খাটিয়ে মারছি," নিকিতা বলল। যেন নতুন কোন কাজের অপেক্ষায়ই ঘোড়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু সেও যেন ঘামে-ভেজা শরীরটাকে আর খাড়া রাখতে পারছে না। "ব্রাউনি তো চলতে চাইছে, কিন্তু সে যে পায়ের উপর দাঁড়াতেই পারছে না। রাতটা এখানে কাটানো ছাড়া ওর পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়।"

এমনভাবে নিকিতা কথাগুলি বলল যেন তারা কোন সরাইখানার উঠোনে থাকবার বন্দোবস্ত করেছে। ঘোড়ার কলারের দড়ি খুলতে খুলতে এক সময় কলারটা দু-ফাঁক হয়ে খুলে পড়ল।

ভাসিলি চেঁচিয়ে বলল, "কিন্তু এখানে যে আমরা বরফে জমেই মারা যাব।"

"তাই নাকি? তাহলেই বা কি করা যাবে? এ ছাড়া আর কিছু করা যাবে না," জবাবে নিকিতা এর চাইতে আশার বাণী কিছু বলতে পারল না।

॥ ৬ ॥

দুটো ভারী কোট চাপা দিয়ে, বিশেষ করে বরফ-স্রোতের মধ্যে যে ধকলটা গেল তার পরে ভাসিলির বেশ গরম লাগবারই কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন বুঝতে পারল যে সেখানেই তাদের রাতটা কাটাতে হবে তখনই যেন তার শিরদাঁড়া বেয়ে বরফের একটা স্রোত নেমে গেল। মন থেকে এই ভয়টাকে তাড়াবার জন্য স্লেজে গ্যাঁট হয়ে বসে সে সিগারেট-দেশলাই বের করল।

এদিকে নিকিতা ঘোড়াটাকে জোয়াল থেকে খুলে দিল, জিনসমেত তার সব সাজ-পোষাক খুলে নিল আর সেই সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে বকতে লাগল।

"এবার তো ছাড়া পেয়ে গেল। অল্প-সল্প যা আছে তাও খুলে দিচ্ছি। তারপর খড় দেব।" যেমন কথা তেমনই কাজ। "ভাল করে খেয়ে নাও, অনেকটা ভাল লাগবে।"

ব্রাউনি কিন্তু তাতেও শান্ত হল না। লেজটা তুলে পা ঠুকতে লাগল। এক পা থেকে আর এক পায়ে শরীরের ভর রেখে সে নিকিতার আস্তিনে মাথা ঘসতে লাগল। খড়ের খাদ্যও যেন তার মনোমত হল না। এক কামড় মুখে তুলেই আবার ছুঁড়ে দিল, বাতাস এসে খড়গুলোকে উড়িয়ে নিয়ে বরফের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

নিকিতা ভাবল, "একটা বিপদ-সংকেত বানালে তো মন্দ হয় না। স্লেজ-টাতে বাতাসের দিকে একটুখানি ঠেলে দিয়ে জিনের পট্টি দিয়ে শকট-দণ্ড দুটিকে ভাল করে একত্রে বেঁধে সেটাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

দস্তানা দুটোকে ঝেড়ে হাতে পরতে পরতে সে বলল, "কেউ যদি এ পথ দিয়ে যায় তাহলে এই দণ্ড দেখে নিশ্চয় আমাদের উঠে যেতে সাহায্য করবে।"

এদিকে ভাসিলি লোমের কোটটাকে গা থেকে খুলে তাই দিয়ে একটা আবরণের মত তৈরি করেছে। তারপর ইস্পাতের দেশলাই-বাক্সে একটার পর একটা কাঠি ঠুকতে লাগল। কিন্তু ঠাণ্ডায় তার হাত এমন ভীষণভাবে

কাঁপছিল যে কাঠিগুলো হয় জ্বললই না, আর না হয় তো যেটা জ্বলল সেটাও সিগারেট পর্যন্ত তুলতে না তুলতেই বাতাসে নিভে গেল। শেষ পর্যন্ত একটা কাঠি ঠিক মত জ্বলে মুহূর্তের জন্য একটুখানি আলো দেখাল। তার হাতের তর্জনীতে পরা সোনার আংটিটা সে আলোয় ঝিকমিক করে উঠল। সিগারেট ধরল। লোভীর মত পরপর দুটো জবর টান দিল। ধোঁয়াটা গিলে ফেলে আবার গোঁফের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দিল। যেই সে তৃতীয় টানটি দিতে যাবে অমনই বাতাস ছুটে এসে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটাকে উড়িয়ে নিয়ে খড়ের মধ্যে ফেলে দিল।

তথাপি যেটুকু ধোঁয়া ভিতরে ঢুকেছিল তাতেই তার মেজাজ বেশ খুসি হয়ে উঠল। নির্ভীক গলায় বলল, "রাতটা যদি এখানে কাটাতেই হয়, বেশ তো, কাটাব। বাস্। এক মিনিট সবুর কর, আমি একটা নিশান উড়িয়ে দিচ্ছি।"

যে রুমালটা ভাসিলি গলা থেকে খুলে স্লেজের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল সেটাকে তুলে নিয়ে হাতের দস্তানা খুলে সে স্লেজের উপরে উঠে গেল। তারপর আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রুমালটাকে শকট-দণ্ডের মাথায় বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রুমালটা বাতাসে উড়তে লাগল—এই দণ্ডের সঙ্গে একবার জড়িয়ে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই বাতাসে খুলে গিয়ে পত্ পত্ করে উড়ছে।

নেমে এসে নিজের কাজে খুসি হয়ে ভাসিলি বলল, "কেমন, একটা বুদ্ধির কাজ করি নি? এবার, দুজন পাশাপাশি শুতে পারলে বেশ গরম হত; কিন্তু মনে হচ্ছে এখানে দুজনের মত জায়গা হবে না।"

নিকিতা বলল, "সেজন্য ভাববেন না; আমার ব্যবস্থা আমিই করে নেব। কিন্তু তার আগে ঘোড়াটাকে ঢাকবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বেচারি ভয়ানক ঘামছে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। এক মিনিট—"

এক লাফে স্লেজের ভিতরে ঢুকে ভাসিলির কাছ থেকে সে বস্তাটা টেনে বের করল। সেটাকে দুই ভাঁজ করে ব্রাউনিকে আগাগোড়া ঢেকে দিল। তার উপরে জিন চাপা দিয়ে বলল, "এবার বেশ গরম হবে রে বোকা।" তারপর ভাসিলিকে বলল, "আজ রাতে যদি আপনার দরকার না হয় তাহলে আমি এপ্রনটা নেব। আমাকে কিছুটা খড়ও দিন।" ভাসিলির কাছ থেকে এপ্রন ও খড় নিয়ে স্লেজের পিছন দিকে গিয়ে বরফে একটা গর্ত করে তার মধ্যে খড় বিছিয়ে দিল। তারপর টুপিটাকে চোখের উপর নামিয়ে 'খালাত'-টা গায়ে জড়িয়ে, তার উপর এপ্রনটা ঢাকা দিয়ে স্লেজের কাঠের পাটাতনে হেলান দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

নিকিতার বিধি-ব্যবস্থায় আপত্তি জানিয়ে ভাসিলি মাথা নাড়তে লাগল

(চাষীদের এই সব আদিম অব্যবস্থাগুলোকে উৎসাহ দেওয়া তার স্বভাব-বিরুদ্ধ); তারপর রাতের জন্য নিজের ব্যবস্থায় লেগে গেল। প্রথমে, স্লেজে বাকি খড় যা ছিল সেটাকে পরিপাটি করে বিছিয়ে নিল; ঊরুর হাড়টা যেখানে পড়বে সেই জায়গায় খড় একটু ঘন করে পেতে দিল। তারপর দস্তানা খুলে স্লেজের দিকটায় মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

যে কারণেই হোক ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল। যেটা তার চিন্তার মুখ্য বিষয় সেটাই তার জীবনের একমাত্র গর্ব, আদর্শ ও লক্ষ্য—অর্থাৎ অর্থ উপার্জন, আরও অর্থ। যে উপায়ে তার কিছু কিছু পরিচিত লোক অনেক টাকা করেছে এবং যে ভাবে তারা সে টাকা ব্যবহার করছে, আর কি ভাবে চললে সেও তাদের মতই আরও অনেক টাকা করতে পারবে—এই সব কথাই সে ভাবতে লাগল। গোভিয়াৎস্কিনস্কির জঙ্গল কেনাটা তার কাছে খুবই বড় ব্যাপার হয়ে দেখা দিল, কারণ তার আশা সেই জঙ্গল থেকে সে এক থোকেই সম্ভবত দশ হাজার রুবল কামাতে পারবে। হেমন্তকালে যে গাছগুলি সে নিজের চোখে দেখে এসেছে মনে মনে সে তার দামের হিসাব করতে লাগল এবং যে দুই 'দেসিয়াতিন' (১ দেসিয়াতিন=২$\frac{৩}{৪}$ একর) দেখে এসেছে তার ভিত্তিতে এখন পুরোটার হিসাব করতে লাগল।

মনে মনে বলল, "ওক গাছটা কাটলে স্লেজ-গাড়ির 'রানার' বানানো যাবে, আর যে অবস্থায় আছে তাতে বরগা হবে। তার কেটে ফেলবার পরে 'দেসিয়াতিন'—প্রতি ৩০ 'সাঝেন' (১ সাঝেন=৭ ফুট) জ্বালানি পাওয়া যাবে।" এইভাবে হিসাব করে তার মনে হল জঙ্গলটার মোট দাম দাঁড়াবে ১২০০০ রুবল, কিন্তু হাতের কাছে নামতার ছক না থাকায় সঠিক অংকটা স্থির করতে পারল না। আবার ভাবতে শুরু করল, "যতই যা হোক, আমি কিন্তু ১০০০০ রুবলও দিচ্ছি না—মাত্র ৮০০০—তাও খোলা জায়গার দরুন বাদসাদ দিয়ে। আমিনের হাতে একশ' বা দেড়শ' রুবল গুঁজে দিলেই সে মাপের বেলায় আমাকে অন্তত পাঁচ 'দেসিয়াতিন' ছাড় পাইয়ে দেবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ৮০০০ রুবলেই মালিক খুসি হয়ে জঙ্গলটা বেঁচে দেবে। তার জন্য তিন হাজার তো হাতে নিয়েই চলেছি; ওতেই সে গলে যাবে।...ওই বাঁকটা যে আমরা কেমন করে ভুল করলাম তা ঈশ্বরই জানেন। কাছাকাছি নিশ্চয়ই একটা বন আছে, আর বন-রক্ষকও আছে। তার কুকুরটারতো আমাদের সাড়া পাওয়া উচিত ছিল। শয়তানের বাচ্চারা দরকারের সময় ডাকে না।"

কোটের কলারটা কানের উপর থেকে সরিয়ে সে কান পাতল। কিন্তু বাতাসের হু-হু, দণ্ডের উপর রুমালটার খস্-খস্, আর স্লেজটার উপর বরফ ছিটকে পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না। সে আবার কান দুটো ঢেকে দিল।

ভাবতে লাগল, "কে জানত যে এ ভাবে এখানে রাত কাটাতে হবে! যা হোক, কাল সকালে তো সেখানে পেঁছবই। তার মানে একটা দিন নষ্ট। তাছাড়া, অন্য লোকগুলোও নিশ্চয় এই আবহাওয়ায় সে দিক মাড়াবে না।"

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, এ মাসের ৯ই তারিখে কসাইরা খাসিগুলো বাবদ তাকে কিছু টাকা দেবে এ রকম কথা আছে।

"টাকাটা বুঝে নেবার জন্য ঐ তারিখের আগে তো আমাকে ফিরতেই হবে। আমাকে সে দর-দামে ঠকাতে পারবে না, কিন্তু আমার স্ত্রী তো দর-দস্তুর করতে মোটেই জানে না। আসলে, কারও সঙ্গে কথা বলতেই সে জানে না।" উৎসব উপলক্ষ্যে গতকাল যখন "স্তানোভয়" (স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট) অতিথি হিসাবে তাদের বাড়িতে এসেছিল তখন যে স্ত্রী তার সঙ্গে মোটেই কথাবার্তা বলতে পারে নি সে কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। "আসল কথা—সে শুধুই একটি মেয়েমানুষ মাত্র। তাছাড়া, আমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সে দেখেছেই বা কি? তার বাবা তো ছিল একজন সম্পন্ন "মুঝিক" মাত্র। একটা ছোট গোলাবাড়িই তো তার একমাত্র সম্পত্তি। কিন্তু এই পনেরো বছরে আমি কী না করেছি? একটা দোকান, দুটো শুঁড়িখানা, একটা কারখানা, একটা শস্যগোলা, দুটো ভাড়াটে বাড়ি, আর মালগুদামসমেত লোহার ছাদওয়ালা একটা বাগান-বাড়ি।" গর্বে সে একেবারে ফুলে উঠল। "আসলে, জেলার প্রধান ব্যক্তি আজ কে? কেন, নিশ্চয় ভাসিলি ব্রেখুনফ!"

সে বলেই চলল, "এটা কেমন করে হল? কারণ সমস্ত মন আমি ব্যবসাতেই ঢেলে দেই আর কঠোর পরিশ্রম করি—অন্যদের মত শুধু শুয়ে থেকে আর খেলা করে সময় কাটাই না। সারাটা রাত ঘুমিয়েও কাটাই না। তুষার-ঝড় হোক বা না হোক, দরকার পড়লেই আমি বেরিয়ে পড়ি, আর তাই ব্যবসাপত্তরও ভাল চলে। সকলে আমাকে বোকা বলে, আমার টাকা উপার্জন দেখে হাসে; কিন্তু তাদের হাসতে দাও ভাসিলি—তুমি কঠোর পরিশ্রম করে যাও; তাতে যদি মাথা ধরে তো ধরুক। দরকার হলে এই ভাবে খোলা জায়গায় রাত কাটাও, তবু সময় নষ্ট করো না। তাতে যদি ঘুম না আসে, তাতেই বা কি! এ রকম ভাবে চিন্তা করার শক্তিই তো বালিশের কাজ করবে," গর্বসহকারে এই সব সে ভাবতে লাগল।

"অনেকে মনে করে, টাকা-পয়সা আসে কপালের জোরে। দূর! লাখে একজনই মিরোনফ্ হয়ে থাকে। না। জোর খাট, ঈশ্বরই তোমাকে বিশ্রাম দেবেন। তিনি যদি স্বাস্থ্য আর শক্তি দেন তো সেই যথেষ্ট।"

একদিন সেও মিরোনফ্-এর মত লাখপতি হতে পারে (এক দিন তো তার কিছুই ছিল না)—এই চিন্তাই ভাসিলিকে এতখানি উত্তেজিত করে তুলল

যে কারও সঙ্গে একটু আলাপ করবার ইচ্ছা জাগল তার মনে। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই। আহা! গোভিয়াৎস্কিনা-তে একবার পেঁছতে পারলে একজন জমিদারের সঙ্গে কথা বলেও সুখ হয়—তাকে কিছুটা ঠকিয়েও মজা হয়!

"হা ভগবান, কী ঝড় বইছে! এত বরফ ছুটছে যে মনে হচ্ছে সকাল হলেও এখান থেকে বের হতে পারব না।"

বরফে চারদিক আবছা সাদা হয়ে আছে। ব্রাউনির কালো মাথা ও তাকে ঢাকা দেওয়া বস্তা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। বাতাসে মাঝে মাঝে বস্তার কোণগুলো উড়ছে: ভা ছাড়া সামনে, পিছনে; চারদিকে শুধু সাদা আর সাদা—কখনও একটু হাল্কা হচ্ছে, আবার পরক্ষণেই ঘন হয়ে বরফ পড়ছে।

সে ভাবতে লাগল, "নিকিতার কথা শুনে কী বোকামিই করেছি। এগিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল; কোথাও না কোথাও তো পেঁছে যেতাম। হয় তো গ্রিশকিনোতেই ফিরে যেতাম; তাহলেও তো তারাস্-এর বাড়িতে আশ্রয় পেতাম। অথচ সারা রাত এখানেই কাটাতে হবে! এতে লাভটা কি হল? যারা নিজে কাজ করে, ঈশ্বর তাদেরই দয়া করেন, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে, বোকাদের নয়। নাঃ, আর একবার ধূমপানের চেষ্টা করতে হচ্ছে।"

উঠে বসল। সিগারেট বের করল। কোটটা দিয়ে বাতাস আটকাবার জন্য উপুড় হল। তবু কোথা দিয়ে বাতাস ঢুকে একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিভিয়ে দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটা কাঠি জ্বেলে সে ধূমপান করতে শুরু করল। এই সাফল্যে তার মন খুসি হয়ে উঠল। যদিও সিগারেটের ধোঁয়ার যতটা সে নিজে টানল তার চাইতে বেশী টেনে নিল বাতাস, তবু তিনটে সুখ-টান দিতে পেরেই সে খুব খুসি হয়ে উঠল। আবার সোজা হয়ে বসে নিজেকে ভালভাবে ঢেকেঢুকে সে নতুন করে সব কিছু ভাবতে লাগল। তারপর একসময় হঠাৎই সে চেতনা হারিয়ে ঝিমুতে লাগল।

কিসের যেন ধাক্কা লেগে তার ঘুম ভেঙে গেল। হয় তো ব্রাউনি তার বিছানার তলা থেকে খড় টেনেছিল, না হয় তো তার ভিতরের কোন গোলমালও হতে পারে; মোট কথা; তার ঘুম ভেঙে গেল—আর তার বুকের ভিতরটা এমন ভাবে ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল যে মনে হল বুঝি বা স্লেজটাই কাঁপছে। সে চোখ মেলে তাকাল। চারদিকে সেই একই দৃশ্য, শুধু একটু আলো বেশী হয়েছে বলে মনে হল।

ভাবল; "হয় তো ভোর হয়ে আসছে। এখনই সকাল হবে।"

হঠাৎ তার মনে হয়, এই আলোর অর্থ তো এও হতে পারে যে চাঁদ

উঠছে। আবার উঠে সে ঘোড়াটার দিকে তাকাল। বাতাসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ব্রাউনি থর্-থর্ করে কাঁপছে। পিঠের উপরকার বস্তায় ঘন হয়ে বরফ জমেছে, জিনটা একপাশে ঝুলে পড়েছে, আর বরফ-মাখা মাথা ও বাতাসে আন্দোলিত গলা ও কপালের ঘাম আরও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। আর নিকিতা? প্রথম যেভাবে ছিল এখনও সেই একইভাবে আছে; যে এপ্রন দিয়ে সে মাথাটা ঢেকে দিয়েছে তার উপরে ও পায়ের উপরে ঘন হয়ে বরফ জমেছে।

স্লেজের পিছন দিকে ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে ভাসিলি ভাবল, "এক-জন 'মুঝিক' কদাপি বরফে জমে যায় না। না, জামা-কাপড় যতই অল্প থাকুক তবু না। এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তথাপি 'মুঝিক'রা বড়ই বোকা—অজ্ঞানতার কাদায় ডুবে আছে।"

একবার মনে হল, ঘোড়ার পিঠ থেকে বস্তাটা তুলে নিয়ে নিকিতার শরীরটা ঢেকে দেবে। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় উঠে গিয়ে সে কাজ করা বড়ই শক্ত। তাছাড়া, ঘোড়াটা আবার বরফে জমে যেতে পারে, সে ভয়ও আছে।

মনে মনে ভাবল, "কি করতে যে নিকিতাকে সঙ্গে এনেছিলাম? সেজন্য ওর বোকামিই দায়ী" (স্ত্রীর কথা মনে পড়ল)।

সে ভেবেই চলল, "আমার খুড়োমশাই এই রকম বরফের মধ্যে একটা রাত কাটিয়েছিল, অথচ তার কোন ক্ষতি হয় নি।" আর একটা ঘটনা মনে পড়তে সে ভাবল, "একবার তো সেবাস্তিয়ান-কে বরফ কেটে বের করতে হয়েছিল। সেবাস্তিয়ান অবশ্য মারাই গিয়েছিল, কারণ সে জমে গিয়ে একেবারে মরার হাড়ের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর চাইতে আমরা যদি গ্রিশ্‌কিনো-তেই থেকে যেতাম।"

নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গরম রাখবার জন্য লোমের কোটটাকে আরও ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে ভাসিলি চোখ বুজে আবার ঘুমুতে চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই ঘুম এল না। আবার সে হিসাব-নিকাশ শুরু করে দিল, বকেয়া ঋণের কথা ভাবতে লাগল। ফলে আরও একবার নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য সে নিজেকেই প্রশংসা ও অভিনন্দন জানাতে লাগল।

কিন্তু যত যাই ভাবুক, সব কিছুর শেষেই দেখা দেয় আতংক, দেখা দেয় বিরক্তি—কেন গ্রিশ্‌কিনো-তেই থেকে যায় নি এই কথা ভেবে।

হঠাৎ সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "ভাব তো! এই মুহূর্তে গরম বিছানায় কেমন মজা করে শুয়ে থাকতাম!"

একটু ভালভাবে শোবার জন্য, বাতাসের হাত থেকে একটু রেহাই পাবার জন্য, বার বার সে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল, কিন্তু প্রতিবারই যেন

আগেকার চাইতে অস্বস্তিকর মনে হয়। শেষ পর্যন্ত আবার উঠে বসল, পা দুটোকে পুরোপুরি ঢাকল, তারপর চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে চেষ্টা করল। তথাপি হয় টপ-বুটের মধ্যে পাটা কন্‌কন্ করে, নয় তো কোন ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে বাতাস ঢোকে; যে অবস্থাতেই থাকুক, এক সময় সক্রোধে তার মনে পড়ে, এই সময়ে গ্রিশ্‌কিনো-তে সে আরামে শুয়ে থাকতে পারত। আবার উঠল, আবার কোটটা জড়াল, আবার নতুন করে শুয়ে পড়ল। এক সময় মনে হল যেন অনেক দূর থেকে মোরগের ডাক ভেসে আসছে; খুসিতে ডগমগ হয়ে সে কোটের কলার নামিয়ে কান পাতল। কিন্তু যতই কান খাড়া করুক, ঝড়ের শোঁ-শোঁ, রুমালের পত্‌-পত্ ও বরফের ছর্‌-ছর্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না।

আর নিকিতা আগের দিন সন্ধ্যায় যে ভাবে শুয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই শুয়ে আছে। একটি বারও নড়াচড়া করে নি, বা ভাসিলির ডাকাডাকিতে সাড়া দেয় নি, যদিও অনেকবারই সে তাকে ডেকেছে।

স্লেজ-এর পিছন দিকটায় ঝুঁকে বরফে-ঢাকা নিকিতার দিকে তাকিয়ে ভাসিলি বিরক্তির সঙ্গে ভাবল, "ওর তো দেখছি ঘুমুতে কোন কষ্টই হচ্ছে না।"

মোট কথা, ভাসিলি অন্ততপক্ষে বিশ বার উঠল আর শুয়ে পড়ল। তার মনে হতে লাগল, এ রাতের বুঝি শেষ হবে না।

একবার উঠে চারদিক তাকিয়ে সে ভাবল, "এতক্ষণে নিশ্চয় সকাল হয়েছে? একবার ঘড়িটা দেখলে কেমন হয়? কিন্তু না, কোটের বোতাম খুললে ঘড়িটা জমে যেতে পারে। তবু একবার যদি বুঝতে পারতাম সকাল হয়ে আসছে, তাহলে অনেক ভাল হত, ঘোড়াটাকে জিন পরিয়ে তৈরি করতে পারতাম।"

কিন্তু ভাসিলি মনে মনে ভালই জানে যে, সকাল হতে এখনও দেরী আছে। অবশেষে লোমের কোটটার বোতাম খুলে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ওয়েস্ট-কোটটা পেয়ে গেল। আরও অনেক কসরৎ করে এনামেলের ফুল-কাটা রুপোর ঘড়িটা বের করল। তাকিয়ে দেখল একটা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সিগারেট ধরাবার সময় যেমন করেছিল সেই ভাবে আবারও দুই কনুই ও পেটের উপর ভর দিয়ে বসে দেশলাইটা বের করে একটা কাঠি জ্বালাতে চেষ্টা করল। এতক্ষণে এ ব্যাপারে সে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে; যে কাঠিতে সব চাইতে বেশী বারুদ আছে সে রকম একটা কাঠি বেছে নিয়ে প্রথম চেষ্টাতেই সেটা ধরিয়ে ফেলল। তখন ঘড়ির ডায়ালটাকে আলোর নীচে ধরে ভাল করে তাকাল। নিজের চোখকেই যে বিশ্বাস করা যায় না! সবে একটা বেজে দশ মিনিট! সারাটা

রাত এখনও বাকী পড়ে আছে।

"উঃ! দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত!" ভাসিলি এমন ভাবে আর্তনাদ করে উঠল যেন বরফের চাঁই ছুটে এসে তার পিঠের উপর আছড়ে পড়েছে। তারপর আবার কোটের বোতাম লাগিয়ে সেটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে স্লেজের এক কোণে গিয়ে বসল। যথাসাধ্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ বাতাসের একঘেয়ে শব্দকে ছাড়িয়ে ভেসে এল একটা নতুন শব্দ—কোন জীবন্ত প্রাণীর শব্দ। শব্দটা বাড়তে বাড়তে চরমে উঠে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। একটা নেকড়ে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জানোয়ারটা খুব বেশী দূরেও নয়; চোয়াল দুটোকে এ-পাশ থেকে ও-পাশে নড়াতে তার ডাকের স্বরের যে তারতম্য হয় সেটা পর্যন্ত বাতাসে ঢাকা পড়ে নি। কানের উপর থেকে কোটের কলারটা সরিয়ে ভাসিলি একাগ্র হয়ে কান পাতল। ব্রাউনিও তাই করছে: সেও হঠাৎ কান দুটো খাড়া করেছে; ডাকটা থামতেই সে পা ঠুকে ঠুকে চিঁ-হিঁ-হিঁ করতে লাগল। ভাসিলি বুঝল, এর পরে আর ঘুমনো অসম্ভব—এক মুহূর্তের জন্যও স্নায়ুকে শান্ত রাখাই অসম্ভব। নিজের ব্যবসা ও হিসাবপত্র, সুনাম, মর্যাদা ও টাকা পয়সার কথা যত ভাবতে চেষ্টা করল ততই ভয় তাকে পেয়ে বসল; আর সে সব চিন্তার সঙ্গে মিশে একটি চিন্তাই তার মনের সামনে ভাসতে লাগল—"গ্রিশ্কিনো-তে কেন রাতটা কাটালাম না?"

আপন মনেই ভাবল, "ঈশ্বর ওই জমিদার আর তার জঙ্গল নিয়ে থাকুন; আহা, ওদের কারও জন্যই যদি আমি না আসতাম! তারই ফলে তো এখানে এইভাবে রাত্রিবাস! লোকে বলে, যারা মদ খায় তারা তাড়াতাড়ি জমে যায়। আজ রাতে আমিও তো মদ খেয়েছি।"

নিজের মনের কথা শুনতে শুনতেই সে কাঁপতে শুরু করে দিল—ঠাণ্ডায় না ভয়ে তা কে জানে। আবার ঢেকেঢুকে শুতে চেষ্টা করল, কিন্তু অসম্ভব। একটা সেকেণ্ডও চুপ করে থাকতে পারে না: মনের মধ্যে যে আতংক জেগেছে তাকে দূর করবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে বার বার ওঠ-বস করতে লাগল। আবার সিগারেট-দেশলাই বের করল; কিন্তু কাঠি আছে মাত্র তিনটি, আর তারও অবস্থা অতি শোচনীয়। বস্তুত, ঠুকতে গিয়ে তিনটে কাঠিই জ্বলেই নিভে গেল।

"তোদের শয়তানে পাক, হতভাগা বাজে মাল সব! চলে যা, ফাঁসিতে ঝুলে পড়!" কাকে যে বকছে সেটা না বুঝেই চীৎকার করতে করতে দুমড়ানো সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দেশলাইটাও সেই পথেই যাচ্ছিল, হঠাৎ হাতটা থামিয়ে বাক্সটাকে পকেটে ভরে রাখল। এত বেশী অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসল যে এক জায়গায় সে বেশীক্ষণ থাকতে পারছিল না।

স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্টটাকে নামিয়ে আবার এঁটে বাঁধতে লাগল।

হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা মাথায় আসায় সে চেঁচিয়ে বলল, "এখানে শুয়ে পড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে থাকব কেন? ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে যাচ্ছি না কেন? পিঠে একজন মাত্র সওয়ার হলে সে আর থামবে না।" এমন সময় নিকিতার কথা মনে হল। "আহা, ও মরল তো কি হল। বেঁচে থেকেই বা ওর লাভটা কি? মৃত্যুতে তার বিশেষ কিছু লোকসান হবে না, কিন্তু বেঁচে থাকলে আমার অনেক লাভ।"

সুতরাং ঘোড়াটাকে খুলে দিয়ে গলায় লাগাম এঁটে সে তার পিঠে চড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু লোমের কোট ও বুটের ভারে প্রতিবারেই সে পিছলে নেমে গেল। তখন স্লেজের উপরে উঠে সেখান থেকে ঘোড়ায় চাপতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার ভারে স্লেজটা এতই কাঁপতে লাগল যে সে চেষ্টাও সফল হল না। অবশেষে তিন বারের বার ঘোড়াটাকে স্লেজের খুব কাছে এনে সাবধানে তার চাকার উপর দাঁড়িয়ে কোন রকমে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল বটে; কিন্তু তার মুখ রইল নীচের দিকে ঝুলে। সেই ভাবেই টানা-হেঁচড়া করতে করতে রেকাবে পা দুটো রেখে ভালভাবে পিঠের ওপর বসে পড়ল। কিন্তু ওদিকে ভাসিলির চাপে কেঁপে-ওঠা স্লেজটার ঝাঁকুনিতে জেগে উঠে নিকিতা ভাসিলিকে কি যেন বলল বলে মনে হল।

ভাসিলি চেঁচিয়ে উঠল, "আরে বোকারাম, তোমার জন্যই তো এত হেনস্তা—অথচ এর কোন কারণই ছিল না।" গ্রেটকোটের কোণগুলো হাঁটুর নীচে গুঁজে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সেটাকে সেই দিক পানে ছুটিয়ে দিল যেদিকে তার মতে বন-রক্ষকের বাড়িটা থাকবার কথা।

॥ ৭ ॥

এপ্রন দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে স্লেজ-এর পিছন দিকটায় শুয়ে পড়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সে একটি বারও নড়াচড়া করে নি। প্রকৃতির কাছাকাছি যারা থাকে এবং তার ফলে দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে যাদের যথেষ্ট পরিচয় থাকে তাদের মতই সেও ধৈর্যশীল, এবং অস্থির না হয়ে বা মন-মেজাজ খারাপ না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকতে পারে। মনিব যে তাকে দু'বার ডেকেছে তা সে শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু নেহাৎই নড়াচড়া করতে চায় নি বা মুখ খুলবার ঝক্কিটা নিতে চায় নি বলেই কোন জবাব দেয় নি; খানিকটা চা পেটে পড়ায় এবং বরফ-স্রোতের মধ্যে বেশ

কিছুক্ষণ মেহনৎ করায় প্রথম যখন সে বসে পড়েছিল তখন তার শরীরটা বেশ গরমই ছিল; কিন্তু সে জানত এ-গরম বেশীক্ষণ থাকবে না, আর সেও এতই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে নতুন করে পরিশ্রম করে শরীরটাকে গরম করবার শক্তিও তার হবে না। তার অবস্থা তখন সেই অতিশ্রান্ত ঘোড়ার মত যাকে বার বার চাবুক কসানো সত্ত্বেও আর চলতে না পেরে থেমে গেছে এবং তার মনিবও বুঝতে পেরেছে যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে খাইয়ে-পরিয়ে না নিলে তার কাছ থেকে আর কোন কাজই পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, ছেঁড়া বুটের ভিতর দিয়ে তার একটা পায়ে বরফ-ক্ষত হয়েছে; ফলে বুড়ো আঙুলটা অসাড় হয়ে পড়েছে এবং সমস্ত শরীর ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ফলে এক সময় তার মাথায় এ ভাবনাও দেখা দিল যে আজ রাতেই সে হয় তো মারা যাবে? অথাপি সে চিন্তাটা তার কাছে বিশেষভাবে অবাঞ্ছিতও নয়, বা আতংকের কারণও নয়। অবাঞ্ছিত নয় এই কারণে যে, তার এতদিনের জীবন কিছু একটানা উৎসবের দিন ছিল না; বরং সে জীবনে ছিল সীমাহীন দাসত্ব, আর সে দাসত্বের বোঝা বয়ে বয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ-চিন্তা তার মনে বিশেষভাবে কোন আতংকের সৃষ্টি করে নি তার কারণ, ভাসিলি আন্দ্রীচ-এর মত যে সব মনিবের অধীনে সে এতদিন কাজ করেছে তাদের প্রতি আনুগত্য ছাড়াও সে চিরদিন নির্ভর করেছে সেই মহান মনিবের উপর যিনি তাকে এই জীবন দিয়েছেন; সে জানে, মৃত্যু হলেও সে সেই মনিবের ভৃত্যই থাকবে. আর তিনি তার কল্যাণই করবেন।

সে ভাবল, "যে জীবন আমি যাপন করছি, যে জীবনে আমি অভ্যস্ত তাকে ছেড়ে যেতে কি আমার দুঃখ হওয়া উচিত? তাছাড়া, যদি যেতেই হয় আমি তো ঠেকিয়ে রাখতে পারব না; কাজেই নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত থাকাই-তো ভাল।"

"আমার পাপ?" অতীতের সব কিছু তার মনে পড়ে গেল—মাতলামির হৈ-হুল্লোড়, মদের পিছনে সর্বস্ব উড়িয়ে দেওয়া, স্ত্রীর প্রতি অপমান, যখন-তখন দিব্যি করা, গির্জায় না যাওয়া, উপবাস থেকে বিরত থাকা, এক কথায় স্বীকারোক্তির সময় পুরোহিত যে সব কাজের জন্য তাকে তিরস্কার করেছিল—সে সব কিছু তার মনে পড়ে গেল। "হ্যাঁ, সে সব নিশ্চয় পাপ; সে কথা আমি কখনও অস্বীকার করি নি; কিন্তু আমি যা হয়েছি সে রকম তো ঈশ্বরই আমাকে বানিয়েছেন। তথাপি সে সব কী ভয়ংকর পাপ! এ পাপের জন্য না জানি আমার কি হবে?"

তারপরেই সে রাতে কপালে কি আছে সে চিন্তা ভুলে গিয়ে তার মন ডুবে গেল স্মৃতির অতলে। মার্থার আগমন, মজুরদের মদের আড্ডা, তাদের সঙ্গে বসে মদ খেতে আপত্তি, বর্তমান অভিযান, তারাস-এর কুটির,

পরিবারটা ভেঙে যাওয়ার আলোচনা, ছোট ছেলেটা, ব্রাউনি এবং যে মনিব এতক্ষণ পর্যন্ত নড়তে-চড়তে তার মাথার উপরকার স্লেজটাতে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করছিল—সব তার মনে পড়তে লাগল।

ভাবতে লাগল, "সেখানে যথেষ্ট চা খেয়েছিলাম; শ্রান্ত হয়েও পড়েছিলাম; সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা আমার ছিল না? অমন আরামের ব্যবস্থা ছেড়ে এসে এই গর্তের মধ্যে মরবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। কিন্তু তার ইচ্ছাটা যে অন্য রকম হল।"

তারপর এই সব চিন্তা ভাসতে ভাসতে তার মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল; সে ঝিমুতে শুরু করল।

তার এই ঝিমুনি ভাঙল যখন ঘোড়ার পিঠে চাপবার জন্য ভাসিলি স্লেজ-এর উপর চড়াতে সেটা কাঁপতে শুরু করল। পিঠে স্লেজের ধাক্কা লাগায় নিকিতা পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। পায়ের উপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে অনেক কষ্টে পা দুটোকে টান করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যথা তার শরীরের ভিতর দিয়ে যেন ছুটে গেল। প্রথম দৃষ্টিতেই ভাসিলির কাণ্ড-কারখানা বুঝতে পেরে সে বস্তাটা ফেলে যেতে অনুরোধ করল, কারণ ঘোড়াটার তো তখন আর বস্তাটার কোন দরকার নেই, অথচ এই ঠাণ্ডায় ওটা দিয়ে সে নিজেকে আরও একটু ভালভাবে ঢাকা দিতে পারবে। সেই কথাটাই সে চীৎকার করে ভাসিলিকে বলল, কিন্তু ভাসিলি তার কথায় কান না দিয়ে বরফ-ঝড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে এখন একা। নিকিতা ভাবতে লাগল, এ অবস্থায় তার কি করা উচিত। সে বুঝতে পারল, কোন লোকালয় খুঁজতে বের হবার মত যথেষ্ট শক্তি তার নেই, আবার সেই পুরনো জায়গায় থাকাও অসম্ভব কারণ বরফ পড়ে-পড়ে গর্তটা এর মধ্যেই ভরে গেছে। স্লেজের মধ্যে ঢুকলেও লাভ কিছু হবে না, কারণ গায়ে জড়াবার মত বাড়তি কিছু সঙ্গে নেই, আর 'খালাত' ও লোমের কোটে আর তার গা গরম হচ্ছে না। বুঝি একটিমাত্র শার্ট পরে থাকলেও এর চাইতে বেশী ঠাণ্ডা লাগত না।

পরিস্থিতি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে।

"ছোট্ট বাবা—স্বর্গবাসী হে আমাদের ছোট্ট বাবা!" সে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠল। সে যে একাকি নয়, এমন একজন যে আছেন যিনি তার কথা শুনতে পাচ্ছেন এবং কখনও তাকে পরিত্যাগ করবেন না, এটা বুঝতে পেরে সে অনেক সান্ত্বনা ফিরে পেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই এপ্রনটাকে মাথায় জড়িয়ে সে স্লেজটার ভিতরে ঢুকল এবং তার মনিবের জায়গাটায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানেও গরম হতে পারল না। প্রথমে আগাগোড়া কাঁপতে লাগল। তারপর কাঁপুনির ধাক্কাটা কেটে গেলে ধীরে ধীরে সে জ্ঞান

হারাল। সে হয় মারা গেল, নয় তো ঘুমিয়ে পড়ল ; দুটো অবস্থার জন্যই সে তখন সমান প্রস্তুত।

॥ ৮ ॥

ইতিমধ্যে যেদিকে বন ও বন-রক্ষকের আস্তানা আছে বলে ভাসিলির ধারণা ঘোড়াটাকে সেইদিকে চালাবার জন্য সে তার গোড়ালি ও চাবুকের হাতল ব্যবহার করছিল। বরফে তার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, বাতাস অবিরাম গতিরোধ করার চেষ্টা করছে। তবু সব রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে ঘোড়াটাকে অবিশ্রাম সামনের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। ঘোড়াটার চলতে কষ্ট হচ্ছে, তবু তার স্বাভাবিক অনুগত ভঙ্গীতে এগিয়েই চলেছে।

মিনিট পাঁচেক ধরে ভাসিলি সোজা সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। এর মধ্যে শুধু ঘোড়ার মাথা ও কান এবং সাদার সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না ; ঘোড়ার কানের উপর দিয়ে ও তার পশমের কোটের কলার ঘিরে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতেও পেল না। হঠাৎ তার সামনে কালো মত কি যেন ভেসে উঠল। তার মন আনন্দে নেচে উঠল ; যেন ইতিমধ্যেই একটা গ্রামের ঘর-বাড়ির দেয়াল দেখতে পেয়েছে এ রকম মনে করে সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বস্তুটা কিন্তু স্থির হয়ে নেই, ক্রমাগত এ-দিকে ও-দিকে দুলছে। আসলে দেখা গেল সেটা কোন গ্রামের চিহ্ন নয়, একটা লম্বা সোমরাজ গাছ ; একটা পাহাড়ের প্রান্তে বেড়ে উঠেছে ; বাতাসের দাপটে তার ডালপালাগুলিই সবেগে নড়ছে। যা হোক, নিষ্ঠুর বাতাসের আঘাতে আঘাতে আন্দোলিত গাছটাকে দেখে ভাসিলি ভয়ে শিউরে উঠল এবং তাড়াতাড়ি আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ; সে একবারও ভেবে দেখল না যে গাছটার দিকে যাবার সময় মোড় ঘোরার দরুন সে তার আগের পথ থেকে সরে এসে আর একটা কোণাকুণি পথ ধরে চলেছে। তথাপি সে যে তার কল্পিত বন-রক্ষকের বাড়ির দিকেই চলেছে এ ধারণা তার মন থেকে গেল না ; তাই ঘোড়াটা যতবার ডান দিকে মোড় নিতে চাইল ততবারই সে লাগাম টেনে তাকে বাঁ দিকে চালাতে লাগল।

দ্বিতীয় বারের জন্য একটা কালো বস্তু তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এবারও তার মন আনন্দে ভরে গেল, কারণ সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে বসল যে ওটা নির্ঘাৎ একটা গ্রাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ওটাও সোমরাজ গাছে ঘেরা একটা পাহাড় মাত্র। প্রথম বারের মতই শুকনো ডাল-

পালার ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ শুনে ভাসিলির ভয় করতে লাগল। যা হোক; ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল সেখানে বরফের উপর অস্পষ্ট ছোট ক্ষুরের দাগ রয়েছে। তার মধ্যে সবেমাত্র একটু একটু করে বরফ জমতে শুরু করেছে। আসল কথা, ওটা তার নিজের ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ। তার অর্থ, সে একই পথে একটা ছোটখাট চক্কর মেরে এসেছে।

সে ভাবল, "দেখছি এই ভাবে ঘুরে ঘুরেই মরতে হবে।" তারপর পাছে ঐ ভয় তাকে পেয়ে বসে তাই সে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ছুটন্ত সাদা বরফের ভিতর দিয়ে তাকালেই কালো কালো বিন্দু চোখে ধরা দিয়েই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হল এমন একটা শব্দ যেন সে শুনতে পেল যেটা কুকুরের ডাক অথবা নেকড়ের গর্জন হতে পারে; কিন্তু শব্দটা এতই ক্ষীণ ও অনিশ্চিত যে সত্যি সত্যি সে কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে না ওটা তার কল্পনামাত্র সে বিষয়েও সে নিশ্চিত হতে পারল না। একটু থেমে সে ভালভাবে কান পাতল।

হঠাৎ একটা গা-শিরু-শিরু-করা চমকে-দেওয়া আওয়াজ যেন তার একেবারে কানের কাছেই ফেটে পড়ল; তার পায়ের নীচে সব কিছু যেন দুলে দুলে কেঁপে উঠল। ঘোড়ার লোম সজোরে আঁকড়ে ধরেও সে কাঁপতে লাগল, আর সেই আওয়াজটা ক্রমেই তীক্ষ্ণতর হতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড ভাসিলি ভাবতেও পারল না বা বুঝতেও পারল না যে কি ঘটছে। অথচ ঘটনাটা আসলে বিশেষ কিছুই নয়; হয় নিজের উৎসাহ বাড়াবার জন্য, আর না হয় তো সাহায্যের কথা জানাবার জন্য তার নিজের ঘোড়াটাই কর্কশ, নাকি সুরে চিঁহিঁ-হিঁ রবে ডেকে উঠেছিল।

ভাসিলি তখন ঢোক গিলে বলে উঠল, "জানোয়ারটা আমাকে কী রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিল! তোর মরণ হোক!" কিন্তু ভয়ের কারণটা জানা সত্ত্বেও ভয় কিন্তু তার মন থেকে গেল না।

"সব কিছু ভেবেচিন্তে নিজেকে সংযত করতে হবে।" সে এরকমটা ভাবল বটে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না; সে নিজের উপর কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে পারল না—ঘোড়াটাকে সেই একই ভাবে সামনে ছুটিয়ে নিয়ে চলল; অথচ একটি বারও খেয়াল করল না যে বাতাসের উল্টো দিকের পরিবর্তে সে বাতাসের দিকেই চলেছে। সারা শরীর, বিশেষ করে নীচের অংশটা, ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ব্যথা করছে, কারণ সেখানকার কোটের বোতামগুলো খুলে গেছে। তার হাত-পাও প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে। নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে। সে নিশ্চিত বুঝতে পারল, এই ভয়ংকর জনহীন বরফের রাজ্যেই তাকে মরতে হবে; কোন কিছুই তাকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ ঘোড়াটা আর্তনাদ করে উঠল; একটা বরফ-স্রোতের মধ্যে তার পা

আটকে গেছে ; যত তার ভিতর থেকে উঠবার চেষ্টা করছে ততই কাত হয়ে ডুবে যাচ্ছে। গতিক ভাল নয় বুঝে ভাসিলি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিল, আর সেই সঙ্গে ঘোড়ার রেকাব ও জিন স্থানচ্যুত হল। কিন্তু ভাসিলি পিঠ থেকে নামামাত্রই ঘোড়াটা সোজা হয়ে দাঁড়াল, সামনে ঝুঁকে বার দুই পা ছুঁড়ল, আর তারপরই সজোরে হ্রেষারব করতে করতে ছুট দিল। ভাসিলি একা পড়ে রইল সেই বরফ-স্রোতের মধ্যে। ঘোড়াটাকে ধরবার জন্য সেও ছুটল, কিন্তু বরফ এত গভীর আর তার পশমের কোটটা এতই ভারি যে প্রতিটি পদক্ষেপেই তার হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবে যেতে লাগল ; বিশ পা চলতে না চলতেই তার দম ফুরিয়ে গেল ; সে থেমে গেল।

তার ভাবনা হল—"কাঠ, কসাইদের খাসি ভেড়া, ভাড়াটে জমি, দোকান, শুঁড়িখানা, লোহার ছাদওয়ালা বাড়ি ও গুদাম, আমার ছোট্ট বংশধর—সবাইকে কি ছেড়ে যেতে হবে? এই কি পরিণাম? না, না, তা হতে পারে না।"

কিন্তু বরফ তার মুখে চাবুকের মত এসে লাগছে; বুঝি তাকে উল্টেই দেবে ; ডান হাতের দস্তানাটা হারিয়ে যাওয়ায় সেটাও ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। এই জনহীন মরুভূমিতে সে একা—ঐ সোমরাজ গাছটার মতই নিঃসঙ্গ—আর এখানেই তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে দ্রুত সমাসন্ন এক অচিন্ত্যনীয় মৃত্যুর জন্য।

"হে স্বর্গের রাণী! হে পবিত্র পিতা সেণ্ট নিকোলাস! তুমি তো আমাদের সংযম শিক্ষা দিয়েছ।" গতকালের ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের কথা, সুবর্ণ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত কালো-মুখ পবিত্র মূর্তির কথা, আর সেই সব মূর্তির সামনে প্রজ্বলিত মোমবাতির কথা অস্পষ্টভাবে মনে আসায় সে কথাগুলি বলল। অথচ এই সব মোমবাতি সেই বিক্রি করেছিল, আবার সোজা তার কাছেই ফিরে এসেছিল, এবং সেও একটুক্ষণের জন্য জ্বালিয়ে সেগুলোকে সিন্দুকে তুলে রেখেছিল। অঘটন-ঘটন-পটীয়ান সেণ্ট নিকোলাসের কাছে বার বার সে মিনতি জানাল এই পরিণামের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে ; বিনিময়ে আর একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান করবার ও অনেক মোমবাতি দেবার প্রতিশ্রুতি সে দিল। অথচ সারাক্ষণ সন্দেহাতীতভাবেই সে জানত যে ঐ কালো মুখ ও স্বর্ণবেদী, ঐ মোমবাতি, পুরোহিত ও ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান ঐ গির্জার মধ্যে যতই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় ব্যাপারই হোক না কেন, এখানে তারা কোন কাজেই লাগবে না ; একদিকে ঐ মোমবাতি ও ধন্যবাদজ্ঞাপন, আর অন্যদিকে তার এই সর্বজনপরিত্যক্ত অবস্থা—এ দুয়ের মধ্যে সত্যিকারের কোন যোগসূত্র নেই।

সে ভাবল, "তবু আমি আশা ছাড়ব না। বরফে ঢেকে যাবার আগেই

ঘোড়ার পায়ের দাগ অনুসরণ করে আমাকে এগোতেই হবে। তাহলেই কোথাও না কোথাও পেঁৗছে যাব। শুধু তাড়াহুড়া করা চলবে না ; নইলে হয় তো আর একটা বরফ-স্রোতে পড়ে আরও নাস্তানাবুদ হব।"

তথাপি ধীরেসুস্থে চলবার সংকল্প করলেও আসলে সে বেশ দ্রুত গতিতেই চলতে লাগল। ক্রমে দৌড়তে শুরু করল ; বার বার আছাড় খেলেও আবার উঠে ছুটতে লাগল ; আবার পড়ে গেল। তার উপর যেখানেই বরফ অপেক্ষাকৃত কম ঘন হয়ে পড়েছে সেখানেই ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না।

অবশেষে সে বলে উঠল, "আমার হয়ে গেল! আমি মোটেই ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখে চলছি না ; ক্রমেই আমি হারিয়ে যাচ্ছি।"

এই কথাগুলি বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে চোখ পড়তেই সে একটা কালো বস্তু দেখতে পেল। সেটা ব্রাউনি! শুধু ব্রাউনিই নয়, সেই শকট-দণ্ড ও তার মাথার সেই রুমালটাও! ঘোড়াটা স্লেজের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক শকট-দণ্ডটার নীচেই। মনে হচ্ছে, যে গিরি-খাদের মধ্যে নিকিতা ও সে আগে পড়ে গিয়েছিল সেই একই খাদেই ভাসিলিও পড়ে গিয়েছিল—আসলে ঘোড়াটা তাকে স্লেজের দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আর যে মুহূর্তে সে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়েছিল তখন এই জায়গা থেকে সে মাত্র পঞ্চাশ পা দূরে ছিল।

॥ ৯ ॥

টলতে টলতে ভাসিলি স্লেজটার কাছে এগিয়ে গেল ; নিজেকে ধাতস্থ করবার ও দম নেবার জন্য স্লেজটাকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিকিতাকে তার আগের জায়গায় দেখতে পাওয়া গেল না, কিন্তু স্লেজের মধ্যে বরফে ঢাকা অবস্থায় কি যেন পড়ে আছে ; ভাসিলি অনুমান করল সেটাই তার চাকর। ভাসিলির মন থেকে ভয় চলে গেছে—বা কিছুটা থাকলেও সে ভয়টা হল পাছে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ার অভিজ্ঞতা, অথবা তার চাইতেও বেশী, বরফ-স্রোতের মধ্যে একাকি পরিত্যক্ত হবার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। আর যাই হোক, সে আতংককে সে আর কিছুতেই আমল দেবে না, আর সেটা করতে হলে তাকে উদ্যমশীল হতে হবে—চিন্তাটাকে কোন কিছুতে লাগাতে হবে। প্রথমেই সে বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য লোমের কোটটা খুলে ফেলল। তারপর কিছুটা দম নিয়ে জুতো থেকে ও বাঁ হাতের দস্তানা থেকে বরফের কুঁচি-

গুলো ঝেড়ে ফেলল (অন্য দস্তানাটা বেমালুম হারিয়ে গেছে, এবং হয় তো কোথাও ইঞ্চি দুই বরফের নীচে চাপা পড়ে আছে) এবং বেল্টটাকে কসে বাঁধল—ঠিক যে রকমটা সে করে থাকে 'মুঝিক'রা গাড়ি-বোঝাই শস্য নিয়ে এলে সেগুলো কিনবার জন্য দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময়। তারপরেই সে কাজে লেগে গেল। প্রথমে ঘোড়াটাকে ঠিক মত বেঁধে সে স্লেজটাতে হাত লাগাল। তখন তার চোখে পড়ল; স্লেজের মধ্যে কি যেন নড়চড়া করছে, আর বরফের ভিতর থেকে নিকিতার মাথাটা বেরিয়ে আসছে। ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া লোকটা অনেক কষ্টে একটুখানি উঠে মুখের সামনে হাত নিয়ে এমন অদ্ভুত একটা ভংগী করল যেন মাছি তাড়াচ্ছে। ভাসিলির মনে হল, সে বুঝি তাকে কিছু বলতে চাইছে। তাই তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাসিলি জিজ্ঞাসা করল, "এখন কেমন আছ? আর কি বলতে চাইছ?"

হাঁপাতে হাঁপাতে নিকিতা জবাব দিল, "শুধু বলতে চাইছি যে আমি —আমি মরতে বসেছি। আমার পাওনা বেতন ছেলে বা স্ত্রী যাকে ইচ্ছা হয় দিয়ে দেবেন।"

ভাসিলি বলল, "তুমি কি জমে গেছ?"

"হ্যাঁ—মরতেও বসেছি।" মাছি তাড়াবার ভংগীতে মুখের সামনে হাতটা নাড়তে নাড়তে ধরা গলায় নিকিতা বলল, "এ কথা আমি ভালই বুঝতে পারছি। খৃস্টের দোহাই, আমাকে ক্ষমা করবেন।"

নিঃশব্দে, নিশ্চলভাবে ভাসিলি দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই হঠাৎ কোন ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় যে রকম স্থির সংকল্পের সংগে সে হাতে হাত চেপে ধরে ঠিক তেমনি স্থির সংকল্পে সে এক পা পিছিয়ে গেল, কোটের আস্তিন গুটিয়ে নিল এবং দুই হাতে নিকিতার শরীরের উপর থেকে এবং স্লেজের ভিতর থেকে সব রকম বরফ তুলে ফেলতে লাগল। তারপর বেল্টটা খুলে লোমের কোটটাও গা থেকে খুলে ফেলল এবং নিকিতার উপর এমনভাবে শুয়ে পড়ল যাতে শুধু কোট দিয়ে নয়, নিজের শরীরের উত্তাপ দিয়েও নিকিতাকে ঢেকে দেওয়া যায়। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। নিকিতাও নিশ্চল হয়ে রইল। তারপর একসময় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ঈষৎ নড়ে উঠল।

ভাসিলি বলল, "দেখলে তো, তুমি ঠিক তাজা আছ, আর বার বার বলেছিলে কিনা মরতে বসেছি। চুপচাপ শুয়ে থাক, গরম হয়ে নাও; আমরা—"

সবিস্ময়ে ভাসিলি অনুভব করল যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না; কারণ তার দুই চোখে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে, নীচের চোয়াল কাঁপছে। হঠাৎ থেমে গিয়ে সে একটা ঢোক গিলল।

ভাবল, "কী বাজে-বাজে দুর্বল হয়ে পড়েছি।" কিন্তু এ দুর্বলতা

তার কাছে অপ্রীতিকর তো মনে হলই না, বরং যে আনন্দের স্বাদ সে আজ পেল তেমনটি আর কোনদিন পায় নি।

গভীর আবেগের বশে সে নিজের মনেই বলল, "হ্যাঁ, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।" অনেকক্ষণ সে চুপচাপ শুয়ে রইল। মাঝে মাঝেই কোটের কোণে চোখ মুছতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার মনে হল, মনের এই আনন্দের কথা অপরকেও জানাতে হবে।

"নিকিতা," সে ডাকল।

"ভাল আছি। বেশ গরম বোধ হচ্ছে।" তার নীচ থেকে কথা ভেসে এল।

"নিকিতা, পুরনো বন্ধু আমার, ভেবেছিলাম আমরা শেষ হয়ে গেলাম। তুমি বরফে জমে গেছ, আর আমি—"

আবার ভাসিলির গলা কাঁপতে লাগল, চোখ জলে ভরে এল, কথা শেষ করতে পারল না।

"না, না; এতে কোন লাভ নেই," নিজের মনেই বলল। "তবু আমি যা জানি তা তো জানিই।" সে চুপ করে রইল। তেমনই শুয়ে রইল। উপরে লোমের কোট, আর নীচে নিকিতার শরীর—দুয়েরই গরম সে অনুভব করতে লাগল। তবু এই মুহূর্তে নিজের হাত-পায়ের কথা সে মোটেই ভাবছে না—তার একমাত্র ভাবনা কেমন করে নীচে শুয়ে থাকা চাষীটিকে আরও একটু গরমে রাখা যায়।

একাধিকবার ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল সেটার পিঠও খোলা পড়ে আছে, কারণ বস্তাটা পিছলে নীচের বরফের উপর পড়ে আছে। একবার ভাবল, উঠে গিয়ে বস্তাটাকে আবার ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে আসবে, কিন্তু পাছে এই আনন্দের রেশটা কেটে যায় তাই মুহূর্তের জন্যও সে নিকিতাকে ছেড়ে উঠতে পারল না। আর আতংক? মনের সে ভাব বহুক্ষণ মিলিয়ে গেছে।

"ঈশ্বরের দোহাই, এবার আমি পরাজয় মানব না!" নিকিতাকে গরম রাখবার প্রচেষ্টার কথা মনে করেই সে কথাগুলি বলল—যে গর্বের সঙ্গে সে কেনা-বেচার কথা বলতে অভ্যস্ত, এখন তার কথায় সেই গর্বের আভাষ।

সেই একইভাবে সে শুয়ে থাকল এক ঘণ্টা—দু' ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা; সময়ের কোন খেয়ালই তার নেই। তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল নানা অস্পষ্ট ছবি। প্রথমে ঝড়, শকট-দণ্ড ও ঘোড়ার ছবি। তারপর উৎসব, তার স্ত্রী; 'স্তানোভয়' ও মোমবাতির বাক্স—সেই বাক্সের নীচে শুয়ে আছে নিকিতা। তারপরই সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। একটার সঙ্গে

আর একটা মিশে একাকার হয়ে গেল—ঠিক যেভাবে রামধনুর সবগুলো রং মিশে একটা উজ্জ্বল সাদা আলো হয়ে ফুটে ওঠে। তারপরই সে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নলীন ঘুমে অনেক সময় কেটে গেল ; ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কিছু কিছু স্বপ্ন-দৃশ্য ভেসে এল। সে যেন মোমবাতির বাক্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর বুড়ি মা তিখোনোভা তার কাছে একটা পাঁচ কোপেক দামের মোমবাতি চাইছে। মোমবাতিটা বের করে তাকে দেবার ইচ্ছা তার হল, কিন্তু তার হাত দুটো যেন আঠা দিয়ে পকেটের মধ্যে সেঁটে দেওয়া রয়েছে। সে বাক্সটার চারদিকে হাঁটতে চেষ্টা করল, কিন্তু পা দুটো নড়ল না, আর তার পরিষ্কার নতুন জুতো জোড়া পাথরের মেঝেতে এমনভাবে আটকে গেল যে জুতো খুলবার জন্য সে পা-ই তুলতে পারল না।

সহসা দেখা গেল, সে বাক্সটা আর বাক্স নেই। একটা বিছানা হয়ে গেছে, আর সেই বিছানায় ভাসিলি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে—ঠিক যেন বাড়িতে তার নিজের বিছানায়ই শুয়ে আছে। সে বিছানায় শুয়ে আছে, অথচ উঠতে পারছে না, যদিও ওঠা দরকার, কারণ 'স্তানোভয়' আইভান মাৎভীচ এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, আর সেও তার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে হয় কিছু কাঠ কিনতে, আর না হয় তো ঘোড়ার পিঠে জিনটা পরাতে—ঠিক যে কোন্‌টা তা সেও জানে না। সে অনবরত স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছে, "তিনি কি এখনও আসেন নি মিকলভ্‌না?" আর তার স্ত্রীও বার বার জবাব দিচ্ছে, "না, এখনও আসেন নি।" এমন সময় সে শুনতে পেল কে যেন গাড়ি হাঁকিয়ে বাইরের সিঁড়ির কাছে এল। নিশ্চয় তিনি? কিন্তু না—গাড়িটা বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল। "তিনি কি এখনও আসেন নি মিকলভ্‌না?" সে আবার জিজ্ঞাসা করল এবং তার স্ত্রী আবার জবাব দিল, "না, এখনও আসেন নি।" তারপর সে বিছানায় শুয়ে আছে তো শুয়েই আছে ; উঠতেও পারছে না ; অপেক্ষা করেই আছে—শুধুই অপেক্ষা : সে অপেক্ষা যুগপৎ বেদনা ও আনন্দদায়ক। হঠাৎ আনন্দটাই পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যার আসার অপেক্ষায় সে ছিল সেই এসে হাজির ; কিন্তু সে তো আইভান মাৎভীচ্‌ নয়, বা অন্য কেউ নয়। অথচ এই সেই 'মানুষ' যার জন্য সে অপেক্ষা করে ছিল। সে এল—সেই 'মানুষ' এল—তাকে ডাকল : যে 'মানুষ' তাকে ডাকল সে এবার চীৎকার করে তাকে বলল নিকিতার দেহের উপর শুয়ে পড়তে। আর 'সেই মানুষটি' আসায় ভাসিলিও খুসি হল। "হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি!" আনন্দে ভাসিলি চীৎকার করে বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল।

হ্যাঁ, সে জেগে উঠল—কিন্তু যখন জেগে উঠল তখন সে যে মানুষ ঘুমিয়েছিল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। উঠতে চেষ্টা করল, পারল না। হাত

নাড়াতে চেষ্টা করল, পারল না। পা নাড়াতে চেষ্টা করল, পারল না। তখন মাথাটা নাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাও পারল না। সে অবাক হল, কিন্তু বিচলিত হল না। তখন তার মনে পড়ল, তার নীচে শুয়ে আছে নিকিতা; আর নিকিতা ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে, জীবন ফিরে পাচ্ছে। তার মনে হল যেন সেই নিকিতা, আর নিকিতা সে, আর তার জীবন এখন আর তার মধ্যে নেই, নিকিতার মধ্যে চলে গেছে। কান খাড়া করে সে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল—হ্যাঁ, নিকিতার অস্পষ্ট, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস। বিজয়োল্লাসে সে নিজেকেই চেঁচিয়ে বলল, "নিকিতা বেঁচে আছে, সুতরাং আমিও বেঁচে আছি!"

তারপর সে ভাবতে লাগল তার টাকা-পয়সা, দোকান, বাড়ি-ঘর, বেচা-কেনা ও মিরনফ্-এর লাখ টাকার কথা। লোকে যাকে ভাসিলি ব্রেখুনফ্ বলে ডাকে সে লোকটাও যাতে তার আকর্ষণ সেই সব বিষয়ের প্রতিই কি ভাবে আকৃষ্ট হয় সেটা সে বুঝতে পারে না। এই ভাসিলি ব্রেখুনফ্ সম্পর্কে তার চিন্তা হল: "পৃথিবীতে সব চাইতে সৎ বস্তু কি তাই সে লোকটি জানে না। আমি যা জেনেছি তা সে কোন দিনই জানতে পারবে না। হ্যাঁ, এখন আমি সেটা নিশ্চিত ভাবেই জেনেছি। শেষ পর্যন্ত—আমি জেনেছি!"

এর আগে যে 'মানুষটি' তাকে ডেকেছিল তারই ডাকে সে আবার শুনতে পেল, আর তার সমগ্র সত্তা যেন আনন্দে ও সহমর্মিতায় সাড়া দিয়ে জবাব দিল: "আমি আসছি, আমি আসছি!" কারণ সে বুঝতে পারছে যে এতদিনে সে মুক্তি পেয়েছে; কিছুই আর তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

আর প্রকৃতপক্ষেও ভাসিলি আন্দ্রীচ এই পৃথিবীতে এর চাইতে বেশী কিছু আর কোন দিন দেখল না, শুনল না, বা অনুভবও করল না।

তাকে ঘিরে তখনও ঝড় বয়ে চলেছে। সেই একই বরফের কুঁচি ঘূর্ণিপাক খেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মৃত ভাসিলি আন্দ্রীচ-এর কোট, কম্পমান ব্রাউনি ও স্লেজগাড়ি (এখন প্রায় অদৃশ্য)-টাকে ঢেকে দিতে লাগল; আর স্লেজ-গাড়ির মেঝেতে মৃত মনিবের দেহের নীচে উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা নিকিতার উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

॥ ১০ ॥

কিন্তু সকালের আগেই নিকিতা জাগল। পিঠে ঠাণ্ডা লাগায় তার ঘুম ভেঙে গেল। এইমাত্র সে স্বপ্ন দেখছিল, মনিবের এক গাড়ি ময়দা নিয়ে সে কল থেকে যাত্রা করেছে; কিন্তু নদীর উপরকার সেতুর উপর না উঠে সে নীচের খাত ধরে যেতে গিয়ে তার মধ্যে আটকে পড়েছে। সে দেখতে পেল, গমের নীচে চাপা পড়ে বস্তাটা ঠেলে তুলবার জন্য সে পিঠটা সোজা করছে।

অথচ, কী আশ্চর্য, বোঝাটা মোটেই নড়ছে না, সব সময় তার পিঠের উপরেই চেপে আছে ; ফলে সে গাড়িটাও চালাতে পারছে না, আবার তার নীচ থেকে বেরুতেও পারছে না। মনে হচ্ছে তার কোমরটাই বুঝি ভেঙে যাবে। আর কী ঠাণ্ডা! যেমন করেই হোক এখান থেকে বেরুতেই হবে। যার জন্য বোঝার চাপে তার পিঠটা ভেঙে যেতে বসেছে তাকে যেন সে বলে উঠল, "ধরে থাক। কিছু বস্তা সরিয়ে নাও।" তবু বোঝাটা ক্রমেই বেশী করে ঠাণ্ডা হতে লাগল, আর ক্রমেই আরও ভারী হয়ে তার পিঠের উপর চেপে বসল। তারপর হঠাৎ কিসে সশব্দে একটা ধাক্কা দিল, আর সেও অমনি সম্পূর্ণ জেগে উঠল ; সব ঘটনাই তার মনে পড়ে গেল। সেই ঠাণ্ডা বোঝাটা—সেটাই তার ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া মৃত মনিব। আর সেই সশব্দ ধাক্কা—ব্রাউনি তার ক্ষুর দিয়ে স্লেজটাকে আঘাত করাতেই সেটা ঘটেছিল।

"আন্দ্রীচ্, আন্দ্রীচ্!" সাবধানে সে তার মনিবকে ডাকল (যদিও আসল ব্যাপারটা সে অর্ধেক বুঝে ফেলেছে)। কিন্তু আন্দ্রীচ্ জবাব দিল না। তার দেহ ও পা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে বোঝার মত শক্ত ও ভারী।

"কোন সন্দেহ নেই যে তিনি মারা গেছেন," নিকিতা ভাবল। সে মাথাটা ঘোরাল, মুখের উপর থেকে বরফ সরিয়ে দিল, তারপর চোখ মেলল। এখন বেশ আলো ফুটেছে। বাতাস এখনও বইছে, বরফ পড়ছে, কিন্তু তফাৎ এই যে এখন আর স্লেজের গায়ে বরফের ঝাপটা লাগছে না, নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে স্লেজ ও ঘোড়াটার উপর ; ঘোড়াটার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

নিকিতা ভাবল, "ব্রাউনিও তাহলে জমে গেছে।" আসলে স্লেজটার উপর সশব্দে যে দুটো ক্ষুরের আঘাত পড়ে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছিল সেটাই ছিল জন্তুটির দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবার শেষ প্রচেষ্টা ; এখন সে মৃত, বরফে জমে পড়ে আছে।

নিকিতা বলল, "হে ঈশ্বর, হে আমাদের ছোট্ট পিতা, তুমি কি আমাকেও নেবে? তাই যদি হয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমাদের দুজন চলে যাবে, আর একজন পড়ে থাকবে, সে যে বড়ই নিষ্ঠুরতা। যথা সময়েই মৃত্যু আসুক।" আবার হাত দুটো টেনে নিয়ে চোখ বুজে সে ঘুমিয়ে পড়ল ; তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এবার সেও সত্যি সত্যিই মারা গেল।

পরদিন দুপুরে রাস্তা থেকে মাত্র সত্তর গজ দূরে আর গ্রাম থেকে আধা ভার্স্ট দূরে কয়েকজন 'মুঝিক' বরফ কেটে ভাসিলি ও নিকিতাকে বের করল।

বরফে স্লেজ-গাড়ি ও শকট-দণ্ডটা সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছিল, শুধু রুমালটা তখনও দেখা যাচ্ছিল। তলপেট সমান উঁচু বরফের মধ্যে একটা জমাট সাদা বস্তুর মত ব্রাউনি দাঁড়িয়েছিল ; তার নাক ও চিবুক শক্ত ঘাড়ের

মধ্যে গোঁজা, নাকের চার দিকে বরফের কুঁচি, চোখ দুটো বরফে ও জমাট চোখের জলে ঢাকা পড়ে চক্‌চক্ করছে। তার উপর ঐ একটি রাতে সে এতই শুকিয়ে গেছে যে শুধু চামড়া ও হাড় ক'খানাই অবশিষ্ট রয়েছে। আর ভাসিলিও একটা জমাট মৃতদেহের মত শক্ত হয়ে গেছে। তার পা দুটো ধরে যখন টান দেওয়া হল তখন মৃতদেহটা একটা জমাট বস্তুর মত নিকিতার উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। তার বাজপাখির মত ভাসা-ভাসা দুটি চোখ জমে শক্ত হয়ে গেছে। ছাঁটা গোঁফের নীচে ঈষৎ হাঁ-করা মুখটা বরফে ভর্তি। সর্বাংগে বরফ-ক্ষত নিয়েও একমাত্র নিকিতাই বেঁচে ছিল। তথাপি সম্বিৎ ফিরে পাবার পরেও তাকে কিছুতেই বোঝান গেল না যে সে মারা যায় নি, এবং এখন যা কিছু ঘটছে সেটা এই জগতের পরিবর্তে পরলোকে ঘটছে না। বস্তুত, 'মুঝিক'রা যখন বরফ কেটে স্লেজটাকে বের করল, ভাসিলির শক্ত দেহটাকে গড়িয়ে নামিয়ে দিল, তখন তাদের চেঁচামেচি শুনে সবিস্ময়ে সে প্রথমেই মনে করেছিল যে 'মুঝিক'রা এই জগতের মতই পরলোকে চীৎকার করছে এবং সশরীরে বিরাজ করছে। শেষ পর্যন্ত যখন সে বুঝতে পারল যে সত্যি সে বেঁচে আছে—এই জগতেই বেঁচে আছে—তখন সে খুসি না হয়ে বিরক্ত হল, বিশেষ করে যখন সে বুঝতে পারল যে তার দুই হাতের আঙুলই বরফের জন্য অসাড় হয়ে গেছে।

প্রায় দু'মাস সে হাসপাতালে পড়ে রইল। তার তিনটে আঙুল কেটে বাদ দেওয়া হল, কিন্তু বাকি ঘাগুলো সেরে গেল। ফলে সে আবার কাজে ফিরে যেতে পারল এবং আরও বিশ বছর বেঁচে রইল—প্রথমে করল মজুরের কাজ, আর পরে বৃদ্ধ বয়সে পাহারাওলার কাজ। বস্তুত, সবে এই বছরেই সে মারা গেছে—নিজের বাড়িতে, দেবমূর্তির পাদদেশে; তার ইচ্ছামতই তার দুই হাতে ছিল জ্বলন্ত মোমবাতি। মৃত্যুর আগে সে তার বৃদ্ধা স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিল। আর মিস্ত্রির ব্যাপারেও তাকে ক্ষমা করল। ছেলে ও নাতি-নাতনিদের কাছ থেকেও সে বিদায় নিল এবং এই ভেবে পরিপূর্ণ সুখে মারা গেল যে তার মৃত্যুতে একটি অকেজো মানুষকে খাওয়াবার হাত থেকে তারা রেহাই পেল, আর সে নিজেও এই একঘেয়ে *ক্লান্ত জীবনকে পরিত্যাগ করে সেই অন্য জীবনে চলে যাবে যার সংগে তার ঘনিষ্ঠতা, যার প্রতি তার আকর্ষণ প্রতিটি বছর, প্রতিটি ঘণ্টায় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেদিন মৃত্যু যখন সত্যি সত্যি এল তখন মৃত্যুর পরে যে জগতে* সে নতুন করে জাগল সেখানে সে কি এখানকার চাইতে ভাল আছে, না মন্দ? তার কি স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, না কি যা আশা করেছিল সত্যি তা পেয়েছে? অচিরেই আমরা সকলেই তা জানতে পারব।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত